অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তম বর্ষ।

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

কলিকাতা

অর্চ্চনা কার্য্যালয়

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট হইতে

শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৫।১২ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, মানসী প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ঐ বাঁধাই ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

অর্চ্চনা সম্বন্ধে মতামত।

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c.—*Statesman & Friend of India.*

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers. It contains articles on various subjects &c.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has, within a very short time, been able to secure an assured place among the vernacular periodicals of the country and amongst the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful and well-written. It is interesting reading and bears ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee.*

ARCHANA—The get up is very taking and it contains many valuable and interesting articles * * This magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

অর্চ্চনা। সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। অর্চ্চনায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হইতেছে।—হিতবাদী।

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে"—বঙ্গবাসী।

অর্চ্চনা। এই মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। * * আমরা এই মাসিকপত্রের উন্নতি কামনা করি।—বসুমতী।

অর্চ্চনা। অর্চ্চনার আলোচনা করিতে আমাদের আনন্দ হয়। অল্প দিনের মধ্যে মাসিক পত্রিকাখানি সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। * * আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অর্চ্চনার উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করি।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

* * এই উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা অর্চ্চনা আজ ছয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্চ্চনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। * * ইহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই পাঠ করা উচিত।—সময়।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

[লেখক ও লেখিকাগণের নাম।]

[লেখক ও লেখিকাগণের নাম।]

[লেখক ও লেখিকাগণের নাম ।]

[লেখক ও লেখিকাগণের নাম।]

'চিত্রাবলী' সম্বন্ধে মতামত।

দেশপূজ্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" পত্রের মন্তব্য—

CHITRAVALI— * * * Remarkable for style and exhibits a characteristic originality which is commendable. The heroes and heroines are not of the ordinary type and scenes of action are various. The paintings are truly realistic and we have no hesitation in declaring the title of the book to be appropriate * * *

বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সাপ্তাহিক "হিতবাদী" পত্রের কথা—

চিত্রাবলী। * * * গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। পুস্তকখানি দেখিতে সুদৃশ্য, প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য।

হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" বলেন—

চিত্রাবলী। * * * গল্পে উপন্যাসের আভাস আছে। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকগণ 'চিত্রাবলী' পাঠে তৃপ্তি পাইবেন। ভাষা ভাল। লেখায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাই।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "সময়" লিখিয়াছেন—

চিত্রাবলী। * * * ইহা একখানি উপাদেয় গল্পগ্রন্থ হইয়াছে। * * রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, প্রভাতবাবু প্রভৃতির গল্প পড়িয়া যে প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, আজি এই গ্রন্থখানি পড়িয়া অনেক দিনের পরে সেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমরা আলোচ্য গ্রন্থ খানিকে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সমশ্রেণীস্থ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই পুস্তকের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে প্রায় সকল রসেরই অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। * * আলোচ্য গ্রন্থে আমরা যেরূপ লিপি কুশলতার পরিচয় পাইয়াছি, আধুনিক উপন্যাস গ্রন্থে তাহা দুর্লভ। পুস্তকের বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং ইহার ছাপা ও কাগজ অতি পরিষ্কার। * * *।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সান্ধ্য সংবাদপত্র "এম্পায়ার" হইতে উদ্ধৃত—

* * Vigorously written and * * distinctly original in conception. One is struck by the fact that the heroes and heroines of the writers are not of the type one ordinarily meets with in Bengali novels. * *

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদ পত্র "এডুকেশন গেজেটের" মত—

চিত্রাবলী। * * * আমাদের খুব ভাল লাগিল।

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুগ্রহলিপি—

মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয় সমীপেষু—

নিবেদন—'আমি সমালোচক নহি, তবে আপনার "চিত্রাবলী" আমি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা, চিত্রাঙ্কণ ও গঠন সকলই আমার সুন্দর বোধ হইয়াছে। ইতি

বশংবদ

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রখ্যাতনামা লেখক ও সমালোচক, সুপ্রসিদ্ধ "উদ্ভ্রান্তপ্রেম" প্রণেতা, "উপাসনা" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র

সদ্‌গুণভূষিতেষু—

সাশীর্ব্বাদ নিবেদন,

* * * 'চিত্রাবলী' আমি পড়িয়াছি। মোটের উপর পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পেরই আখ্যান-বস্তু ভাল, রচনায় নিপুণতা আছে। যে সকল পাঠক গল্প পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহাদের যে এই পুস্তক চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। * *

শুভাকাঙ্ক্ষী—

(স্বাক্ষর) শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের মত—

চিত্রাবলী। অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত গল্পগুলি পড়িয়াছি। অনেকেই ছোট গল্প পড়িতে ভালবাসেন, কিন্তু এই চিত্রাবলীর গল্পগুলি সে ভালবাসার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; কারণ গল্পগুলিতে যথেষ্ট রচনাকৌশল আছে, নূতনত্ব আছে এবং অতুল সৌন্দর্য্যের সহিত অধিকাংশ চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি গল্প এতই করুণ যে, পাঠশেষে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে তাহাদের প্রভাব অনুভূত হয়; ক্ষুদ্রগল্পগর্ভ চিত্রাবলীর পক্ষে ইহা অবশ্যই খুব গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীপাঁচকড়ি দে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখপত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার অভিমত—

* * * ঘটনা বৈচিত্র্যে, ভাষার লালিত্যে এবং বাক্‌চাতুর্য্যের চমৎকারিত্বে গল্পগুলি লেখক মহাশয়দিগের যথেষ্ট কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশে প্রত্যেকটী গল্প প্রকৃতপক্ষেই চিত্তাকর্ষী, লেখকমহোদয়গণ এই মনোরম গল্পগুচ্ছের মধ্য দিয়া শ্রোতৃবর্গের মানসনেত্রের সমক্ষে যে অপূর্ব্ব সৎশিক্ষার প্রতিচ্ছবি আলম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, তৎসকল একদিকে যেমন পাঠকের চিত্তাকর্ষক অপরদিকে সমাজের পক্ষে তেমনই হিতকর। এই গ্রন্থের কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ ও আবরণবন্ধন আধুনিক সময়ের উপযোগী ও উৎকৃষ্ট * * *

ময়মনসিংহ জিলার মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ "চারুমিহিরে" প্রকাশিত হইয়াছে—

চিত্রাবলীর কাগজ, ছাপা এবং বহিরাবরণ মনোরম। রবিবাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কয়েকজন সুলেখক বঙ্গভাষায় কয়েকখানি সুন্দর গল্পের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; চিত্রাবলী তাহার মধ্যে অন্যতম। এই সমস্ত গল্পের সৌন্দর্য্যে বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা চিত্রাবলী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। চিত্রাবলীর গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক; লিপিকৌশল প্রশংসনীয়। সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্যহীন গল্প পাঠ করিতে পাঠকের ক্লান্তি অনুভব হয়; চিত্রাবলী পাঠে তাহা হইবার আশঙ্কা নাই। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, চিত্রাবলী পাঠে বঙ্গীয় পাঠক সুখী হইবেন।

ঢাকা জিলার মুখপত্র সুবিখ্যাত "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশ—

চিত্রাবলী। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাসপ্রিয় পাঠকের মনোমুগ্ধকর। * * * চিত্রাবলী স্বদেশজাত এণ্টিক্ উভ্ কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে; প্রিয়জনকে যাঁহারা গ্রন্থাদি উপহার দিয়া থাকেন, গুণের গৌরবে ও বাহ্য সৌন্দর্য্যে এই চিত্রাবলী তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপে আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৬। [প্রথম সংখ্যা।

রাজকর।

প্রথম প্রস্তাব।

(১)

রাজা রাজ্যশাসন করেন, শাসনব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার শাসনাধীন প্রজামণ্ডলী সাধ্যানুসারে তাঁহাকে কর প্রদান করে, এ পদ্ধতি মনুষ্যসমাজগঠনের প্রথম অবস্থা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রমধ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি বিরাজমান না থাকিলে দলবদ্ধ হইয়া সমাজমধ্যে বাস করিবার উপকারিতা মানব সম্যক্ উপভোগ করিতে পারে না। ফলতঃ যখন হইতে মনুষ্যজাতি আদিম বর্ব্বরতার অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত অকারণ কলহ-বিবাদ করিতে নিরস্ত হইয়াছে এবং একত্র বাস করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই সমাজের সৃষ্টি। আর সমাজের রক্ষণহেতু দুই প্রকারে সমাজমধ্যে শান্তির আবশ্যক, তাহাও পূর্ব্বাবধি মানবজাতি উপলব্ধি করিয়াছে। প্রত্যেক সমাজকে স্বতন্ত্র ও সুগঠিত রাখিবার জন্য উহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ অদম্য দুরাত্মাদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সমবেত চেষ্টা প্রথম সমাজগঠনের সময় হইতেই মনুষ্যজাতিকে করিতে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমার বোধ হয় বহিঃশত্রুর উৎপীড়নে যাহাতে সমাজমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে নিগৃহীত না হইতে হয়, আদিম সমাজে সেই চিন্তাটা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত

হইত। নিজ নিজ পারিবারিক সম্বন্ধহেতু বা স্বেচ্ছায় একত্র সম্মিলিত মানব-সমষ্টির উপর অপর মানবের দল আক্রমণ করিলে কিম্বা তাহাদিগের অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপর দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গ লুণ্ঠন করিবার প্রয়াস করিলে সমাজ-অন্তর্ভূত সকল মানব সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমবেতভাবে চেষ্টা করিত। তাহাদিগের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধি যাহার অধিক, সেই তাহাদিগের নেতারূপে বরিত হইয়া আপন সাহসিকতার দৃষ্টান্তে সকলকে অনুপ্রাণিত করিত।

ক্রমে যখন মানবসমাজ আরও যন্ত্রীকৃত হইল, যখন প্রত্যেকে নিজে নিজে সদাই সশস্ত্র থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পশুর মত বাস করিবার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন একই সমাজের অন্তর্গত এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির বিবাদ হইলে সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার একটা উপায়ও মানবের চিন্তার বিষয়ীভূত হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সমাজমধ্যে যাহার ক্ষমতা অধিক, সেই এই কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইল। সমাজ যখন বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, তখন এই শক্তিই রাজশক্তিরূপে সমাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি হইয়া দাঁড়াইল। দেশ-কাল-অবস্থা-ভেদে এই শক্তি কোথাও এক ব্যক্তির হস্তে, কোথায় এক শ্রেণীর হস্তে, কোথাও বা সাধারণ প্রজামণ্ডলীর প্রতিনিধির হস্তে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইল। ক্ষেত্রবিশেষে রাজশক্তি উপরোক্ত দুই বা তিন সম্প্রদায় ভাগ করিয়া লইল।

সমাজমধ্যে রাজশক্তি যতই কেন্দ্রীভূত হইল, সমাজ যতই যন্ত্রীকৃত হইতে লাগিল, সমাজমধ্যস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের মধ্যে সামাজিক সকল কার্য্যেই শ্রমবিভাগের আদর বাড়িল। যে হস্তে রাজশক্তি নিহিত হইল, তাহাদের পক্ষে শান্তিরক্ষারূপ রাজকার্য্যটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। সুতরাং সাধারণ প্রজাও সে রাজছত্রের ছায়ায় বাস করিয়া নিজ সাধ্যমতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার উপায় করিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার মূল্যস্বরূপ আপনাপন সামর্থ্যানুযায়ী তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হইল। রাজা বা রাজস্থানীয় শাসকসম্প্রদায় যেমন পরিশ্রম করিয়া প্রজার মন হইতে আত্মরক্ষা-চিন্তার বোঝা নামাইয়া দিল, প্রজাও তেমনি আপন কষ্টার্জ্জিত ধনের অংশ দান করিয়া রাজশক্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিল। প্রথমে রাষ্ট্রসংস্থাপনের পরও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অসি-ভল্ল-ধনুর্ব্বাণ বা গদা-মুষল-ভিন্দীপাল লইয়া সমরে

সময়ে প্রজাবর্গকে সমর-প্রাঙ্গনে সমাসীন হইতে হইত। সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা ব্যবহার-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া একজন প্রজা অপরের ধন,মান বা শরীর-সম্বন্ধীয় স্বত্বের হানি করিলে প্রথমাবস্থায় রাষ্ট্রমধ্যে কতকগুলি প্রজা সভা করিয়া সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিত। কিন্তু সমাজ যতই উন্নতির পথে ধাবিত হইল, শ্রমবিভাগ যতই সম্পূর্ণতা পাইতে লাগিল, রাষ্ট্রমধ্যে শান্তিরক্ষার ভার ততই সম্পূর্ণরূপে প্রজার হস্ত হইতে শাসকসম্প্রদায় বা শাসনকর্ত্তার হস্তগত হইল। তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য রাজা একদল বেতনভোগী যোদ্ধা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। প্রাচীন জগতের রাষ্ট্রবাসী যোদ্ধার (Citizen Soldiers) পরিবর্ত্তে ক্রমে বেতনভোগী যোদ্ধার (Mercenary Soldiers) প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। প্রাচীন জগতের পঞ্চায়তী বিচারকদিগের স্থানে রাজা বেতনভোগী বিচারকদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গও তাঁহার শাসন-মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও যোগ্যতানুসারে পরিশ্রম করিয়া জগতপিতার যত্ন-শোভিত স্বভাবের ভাণ্ডার হইতে নানা প্রকার উপভোগের সামগ্রী আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। এক শ্রেণী পার্থিব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া সৃষ্টি-রহস্যের মাহাত্ম্য-নির্ণয়ে জীবনদান করিল, কোনও কোনও মহাত্মা সত্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অন্ধ নরব্রজকে সার সত্যের আস্বাদন দিবার জন্য দেহপাত করিতে লাগিলেন। এ সব শান্তি ভিন্ন সম্ভবে না। জগতে মানব যে আজ সমুদায় সৃষ্ট জীবের স্বামিত্ব উপভোগ করিতেছে,তাহা কেবল শান্তির ছায়ায় বসিতে পাইয়াছিল বলিয়া।

কাজেই এই শান্তি-উপভোগের জন্য মানব শাসনকর্ত্তাকে কর দিতে আরম্ভ করিল। আমার ধারণা এইরূপে রাজস্বদানগ্রহণের প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ক্রমে অপরাপর সকল অনুষ্ঠানের মত এ প্রথা এক্ষণে বিশেষ উন্নত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে করগ্রহণবিষয়ে কি প্রথা অবলম্বন করা উৎকৃষ্ট, তাহা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রাজশক্তি এক হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবার পূর্ব্বে রাজার ক্ষমতা যেরূপ ছিল রাজশক্তি একজনের বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের হস্তে নিহিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক ভীষণ শক্তিরূপে পরিণত হইল। যে পরিমাণে রাজশক্তি বাড়িতে লাগিল, প্রজাশক্তি সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং রাজাকে শান্তির মূল্যস্বরূপ প্রজা যে কর দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ক্রমে নরপতিবিশেষের হস্তে একটা উৎপীড়নের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। যে সকল

ভূপতি প্রজার হিতসাধন জন্য,সাধারণের উপকারিতার উদ্দেশ্যে ঠিক যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক, সেই পরিমাণে কর-গ্রহণ করিয়া প্রজার অর্থে কেবল প্রজার উপকার করিয়া আপনাপন সমাজকে সমৃদ্ধির শিখরে তুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই ইতিহাসে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বহু সহস্র বর্ষ পরেও অদ্যাবধি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রাজকুলের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। আবার আপনার বিলাসবাসনা, ইন্দ্রিয়সুখ বা উৎকট উচ্চাভিলাষ-প্রণোদিত হইয়া, ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া ত্রিভুবন জয় করিবার মানসে কত নরপতি প্রজাপীড়নদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া আশ্রিত প্রজাকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন।

শাসনকর্ত্তা বা শাসকসম্প্রদায়কর্ত্তৃক প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য যে প্রজার মঙ্গলবিধান করা, এ ধারণা প্রাচীন ও আধুনিক সকল সভ্য জাতিদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস বিশুদ্ধ ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত শুদ্ধিমত্তর রাজন "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভুজঃ" দিলীপ রাজার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।

অর্থাৎ দিবাকর যেমন সহস্রগুণ জল প্রতিদান করিবার জন্য পৃথিবী হইতে জলাকর্ষণ করেন, তদ্রূপ রাজা দিলীপও প্রজাবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে করগ্রহণের আদর্শই এই। এরূপ কর প্রজা আনন্দের সহিত প্রদান করে এবং এইরূপে অর্থ ব্যয় করিলে রাজা সকল শ্রেণীর প্রজার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

(২)

আধুনিক রাজনীতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ রাজকরকে, প্রত্যক্ষ (direct) ও পরোক্ষ indirect) এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। কোনও প্রজা হাতে করিয়া উপস্থিত আপনার তহবিল হইতে রাজপুরুষের হস্তে কর প্রদান করিলেই সে কর যে তাহার দ্বারাই প্রদত্ত হয়—অর্থাৎ সে করভার (incidence of taxation) যে তাহাকেই বহন করিতে হয়, তাহা নহে। কতক শ্রেণীর কর অবশ্য যে কর প্রদান করে, তাহাকেই বহন করিতে হয়। অস্মদ্দেশের আয়ের উপর কর (income tax) অথবা রোডশেষ্ (Road Cess) প্রভৃতি কর প্রত্যেক

করদাতা প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের উপর যে সকল কর গৃহীত হয়, তাহা প্রথমে ব্যবসায়ীকে দিতে হইলেও শেষে তাহার ভার সেই সকল দ্রব্যব্যবহারকারী প্রজাকে দিতে হয়। যখন কোনও বণিক বিদেশ হইতে এক গাঁট কাপড় এদেশে আমদানী করে, তখন কাষ্টম-হাউসে তাহাকে একটা কর দিতে হয়। পরে যখন সে কাপড় বিক্রয় করে, তখন সেই শুল্কের হার মত অর্থ কাপড়ের দরের সহিত যোগ করিয়া দিয়া তাহা বস্ত্রক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। আমরা এইরূপে প্রায় প্রত্যেক দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় রাজকর প্রদান করি, তাহা সাধারণতঃ আমাদের মনে স্মরণ হয় না। এমন কি এক পয়সায় দুইটা দিয়াশলাই ক্রয় করিবার কালেও সমস্ত সভ্য জগতের অধিবাসীকে কর প্রদান করিতে হয়। তাহা না হইলে আধুনিক জগতের এ সকল বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব।

প্রাচীন জগতে এই দুই প্রকার ব্যতীত অপর এক প্রকারে প্রজাকে রাজ-কর দিতে হইত। তখন মুদ্রা-ব্যবহার এত বহুল ছিল না। সুতরাং শ্রমজীবীদিগকে ধনদ্বারা রাজকর না দিয়া রাজার জন্য কায়িক পরিশ্রম করিয়া শান্তির মূল্য প্রদান করিতে হইত। সে কথা আমরা পরে বলিব।

প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে আবশ্যকব্যতিরেকে কর গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। প্রজাকে নিষ্পীড়ন করিয়া করগ্রহণ যে রাষ্ট্রের হিতের পক্ষে অন্তরায়, তাহা প্রায় সকল স্মৃতিকার বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি-লেন। ভগবান মনুর আদেশ—

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম
তথা বেক্ষ্যানৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েত সততং করান।

অর্থাৎ যাহাতে নিজে এবং প্রজাবর্গে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ফললাভ করিতে পারেন, এইরূপ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে করনির্দ্ধারণ করা রাজার সতত কর্ত্তব্য। অপিচ—

যথাল্পাল্প মদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।

জলৌকা যেমন অল্প অল্প শোণিতপান করে, বৎস যেমন দুগ্ধপান করে, মধুপ যেমন অল্প অল্প মধুপান করে, রাজারও তেমনি কর্ত্তব্য অল্পে অল্পে প্রজার নিকট কর গ্রহণ করা। পণ্ডিত কুল্লূকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় বলেন—"রাজ্ঞা মূলধনানুচ্ছিন্দতা অল্পোহল্পো রাষ্ট্রাদাব্দিক করো গ্রাহ্য।" অর্থাৎ রাজা

এরূপ বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজার মূলধনের উচ্ছেদ না হয়। বলা বাহুল্য, অধুনা রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতদিগেরও অভিমত যে, রাজকরের দ্বারা কোনও বিশেষ শিল্পের হানি বা মূলধনের বিনাশ সাধিত হওয়া একেবারে অকর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে মহামুনি পরাশর বলেন—

পুষ্পং পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদনং না কারয়েৎ
মালাকার ইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ॥

(পরাশর সংহিতা ১ম সঃ ৫৯ শ্লোক।)

অঙ্গারকার মূলোচ্ছেদ করে, মালাকার কেবল বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। যাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এরূপভাবে রাজস্ব আদায় করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুশাস্ত্রপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকার কর ব্যতীত রাজা প্রজাদিগের দ্বারা আপনাপন কার্য্য করাইয়া লইবারও স্বত্ব রাখিতেন। অস্মদ্দেশের আধুনিক বেগার দেওয়ার প্রথা এই বিধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের ভূমিজাত উদ্ভিদের উপরই প্রধানতঃ রাজাকে রাজস্ব জন্য নির্ভর করিতে হইত। এ সম্বন্ধে মনু বলেন—"ধান্যনামষ্টমে ভাগঃ যষ্ঠো দ্বাদশ এক বা" অর্থাৎ ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য। হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজাই ভূমির অধীশ্বর একথা স্মরণ করিলে এই ষষ্ঠ অংশ আদৌ অযথা বলিয়া মনে হয় না। অনুর্ব্বর ভূমির রাজস্ব ষষ্ঠাংশেরও কম নির্দ্ধারিত হইত। টীকায় কুল্লুকভট্ট বলেন,—"এবং ধান্যানাং ষষ্ঠোঽষ্টমো দ্বাদশো বা ভাগো গ্রাহ্যঃ ভূম্যুৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়া কর্ষণাদিক্লেশ লাঘব গৌরবাপেক্ষোঽয়ং বহ্বল্প গ্রহণ বিকল্পঃ।" অর্থাৎ ভূমির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করিয়া কর্ষণাদিক্লেশের লঘুত্ব-গুরুত্ব বিচার করিয়া করের অংশনির্ণয় করা হইত। এই ভূমির করই চিরকাল ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের প্রধান রাজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভূমিজাত পদার্থের মধ্যে ধান্যব্যতীত অপরাপর দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। যথা—

আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাম্মমধুসর্পিষাম
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্প মূল ফলস্য চ।

পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বেদলস্য চ চর্ম্মনাম
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ ॥ (মনু. ৭ম স)

বৃক্ষ, শস্য মধু ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, বৃক্ষনির্য্যাস, ফল, মূল, পুষ্প, তৃণ, পত্র, শাক, মৃণ্ময় পাত্র, বংশপাত্র, চর্ম্মপাত্র এবং প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যসমষ্টির ক্রয়-বিক্রয় লাভাংশের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজ্যগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন হইত। সুতরাং প্রত্যেক রাজ্যেরই ব্যয় অধিক হইত। ব্রাহ্মণ-প্রভাব যেমন অপরাপর রাজকার্য্যের গতি-নির্ণয় করিত, রাজকরসম্বন্ধেও তাহাদিগের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কর দিতে হইত না।

"ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম।"

অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখনও করগ্রহণ করিবেন না। কেবল তাহাই নহে, এই সকল বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে পালন করা একটী প্রধান রাজকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং চরিত্রবান্ বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রচর্চ্চাকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীর ভরণপোষণের জন্য রাজাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইত।

শ্রুতবৃত্তে বিদিতাস্য বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ
সংরক্ষেত সর্ব্বতশ্চৈনং পিতাপুত্রমিবৌরসং।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির বিষয় এবং চরিত্র অবগত হইয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজা তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি অবধারণ করিবেন এবং স্বপুত্রনির্ব্বিশেষে চৌরাদি সকল প্রকার উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করিবেন।

পণ্য দ্রব্যের উপরও শুল্ক গৃহীত হইত। বিষ্ণু বলেন,—স্বদেশ পণ্যাচ্চ শংশুল্কাদশমমদদ্যাৎ। পরদেশ পণ্যাচ্চবিংশতিতমম্। শুল্কস্থানমশঙ্ক্রামন্ সর্ব্বাপহারমাপ্নুয়াৎ। (বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অঃ) অর্থাৎ স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য বিবেচনায় দশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবে, এবং পরদেশজাত পণ্য হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাশুল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্য নিজ দেশে নির্ম্মিত হইয়া বিদেশে বিক্রীত হইবে, সে সকল দ্রব্যের কর বিদেশী ব্যবহারকারীদিগকে দিতে হয়। সুতরাং সে সকল দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ করিলে বিদেশী প্রজাকে দিতে হইবে এই ধারণায় রপ্তানী মাশুল আমদানী মাশুলাপেক্ষা অধিক হারে নির্দ্ধারিত হইত। এ প্রথা কিন্তু বিদেশে নিজ

দেশজাত পদার্থের বহুল বিক্রয়ের অন্তরায়। বিদেশজাত দ্রব্য অপেক্ষা স্বদেশ-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিবার বাসনাটা মনুষ্যহৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন বিদেশজাত দ্রব্যের মূল্য স্বদেশজাত দ্রব্যাপেক্ষা অল্প হয় তখন লোকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে। এইরূপ শুল্কের ফলে বিদেশে নিজদেশজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা ক্রমে ব্যবসায়ে অনিষ্টোৎপাদন করিবে মাত্র।

খনিজ পদার্থ ক্ষেত্রভেদে অস্বামিক (বে-ওয়ারিস) সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "আকরেভ্যঃ সর্ব্বমাদদ্যাৎ। নিধিংলব্ধা তদর্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাৎ, দ্বিতীয়মর্দ্ধং কোশে প্রবেশয়েৎ।" (বিষ্ণু) আকর হইতে উৎপন্ন সম্পত্তি রাজারই প্রাপ্য। নিধি অর্থাৎ অস্বামিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে, অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, অপরার্দ্ধ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি নিধি পান,তাহা হইলে তিনি সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবেন। অপরাপর প্রজা নিধি প্রাপ্ত হইলে জাতি-হিসাবে সে তাহার কতকাংশ প্রাপ্ত হইত এবং রাজাকে কতকাংশ দিতে হইত। বলা বাহুল্য, এরূপ আয়ের উপর রাজা কখনই নির্ভর করিতে পারিতেন না। দৈবযোগেই নিধি মিলিত। সুতরাং ভূপতি এরূপ আয় দৈবযোগেই লাভ করিতে পারিতেন।

শিল্পিগণকর্ত্তৃক বেগার দেওয়া বা করের পরিবর্ত্তে রাজার জন্য কায়িক পরিশ্রম করা সম্বন্ধে মহামুনি বিষ্ণুর আদেশ এইরূপ—

"শিল্পিনঃ কর্ম্মজীবিনশ্চ শূদ্রাশ্চ মাসনৈকং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ।"

অর্থাৎ শিল্পী, কর্ম্মজীবী এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে।

মনুসংহিতায় এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে—

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাশ্চাত্মোপজীবিনঃ
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥

কারুকর্ম্মকারী শিল্পকর, শূদ্র এবং শ্রমজীবির দ্বারা রাজা মাসিক একদিন করিয়া নিজ কার্য্য করিয়া লইবেন।

জৈনধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও তিনটি ধর্ম্মের বিশেষত্ব আছে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অপর দুইটি ধর্ম্মকে বিভিন্ন-সম্প্রদায়-বিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার অনেকে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে এক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অপর শ্রেণীভুক্ত করেন।

এই তিন ধর্ম্ম একই জাতির মধ্যে প্রচলিত, একই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ও মতাদির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। একথা অনেকে বিশ্বাস করে না এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ একথা স্বীকার করে না। তবে এতদুভয় ধর্ম্মই যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ কতকগুলি হিন্দু-মতের বিরুদ্ধে নূতন মত প্রচার করিবার জন্যই বৌদ্ধ, জৈন, শিখ্, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিয়া বর্ণনা করা হিন্দুধর্ম্মের মতবিরোধী। যে সকল ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মব্যাখ্যা বেদোপবৃংহণ করে না অথবা পবিত্র বেদগাথা হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। বৌদ্ধগণ এবং জৈনসম্প্রদায় বেদের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না, সুতরাং এ দুইটী ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিতে পারা যায় কেমন করিয়া? শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি কোনও সম্প্রদায় বেদের অসম্মান করে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে সামঞ্জস্য করা জৈনধর্ম্মের প্রয়াস এ কথা জৈনগণ স্বীকার করেন না। ফলতঃ বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম অনেক বিষয়ে একমত।

জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরগণ শ্বেত বস্ত্রে আপনাদিগকে সজ্জিত করেন এবং দিগম্বরগণ প্রকৃতপক্ষে দিগম্বর থাকিতে আদিষ্ট হইলেও নানারূপ রঙ্গিন্ বস্ত্র ব্যবহার করেন। এ উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম্মসূত্র নামক গ্রন্থরাজি হইতে আপনাপন ধর্ম্মমত সংগ্রহ করেন। তবে কতক ক্ষুদ্র বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। দিগম্বরগণ আপনাদিগের বিগ্রহকে দিগম্বর রাখেন, শ্বেতাম্বরগণ জিনমূর্ত্তিদিগকে বস্ত্রবিভূষিত করেন।

জিনদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করাই জৈনের পূজা। যে সকল মহাত্মা

নিজ কর্ম্ম-জ্ঞান-সাধনাদ্বারা জগতের মায়া-প্রলোভনাদি জয় করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের জীবনের পবিত্রতা স্মরণ করিলে, যাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলে ভ্রান্ত জীব প্রকৃত পথ দেখিতে পায়, তাঁহাদিগকে ইহারা পূজা করে। ইঁহারাই জিন বা বিজেতা, ইঁহারাই তীর্থকর বা তীর্থঙ্কর, কারণ এই মহাত্মাগণই প্রকৃতপক্ষে এই মর জগত হইতে অমরত্বে তীর্থ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের অপর নাম "অর্হত" অর্থাৎ "পূজনীয়", "সর্ব্বজ্ঞ" এবং "ভাগবত।" যাঁহারা সত্য-তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জিন, তীর্থকর, অর্হত, সর্ব্বজ্ঞ, ভাগবত। আর্য্যাবর্ত্ত-গৌরব ভগবান বুদ্ধ জিনেশ্বর। ইঁহাকে জিনেশ্বর বলা হয় বলিয়াই অনেকে জৈন ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

জৈনদিগের যুগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। ইহাদের আবার ছয়টি করিয়া অংশ আছে। বলা বাহুল্য, কয় বৎসরে এক যুগ হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আপাততঃ অবসর্পিণী কালের পঞ্চম ভাগে আমরা বাস করিতেছি।

এই উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কাল ধরিয়া মুক্তাত্মা জিনদিগের সংখ্যা নির্ণীত হয়। বিগত উৎসর্পিণীতে চতুর্ব্বিংশ জিনমহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে চতুর্ব্বিংশ জন মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও চতুর্ব্বিংশ জন অর্হত জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহারাই জৈনদিগের দেবতা, ইঁহারাই তাহাদিগের আরাধ্য। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপিয়া যে সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট দৃষ্টি-সুখকর জৈন-মন্দির-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে এক একজন তীর্থকর মহাত্মার মূর্ত্তি শত শত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অযুত ভক্তের পূজাগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নলিখিত ২৪ জন মহাত্মা বর্ত্তমান কালের অর্হত—

(১) ঋষভ বা বৃষভ (২) অজিত (৩) সম্ভব (৪) অভিনন্দন (৫) সুমতি (৬) পদ্মপ্রভ (৭) সুপার্শ্ব। (৮) চন্দ্রপ্রভ (৯) পুষ্পদন্ত (১০) শীতল (১১) শ্রেয়স বা শ্রেয়াংশ (১২) বাসুপূজ্য (১৩) বিমল (১৪) অনন্ত (১৫) ধর্ম্ম (১৬) শান্তি (১৭) কুন্থ (১৮) অর (১৯) মল্লি (২০) মুনি সুব্রত বা সুব্রত (২১) নিমি (২২) নেমি (২৩) পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ (২৪) বর্দ্ধমান, মহাবীর বা বীর।

ঋষভ জিন ৮,৪০০,০০০ বৎসর বয়ক্রমকাল অবধি জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার শরীরের আয়তন ৫০০ ধনু পরিমাণ ছিল। দ্বিতীয় অর্হতের বয়স ও আয়তন ইহাপেক্ষা অল্প ছিল এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের বয়স আধুনিক কালের

সাধারণ জীবিতকাল মাত্র ছিল। পরেশনাথ দেব মনুষ্যাকারবিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি শতবর্ষকাল জীবিত ছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর মাত্র ৪০ বৎসর কাল এ পৃথিবীতে জীবনধারণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ২৪ জন দেবতাব্যতীত একাধে ১২ জন চক্রবর্ত্তী, ৯ জন বলদেব, অপর নয়টী দেবতা বা বসুদেব এবং অপর ৯টি প্রতিবসুদেবও জৈনদিগের দ্বারা পূজিত হয়েন। ইঁহাদিগের নিম্নে তাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং গণেশ প্রভৃতি হিন্দুদেবদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহাদিগেরও পূজা করে। আধুনিক জৈনগণ সকল দেবতা অপেক্ষা পরেশনাথেরই অধিক সম্মান করিয়া থাকে।

জীব ও অজীব এই দুই প্রকার তত্ত্ব হইতে সমস্ত জগত সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই জৈনদিগের ধারণা। অজীব পদার্থও চিরস্থায়ী, সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস নাই। পৃথিবী ঊর্দ্ধ, অধঃ, ও নিম্ন এই তিন ভাগে বিভক্ত। স্বর্গ ও নরকেরও অস্তিত্ব এ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে।

জীবাত্মা আবার তিন ভাগে বিভক্ত—(১) নিত্যসিদ্ধ যাঁহারা জিনদিগের মত সদাই অমলাত্ম (২) মুক্তাত্মা বা যাঁহারা সাধনাদি দ্বারা আপনদিগের আত্মা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং (৩) বদ্ধাত্মা বা যাঁহাদিগের আত্মা বাসনাদির দ্বারা সংসারবন্ধনে আবদ্ধ।

তিন প্রকার "রত্ন" আছে, যাহার সাধনায় আত্মার মোক্ষ বা মুক্তি সাধিত হইতে পারে। ১ম সম্যগ্ দর্শন। ২য় সম্যগ্ জ্ঞান। ৩য় সম্যগ্ চরিত্র। নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার ব্রতাচরণ করিলে সম্যগ চরিত্র লাভ হয়।

(১) "অহিংসা পরমোধর্ম্ম"-নীতি সর্ব্বদা পালন করা কর্ত্তব্য, সম্যক চরিত্রলাভের পক্ষে এ শিক্ষা সর্ব্বপ্রথম। মৎস্য-মাংসাদি কোনও প্রকার আমিষের কথা দূরে থাক, জৈনদিগের মধ্যে কেহ কেহ ডুম্বুরাদি বীজযুক্ত ফল ভক্ষণ করে না। কোনও কীট, পতঙ্গ বা সৃষ্টজীব অজ্ঞাতে ভোজন করিবার ভয়ে ইহারা সূর্য্যাস্তের পর মোটেই আহার করে না। কোনও স্থলে বসিবার পূর্ব্বে ইহারা হস্তস্থিত চামরদ্বারা সে স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়। যাঁহারা অতিশয় ধার্ম্মিক, তাহারা পাতলা বস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া থাকে। যাহাতে তাহাদের অজ্ঞাতে বায়ুর সহিত কোনও জীবাণু মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইতে না পারে তজ্জন্য এইরূপ সাবধানতার আবশ্যক।

(২) মিথ্যা কথা বলিওনা—ইহা দ্বিতীয় নীতি।

(৩) চুরি করিও না।

(৪) কায়মনোবাক্যে পবিত্র ও শুদ্ধস্বত্ব হও।

(৫) কোনও বিষয়ে প্রবল বাসনা করিও না।

গৃহস্থাশ্রমাবলম্বী জৈনদিগকে শ্রাবক বলা হয়। সন্ন্যাসীগণকে যতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, বৌদ্ধ শামন বা সন্ন্যাসীদিগের মত জৈন সাধুগণ মঠে বাস করেন।

জৈনগণ জাতিভেদ মানে না। কিন্তু পশ্চিম ভারতের জৈনদিগের পূজাদি কার্য্যসমুদায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিচিত্র পত্র।

(গল্প)

(১)

কদাচিৎ কখনো দুই একটা গ্রাম্য দেশী কুকুরের কেলো, বিট্‌লে, পাগলা এই প্রকারের স্বদেশী নাম থাকিলেও প্রায় শতকরা নিরানব্বইটা পালিত কুকুরেরই ইংরাজী নাম থাকে। যে কুকুরের ঊর্দ্ধতন ১৪।১৫ পুরুষের মধ্যে কাহারও ধমনীতে কখনও দুই চারি বিন্দু বিলাতী রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে তাহার জিম, ডিক্, টেবী, লেটী প্রভৃতি একটা ইংরাজী নাম অনিবার্য্য। সেরূপ কুকুরের দেশী নাম দিলে যেন তাহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়। সুতরাং এই প্রথা অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধা ফক্সটেরিয়ার ও আধা নেড়ি কুকুরটির নাম রাখিয়াছিলাম বিল্। বিল বিশেষ উচ্চবংশসম্ভূত না হইলেও প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার হিসাবে কুকুর সমাজে বেশ নামজাদা ও প্রশংসনীয় ছিল। তাহার চালচলন অঙ্গভঙ্গী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

আমি নূতন কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় কুকুরটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। রেলের কার্য্যে তো আর জীবনে কোন প্রকার সুখ শান্তি নাই সুতরাং প্রবাসে পুরাণো বিশ্বস্ত বন্ধুহিসাবে সেই শারমেয় নন্দনের সঙ্গসুখে দুঃখ লাঘব করিবার মানস করিয়াছিলাম।

তাহার মুখে ছাতাটি দিয়া আমি সান্ধ্য সমীরণ উপভোগ করিতে করিতে আমাদের নূতন রেলওয়ে লাইনের অনতিদূরে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম এবং আপনার ভবিষ্যৎ ও অতীত জীবনসম্বন্ধে নানা কথা লইয়া অলসভাবে গবেষণা

করিতেছিলাম। হঠাৎ কুকুরটার শব্দ পাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের এঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার বিলের গলার কলার ধরিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহার সহিত প্রণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং মুখ হইতে ভূমে ছাতাটি ফেলিয়া বিল্ এঞ্জিনিয়ার সাহেবের এরূপ অযাচিত অনুগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য একটু একটু লাফাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতেছে।

অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার সার্লি সাহেব আমাদের রেলবিভাগে বিশেষ উচ্চপদস্থ সাহেব। আমি ফিরিয়া সেলাম করিয়া আমার ছাতাটি কুড়াইয়া লইলাম। তাঁহার হস্তে কুকুরটিকে দেখিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলাম না দেখিয়া বিল বোধ হয় আমার সাহসিকতার উপর একটু সন্দিহান হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। সার্লি সাহেবও আমার দিকে চাহিয়া ইংরাজিতে বলিলেন—বাবু আপনি আমাদের রেলের ষ্টেসনের শিগ-নালার না ?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাহেব বলিলেন—এ কুকুর পাইলেন কোথা ?

ইহার উত্তরটা একটু লম্বা হইবে অথচ তাড়াতাড়ি ইংরাজি যোগানও বড় বিপদের কথা ইহা বেশ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেও আমি সংক্ষেপে তাঁহার নিকট বিলের জীবনচরিত বর্ণনা করিতে লাগিলাম। আমার ইংরাজী সাহেবের বেশ হর্ষোৎপাদন করিতেছিল বলিয়া বোধ হইল। আমার গল্প শুনিতে শুনিতে সাহেব আপনার পকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া তাহা বিলের কলারের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া বিলকে বেশ বাগাইয়া ধরিলেন। বিলও এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত বেশ বন্ধুর মত আচরণ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। আমার কথা শেষ হইলে সাহেব বলিলেন—বাবু আমার ধন্যবাদ জানিবেন। আপনি যে আমার কুকুরটিকে এরূপভাবে শিক্ষিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশেষ বাধিত হইলাম। এক্ষণে বিদায় (Good night now.)

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম—সাহেব আমি সামান্য লোক, আমি আপনার বিদ্রূপের উপযুক্ত নই। এ কুকুরটি আমার বড় প্রিয়—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—এটি আমারও বড় প্রিয় ছিল ! চুরি যাইবার পর বোধ হয় আপনার প্রিয় হ'য়েছে।

আমি বিরক্ত হইলাম। আর কেহ হইলেও বা একটা ঝগড়া করিতাম। সার্লি সাহেব বড় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং অতিশয় সজ্জন। সুতরাং যতটা পারিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—সাহেব (Sir) আমি উহার জন্মের সময় হইতেই উহাকে দেখিয়াছি। ওর মা টপ্সি আমাদের প্রতিবাসীর গৃহে পালিত হইত। 'ওর বাপ কে তা' অবশ্য বলা যায় না।

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ঠিক্ হ'য়েছে, ওর বাপই আমার কুকুর ছিল। বাবু আপনার বোধ হয় রাত্রে অফিসে কার্য্য করিতে হইবে। আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। আচ্ছা বিদায়।

আমার সেই কথামালার মেষশাবক ও নেকড়ে বাঘের গল্প মনে পড়িল। বুঝিলাম ছাতা মুখে করিয়া আসিতে দেখিয়া সাহেবের কুকুরটির উপর লোভ পড়িয়াছে। এত দিনের প্রেমের বাঁধনটা ছিঁড়িয়া কুকুরটি সাহেবকে দিতে হইবে ভাবিবামাত্র যেন হৃদয়-তন্ত্রে টান পড়িল। বড় কষ্ট হইল। এদিকে সার্লি সাহেবের মত পদস্থ ব্যক্তির সহিত একটা সামান্য কুকুরের জন্য কলহ করাও আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। আমি এরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম সাহেব কুকুরটিকে টানিবার চেষ্টা করিলেন, শেষে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আমার দিকে একটু হাসিয়া সটান সাধারণ ভাবে চুরুট টানিতে টানিতে চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখা গেল আমি সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শেষে সাহেব ও বিল্ আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলাম। একটা যেন ভয়াবহ নির্জ্জনতার ছায়া আসিয়া আমায় ঘেরিল। বিলের অনুপস্থিতিতে আমার সেই ক্ষুদ্র গৃহটি কিরূপ জনমানবহীন গহন কানন সদৃশ ভীষণ দর্শন হইবে তাহা ভাবিয়া বড় আকুল হইলাম!

(২)

পরদিন প্রাতে অফিস হইতে ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে বিল আসিয়া লাঙ্গুল দুলাইয়া লাফাইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তাহাকে পুনরায় নিজ গৃহে দেখিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। বিলের মুখে একখানা পত্র ছিল। আমি ভাবিলাম সার্লি সাহেব আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র দিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি বিলের মুখ হইতে পত্রখানা লইয়া শিরোনামা পড়িয়া বুঝিলাম সার্লি সাহেবের পত্র। চিঠিখানার

লেফাফা কাটা ছিল। সুতরাং মনে হইল সাহেব পড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। বিল্ কোনওরূপে মুক্তি পাইয়া পত্র দেখিয়া অভ্যাসবশতঃ উহা মুখে করিয়া আনিয়াছে।

বিল্-উদ্ধারের প্রথম হর্ষের আবেগটা কাটিয়া গেলে পত্রসম্বন্ধে আমার উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বড় গোল বাঁধিল। শেষে স্থির করিলাম, পত্রখানায় কি লেখা আছে পাঠ করিয়া দেখা ভাল। তাহার আয়তন দেখিয়া সন্দেহ হইল যে উহা অফিস-সংক্রান্ত কোনও পত্র হইতে পারে। সরকারী পত্র হইলে তাহা আমাদের পড়িবার অধিকার আছে, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লেফাফা হইতে পত্রখানা বাহির করিলাম। দেখিলাম তাহা ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে—"Mine own son Charlie (আমার নিজের পুত্র চার্লি)"। এরূপ একটা পাগলামির আরম্ভ দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল উপস্থিত হইল। বিলাতের পত্র লিখিবার প্রথা আমাদিগের পত্র লিখিবার প্রথা হইতে কত স্বতন্ত্র! ছেলে তো সবারই নিজের। সুতরাং সাহেবকে এরূপ একটা আশ্বাস দিয়া পত্র লেখে কে? ভাবিলাম হয়ত এটা একটা সাহেবি পদ্ধতি। সার্লি সাহেবের মত উচ্চপদস্থ সাহেবের এটিকেট্ যে একটা খুব গুরুতর আকারের হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ বিবেচনায় আরও দুই একটা নূতন রকম এটিকেট্ শিখিবার বাসনায় ভদ্রতার সকল নিয়মে জলাঞ্জলি দিয়া অবাধে সেই পরের পত্রখানা পড়িয়া ফেলিলাম। পত্রখানার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

(৩)

কেপ্‌টাউন্। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯—

আমার নিজের ছেলে চার্লি—

তোমার বৃদ্ধ শ্যাম খুড়াকে (uncle Sam) মনে পড়ে কি? যখন তুমি আমায় শেষ দেখিয়াছিলে, তখন তুমি পাঁচ বৎসর বয়সের প্রিয় ক্ষুদ্র আত্মা (dear little soul); আমি যখন তোমাদের কেনসিংটনের বাটীতে যাইতাম, তুমি ছুটিয়া আসিয়া তোমার মধুর প্রিয় স্বরে (sweet dear voice) আমায় সুপ্রভাত বলিতে এবং আমার উপহার লইয়া ছুটিয়া তোমার মাতাকে আমার আগমন সংবাদ দিতে। এখন এ সকল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। সে সামান্য ২৫ বৎসর আজ যেন ২৫ শতাব্দী বলিয়া বোধ হইতেছে।

তোমার পিতা ও আমি উভয়েই অর্থের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি। আমাদের এক ধনী খুড়তুতো ভাই (cousin) ছিল। একদিন তাহার

নিমন্ত্রণ মত তাহার বাটীতে গিয়াছিলাম। লণ্ডনের যত বড় বড় লোক সেদিন তাহার গৃহে সান্ধ্য ভোজন করিতে আসিয়াছিল। আলোকমালা-বিভূষিত সুন্দর পত্র পুষ্প সুশোভিত হইয়া তাহার প্রাসাদসদৃশ হর্ম্ম্য আরব্যোপন্যাসবর্ণিত কোনও প্রাচ্য বাদসাহের প্রমোদপ্রাসাদসদৃশ হাসিতেছিল। আমাকে দেখিয়া একটি কোণে লইয়া গিয়া গৃহস্বামী বলিলেন—শ্যাম তোমার কি একটা সমীচীনতার জ্ঞান (sense of propriety) নাই? তুমি আত্মীয় বলিয়া আজ এই সভায় তোমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আশা করিয়াছিলাম যে তুমি নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া এস্থলে আসিবে না, আর যদি আইস তো উত্তমরূপে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিবে।

বাছা চার্লি (Charlie, my son) যখন আমাদের আত্মীয়ের নিকট এই কথা শুনিলাম, তখন আমার মনের অবস্থাটা কিরূপ হইল তাহা তুমি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে। একটা তীব্র বেদনা আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিল। সেই প্রমোদ-হর্ম্ম্যের প্রত্যেক পতাকাটা যেন আমায় উপেক্ষা করিয়া আমার পরাজয় ঘোষণা করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছিল, সেই রাশি রাশি গোলাপ-ভায়লেট-হানিশাকল পুষ্পগুলা আমাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য যেন তাহাদের সরল পবিত্র বদনে আমার প্রতি চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল। সত্য কথা বলিতে কি, নীচের সংস্পর্শে পবিত্রতার নিদর্শন ফুলগুলাও যে এত লজ্জাহীন হইতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। যাহা হউক, আমি আত্মীয়কে বলিলাম—জো, অপরাধ হইয়াছে। দারিদ্র্য যে পাপ তাহা আমার স্মরণ করা উচিত ছিল—"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমরা যে কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম, তথায় একটি রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থল হইতে সমস্ত হলটি দেখা যাইলেও অন্ধকারহেতু সে স্থল অপরের অদৃশ্য ছিল। আমি রমণীটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার বেশভূষা, হাবভাব দেখিয়া তাহাকে সে সভায় নিমন্ত্রিত বলিয়া বোধ হইল না। তাহার চক্ষু দেখিয়াও তাহাকে পাগল বলিয়া বোধ হইল। আর সে সময় জোসেফের যেরূপ মুখের ভাব হইল, তাহা আজ ২৫ বৎসর পরেও আমি বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। রমণীকে দেখিয়া জোসেফ একটু সরিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা হইতে জোসেফের নীতিজ্ঞানসম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা হইল না। কিন্তু পরের সে গুপ্তকথা বলিয়া তোমার মত যুবকের অনাবিল হৃদয় কলুষিত করিতে চাহি না।

কিন্তু সেই মিলনে কি ঘটনা ঘটিল, তাহা তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারি না। বস্তুতঃ সেই দিন হইতেই আমার জীবনের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। সেই রমণীর নীল-লোচন-নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া জোসেফ একটা কোণের দিকে সঙ্কুচিত হইয়া গমনপূর্ব্বক ভীতিবিহ্বল অর্দ্ধস্ফুট স্বরে রমণীকে সে স্থল হইতে পলাইতে বলিল। রমণী একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আপনার বস্ত্রের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া জোসেফের বক্ষে বসাইয়া দিল। রক্তের স্রোত বহিল। আমি বিস্মিত হইয়া খুন খুন করিয়া চীৎকার করিলাম। নিমন্ত্রিত নরনারী আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটা লোক আমায় ধরিয়া নিম্নে লইয়া আসিল। আমি বিস্মিত হইয়া আমার নির্দ্দোষিতার কথা বলিলাম—কেহ শুনিল না। সৌখীন (fashionable) লণ্ডনাকুল, ভয়ে আমার দিকে চাহিয়া পলাইতে লাগিল।

আমি যখন নীচে আসিলাম, তখন আমাকে যে ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়াছিল সে ব্যতীত আমার নিকট কেহই ছিল না। সে বলিল—"ভীত হইও না। আমি সমস্তই দেখিয়াছি। রমণীর নাম করিলেই প্রভুর নামে কলঙ্ক হইবে। সুতরাং তোমাকেই হত্যাকারী বলিয়া ধরিয়াছি। যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আজই ইংলণ্ড হইতে পলাইবে বা এমন কোনও স্থলে লুকাইয়া থাকিবে যে পুলিস তোমার সন্ধান পাইবে না তাহা হইলে ছাড়িয়া দিতে পারি। একটা নির্দ্দোষ লোকের দণ্ড হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু যদি ধরা পড়, তাহা হইলে জানিও, আমার মত অন্ততঃ ৫।৭ জন বাইবেল চুম্বন করিয়া হলপ করিয়া বলিবে যে, তুমিই হত্যাকারী"।

আমি তাহার কথায় অগত্যা স্বীকৃত হইলাম এবং আর কোন কথা কহিবার অবসর না পাইয়া অলি গলি দিয়া ক্ষিপ্তের মত প্রাণভয়ে পলাইলাম।

সে ব্যক্তি আরও একটা কথা বলিয়া দিয়াছিল। তখন সে কথার অর্থ না বুঝিয়াই তাহার কথা মত কার্য্য করিয়াছিলাম। তাহার কথা মত লণ্ডনের পুলের নিম্নে নদীর ধারে আমার কোট ও টুপি ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)।

প্রভু করি কি !

কোকিল।—

আমি নূতন শব্দে নূতন ছন্দে
রচিয়াছি শত গান,
গাহিয়াছি কত সুমোহন সুরে
হরিয়াছি শত প্রাণ !
প্রতি কথা তার চয়ন করেছি
কত না কষ্ট করিয়া,
জ্বলিছে, ঝকিছে তারা যেন সবে
হীরা কি মুক্তা মতিয়া !
মোর সেই ভাষা বেমালুম চুরি
করিয়া বাঙালী-কবি
ভাবিছে তাহারা গ্রাসিবে আমারে
রাহু গ্রাসে যথা রবি !
তাই ভাবি প্রভু ছাড়িব এ গান
ছাড়িব তার বাঁধুনী।
ছাড়িব আমার হাসি, সুখ, প্রেম
ভুলিব মিছে কাঁদুনী !

ছুছুন্দর।—

পরাণে ব্যথা দিও না প্রভো !
ছাড়িবে সাধের কাঁদুনী ?
তোমারে শিষ্য ছুঁচোর দল
এখনো তো কেহ মরেনি' !
বারেক ফিরে দেখ না চেয়ে
দাঁড়ায়ে তোমার দুয়ারে,
তারা যে সবাই শিষ্য তব
তারা যে তোমার 'পেয়ারে !'
ইঙ্গিত যদি পাই গো মোরা
চষিয়া ফেলিব বাঙলা !
মানসী মোরে করিছে দয়া
রহিব না আর জঙ্গলা !
মোদের গন্ধে জানতো প্রভো !
ছুটিয়া পলায় দেবতা,
তুচ্ছ মানব, তুচ্ছ তাহারা
চুরি করে লেখে কবিতা !

কোকিল।—

শুধু লেখা নয়, আরো বলি শোন—
আমার হাসিটী, কাশিটি—
শুধু তাহা নয়, আরো কহি শোন—
আমার চলাটী ফেরাটী—
আমার চাহনি নয়নের কোণে
করেছে সেটীও হরণ,
আমার দেবতা বিধাতা পুরুষ
করেছে তাঁ'রেও বরণ !
এ দিন দুপুরে ডাকাতি এদের
পুলিশে খবর দেব কি ?
এত চুরি, ভাল লাগে না তো আর !
ভাবি তাই প্রভু করি কি !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

বৌদ্ধমঠে শিক্ষা।

প্রাচীন ভারতের অগণিত মঠ ও বিহারগুলিতে অতি সুচারু প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। সেই শিক্ষাদানের উৎকর্ষ দেখিয়া সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই সকল মঠে কিরূপ ভাবে শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীর চিত্তে কিরূপভাবে জ্ঞানানুরাগের বীজ বপণ করা হইত, তৎসম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প লিপিবদ্ধ আছে। সে গল্পটী এই। একদিন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্রাহ্মণ তাহার বালক পুত্রকে বিষম প্রহার করিতেছেন। ভিক্ষু ব্রাহ্মণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "আমার এই মূর্খ পুত্রটী আমার বংশের কলঙ্কস্বরূপ। এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও পাণিনির সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিতে পারে নাই। ইহাকে প্রতিপালন করিয়া বৃথা কুল-কলঙ্ক-বৃদ্ধিতে আর ফল কি? আপনার ইচ্ছা হইলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারেন।" ভিক্ষু সেই ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি ইহাকে এত পীড়ন করিতেছেন বটে; কিন্তু আপনি শুনিলে বিশ্বাস করিবেন কি যে, এই বালকই পূর্ব্ব জন্মে পাণিনি ছিলেন?" ভিক্ষুর কথায় ব্রাহ্মণের ক্রোধের উপশম হইল না। অগত্যা পিতৃ-পরিত্যক্ত বালককে সঙ্গে করিয়া ভিক্ষু স্বীয় মঠে আনয়ন করিলেন এবং আশ্রয় দিলেন।

বালকটি খায় দায়, খেলা করে, কেহ তাহাকে একটি কথাও বলে না; কেহ তাহাকে শাসনও করে না। পিতার কঠিন শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অকস্মাৎ মঠের স্বাধীন-প্রাঙ্গণে আসিয়া বালকের হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। মনের সাধে খেলা করিয়া খেলার সাধ মিটিল।

ক্রমে তাহার বালসুলভ চাপল্য ও ক্রীড়াশীলতা অন্তর্হিত হইল। ভিক্ষুগণের শান্ত-সংযত জীবনের আদর্শ প্রতিনিয়ত চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া তাহার ভিক্ষু হইবার বাসনা হইল। বালক ভিক্ষু হইল। প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা কিছু জুটিত, তাহাই পরমানন্দে আহার করিত। আর অবসর সময়ে অধ্যয়ন ও ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিত। কয়েক বৎসর মধ্যেই এই অধ্যয়নশীল বালক সমগ্র পাণিনি ও অন্যান্য বিদ্যায় সম্যক্ জ্ঞান-

লাভ করিয়া তাহার পিতা ও আত্মীয়বর্গের পরম আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল।

শিক্ষার্থীর হৃদয়ে জ্ঞানলাভের আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষকের কর্ত্তব্য। অসংযমীকে সংযমের নিগড়ে বাঁধিতে হইলে তাহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত নয়, যে তাহাকে সংযত করা হইতেছে। তাহা হইলে সে আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাকে সংযম অভ্যাস করাইতে হইবে, অসংযমের ভিতর দিয়া। অভিজ্ঞ শিক্ষক নানা ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লন।

এই অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণতনয়কে স্বাধীনতা দিয়া ভিক্ষু তাহার স্বভাব-চরিত্রের গতিবিধি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে তাহার সম্মুখে মঠের উন্নত ও আদর্শ চরিত্রগুলি দেখিয়া বালকের জ্ঞাননেত্র আপনিই উন্মীলিত হইয়াছিল, কেবল ভিক্ষু মহোদয় বালকের অজ্ঞাতসারে তাহার শিক্ষানুরাগিতা কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের মঠে ও আশ্রমগুলিতে এইরূপ ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইত। চরিত্র উন্নত ও জ্ঞান-লিপ্সা সম্যক্ উদ্বুদ্ধ না করিয়া শিক্ষাপ্রদানের নিয়ম ছিল না। শিক্ষকের আদর্শ চরিত্র ও সহযোগী সাধুস্বভাব শিক্ষার্থীবৃন্দের সাহচর্য্য সেই শিক্ষাকে অধিকতর প্রসারিত করিয়া তুলিত।

অতীতকালের এই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বর্ত্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দের কতদূর উপযোগী হইতে পারে, তাহা শিক্ষাদান-রত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের আলোচ্য।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

সাময়িক সাহিত্য।

[লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র ও শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

মধু ও মধুমক্ষিকা।

সম্প্রতি "Review of Reviews" নামক সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী মাসিক পত্রে মধু ও মধুমক্ষিকা-সম্বন্ধে যে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা 'অর্চ্চনা'র পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম; আমেরিকার কোন্ প্রদেশে কত মধু জন্মে,

প্রবন্ধটিতে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতে ভারতীয় মধু-সম্বন্ধে আদৌ আলোচনা হয় নাই। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে,মধু অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইত। বৈদিক সাহিত্যে ইহার ভূরি উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। আর্য্যগণের নিকট মধু এত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় ছিল যে, ঔষধের অনুপানরূপে, এমন কি দেব ও পিতৃকার্য্যেও মধুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতবর্ষে মধুর আদর পূর্ব্ববৎই আছে; তবে পণ্ডিতগণ মধু-অভাবে কখনও কখনও গুড়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, মধু হইতে 'মধুর' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

জগদীশ্বরের সৃষ্ট সমুদয় প্রাণীর মধ্যে মধুমক্ষিকা ক্ষুদ্র হইলেও অতি অদ্ভুত জীব। প্রকৃতিদেবীর পুষ্পভাণ্ডারের সঞ্চিত মধু মনুষ্যজাতির ব্যবহারের জন্যই বুঝি মক্ষিকার সৃজন! মধুমক্ষিকা কোন্ প্রাচীন যুগ হইতে এই ধরাধামে মধুসঞ্চয়কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের আবির্ভাব কাল কখন এবং আদি নিবাসই বা কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে আজি পর্য্যন্ত কোন প্রাণী ও প্রত্নতত্ত্ববিদই সমর্থ হন নাই; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের আদিম অধিবাসিবৃন্দ মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করিত এবং তাহা ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিত।

মিশর এবং মেক্সিকোবাসিগণ সযত্নে মধু রক্ষা করিয়া থাকেন। মেক্সিকো প্রদেশেও মধুর ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে।

সমুদয় পৃথিবীতে বার্ষিক তিন লক্ষ টন অর্থাৎ ৮১ লক্ষ মণ মধু উৎপন্ন হয় এবং তাহার দুই-তৃতীয়াংশ কেবল আমেরিকা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। মধুর প্রয়োজনাধিক্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে মধুমক্ষিকার রক্ষণ ও পোষণ করিয়া যাহাতে সমধিক পরিমাণ মধু সঞ্চিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ এই জন্য প্রতি বৎসর ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার এবং মেক্সিকো প্রদেশে এক শ্রেণীর মধুমক্ষিকা আছে; তাহাদের হুল নাই। তদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় মক্ষিকাসমূহ সেই সকল স্থানে আনীত হইতেছে।

একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ লক্ষ পৌণ্ডের (Pound) অর্থাৎ ছয় কোটী টাকার মধু এবং চার লক্ষ পৌণ্ড (Pound) অর্থাৎ ৬০ লক্ষ টাকার মোম উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতেও যুক্তরাজ্যের মধু ও মোমের অভাব সম্পূরিত হয় না। কিউবা দ্বীপ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা হইতে বাৎসরিক প্রায় ত্রিশ হাজার মণ মধু এবং প্রায় নয় হাজার মণ মোম যুক্তরাজ্যে আমদানী হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী আর্জ্জেণ্টিয়ায় প্রতি বৎসর ১২০০ মণ মধু আমদানী হইয়া থাকে। ব্রেজিল প্রদেশেও মধুর চাষের উন্নতি-চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। চিলি প্রদেশ হইতে বাৎসরিক বার হাজার মণ মধু এবং ৬০ হাজার মণ মোমের উৎপত্তি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। চিলিতেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মধুমক্ষিকা রক্ষিত ও পালিত হইয়া থাকে। সেখানে গড়ে প্রতিবর্ষে এক একটী মধুচক্র হইতে ২৫ সের মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মধুর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধির সহিত জগতের সর্ব্বপ্রদেশেই মধুর আবশ্যকতা বাড়িতেছে। ভারতের নানা স্থানে, অরণ্যে ও উপবনে, লোকালয়ে এবং পর্ব্বতে যথেষ্ট মধু সঞ্চিত হয়। এখানে নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাই মধু সঞ্চয় ও বিক্রয় করে। মধুর উৎপত্তি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজাতিগণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়াছে, এদেশবাসী কোন শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মধুর উৎপত্তি নিশ্চিতই বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহা বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থাগমের একটী নূতন পন্থা সৃষ্ট হইতে পারে।

যৌবন-রক্ষার পন্থা।

বহু গবেষণা করিয়া ও নিজ অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলন করিয়া বিলাতের ডাক্তার স্যালিবি (Dr. Saleeby) দীর্ঘায়ু হইবার কয়টী নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় পুষ্টিকর ঔষধাদি, উত্তম উত্তম খাদ্য ও পেয় দ্রব্যাদি অপেক্ষা ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থাপত্র আশুফলপ্রদ। ইহা ব্যবহার করিবার সামর্থ্য ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না; কিন্তু খুব দরিদ্রের মধ্যে হয় ত অনেকের আছে। ডাক্তার সাহেব বলেন—

(১) প্রত্যহ ছয় পেন্স উপার্জ্জন কর এবং তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর।

(২) আনন্দ, শান্তি, মিতাচার ও বিশ্রামসম্ভোগে থাকিলে ভিষকের দ্বারে গমন করিতে হইবে না।

(৩) বিশ্রাম, সুপথ্য ও চিত্তপ্রফুল্লতা নামক তিনজন বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বোধ হয় কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই; কিন্তু অতিরিক্ত পান-ভোজনে অনেককে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে শুনা গিয়াছে।

(৪) 'অবসাদ'ই মানুষকে মরণ-পথে লইয়া যায়।

(৫) আনন্দ-উৎস জীবনের পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং মানসিক সন্তাপ ও মর্ম্ম-বেদনা আয়ুক্ষয় করে।

(৬) যৌবন রক্ষা করিবার গুপ্তমন্ত্র কর্ম্মশীলতা। পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টভাব অকালে মানুষের বয়স বাড়াইয়া তাহাকে বৃদ্ধশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়।

(৭) যৌবন রক্ষা করিতে হইলে তরুণ-বয়স্কের সংসর্গ রাখিতে হয়—তাহাদের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতে হয়, তাহাদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিতে হয়, কখনও বা তাহা-দের ক্রীড়া ও আমোদে যোগদান করিতে হয়।* ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অপুত্রক অপেক্ষা সপুত্রক দীর্ঘজীবী হয়। সপুত্রকেরা স্ব স্ব সন্তানাদি লইয়া আমোদ-আহ্লাদে নিজেদের অজ্ঞাতসারে কতকটা পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া লয়।

---

* ইহা হইতে আর একটী এই সুফল প্রাপ্তি হয় যে তরুণবয়স্কেরা সহজে উন্মার্গগামী হইতে পারে না।—লেখক।

(৮) নিরুৎসাহিতা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে এবং সকল কার্য্যে সাফল্যের আশা করিবে।

(৯) গত কার্য্যাবলীর জন্য মনকে বিকারগ্রস্ত করিবে না। *

(১০) যতদিন পার 'বালক' থাকিবার চেষ্টা করিবে। বৃদ্ধ হইবার ভাবনাই মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। মন মানবকে যে পরিমাণে বৃদ্ধাবস্থায় আনিয়া ফেলিবে, মানবও সেই পরিমাণে বৃদ্ধ হইবে। সুতরাং মনকে এই বিষয়ে সংযত রাখা আবশ্যক।

প্রেতের প্রতিদান।

(বিদেশী গল্প।)

মানুষের জীবনে এমন এক একটী ঘটনা ঘটে, যাহার স্মৃতি আজীবন জাগরূক থাকিয়া যায়। শত শোক-তাপ ব্যথার মাঝে, অশ্রান্ত কর্ম্মময় জীবনের ক্ষণিক অবসরের মধ্যে আমার জীবনে তেমনই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল;—আজিও এই মর-জীবনের অন্তিম দশায় তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই।

আমার পিতা কালিফর্ণিয়ার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক বিশ্লেষক (Chemical Analyser) ছিলেন এবং তাঁহার উপার্জ্জনের মাত্রাও অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং জন্ম-কাল হইতে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি অতুল বিভব ও সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আদর ও স্নেহভোগ আমার এই দগ্ধ অদৃষ্টে ছিল না। বোধ হয়, সেই জন্য আমার পরম স্নেহময়ী জননী আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া লোকান্তর-প্রস্থিতা হইলেন,—আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না।

আমার বেশ স্মরণ আছে, মাতার শোকে পিতা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজকর্ম্মে তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। এই দারুণ দুঃখের সময় তিনি সকলের সহবাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার শৈশব-বন্ধু সহপাঠী জোসেফ্ কটনের সঙ্গ ছাড়েন নাই। জোসেফ্ কটন কোন খনির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং খনির অভ্যন্তরে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালে ডিনামাইটের আকস্মিক বিস্ফোরণে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি যখন হাঁসপাতাল হইতে এই অকর্ম্মণ্য জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমার পিতা অতি যত্নে তাঁহার বাল্যসুহৃদ্‌কে গৃহে স্থান দেন এবং তাঁহাকে অতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই মাতৃহীন শিশুর—অর্থাৎ আমার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন।

---

* আশায় ভগ্নমনোরথ হইলে সে বিষয় মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে, অন্যথা এই নিরুৎসাহিতাই পুনরায় হৃদয় অধিকার করিবে।—লেখক।

সুতরাং জোসেফ্ কটন একদিকে যেমন আমার পিতৃ সুহৃদ্, অপর দিকে তেমনই আমার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তেমন স্নেহময় হৃদয় আমি আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না।

জোসেফ কটনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল—তাহার নাম মেরী। অতি শৈশবেই মেরীর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়; সে জন্য আমার শিক্ষক মহাশয়ই তাঁহাকে লালন-পালন করিবার ভার গ্রহণ করেন। মেরী ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। তিনি নিজে চিরকুমার ছিলেন।

মেরীর বয়স তখন তিন বৎসর এবং আমার বয়স পাঁচ বৎসর। আমরা দু'জনে একত্র খেলা করিতাম, খাইতাম, বেড়াইতাম। মেরী দোলায় চড়িত, আমি দোলা টানিয়া তাহাকে "দোল' খাওয়াইতাম। প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মেরীর 'পেরাম্বুলেটর' ঠেলিতে না দিলে আমি রাগ করিতাম। কখনও মাঠের ধারে গাছের তলায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া মেরীকে ফুল কুড়াইয়া দিতাম,—মেরী সুশুভ্র কুন্দদন্ত বিকাশ করিয়া মধুর হাসি হাসিত, আমিও আনন্দে নৃত্য করিতাম।

মানসিক প্রফুল্লতার একেবারে হ্রাস হওয়াতে আমার পিতার মস্তিষ্কের রোগ জন্মিল এবং তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে সহর ছাড়িয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য একটী পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে আসিলেন। সঙ্গে রহিলাম আমি, আমার গৃহশিক্ষক জোসেফ্ কটন্, মেরী এবং মেরীর গভার্ণেস্ (governess)।

আমরা যে বাটী ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার পশ্চাদ্দেশে একটী বাগান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে দেখিতাম, একজন মালী গাছের গোড়ার মাটী কাটিয়া দিতেছে, গাছগুলির পাতা "কেয়ারী" করিতেছে, ফলগুলিতে পাতলা ক্যাম্বিসের (canvas) আবরণ দিতেছে। আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে কোনও কোনও দিন তন্ময় হইয়া যাইতাম। আমার গৃহশিক্ষক ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সুশিক্ষার ইঙ্গিতে উত্তরকালে আমার হৃদয় কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই বৎসর সেখানে থাকিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আমার পিতা এখন বেশ সারিয়াছেন এবং নিজকার্য্যেও যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারিয়াছেন।

তারপর নিরবচ্ছিন্ন সুখে প্রায় পনের বৎসর জলস্রোতের মত কাটিয়া গেল। আমি এখন গৃহ ছাড়িয়া "কর্ণেল" বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছি এবং মেরী চিকাগোর কোন কালেজে ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে নিয়োজিত আছে।

অকস্মাৎ একদিনের প্রবল ভূমিকম্পে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আমাদের বাসগৃহ ও পিতার বিস্তৃত ও বহুমূল্য রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Laboratory) ভূমিসাৎ হইল। আমার পিতা তখন পরীক্ষাগারে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দৈব-ক্রমে আমার গৃহশিক্ষক জোসেফ কটনের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। এই ভূমিকম্পে আমাদের সর্ব্বস্ব গেল, আমরা পথের ভিখারী হইলাম।

এই আকস্মিক জীবন-চক্রের পরিবর্ত্তনে আমরাও দেশান্তরিত হইলাম। চিকাগো নগরীর

প্রান্তভাগে আমার গৃহ-শিক্ষকের কোন পুরাতন বন্ধুর একটি ক্ষুদ্র বাটী ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া মিষ্টার কটনের কথায় তাহা ছাড়িয়া দিলেন। আমরা তিনজনে মেরী, মিঃ কটন ও আমি—সেখানে অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলাম।

মিঃ কটন আমাদের উভয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মেরী গৃহকর্ম্ম করিত, আর আমি সারাদিন কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মিঃ কটন রাত্রে আমায় লইয়া বসিতেন, এবং পুরাতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ তিনি বলিয়া যাইতেন আর আমি লিখিতাম। এই প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, আমাদের তিন জনের তাহাতে কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

ক্রমাগত চারি পাঁচ মাসকাল অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর আমি কোন একটি নৈশ-বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানের অস্থায়ী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। বেতন অতি সামান্য, কিন্তু কি করিব এই কর্ম্ম গ্রহণ করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিল না।

এখন সারাদিনমানটা বাড়ীতে বসিয়া থাকি। কোন কাজ কর্ম্ম নাই, মেরী ও আমি দুজনে বসিয়া বসিয়া সতরঞ্চ খেলি। আমার গৃহ-শিক্ষক মিষ্টার কটন সতরঞ্চ খেলায় বিশেষ দক্ষ। তিনি দুইজনকেই 'চাল' শিখাইয়া দেন। এই দাবা খেলা আমার এখন একটা নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমাগত এক বৎসরের অভ্যাসে দাবা খেলায় আমার এরূপ নিপুণতা জন্মিয়াছে, যে এখন বাহিরে বন্ধুগণের গৃহে খেলিয়া জয়ী হইয়া আসিতাম। কাচিৎ যে দিন হারিতাম, সে দিন সেই 'চালের' বিষয় মিঃ কটনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে নানা রকমের চাল শিখাইয়া দিতেন। আমি সেগুলি বেশ যত্নপূর্ব্বক মনে রাখিতাম।

আমার দুরদৃষ্টক্রমে আমার পিতৃপ্রতিম স্নেহাধার গৃহ-শিক্ষকের মৃত্যু হইল—মেরী মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মেরীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মিঃ কটন তাঁহার বন্ধু চার্লসকে একখানি লিখিত কাগজ দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার মর্ম্ম জানিতাম না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পরও যে আমরা মিষ্টার চার্লসের বাটীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চিতই আমার স্বর্গগত গৃহ-শিক্ষকের অনুরোধে।

এইরূপে আরও তিন মাস অতি কষ্টে কাটিল,—আর দিন চলে না। আমি সারাদিন দাবা খেলি, আর রাত্রিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করি। একদিন শুনিলাম, আমার কর্ম্ম আর একমাস অবধি থাকিবে, তারপরে থাকিবে না। আমি বিষম প্রমাদ গণিলাম। সেই দিনই মেরীকে এ কথা শুনাইলাম। মেরী বলিল, "ভাবিলে কি হইবে? ভগবান্ একটা উপায় অবশ্যই করিবেন।"

আমরা যে পল্লীতে ছিলাম, সে পল্লীর রাস্তাগুলি খুব সরু সরু ছিল। একদিন বাটীতে বসিয়া আছি, একজন মিউনিসিপালিটীর লোক আসিয়া একটা 'নোটীস' দিয়া গেল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"আর দেড় মাস পরে যে প্রশস্ত পথ এই পল্লীতে প্রস্তুত হইবে, তাহা আপনার বাটীর উপর দিয়া যাইবে। সুতরাং আপনি অনূন ৩৫ দিনের মধ্যে এই বাটী খালি করিয়া দিবেন এবং এই 'নোটীস' এ বাটীর অধিকারীকে দিবেন।"

বিপদের উপর বিপদ। আমাদের সম্মুখে অভাব, দৈন্য ও নৈরাশ্যের কি মর্ম্মভেদী ছবি! মেরীর চিরপ্রফুল্ল মুখেও যেন চিন্তার ছায়া নিপতিত হইয়াছিল।

আর তিন দিন পরে আমার বিদ্যালয়ের চাকরী যাইবে—সকালে উঠিয়া তাহাই ভাবিতেছি। মেরীর ও আমার অবস্থা কিরূপ হইবে, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছি। এমন সময় পিয়ন আসিয়া আমার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিয়া গেল। সেই কাগজের একস্থলে একটী বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে এই লেখা ছিল যে—"নিউইয়র্কের কোন ধনবান ব্যক্তি মৃত্যুকালে সেখানকার একটী দাবা খেলার সভায় (Chess Institute) এককালীন বহুমুদ্রা একটী বাটী এবং কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রস্তাব-অনুসারে একটী সতরঞ্চ ক্রীড়ার সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হইবে। যিনি এই পরীক্ষায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকে এককালে সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তিনি এই সতরঞ্চ-সভার সম্পাদক হইবেন। আরও তাঁহাকে বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড বেতন ও সভা-সংলগ্ন একটি বাটীও থাকিবার জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ নিজ নাম ধাম পাঠাইবেন। শুনিলাম, এই বিজ্ঞাপন তিন মাসেরও অধিককাল বাহির হইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একদিনও ইহা আমার নজরে পড়ে নাই। আর দিন নাই ; আমি তাড়াতাড়ি আমার নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া দিলাম। তারপর পত্র পাইলাম, ১৫ই জুন আমাকে নিউইয়র্কে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই দিন হইতে প্রতিযোগিতা-ক্রীড়ার আরম্ভ হইবে।

যাহা হউক নির্দ্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, গ্যালারি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই দিকে দুই প্রস্থে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে আমার পালা আসিল। সেইদিন যাহাদের সহিত খেলিলাম, প্রতিযোগিতায় তাহারা সকলে হারিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবসেও সকলে হারিল। অপর প্রস্থেও একজন কানাডাবাসী সকল ক্রীড়ার্থীকে হারাইয়া দিয়াছিল। এইবার তাঁহার ও আমার দুইজনের পালা। আজ তৃতীয় দিন ; এইবার আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানস-চক্ষে আমার স্বর্গীয় গৃহ-শিক্ষকের প্রতিমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল,—মনে মনে ভাবিলাম হায়! আজ আপনি কোথা? আপনার স্নেহের ছাত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে যেন পরীক্ষায় জয়লাভ করে!

আমার প্রতিযোগী প্রৌঢ়, আর আমি যুবক। দর্শকমণ্ডলীর সহানুভূতি আমারই দিকে বেশী। খেলা আরম্ভ হইল, চালের পর চাল, চালের পর চাল চলিতে লাগিল। ক্রমে আমার খেলা খারাপ হইয়া আসিল, বলও অনেক কমিয়া গেল। আমি প্রমাদ গণিলাম। অবশেষে আমার প্রতিযোগী আমাকে হারাইলেন, আমি "মাৎ" হইলাম। তিনি আনন্দের অত্যধিক আবেগে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছক্ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাহাতে দর্শকগণের মধ্যে ও বিচারকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্থির হইল, প্রথম পারিতোষিক দুই ভাগে বিভক্ত করা হউক। কানাডাবাসী না হয় সেক্রেটারী হউন। কিন্তু পুরস্কারের অর্দ্ধেক টাকা এই যুবকের প্রাপ্য। আমার প্রতিযোগী তাহা শুনিলেন না, তিনি বলিলেন, "দাতার প্রস্তাবমতে প্রথম পুরস্কার সম্পূর্ণই আমার প্রাপ্য, আমি কাহাকেও অংশ দিব না। কাল

পুনরায় খেলা আরম্ভ হউক, আমি বাজি নিশ্চয় জিতিব। আর ছক ভাঙ্গিয়া দিব না।" বিচারকগণের মতে তাহাই ঠিক হইল।

সেইদিন রাত্রে যখন নিরাশহৃদয়ে শয্যায় শয়ন করিলাম, তখন গুরুদেবের মূর্ত্তি মনে পড়িতেছিল। যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তখন স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার স্বর্গীয় গৃহ-শিক্ষক মিষ্টার কটন আসিয়াছেন এবং কাল খেলিতে যাইবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। আরও বলিতেছেন, ভয় নাই, কল্যাকার খেলায় তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। তোমার পিতা আমাকে ও মেরীকে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তুমিও যেরূপ অকৃত্রিম ভালবাসার সহিত মেরীর ভার গ্রহণ করিয়াছ, কাল আমি তা'র একটা তুচ্ছ প্রতিদান করিব। খেলিতে যাইও, ভয় পাইও না। তিনি যাইবার সময় সেই মারাত্মক চাল বাঁচাইবার চালও যেন বলিয়া দিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তারপর দিন আবার খেলা সুরু হইল। আবার 'ছক্' সাজান হইল। আমরা চালিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ধীরে ধীরে খুব সাবধানে চালিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই ভয়ঙ্কর সন্ধিস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, আমার প্রতিযোগী কালিকার সেই মারাত্মক চাল চালিলেন, আমাকে তাহার বিপরীতে চালিতে হইবে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। আর কত বিলম্ব করিব?—চারিদিকে অন্ধকার দেখিলাম। এই বিপদের সময় চতুঃপার্শ্বে দর্শকেরা "ভাবিয়া খেলুন", "ভাবিয়া খেলুন" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। আমার হৃদয়ে কেবল গুরুদেবের মূর্ত্তি জাগিয়াছিল।

হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, আমার গুরুদেবের ছায়া-শরীর সকলের অদৃশ্যভাবে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া ঘোড়াকে মন্ত্রীর গজের পঞ্চম ঘরে চকিতে বসাইয়া দিলেন। যেন চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আমার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

চালটি দেখিয়া প্রথমে আমার প্রতিযোগী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে যখন তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন, তখন তাহার মুখ অতীব বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তাহার পর আর পাঁচ-ছয় চাল পরেই তিনি 'মাৎ' হইলেন এবং পরাজয়-স্বীকার করিলেন।

চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

আমি তাড়াতাড়ি মেরীকে টেলিগ্রাম করিলাম, "আমি প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইয়াছি। তুমি যত শীঘ্র পার, নিউইয়র্কে আসিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

প্রেতাত্মার এ প্রতিদান, এ প্রত্যুপকার আমার অদৃষ্টের গতি ফিরাইয়া দিল।

মরণের পরপারেও—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের শত ব্যবধানের মধ্যেও স্নেহের আকর্ষণ কত প্রবল, প্রীতির বন্ধন কত সুদৃঢ়!

চার্ব্বাক দর্শন।

পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে অন্যান্য দেশের মত নানা মুনির নানা মত প্রচলিত থাকিলেও, এদেশে নাস্তিক বুদ্ধি চিরকালই বিরল। প্রকৃতির লীলাভূমি সিন্ধু-জাহ্নবী-প্রবাহিত বিহঙ্গম-কূজিত ভারতবর্ষে মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্ত্বা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াই অসম্ভব। জগদীশ্বরের বিশ্বব্যাপী মধুর রূপের অনুভূতি, তাঁহার করুণা-মাধুরী, বেদগাথামুখরিত প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীর হৃদয় স্বতঃই ভক্তির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত করিত। বেদানুমোদিত বিধি অনুসারে যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি পুরাকাল হইতে আর্য্যদিগের অনুশীলনের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। জ্যোতিষানুশীলন দ্বারা প্রকৃত সৃষ্ট জগতের বিপুলতা ও অসীমতা উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীগণ ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

কিন্তু মানবসমাজ চিরকালই ভিন্নরুচিসম্পন্ন। সুতরাং এহেন ধর্ম্মভূমি ভারত-বর্ষেও চার্ব্বাক দর্শন নামে এক নাস্তিক মতের উদ্ভাবন হইয়াছিল। বিশাল হিন্দু-স্থানের অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রকৃতপক্ষে এই মতের পরিপোষক থাকিলেও কতকগুলি আর্য্য যে নাস্তিকতা অবলম্বন করিত, তাহা বড় ক্ষোভের বিষয়।

এই নাস্তিক মত-প্রবর্ত্তক চার্ব্বাকের জীবনচরিতসম্বন্ধে অতি অল্পকথাই জানিতে পারা গিয়াছে। তাহার মতানুবর্ত্তী সকল নাস্তিককেই চার্ব্বাক নামে অভিহিত করা হইত। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে চার্ব্বাক শব্দ নাস্তিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে চার্ব্বাক-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। কুরুক্ষেত্র রণাবসানে বিজয়ী পাণ্ডবকুলতিলক যুধিষ্ঠির যখন মহোৎসবপূর্ণ হস্তিনাপুরে সমারোহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন চার্ব্বাক নামক একটি রাক্ষস ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া পথ-পার্শ্বে ব্রহ্ম-নিন্দা ও নাস্তিকতা প্রচার করিতেছিল। ক্রমে তাহার কথা ব্রাহ্মণদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল এবং তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পাপাত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগকে কেহ কেহ 'লোকায়ত' বা লোকায়তিক বলিয়া থাকে। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত মহামতি মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন যে বার্হস্পত্য সূত্র হইতে চার্ব্বাক দর্শনের 'সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে চার্ব্বাক-মতানুমোদিত কতকগুলি শ্লোক ইংরাজিতে অনূদিত করিয়া ইংরাজমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু স্মৃতিকার বৃহস্পতি মহামুনির সূত্রে নাস্তিকতার

কোনও লক্ষণই পাই না। বৃহস্পতি সংহিতায় কেবল দান-মাহাত্ম্য-বর্ণিত হইয়াছে। লোকায়তদিগের গুরু বৃহস্পতি বোধ হয় অপর কেহও হইবেন।

লোকায়তগণ তর্কে বড় পটু ছিল। কেহ কেহ বলে চারু বাক্ বা বাক্‌চাতুর্য্য হেতু তাহাদিগের শাস্ত্রকে চার্ব্বাক শাস্ত্র বলা হয়। তাহাদিগের মতে প্রকৃত-জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ। যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, তাহা জ্ঞান নহে। পৃথিবীতে সচরাচর আমরা চারিটি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি—যথা, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ। এই চারিটি তত্ত্বের মিশ্রণ হইতেই চৈতন্যের উদয় হয়। এই চারি জড় তত্ত্ব হইতে কিরূপে বুদ্ধি বা চৈতন্যের উদয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষীভূত করা যায় না বলিয়া, ইহারা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আত্মা দেহ হইতে বিভিন্ন নহে, যদি আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থ থাকে, তাহা দেহের নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য, এমতের উপাসকগণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব মানিত না।

আমরা নিম্নে মিঃ মনিয়র উইলিয়মস্-বর্ণিত কতকগুলি চার্ব্বাক মত লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা হইতেই তাহাদের দর্শন বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

"স্বর্গ বা মোক্ষ কিছু নাই। আত্মা বা অপর জগত, জাতক্রিয়া বা কর্ম্মফল সকলই মিথ্যা। অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং অনুতাপের সমস্ত ধূলা ভস্ম, বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বহীন লোকের (ব্রাহ্মণের) জীবন ধারণ করিবার পন্থা মিলাইয়া দিবার উপায় মাত্র অর্থাৎ এই সবের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণগণ জীবিকানির্ব্বাহ করে।"

উপরোক্ত শ্লোক হইতে চার্ব্বাকদিগের ব্রাহ্মণদ্রোহিতা ও বেদাদির অসম্মান স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণও ইহাদিগের বিদ্রূপের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। যজ্ঞাদি কর্ম্মে পশুবধ করিলে তাহাদিগের উত্তম গতি হয়, এ কথা মহাভারতে এবং মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

এষ্বর্থেষু পশূন হিংসন বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম॥

(৫ম অঃ ৪২ শ্লোক।)

অর্থাৎ এই সকল মধুপর্কাদির জন্য পশুবিনাশ করিয়া বেদতত্ত্বার্থজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর উভয়েরই সদ্গতি সম্পাদন করিবেন। এই পশুবলিদানবিধি লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাকশাস্ত্র বলিয়াছে—

"যদি যজ্ঞে নিহত হইলে জীবের স্বর্গে গতি হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকর্ত্তা আপনার পিতাকে এইরূপে স্বর্গে পাঠায় না কেন?"

পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া লোকায়ত শাস্ত্র বলিয়াছে—"যদি আহার্য্যের পিণ্ড প্রদান করিলে ক্ষুধার্ত্ত লোকান্তরগত আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তবে বিদেশ-গমনপ্রয়াসী পর্য্যটকের সহিত আহার্য্য পাঠাইবার প্রয়োজন কি? তাহার উদ্দেশ্যে তাহার বন্ধুবান্ধবদের ঘরে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেই তো তাহার উদরপূর্ণ হইবে। যাহারা উচ্চে স্বর্গধামে বসিয়া থাকে, মর্ত্তে তাহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে তাহাদের ক্ষুধার উপশম হয়। তবে যাহারা সৌধের দ্বিতলে বসিয়া থাকে, তাহাদের জন্য নিম্নে ভূমির উপর অন্ন সাজাইয়া দিলে তাহাদের আহার হইবে না কেন"?

পৃথিবীতে বাস করিবার সময় কিরূপ নৈতিক নিয়মে জীবনাতিবাহিত করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে চার্ব্বাক শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ—"যতদিন দেহে প্রাণ থাকে শান্তি ও প্রমোদে জীবন যাপন কর। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট ঋণ করিয়া ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।"

এইরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি গ্রীসের এপিকিওর ও পাইরোর দর্শনে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অভিমত যে চার্ব্বাকের মত সকল মতাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। সুখের বিষয়, এ সকল নীতি কোনও দিনই কোনও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। রুবাইয়াত নামক গ্রন্থে পারস্যকবি ওমরখায়াম ঐ সুরে বলিয়াছেন—

"Why, all the saints and sages who discuss'd
Of the two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to scorn
Are scattered, and their Mouths are stopt with Dust."

তজ্জন্য ইনি ব্যবস্থা করিয়াছেন—

Here with a loaf of bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে চার্ব্বাক দর্শন বলে—

"ভস্মীভূত হইয়া আবার এই দেহ কিরূপে পৃথিবীতে ফিরিতে পারে? যদি তাহারা প্রেত হইয়া অপর জগতে ভ্রমিতে পারে, তবে যাহাদের পৃথিবীতে রাখিয়া যায়, তাহাদের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না কেন? মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের কৌশল ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তিন বেদের তিন রচনাকর্ত্তা দুষ্ট আত্মা বা বিদূষক ছিল। মন্ত্রোচ্চারণ অর্থহীন।

এ সকল মতের প্রতিবাদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বলা বাহুল্য, সামান্য জ্ঞানযুক্ত হিন্দু বালকেও এ সকল জড়বাদিতার অসারবত্তা প্রতিপন্ন করিতে পারে।

অর্চ্চনা।

জাহ্নবী লুকায়ে যথা আবর্জ্জনা রাশি
আপন বিমল স্রোতে কলুষনাশিনী—
জগত মঙ্গল তরে অমিয়া উচ্ছাসি
অবারিত বহে যায় রজত-অঙ্গিনী!
কিংবা যথা জননীর স্নেহ নির্ঝরিণী
সন্তানের শত ত্রুটী দেয় প্রক্ষালিয়া
অকুণ্ঠিতা চিরদিন প্রেমময়ী হিয়া
কি অনন্ত তব দয়া—করুণারূপিণি!
কত দিন হ'ল গত, শুষ্ক ফুল ডালি
দীন ভক্ত কয়জন আসিল পূজিতে—
হৃদয়ে সাধনা নাই অলস প্রণালী—
সুলভে তোমার দয়া চেয়েছে লভিতে!
নির্ব্বিচারে বহিয়াছে তোমার করুণা
সস্নেহে লয়েছ দেবি! দীনের অর্চ্চনা!

শ্রীউমাচরণ ধর।

সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য—মাঘ, ১৩১৬। বর্ত্তমান সংখ্যায় এক 'হতাশের আক্ষেপ' ব্যতীত কোনও সুপাঠ্য বিষয় সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। সহযোগী সাহিত্যের 'কুমেরু প্রদেশ' পাঠে কথঞ্চিৎ আমোদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে সাহিত্য পরিচালকগণের গৌরব কোথায়? ইহা লেফ্‌টেন্সাণ্ট স্যাকলটনের বর্ণনার বঙ্গানুবাদ মাত্র। এবারকার মলিন প্রবন্ধরাশি-সমন্বিত 'সাহিত্যে'র অবস্থা উপলব্ধি করিয়া এবং 'সাহিত্যে'র পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া 'হতাশের আক্ষেপ' লেখক কবিবর দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন,—

"কি ছিলাম, কি হ'লাম, কি কুক্ষণে ভখিলাম,
কুকর্ম্ম মাখালফলে ভাবিয়া রে অমিয়া।

* * *

হায় আমি লক্ষ্মীছাড়া, হইয়াছি তারাহারা,
হে সুধাংশু! তুমি কেন আর এ গগনে?"

"সম্মার্জ্জনী"—এই বিশেষত্ব-বর্জ্জিত ক্ষুদ্র গল্পটি একটি ব্যর্থ রচনা। "প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-পদ্ধতি"—যদি লেখক মহাশয় সরল গ্রীক-ইতিহাস লিখিয়া সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য প্রবন্ধ-বর্ণিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোন কথা বলিবার থাকিত না; কিন্তু 'সাহিত্যে'র শিক্ষিত পাঠকগণের সম্মুখে এ সকল বিষয় উপস্থাপিত করা অসমীচীন। লিখন-ভঙ্গীর দোষে 'মাদুরা' মোটেই চিত্তাকর্ষক হয় নাই। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় 'কোকিল'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"ডিম পেড়ে' রাখো তুমি চুরি করে' গিয়ে কাকের বাসায়;
কুঞ্জে এসে, প্রেমের গানে পরে পূর্ণ কর বনস্থলে;
অত্যন্ত দুঃশীল তুমি, অন্য কথা খুঁজে পাইনে ভাষায়,"

কবিবর তো 'বাসায়' 'ভাষায়' মিলাইলেন, আমরাও যে ইহার সমালোচনা করিবার 'কথা খুঁজে পাইনে ভাষায়'! এই কবিতায় একাধারে গবেষণা, রসিকতা ও কবিত্ব-শক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়া "কবিবর" দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সর্ব্বদিকস্পর্শিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার অন্ধ উপাসকবৃন্দ বোধ হয় ইহাই বলিবেন!

আশা করি, ভাববাতে আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোগী তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস করিবেন।

প্রবাসী—পত্রিকার শিরোনামা হইতেও উচ্চস্থানে লোহিত অক্ষরে লেখা—"মাসিক একশত পৃষ্ঠা।" ক্ষুদ্রবপু বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যে একত্র একশত পৃষ্ঠা গৌরবের বিষয় বটে, তবে পৃষ্ঠা-গৌরব অপেক্ষা প্রবন্ধ-গৌরবই শ্লাঘনীয়। প্রবাসীর গর্ব্ব দেখিয়া আমাদের সিংহী ও শৃগালীর গল্প মনে পড়ে। জম্বুকপত্নী বড় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল যে সে এককালে বহু সন্তান প্রসব করে। সিংহী উত্তরে বলিয়াছিল, তোমার শত পুত্র অপেক্ষা আমার এক পুত্র ভাল কারণ সে সিংহশিশু।

ফাল্গুনের প্রবাসীতে যে কেবল পাতা পুরাইবার জন্য রাবিস ছাপা হইয়াছে সে কথা বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহাতে শিক্ষাপ্রদ এবং পাঠোপযোগী প্রবন্ধও আছে। দুই কিস্তিতে রবীন্দ্রবাবুর "গোরা" নামক গল্প এবার শেষ হইয়াছে। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য লিখিত "মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ" নামক প্রবন্ধটী শিক্ষাপ্রদ। তবে সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইবার পর ছাপাইলে সম্মিলনের সভ্যদিগকে এই প্রবন্ধের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইতে হইত না। এবিষয়ে সম্পাদকীয় ব্যগ্রতাটা সংযমের পরিচায়ক নহে। মাঘোৎসবে পঠিত রবীন্দ্রবাবুর 'বিশ্ববোধে' ভাবিবার ও শিখিবার কথা আছে। "বঙ্গোপসাগরকূলে পর্ত্তুগীজ" প্রবন্ধটি সংকলন হইলেও সুখপাঠ্য।

প্রবাসীর অপর প্রবন্ধগুলি মোটের উপর 'চ বা তু হি' শ্রেণীর—পাতাপুরণের জন্য। দুষ্প্রবেশের নিম্নে "অ" এবং তাহার পরেই 'জার্ম্মানীর রাজকীয় বীমা'র নিম্নে "জ্ঞ" লিখিত অর্থাৎ দুইটি মিলিয়া "অজ্ঞ" লিখিত। সুতরাং উহাদের বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য। আগামী বারে হনলুলুর রাজত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে কলিকাতাবাসী 'প্রবাসী' ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকীয় স্তম্ভকেও হারি মানাইবে। দুষ্প্রবেশের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা বাস্তবিক্ দুরূহ। ইহা অনূদিত প্রবন্ধ সুতরাং ভাষা মাদার সীগলের ছাঁচের হইলে বোধ হয় কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। দুই একটা নমুনা দেখুন—"আজকাল কেমন যেন ভিজে রকমের ঠাণ্ডা করেছে।" "নির্ভর স্থাপন করা উচিত" "এই প্রথম একটি সন্ধ্যা বেশ আরাম করবার মত।" "চাই কি একটু হাস্‌তে খেল্‌তেও পারি বা।" "আপনাকে সত্য কথা বলাই বরং আমাদের কর্ত্তব্য হবে।" "ঘরের নানাস্থানে অদ্ভুত রকমের রহস্যময় দ্যুতি নিক্ষেপ করিল। ঘড়িতে টং টং শব্দে রাত্রি দ্বিপ্রহর বাজিল—শেষ টঙ্কারে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল যেন হঠাৎ দ্রুতবেগে কেহ উঠিয়া পড়িল।" ঘড়িটা ধনুকের মত মারাত্মক! তবে এরূপ টঙ্কার যে প্রবাসীর গৌরব-হুঙ্কারক হইবে। "বার্দ্ধক্য কি অবশ্যম্ভাবী?" এ গবেষণার উত্তরে আমরা বলি যে মাঝে মাঝে যৌবনে মরিতে পারিলে আর বার্দ্ধক্যে ভীমরথী-গ্রস্ত হইয়া লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

রাজকর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(৩)

হিন্দু-নরপতি-শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই রাজকর পূর্ব্ববর্ণিত বিধি অনুসারে সংগৃহীত হইত। হিন্দুজাতির সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যেরূপ সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়, উক্ত নিয়মানুসারে রাজকর সংগ্রহের প্রথাও বেশ সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের বিপুলায়তন সাম্রাজ্য মধ্যে যে সকল জটিল রাজনৈতিক সমস্যা গ্ল্যাডষ্টোন, বিসমার্ক প্রভৃতি মনীষিদিগের মত অশেষ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজপুরুষদিগকেও চিন্তাকুল করিয়া তুলে, সে সকল কূটরাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন লইয়া সাধারণতঃ হিন্দু রাজন্যবর্গকে মাথা ঘামাইতে হইত না। সুতরাং মন্বাদি ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া সরল স্বাভাবিক ভাবে তাঁহারা প্রজা রক্ষা করিতে যত্নবান হইতেন।

আধুনিক জাতিদিগের সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সকল বিষয়েই শিক্ষাদাতা বলিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতি সম্মানিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আধুনিক জগতের শীর্ষস্থানীয় জাতি সকলের কার্য্যপ্রণালীর ভিত্তি প্রাচীন গ্রীস ও রোমের, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারে। মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর মোস্লেম ধর্ম্মে দীক্ষিত মোগল, তুর্কী, পারসীক প্রভৃতি অনেক আসিয়াবাসী জাতিও বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া কোটী কোটী লোকের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছিল। আয়তন বা লোকসংখ্যা হিসাবে বিচার করিলে প্রাচীন বা আধুনিক চীন সাম্রাজ্যও খুব বিশাল বিস্তৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সুবৃহৎ সাম্রাজ্যাধ্যক্ষ মোস্লেম জাতি বা চীন জাতির শাসন-প্রণালী আধুনিক জগতের সভ্য জাতিদিগের প্রণালী হইতে বিলক্ষণ পৃথক। শুধু শাসনপ্রণালী কেন, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি সম্বন্ধে উহাদিগের ধারণা বা রাজা প্রজায় কি সম্পর্ক সে সকল বিষয়ে আসিয়াবাসীদিগের জ্ঞান

আসিয়াবাসীদিগের নিজস্ব। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন ভাব বা ধারণার সমতুল্যতা নাই। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের রাজনৈতিক ভাবরাজি অভিব্যক্ত হইয়া আধুনিক রাজনীতি বিষয়ক চিন্তার আদর্শ নিরূপণ করিয়াছে। সুতরাং আধুনিক রাজকর গ্রহণ প্রথার আদর্শ সম্যক বোধগম্য করিতে গেলে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের রাজকর গ্রহণের পদ্ধতিটা সংক্ষেপে বিচার করা উচিত।

প্রাচীন ভারতের মত প্রাচীন গ্রীসও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। তবে সেই সকল প্রদেশ এক একটি নরপতির অধীনস্থ ছিল না ইহাই প্রাচীন গ্রীক দেশের বিশেষত্ব। স্বাধীনতা-প্রিয় সাম্যবাদী গ্রীকজাতি একজনের হস্তে সমস্ত রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজানুগ্রহে বর্দ্ধিত হইবার, রাজছত্রের ছায়ায় বসিয়া সুখে শিল্প বিদ্যার অনুশীলন করিবার বা এক মাত্র রাজার নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতিকে পরাজিত করিয়া বিজয়গৌরব অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা অনুপযুক্ত বিবেচনায় হৃদয় মধ্যে পোষণ করিত না। অধিকাংশ গ্রীক প্রদেশ প্রজাতন্ত্র-শাসিত ছিল এবং যে সকল প্রদেশ বংশ-পরম্পরাগত নৃপতি দ্বারা শাসিত হইত সে সকল রাষ্ট্রেও আধুনিক পার্লামেণ্টের মত মন্ত্রণা সভা রাজার সহিত রাজশক্তি বিভক্ত করিয়া লইত।

প্রত্যেক গ্রীক রাষ্ট্রে কি বিধি অনুসারে রাজকর সংগৃহীত হইত তাহা বিচার করিবার স্থান আমাদের এ প্রবন্ধে নাই। গ্রীকরাষ্ট্রাগ্রগণ্য এথেন্স রাষ্ট্রে কি উপায়ে কর সংগ্রহ হইত ও রাষ্ট্রের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত আমরা এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আধুনিক আয়ের উপর করের মত প্রাচীন এথেন্সে সম্পত্তি অনুসারে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গৃহীত হইত। ধনীকে অধিক কর দিতে হইত, দরিদ্রের উপর সামান্য ভাবে কর ভার পতিত হইত। প্রত্যেকের নিজ নিজ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অনুসারে রাজকার্য্যের ব্যয় বহন করিবার বিধি বেশ ন্যায়সঙ্গত হইলেও এ প্রথা কার্য্যে পরিণত করা তত সুবিধাজনক ছিল না। ন্যায়ানুসারে দেখিতে গেলে যাহার যত সম্পত্তি রাজশক্তিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তত অধিক ব্যয় সহ্য করিতে হয়। সুতরাং যাহার সম্পত্তি অধিক তাহার পক্ষে অধিক কর রাজকোষে অর্পণ করা বাঞ্ছনীয় এইরূপ ভাবিয়া বুদ্ধিমান এথিনীয় জাতি ঐরূপ করগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

ন্যায়ের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উক্ত কর সমীচীন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইলেও ঐরূপ প্রথায় কর সংগ্রহ করিতে বোধ হয় আথিনীয় প্রজাতন্ত্রের অনেক অর্থ নষ্ট হইত। কমলার চাঞ্চল্য চির প্রসিদ্ধ। আজ যাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হিসাব করিয়া করের অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল কাল হয়ত একটা প্রবল ঝটিকায় তাহার ধনধান্যপূর্ণ অর্ণবপোত জলমগ্ন হইয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া দিতে পারে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আবার তাহাকে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করাইয়া লইতে হইত। সামান্য অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আথিনীয় প্রজাতন্ত্র সমস্ত সম্পত্তি হইতে অবস্থাভেদে এক পঞ্চম হইতে এক দশমাবধি অংশ বাদ দিয়া বক্রী সম্পত্তির উপর কর গ্রহণ করিত।

আথিনীয়দিগের অধিকার বিস্তারের সহিত যাহাতে তাহাদের আপনাদিগের উপর করভার অল্প পরিমাণে পতিত হয় তদুদ্দেশ্যে যুদ্ধাদির ব্যয় সঙ্কলন জন্য তাহারা করদ রাজ্যের উপর করভার কিয়ৎ পরিমাণে চাপাইয়া দিত। ইজিয়ান সাগরোপকূলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আত্মশক্তিতে পারস্য ও ফিনিসিয় নৌসেনার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত না। সুতরাং এথেন্সের অধীনে থাকিয়া আথিনীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া, ইজিয়ান সমুদ্রের নৌবাহিনীর ব্যয় সম্বন্ধে সাহায্য করিবার জন্য এথেন্সকে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহারা আততায়ীদিগের আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। এথেন্সও সেই অর্থে আপনার জলবাহিনী সুদৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া সমসাময়িক জাতিদিগের মধ্যে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। মিতব্যয়িতার দ্বারা এই সাগর চমূর ব্যয় হ্রাস করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা আথিনীয়গণ আপনাদের সহরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিত।

শুনিয়াম (Sunium) প্রদেশে এথেন্সের কতকগুলি রৌপ্য আকর ছিল। সে গুলিকে ভাড়া দিয়া এথেন্সের বেশ অর্থ সংগ্রহ হইত। প্রাচীন ও আধুনিক সকল রাষ্ট্রেই আকরোদ্ভব ধনের উপর শাসনকর্ত্তা দাবী করে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রাপেক্ষা প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি খনিজ পদার্থের অংশ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিত।

বিদেশী পণ্য দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসেও প্রবর্ত্তিত ছিল। তবে যতদূর জানা গিয়াছে তাহারা আমদানী শুল্কদ্বারা বিদেশী পণ্যোপ-

ভোগী স্বদেশী প্রজাদিগের নিকট হইতেই এ শুল্ক আদায় করিত। এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক জাতিকে অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। স্বদেশজাত দ্রব্য বিদেশে যাইবার সময় তাহার উপর শুল্ক বসাইলে নিজ দেশজাত দ্রব্য বিদেশে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। তাহাতে সেই দেশোদ্ভব দ্রব্যের মূল্যের প্রতিযোগিতায় নিজ দেশজাত দ্রব্যের বিক্রয় অল্প হয়। সুতরাং বিদেশে নিজ দেশজাত পণ্যের প্রসার হয় না। এখনও জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানীর সময় স্বদেশজাত কোনও কোনও দ্রব্যের উপর কর লওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের উৎপাদনের সময় স্বদেশে যে কর গৃহীত হইয়াছিল তাহা রপ্তানীর সময় প্রত্যর্পিত হইয়া থাকে। ইহাকে bounty বলে। রপ্তানীর সময় বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তাহাতে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় বর্দ্ধিত-মূল্য বিদেশী দ্রব্য হারি মানিয়া যায়। ফলে স্বদেশী শ্রম শিল্পের উন্নতি হয়, দেশীয় শিল্পিদিগের অবস্থা ভাল হয়, দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়। ঠিক এই নীতি অনুসারে না হইলেও অর্থ সংগ্রহের জন্য আথেনীয় জাতি আমদানী দ্রব্যের মূল্য অনুসারে শতকরা দুই মুদ্রা করিয়া শুল্ক আদায় করিত। কেহ কেহ বলেন যে, সমরব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এই শুল্ক গৃহীত হইত। ত্রিংশত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় শতকরা দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে আমদানী শুল্ক শতকরা পাঁচ মুদ্রা হারে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এথেন্সে কোনও কোনও সময় বিজাতীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে সংখ্যা হিসাবে (poll tax) কর গ্রহণ করা হইত। বেশ্যালয় প্রভৃতি কুৎসিত নিবাসের অধিবাসীবৃন্দকেও অতিরিক্ত কর দান করিতে হইত।

সমরকালে প্রয়োজনানুসারে এথিনীয় ধনীদিগকে অপর একপ্রকার কর প্রদান করিতে হইত। অনেক সময় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবাদির ব্যয়ের জন্য কোনও কোনও ধনীকে সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহার পরিবর্ত্তে সেই সমারোহে সেই ধনীব্যক্তি নেতা হইতেন। এইরূপে ক্রমশঃ যুদ্ধেরও কতক কতক ব্যয় নিজস্কন্ধে লইয়া কোনও কোনও ধনী নিজধনপুষ্ট বাহিনীর নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

মোটের উপর দেখিতে গেলে প্রাচীন গ্রীসেও রাজকরের প্রথা আদর্শতা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যখন যেদিকে বৃষ্টি পড়িত এথিনীয় রাষ্ট্র সচিব তখন সেই দিকে ছত্র ধরিতেন। যখন অর্থের প্রয়োজন হইত তখন তাহারা উপস্থিত অর্থ দৈন্য নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিত। এথিনীয়দিগের

স্বদেশভক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আবশ্যক মত তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত।

(৪)

সাম্রাজ্য-গর্ব্বিত রোমান জাতি অতিরিক্ত রাজকর শোষণের জন্য অধঃপতিত হইয়াছিল। কেবল যে সংগৃহীত করাধিক্য বশতঃ গৌরবমণ্ডিত রোমানজাতি যশের উচ্চশিখর হইতে অপযশের তমসাবৃত গহ্বরে পতিত হইয়াছিল তাহা নহে। বিলাসিতার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য বিজিত বর্ব্বরজাতিবৃন্দকে আপনাদের জাঁকজমক দেখাইবার জন্য অর্থ আহরণ করিবার মানসে রোমান সম্রাটগণ অতি কঠোর নিয়মে আপনাদিগের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহ হইতে রাজকর সংগ্রহ করিতেন। ফলে সাম্রাজ্যের সকল অংশ অতিরিক্ত শোষণের দ্বারা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। তাই আক্রমণশীল বর্ব্বরদিগের আমক্রণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া লুপ্তশক্তি রোমান সাম্রাজ্য এত শীঘ্র ছারখার হইয়া গিয়াছিল। যে রোমান ঈগল শ্রম ও সুবিচারের নিদর্শন হইয়া তদানীন্তন কালের রোমান প্রজার হৃদয়ে ভয় ও সম্মান উদ্রেক করিত, সেই ঈগল চিহ্ন ক্রমে অত্যাচারের নিদর্শনস্বরূপ প্রজা সাধারণের ঘৃণার কারণ হইয়াছিল। বিলাসপ্রিয় আত্মসুখানুসন্ধিৎসু সম্রাটগণ চরমবিপদের সময়ে প্রজার নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাইতে পারে নাই।

ব্যবসার লাভের অংশ হইতে একাংশ রাজকর স্বরূপ রোমের রাজকোষে প্রদান করিতে হইত। যে প্রজা এই কর দিতে বিলম্ব করিত তাহাকে নানা প্রকার অবমাননা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। গবাদি পশুর অধিস্বামীকে কর দিতে হইত, যাহারা বিলাসের জন্য ক্রীতদাস রাখিত তাহাদিগকে ক্রীতদাসের সংখ্যানুসারে কর প্রদান করিতে হইত। আমদানী ও রপ্তানি উভয়বিধ শুল্কই রোমান প্রজাকে দিতে হইত। সুতরাং একই দ্রব্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে প্রেরিত হইলে সেই একই দ্রব্যের জন্য দুইবার শুল্ক প্রদান করিতে হইত। ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার সময় রাজকোষে কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। যখন আপনার বংশের বাহিরে কেহ কাহাকেও সম্পত্তি দান করিত তখন গৃহীতাকে সেই ধন উত্তরাধিকারীরূপে পাইবার সময় একটা কর দিতে হইত।

সাম্রাজ্যান্তর্গত সকল স্বাধীন প্রজাকে রোমান নগরবাসীর সত্ব প্রদত্ত হইবার পর প্রাদেশিক সমিতির উপর নিজ নিজ শাসনাধীনস্থ প্রদেশের কর

সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল। যে সকল লোক এইরূপে রাজকর সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত তাহাদিগকে দেকুরিয়ন (Decurion) বলা হইত। ইহারা একপক্ষে অপরাপর প্রজা অপেক্ষা কিয়দ্ পরিমাণে সম্মানিত হইলেও ইহাদিগকে বড় অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। সাধারণ প্রজা যে সকল অবমাননাসূচক শাস্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইত ইহাদিগকে সে সকল শাস্তি গ্রহণ করিতে হইত না। ইহারা অপরাধ করিলেও লাঞ্ছিত হইত না। কিন্তু যাহার উপর যে পরিমাণে কর সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত হইত, তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণে অর্থ রাজকোষে নিয়মিতরূপে সরবরাহ করিতে হইত। আদায় না হইলে নিজ সম্পত্তি হইতে বক্রী মুদ্রা দিয়া তাহারা রাজরোষের কঠোরতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত।

ক্রমশঃ।

কৃপণের মন্ত্র।

(গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়।)

একদিন রাত্রে গোবিন্দরাম একটা প্রকাণ্ড টিনের বাক্স হইতে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিতেছিলেন। একবার মনে করিলাম, জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কি; কিন্তু আমি জানি, তাঁহার নিজের মৌজ না হইলে তিনি কোন কথাই বলিবেন না, সুতরাং তাঁহার মৌজের প্রতীক্ষা করিয়া নীরবে তাঁহার কাগজের বাণ্ডিলগুলির দিকে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মাথা তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার, এখানে এত ব্যাপার আছে যে, তোমার পাঁচ-সাতখানা প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয়, এই সকল তোমার প্রথম অনুসন্ধানের ফল। কতকগুলি ব্যাপার শুনিতে পাইলে খুসি ভিন্ন অসুখী হইব না।"

"হাঁ, কথাটা ঠিক—আমার জীবনচরিত লেখকের সহিত আমার পরিচয় হইবার পূর্ব্বে এই সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই টীনের বাক্সের আর

বাণ্ডিলগুলির ধূলিধূসরিত অবস্থা দেখিয়াই তুমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; বিশেষতঃ এই জিনিষগুলির উপরে কালের যেরূপ প্রলেপ পড়িয়াছে, তাহাতে এ কথা বলা শক্ত নহে। ডাক্তার, ইহার সকলগুলিতে যে আমি সফল হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা নহে, তবে ইহার মধ্যেও কতকগুলি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার আছে—এই রামবাগানের খুন—এই—গঙ্গাধরের মোকদ্দমা—হাঁ—এই ব্যাপারটীতে খুব নূতনত্ব আছে।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম সেই প্রকাণ্ড টীনের বাক্সের ভিতর হইতে একটা ছোট কাঠের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের ডালা তুলিয়া তিনি একখণ্ড কাগজ, একটা প্রাচীনকালের পিতলের চাবি—একটা কাঠে জড়ান এক বাণ্ডিল সুতা আর তিনটা কৃষ্ণবর্ণের ধাতুখণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, এ সকল দেখিয়া কি মনে কর?"

"নূতন বটে, খুব চমৎকার সংগ্রহ।"

"হাঁ, ইহার সহিত যে ঘটনা জড়িত আছে, তাহা আরও চমৎকার!"

"তাহা হইলে ইহাদের সহিত একটা ইতিহাস জড়িত আছে?"

"হাঁ, কৃপণের মন্ত্র সম্বন্ধে এখন আমার কাছে এই কয়েকটী জিনিষমাত্রই আছে,"—বলিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে গোবিন্দরাম সেইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

"এ ব্যাপারটা কি জানিলে উপকৃত হইব। তা ছাড়া সেটা কাজেও লাগাইতে পারিব।"

গোবিন্দরাম ব্যগ্রভাবে সম্মুখদিকে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রক্ষা কর—আর কাজে লাগাইয়া কাজ নাই, যাহা তুমি কিছু কাজে লাগাইয়াছ, তাহাতেই তুমি আমাকে এমনই বিশ্ববিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছ যে, আর কিছু কাজে লাগাইলে আমার কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইবে—এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত। মানুষ খুন করিবার এ একটা তোমার অভিনব কৌশল বটে। পুলিসের লোকের হুড়াহুড়ি ত আগেকার চেয়ে এখন দশগুণ বাড়িয়াছে, তাহার উপর বাহিরের লোকেরও আমদানী প্রচুর—ঈশ্বর ত আমার জন্য আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় করেন নাই। যাক্—কি উদ্দেশ্যে কিরূপে আমি ডিটেক্‌টিভের ব্যবসায় গ্রহণ করিলাম, তাহা সমস্তই তুমি জান; সুতরাং সে সব বিষয়ের পুনরুল্লেখে প্রয়োজন নাই। এখন তোমাকে এই ব্যাপারটার বিষয় বলি, যৌবনের প্রারম্ভে শান্তশীল বলিয়া পল্লিগ্রামের একটী যুবকের

সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। বর্দ্ধমান জেলায় গাংপুর গ্রামে তাঁহার বাস। পূর্ব্বে তাঁহারা খুব বড় লোক ছিলেন, কিন্তু এখন একখানি বৃহৎ অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা ব্যতীত আর তাঁহাদের বিশেষ কিছু নাই,তবে তাঁহারা একেবারে দরিদ্রও নহেন। এখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তাঁহাদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ এমনই কৃপণ-চূড়ামণি ছিলেন যে, তিনি প্রাণ ধরিয়া সরকারকে খাজনা দিতেন না; তাহাতেই তাঁহার সমস্ত জমিদারী বিক্রয় হইয়াছে, অনেক জমিদারী তিনি নিজেই বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তিনি এক পয়সা খরচ করিতেন না, সুতরাং তাঁহার এই সকল ধন কোথায় গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

"অনেকদিন শান্তশীলের সঙ্গে আমার দেখা নাই, সহসা তিনি একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম; তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া বলিলাম, 'সব ভাল ত?'

"শান্তশীল আমাকে বলিলেন, 'হয়তো তুমি আমার পিতৃবিয়োগের কথা শোন নাই। আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, তিনি মারা গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত আমাকে গাংপুরে আসিয়া বিষয়-সম্পত্তি সব দেখিতে হইতেছে; শুনিলাম, তুমি নাকি আজকাল একজন মস্ত বড় ডিটেক্‌টিভ হইয়াছ?" '

" 'হাঁ, কতকটা তাহাই বটে।' "

"'শুনিয়া খুসী হইলাম। তোমার পরামর্শ এখন আমার বিশেষ কাজে লাগিবে। গাংপুরে সম্প্রতি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক দুই-একটী ঘটনা ঘটিয়াছে,পুলিস তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। প্রকৃতই বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।'

"তখন আমার হাতে কোনই কাজ ছিল না। বিশেষতঃ আলস্যের সহিত বন্ধুত্বটা তখন আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, এই জন্য শান্তশীলের কথা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। পুলিশে কিছু করিতে পারে নাই, এ বিষয়ে আমি সফল হইলে খুব একটা বাহাদুরী প্রকাশ করিতে পারিব। আমি হৃদয়ের আনন্দ অবশ্য প্রকাশ করিলাম না। গম্ভীরমুখে বলিলাম, 'সব বল, তাহা হইলে বুঝিতে পারি।'

"শান্তশীল আমার নিকটে সরিয়া বসিয়া বলিলেন, 'প্রথমে গাংপুরে আমার বাড়ীর বিষয় বলি। যদিও পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের জমিদারী আর নাই, তবুও পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিতে হয়; বাড়ীতে অনেক লোকজন দাস-দাসী আছে, ইহাদের মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।

"'ইহার নাম নন্দলাল। বাবা ইহাকে চাকরী দেন, এই লোক বাড়ীর সরকারের কাজ করিয়া থাকে, এ এরূপ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ কাজের লোক যে এখন এ না থাকিলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। নন্দলাল প্রায় পনের বৎসর আমাদের বাড়ীতে আছে, দেখিতেও সুপুরুষ, এখন বয়স চল্লিশের উদ্ধ´ নহে।

" 'যদিও নন্দলালের অনেক গুণ, তবুও একটা অতি গুরুতর দোষ আছে, স্ত্রীলোকের প্রতি নন্দলালের সর্ব্বদাই দৃষ্টি, যতদিন তাহার স্ত্রী জীবিতা ছিল, ততদিন বড় কোন গোলযোগ হয় নাই, তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে তাহাকে আর আমার দাসাদের লইয়া বড়ই গোলযোগ হইতেছে। প্রথমে রঙ্গিয়া বলিয়া একজন হিন্দুস্থানী দাসীর সহিত তাহার প্রণয় হয়। কিন্তু নন্দলাল তাহার কয়েক দিন পরেই রঙ্গিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া শ্যামা বলিয়া আর একটী দাসীর স্কন্ধে চাপিয়াছে, এ দিকে রঙ্গিয়া সেই পর্য্যন্ত পাগলের মত হইয়াছে।

" 'এই ত গেল প্রথম ঘটনা—তাহার পর নন্দলাল যে কাণ্ড করে, তাহাতে তাহাকে একেবারে দূর করিয়া দিতে আমি বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লোকটা ভারি কাজের লোক—ভারি বুদ্ধিমান্; কিন্তু যে সকল বিষয়ে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে সর্ব্বদাই সেই সকলে হাত না দিয়া থাকিতে পারিত না। অসাক্ষাতে এটা দেখিবে, সেটা দেখিবে, এটা ওটা দেখিবার জন্যই সে যেন মহা ব্যস্ত। মনে হয়, এ সংসারে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাতে তাহার আদৌ কৌতূহল নাই।

" 'যাহা হউক, সম্প্রতি একদিন রাত্রে আমার ঘুম না হওয়ায় আমি মনে করিলাম, যে উপন্যাসখানি পড়িতেছিলাম, যতক্ষণ ঘুম না হয়, ততক্ষণ সেখানি পড়ি। সেজনা একটা আলো লইয়া আমার বসিবার ঘরের দিকে চলিলাম; সেইখানেই আমার সমস্ত পুস্তক থাকিত। দূর হইতে দেখিলাম, আমার ঘরের দ্বারের ফাঁক দিয়া আলো বাহির হইতেছে। আমি উঠিয়া আসিবার সময় নিজে আলো নিবাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম; তবে আবার আলো জ্বালিল কে? আমি বিস্মিত হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইলাম; দ্বারে উঁকি মারিয়া আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে মহাবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—দেখি আমারই চেয়ারে বসিয়া আমারই টেবিলে ম্যাপের মত কি একখানা কাগজ খুলিয়া নন্দলাল বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছে।

" 'এ ব্যাপারে আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, আমি দ্বারের পার্শ্বে

নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিল, যে দেরাজে আমাদের কুল-কারিকাদি বংশ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র থাকিত, তাহা একটা চাবি দিয়া খুলিল। খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলে রাখিয়া ব্যগ্রভাবে সেই ম্যাপের সহিত মিলাইতে লাগিল।

" 'তখন আর আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; দরজা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সে আমাকে দেখিয়া চকিতে একলম্ফে সরিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইল, তাড়াতাড়ি ম্যাপের মত সেই নক্সাখানা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম, 'নন্দলাল, এইরূপে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কর? কাল সকালেই এ বাড়ী হইতে দূর হও।'

" 'সে কোন কথা না কহিয়া নতমুখে তথা হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, সে দেরাজ হইতে কি কাগজ বাহির করিয়াছে, আমি তাহাই দেখিতে অগ্রসর হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম; দেখিলাম, বিশেষ আবশ্যক কাগজ কিছুই নয়, ইহাতে আমাদের বংশগত একটা মন্ত্র লেখা আছে মাত্র, ইহা কৃপণের মন্ত্র বলিয়া আমরা জানি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে একজন নাকি বড় কৃপণ ছিলেন, তিনিই নাকি এই মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যান। যখন আমাদের বংশের কেহ সাবালক হয়েন, তখন তাঁহাকে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কত শত বৎসর হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহা কেহ জানে না; আর এই মন্ত্রের যে কোন একটা বিশেষ অর্থ আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না; বংশগত নিয়ম বলিয়া সকলেই উচ্চারণ করে এইমাত্র।'

"আমি বলিলাম, 'কাগজের কথা পরে আলোচনা করা যাইবে, এখন কি হইয়াছে, তাহাই বল।"

" 'আমি দেরাজে কাগজখানি রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলাম, আমি শয়ন করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, নন্দলাল ফিরিয়া আসিয়াছে!'

" 'সে রুদ্ধপ্রায় জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'বাবু, প্রায় বিশ বৎসর এই সংসারে কাজ করিতেছি, সকলের সম্মুখে অপমান করিয়া আমায় তাড়াইবেন না, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না, আমি আত্মহত্যা করিব। যদি আপনি কিছু-তেই আমায় না রাখেন, তবে দয়া করিয়া আমায় আর এক মাস সময় দিন,

তখন কেহ এ সকল কিছুই জানিতে পারিবে না, সকলে বুঝিবে আমি স্ব-ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেছি।'

"ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, আমি বলিলাম, 'তুমি বিন্দুমাত্র দয়ার উপযুক্ত নও, যা-ই হউক, তুমি আমাদের সংসারে অনেক দিন আছ, আমি সকলের সম্মুখে তোমার অপমান করিয়া তাড়াইব না। এক সপ্তাহ সময় দিলাম, এই এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার ইচ্ছামত যে কোন অজুহতে আপনা-আপনি তুমি আমার বাড়ী হইতে বিদায় লইবে।'

" কাতরভাবে নন্দলাল বলিল, 'মোটে এক সপ্তাহ—পনের দিন সময় দিন।'

" 'আমি গর্জ্জিয়া উঠিলাম, 'আর এক দিনও নয়, ইহাই তোমার উপর বিশেষ দয়া প্রকাশ করা হইল।'

" 'সে তখন হতাশ হইয়া নতমুখে প্রস্থান করিল, আমিও সেই ঘরের আলোটা নিবাইয়া দিয়া নিজের শয়নগৃহে আসিয়া শয়ন করিলাম।

" 'এই ঘটনার পর দুই দিন নন্দলাল বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কাজকর্ম্ম করিল, আমি রাত্রের ঘটনা একেবারে আর উত্থাপন করিলাম না। কি ছল করিয়া সে এ বাড়ী ত্যাগ করিবে, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

" 'প্রত্যহ সে দিনের মধ্যে কি কি কাজ করিতে হইবে, আমার নিকট তাহা জানিতে আসিত, কিন্তু তৃতীয় দিনে না আসায় আমি বিস্মিত হইলাম। এই সময়ে রঙ্গিয়া সেইখানে আমাকে দুধ দিতে আসিল। আমি প্রত্যহ প্রাতে গরম দুধ খাইয়া থাকি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে পীড়িত হইয়াছিল, সম্প্রতি সে কঠিন পীড়া হইতে কিছু সুস্থ হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহাকে আরও দুর্ব্বল ও পাংশুবর্ণ দেখিলাম; এ অবস্থায় সে কাজ করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সেজন্য আমি তাহাকে বলিলাম, 'রঙ্গিয়া, দেখিতেছি তোমার এখনও অসুখ রহিয়াছে, যাও শুয়ে থাক গে, ভাল না হইলে তোমার কাজ করিবার আবশ্যক নাই।'

" 'রঙ্গিয়া এমনই ভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমি তাহার সেই ব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া মনে করিলাম, কোন কারণে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'বড় বাবু, আমার তো আর কোন অসুখ নাই।'

"'আচ্ছা, আগে ডাক্তার কি বলেন শুনি, এখন তুমি শুইয়া থাক গে—যাও, নন্দলালকে আমার কাছে এখনই একবার পাঠাইয়া দাও।'

" 'নন্দলাল বাবু চলিয়া গিয়াছেন।'

" 'চলিয়া গিয়াছে ! কোথায় ?'

" 'তা জানি না ; তিনি তাঁহার ঘরে নাই,সকাল হইতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই !' সে এই বলিতে বলিতে প্রাচীরে গিয়া পড়িল, হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসির উপর হাসি—কিছুতেই তাহা থামে না। আমি চোখ রাঙাইয়া ধমক দিলাম, তথাপি সে উন্মত্ততার স্থায় উচ্চহাস্যে অস্থির হইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার উপর হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ হইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত ও ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া লোক ডাকিলাম, সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে অন্দরে লইয়া গেল।

" 'তখন আমি নন্দলালের অনুসন্ধান করিলাম। সে যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার ঘরে গিয়া দেখিলাম, সে রাত্রে বিছানায় শোয় নাই। গতরাত্রে সে তাহার ঘরে গিয়াছিল—এই পর্য্যন্ত, তাহার পর কেহ আর তাহাকে দেখে নাই। অথচ সে কিরূপে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, আশ্চর্য্য ! প্রাতে উঠিয়া সকলেই দেখিয়াছিল যে, দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ রহিয়াছে,অথচ সে নাই। তাহার কাপড়, তাহার বাসন, তাহার টাকা, তাহার জিনিস-পত্র সমস্তই তাহার ঘরে পড়িয়ারহিয়াছে, সে কিছুই লইয়া যায় নাই। তাহার জুতা পর্য্যন্ত রহিয়াছে, কেবল চটি জুতা জোড়াটা নাই, এ অবস্থায় সে কিরূপে কোথায় গেল, আর তাহার হইয়াছেই বা কি ?

" 'বলা বাহুল্য আমরা সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, যদিও বাড়ীটী পুরাতন ও বড়, তবুও আমরা প্রতি ঘর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহার সমস্ত টাকা-কড়ি জিনিষ-পত্র ফেলিয়া রাখিয়া সে কোথায় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইল ? আশ্চর্য্য !

" 'আমি পুলিশে সংবাদ দিলাম। রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। পায়ের দাগ থাকিবার কথা, তাহাও কোন স্থানে দেখিলাম না। আমরা বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

" 'ইহার পর আবার যাহা ঘটিল, তাহাতে এই প্রথম রহস্য একরূপ চাপা পড়িয়া গেল। রঙ্গিয়া তিন দিন প্রায় অজ্ঞান হইয়া রহিল, আমি ডাক্তার ডাকিয়া তাহার চিকিৎসা করাইলাম। নন্দলালের নিরুদ্দেশের তৃতীয় দিন রাত্রে রঙ্গিয়াও নিরুদ্দেশ হইল। প্রাতে এই কথা শুনিয়া আমি তখনই তাহার অনুসন্ধান করিলাম। সে নীচের যে ঘরে শয়ন করিত, সেই ঘরের জানালা

খোলা রহিয়াছে, জানালার বাহিরেই তাহার পায়ের দাগ. আমরা সেই পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া চলিলাম ; দাগ খিড়কীর পুষ্করণীর ঘাটে পর্য্যন্ত আসিয়া আর নাই।

" 'ইহাতে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,আমি বুঝিলাম উন্মত্তা রঙ্গিয়া পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমি তখনই টানা জাল আনিয়া পুকুরে টানাইলাম, কিন্তু তাহার মৃতদেহের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার দেহের পরিবর্ত্তে জালে এক অদ্ভুত দ্রব্য উঠিল—ক্যাম্বিসের ব্যাগ! ব্যাগটা খুলিয়া দেখি, তাহাতে কতকগুলা ভাঙা মর্চ্চেধরা লোহা, আর কতকগুলা নুড়ি, সেই নুড়িগুলি এতই কাল যে, তাহা পাথরের বা কাচের, কিছুই স্থির করিবার উপায় নাই।

" 'পুনঃ পুনঃ জাল টানিয়াও পুষ্করিণীতে আমরা আর কিছুই পাইলাম না, তাহার পর তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু রঙ্গিয়া বা নন্দলাল, এই দুইজনের কাহারই সন্ধান পাই নাই। আমাদের সেখানকার পুলিশ হতাশ হইয়াছে ; তখন তোমার কথা মনে পড়িল, সেইজন্য তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি!' "

গোবিন্দরাম আমাকে বলিলেন,"ডাক্তার,তুমি বুঝিতেই পারিতেছ,আমি অতি ব্যগ্রতার সহিত এই ব্যাপারটা শুনিলাম, তাহার পর এই সমস্ত ব্যাপারটা কেবল একটা মাত্র সূত্রে ঝুলিতেছে কি না, তাহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। নন্দলাল নিরুদ্দেশ—রঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ! রঙ্গিয়া নন্দলালকে ভালবাসিত, পরে নন্দলাল তাহাকে হতাদর করায় নিশ্চয়ই নন্দলালের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক রাগ হইয়াছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে,সে একটা ব্যাগ পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে ; ব্যাগে কতকগুলা নুড়ী। এই সমস্তই বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে ; কিন্তু ইহাদের কোনটাই মূল রহস্যের দিকে যাইতেছে না। এই সকল ঘটনাবলীর মূলসূত্র কোথায়? সেই মূলসূত্রটা একবার অবলম্বন করিতে পারিলে, এক মুহূর্ত্তে সকল রহস্যই পরিষ্কার হইয়া যায়।

"একটা কথা মনে হওয়ায় আমি শান্তশীলকে বলিলাম,'আমি সেই কাগজটুকু দেখিতে চাই। সেখানা এমন কি কাগজ, যাহা দেখিবার জন্য তোমার এই সরকার নিজের এতদিনের চাকরী পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।'

"আমার বন্ধু বলিলেন, 'সে এক রকম একটা হাস্যজনক ব্যাপার! বংশ-

পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইহাই ইহার একমাত্র গুণ বা যাহাই বল। আমি তাহার একটা কাপি তোমায় দেখাইবার জন্ত আনিয়াছি, দেখিতে চাও—দেখ।'

"আমি কাগজখানি লইয়া পড়িলাম, এটা একটা প্রশ্নোত্তর বলিয়া বোধ হইল। এই দেখ সেই কাগজখানাও আমি রাখিয়াছি, ডাক্তার এই শোন ;—

" 'কাহার ছিল ?

" 'সে গিয়াছে।

" 'কাহার হবে ?

" 'যে আসিবে।

" 'কি মাস ?

" 'প্রথম হইতে ষষ্ঠ।

" 'কোথায় ছিল সূর্য্য ?

" 'তালগাছের মাথায়।

" 'কোথায় ছিল ছায়া ?

" 'বটগাছের তলায়।

" 'কত পা—কত পা ?

" 'উত্তরেতে দশ দশ—পূর্ব্বেতে পাঁচ পাঁচ—দক্ষিণেতে দুই দুই—পশ্চিমেতে এক এক—সেই রকমতো নীচে।

" 'ইহার জন্য কি দিব ?

" 'যা আছে সব দিব।

" 'কেন দিব—কেন দিব ?

" 'ভালর জন্য—ভালর জন্য।'

"আমার বন্ধু বলিলেন, 'এ কাগজখানায় কোন তারিখের উল্লেখ নাই, তবে লেখা ও বানান দেখিয়া বোধ হয়, অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসরের আগের লেখা। শুনিয়াছি, অনেক পুরুষ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে গোবিন্দরাম তোমার যে বিশেষ সাহায্য হইবে, এমন বোধ হয় না।'

"আমি বলিলাম, 'যাহাই হউক, ইহাও যে আর একটা রহস্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় তোমার সরকার ও দাসীর নিরুদ্দেশ-রহস্য অপেক্ষাও এটা আরও রহস্যময়। হয় ত একটার রহস্য ভেদ করিতে পারিলে, অপরটার রহস্যও ভেদ হইবে। তুমি কিছু মনে করিও না, আমি দেখিতেছি, তোমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা তোমার এই সরকারের প্রবল বুদ্ধি ছিল।'

" 'আমি ঠিক তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, আমি ত এই মন্ত্রের কোন মানে দেখিতে পাইতেছি না।'

" 'আমি কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট গুরুতর ব্যাপার দেখিতেছি, তোমার সরকারও ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিল। খুব সম্ভব, তুমি যে রাত্রে তাহাকে এই কাগজ দেখিতে দেখিয়াছিলে, তাহার পূর্ব্বেও সে এই কাগজ দেখিয়াছিল।'

" 'খুব সম্ভব—ইহা লুকাইবার জন্য আমরা কেহই কখনও আবশ্যক মনে করি নাই।'

" 'শেষ দিন সে কেবল তাহার নক্সার সঙ্গে ইহা মিলাইতেছিল, এইমাত্র।'

" 'হাঁ, তাহাই সে দেখিতেছিল বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, আর এই পাগলের অর্থশূন্য মন্ত্রের মানেই বা কি ?'

" 'আমার বোধ হয়, ইহা বুঝিতে আমাদের বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। চল, এখনই আমি তোমার সঙ্গে গাংপুরে যাইতে প্রস্তুত আছি, সেখানে গেলে ইহার ভিতরে আরও প্রবেশ করিতে সক্ষম হইব।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সোরাব্ ও রস্তম্।*

সমাগতা উষা। পূর্ব্ব গগনপ্রাঙ্গণে
ফুটেছে পাটলছটা! কুহেলী-আঁধার
ঢাকিয়াছে নীরময় আমুর শরীর!
সারি সারি তটিনীর তীরে কতদূর
তাতারশিবির সব নীরব, তাপস
যেন মৌনব্রতে ব্রতী! আকাশের পথে
পতাকা লইয়া খেলে প্রভাতসমীর
সুমন্থর, নিস্তব্ধতা বিনাশি উষার!
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শয়ান সকলে
লভিছে বিরাম! কেবল যুবক এক
তাতারশিবিরে জাগরিত; কাটিয়াছে
দীর্ঘ রাত্রি উন্মীলিত-আঁখি শয্যাতলে
বিবর্ত্তনে! শিবিরের ছিদ্রপথে তাই,
পশিয়াছে উষাদেবী ব্যথিত-অন্তরা—

---

* Mathew Arnold এর "Sohrab and Rustum" নামক কবিতালম্বনে অনূদিত।

কাতর পরের দুঃখে কোমলহৃদয়—
সে শিবিরে, ঢালিবারে শান্তির সুধারা
যুবার অশান্ত হৃদে! উষালোক হেরি,
শয্যাতল পরিহরি, আশ্বাসহৃদয়
উঠিল সম্ভ্রমে যুবা; রণপরিচ্ছদে
সাজিল সাদীর বেশে; পিধানে শোভিল
কটিতটে অসিবর; শিবির তেয়াগি
বাহিরিল বীরবর কুহেলী-আঁধারে;
দূরে, কতদূরে, দেহ গেল মিলাইয়া!

বিস্তৃত আমুর তীর নিম্ন, সমতল
কতদূর—নিদাঘের খর রবিকরে
বিগলিত হিমরাশি পামীরশিখরে
বিপ্লাবিয়া করে যার শরীর শীতল
বালুময়—তদুপরি সারি সারি সারি
কতদূর ঢাকি শোভে শিবিরের মালা—
পুঞ্জীভূত যেন কত মধুক্রমচয়—
তাতারের! বীরবর চলিল সে পথে
অবুত শিবিরমাঝে। কতক্ষণে আসি
উত্তরিলা গিরিপার্শ্বে;—ক্ষুদ্র গিরি সেই,
তটিনীর তীর ছাড়ি নহে বহুদূর।
রচিল মৃন্ময় দুর্গ—মুকুট যেমন—
সে গিরির শির'পরে প্রাচীন প্রধান;
কিন্তু,হায়, কালসহ যুঝি পরাক্রমে,
পরিণত ভগ্নশেষে শিথিলশরীর!
তাতারশিবির এক শোভে তদুপরি;—
সূক্ষ্মদারুময় তা'র পঞ্জর সুন্দর
ঢাকিয়াছে ত্বগ্‌রূপে লোম-আস্তরণ!
শিবিরে পশিল যুবা নিঃশব্দসঞ্চারে;
নিরখিল সেনানীরে প্রাচীন, শয়ান,
নিদ্রিত; গভীর নিদ্রা নাহি সে নয়নে
স্থবিরের,—তাই মৃদু চরণসঞ্চারে
ভাঙ্গিল স্বপনাবেশ। সসম্ভ্রমে তবে
অর্দ্ধোত্থিত,জিজ্ঞাসিল—"সেনানী কেতুমি
এখনো যুঝিছে হের তিমিরে আলোকে!
কহ, কি সংবাদ! অথবা উদ্বেগ কিছু
তাতারশিবিরে করিয়াছে শান্তিনাশ"!

নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বে অগ্রসরি যুবা
কহিল;—"জানেন মোরে, সেনানী,
আপনি—
আসিয়াছি আমি—সোরাব্;
এখনো, তাত!
দিনকরকর-জাল দিক্‌চক্রে লীন;
নিদ্রিত শিবিরে এবে অরাতিনিচয়"!
যাত্রাকালে আদেশিলা সম্রাট্;"সোরাব
সেনানীর লইও মন্ত্রণা, পিতৃজ্ঞানে
ভক্তিভাবে করিও সম্মান পুত্রবৎ।"
"যাপি জাগরণে তাই দীর্ঘ নিশাকাল,।
আপনার সন্নিধানে উপনীত এবে!
বিদিত আপনি, পশিলাম যবে আসি
তাতারের দলে, ধরিনু সমর-অস্ত্র,
সেবিনু সম্রাটে তদবধি ভক্তিমান্;
দেখাইনু বাল্যে কত বীরের বিক্রম!
পরাজিত প্রতি রণে করি পারসীকে,
বিশ্ববিজয়িনী এই তাতারপতাকা,
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে বহি যাবে,
অন্বেষণ করি একজনে—একবীরে—
জনকে আমার;—অন্তরের অন্তস্তলে,
নিগূঢ়প্রদেশে, বহি আশা বলদাত্রী,—
একদিন, একদিন, জনক রস্তম্
সমরকৌশলে মুগ্ধ, তুমুল সমরে,

তুষিবেন স্নেহময় আলিঙ্গনে মোরে,—
বীরের সন্তান আমি, বীর-অবতার,
বীরবীর্য্যে খ্যাতিমান্—জানেন আপনি!
এতদিন পুষি আশা আশ্বাসহৃদয়ে,
না পাই জনকে,তাত! নিরাশ এক্ষণে!
তেঁই বলি, বাঞ্ছা মোর করুন পূরণ :—
ভুঞ্জুক উভয় সৈন্য শান্তিসুখ আজ ;
আমি কিন্তু আহ্বানিব পারসীকগণে
শৌর্য্যে বীর্য্যে খ্যাত,দ্বন্দ্বযুদ্ধে মোরসনে!
জয়ী যদি রণে, পাইবেন এ বারতা
জনক নিশ্চয়! অন্যথা, মরণ যদি,
সব অবসান! কিবা কাজ আপ্তজনে!
সামান্য সমরে, যুঝে যাহে সৈন্যে সৈন্যে,
সৈনিকজীবন শত শত অস্তগত,
মরি যদি,তাহে কি যশ! নিষ্প্রভ তাহা!
দ্বন্দ্বযুদ্ধে কীর্ত্তি কিন্তু দিগন্তব্যাপিনী!"

নীরব সোরাব। সস্নেহে যুবার কর
নিজকরে করি, পরিহরি দীর্ঘশ্বাস,
তাতারসেনানী কহিলা পিরান্ উইসা ;—
"হা বৎস সোরাব! অসুখিত চিত তব!
তাতারনায়ক-দলে পার না থাকিতে
শান্তমনে! সকলের প্রিয়, তাত, তুমি!
রণাঙ্গনে সকলের ভাগ্যের যে ফল,
পার না কি ভাগ্যলিপি মিশাতে সে ফলে
তাই, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বলি দিয়া নিজপ্রাণ,
ইচ্ছিয়াছ অন্বেষিতে জনকে তোমার!—
জনক, তোমার চক্ষু চেনে না যাঁহারে!
শান্ত কর মন, থাক আমাদের সনে,
নগরে, শান্তির কালে ; শিবিরে,সমরে!
ইহাই উত্তম কল্প, লয় মোর মনে!
কিংবা অন্বেষিতে তাতে নিতান্ত বাসনা,
বৎস, যদি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর পরিহার,
ভ্রমি দেশ, গ্রাম, পুরী অন্বেষ জনকে ;
ভুঞ্জ স্নেহ-আলিঙ্গন অক্ষতশরীরে
পিতার, সোরাব! আর বলি, দূরদেশে
কর অন্বেষণ, হেথায় নহেন তিনি।—
যৌবনের কালে মোর হেরিয়াছি, তাত!
প্রতি রণে সৈন্যদলে অগ্রণী তাঁহারে ;
না দেখি নায়করূপে এবে তাঁ'রে আর।
পারস্যরাজের সহ কলহের তরে,
কিংবা জরা-আক্রমণে, স্রস্তগ্রন্থি-দেহ,
ক্ষীণবল, পরিহরি তাতারবাহিনী,
নিবসেন গৃহে বীর বৃদ্ধ পিতা সনে,
বৃদ্ধকালে, জন্মভূমি সিস্থান নগরে।
যাহ,বৎস! তথা। বুঝি ইচ্ছা নাহি তায়!
মনে লয় মোর, ঘটিবে অহিত কিছু
এ দ্বন্দ্বসমরে ;—বিপদ্ অথবা মৃত্যু!
যদ্যপি যাইবে, বৎস! ত্যজি আমা সবে,
সুস্থ, নিরাপদ্ তবু হেরিলে তোমারে,
বড় প্রীতি পাই মনে ; তাই সে সানন্দে
প্রেরি তোমা, যাহ, বৎস! পিতার উদ্দেশে
শান্তমনে, পরিহরি সমরবাসনা!
কিংবা কে রাখিতে পারে কেশরি-শাবকে
শিকার-উন্মুখ যবে? কে রাখে শাসনে
শিশু রস্তমের সুতে? যা' বৎস সোরাব!
মনের বাসনা যাহা, সাধ একমনে।"

এত বলি,ছাড়ি দিলা সোরাবের কর
সেনানী। উঠিলা ত্যজি কম্বল-আস্তর

শয্যাতল, আচ্ছাদিলা শীতার্ত্ত শরীর
লোমজ কঞ্চুকে ; তদুপরি বেড়িলেক
শুভ্র আচ্ছাদনে ; শোভিল দক্ষিণ করে
অসিবিনিময়ে রাজদণ্ড ; শিরস্ত্রাণ
শিরে, মেষচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, সুচিক্কণ,
কুঞ্চিত, আসত ; শিবিরের যবনিকা
উত্তোলন করি, আহ্বানি আপন দূতে,
মুক্ত সমীরণে বাহিরিলা সেনাপতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচিত্র পত্র।

"গৃহ মধুর গৃহ" এ কথার যাথার্থ্য বুঝিলাম জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই মধুরস্মৃতিবিজড়িত মধুর ইংলণ্ড দ্বীপটা পশ্চাতে সরিয়া গিয়া মাধুরীমণ্ডিত বাল্যকালকল্পিত স্বপ্নরাজ্যসদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। ইংলণ্ডের মাধুরী প্রতিক্ষণেই আমার অশান্ত হৃদয়ে একটা ব্যাকুলতা উৎপাদন করিতেছিল। শেষে যখন চতুর্দ্দিকে এক উদ্বেলিত নীলসমুদ্রব্যতীত অপর কিছুই লক্ষ্য করিতে পাইলাম না, তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পশ্চাতে ফিরিলাম। একটি লোক একখানি সংবাদ পত্র হস্তে লইয়া আমার দিকে দেখিতেছিল। আমি তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে একটু হাসিয়া বলিল—মাপ করিবেন, আপনি কি এই প্রথম দেশ ছাড়া হইতেছেন? আবার ফিরিবার সময় যখন ধীরে ধীরে নীল সিন্ধুর ভিতর হইতে অল্পে অল্পে মাতৃভূমির উপকূল জাগিয়া উঠিবে, তখন দেখিবেন সে অনির্ব্বচনীয় সুখের সহিত এ দুঃখের তুলনাই হইতে পারে না।

আমি আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু কষ্ট করিয়া হাসিলাম; আমাকে যে বিনা অপরাধে একটা মুহূর্ত্তব্যাপী অমঙ্গলকর ঘটনার জন্য মাতৃ-ভূমির নিকট চিরবিদায় লইতে হইতেছিল, তাহা আমার সঙ্গী কিছুই জানিতে পারে নাই। আমি আবার গৃহে ফিরিয়া প্রিয়জনদিগের মুখ দেখিতে পাইব, যদি এ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এতদূর বিষণ্ণ হইতাম না।

এ কথা সে কথার পর ভদ্রলোকটি বলিল—মিঃ সার্লির বাটীতে কল্যকার ঘটনাটা বড় আশ্চর্য্যজনক ব'লে আপনার মনে হয় না কি? সমস্তটার নিম্নে নিশ্চয় একটা জটিল রহস্য নিহিত আছে।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—আমার কিছুই মনে হয় না। যে বিষয় কিছু শুনি নাই, সে বিষয় কোন কথা মনে হইবে কেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—ক্ষমা করিবেন। যাহা সমস্ত ইংলণ্ড জানিয়াছে, তাহা আপনি জানেন না তাহা জানিতাম না।

লোকটা একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিল। আমি একটু ভীত হইয়া বলিলাম—কি জানেন, আমি আজ সকালে এই যাত্রার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম। প্রাতঃকালে সংবাদপত্র পড়িবার সময় পাই নাই।

ভদ্রলোকটি আমার হস্তে সেই সংবাদপত্রখানি দিয়া একস্থল অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে—

South London Sensation.

দক্ষিণ লণ্ডন হুজুক

Indigent relation attempts to kill a millionaire.

(দরিদ্র কুটুম্ব লক্ষপতিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।)

Jumps into the Thames.

(টেমস্ নদীতে লম্ফ প্রদান করিয়াছে।)

তাহার পর নানা আড়ম্বরের সহিত পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। সংবাদপত্রপাঠে জানিলাম যে মিঃ সার্লির দরিদ্র কুটুম্ব প্রমোদরজনীতে তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে একটা কোণে লইয়া যায়। তাহার পর তাহাকে বলে যে তুমি এক রাত্রির আমোদে এত অর্থ ব্যয় করিতেছ, আমাকে কিছু সাহায্য কর। দয়ার্দ্রহৃদয় সার্লি সাহেব তাহাতে সম্মত হইয়া আজ প্রাতে আসিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। লোকটি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তখনি অর্থ সাহায্য পাইবার জন্য আহূত ব্যক্তিকে জোর করিয়া অনুরোধ করে। তাহাতে একটু বচসা হয়, সেই বাদানুবাদের মধ্যে লোকটি তাহাকে কাপুরুষোচিতভাবে প্রহার করে। পরে সে দৌড়িয়া পলায়ন করে। মিঃ সার্লির সেক্রেটারী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে অনন্যোপায় হইয়া লোকটা টুপি ও কোট ফেলিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়ে। শেষে তাহাকে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া প্রভু-দুঃখ-কাতর সেক্রেটারী-মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করেন। যতদূর জানা গিয়াছে

লোকটার নাম শ্যামুয়েল সার্লি। আহত সার্লি এক্ষণে হাঁসপাতালে আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁহার আরোগ্যসম্বন্ধে বিশেষ আশা করেন।

আমার অপরাধ ও আত্মহত্যাসংক্রান্ত যথাযথ ঘটনাবলী জানিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইলাম। লোকটা আমাকে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। আমি যে প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি, তাহা তাহাকে বলিলাম। এরূপ ঘটনা শুনিয়া বিস্মিত না হইবে এমন লোকত যুক্তরাজ্যে কেন, পৃথিবীতে ছিল না।

ধীরে ধীরে আমার নূতন জীবনে এক রকম অভ্যস্ত হইতেছিলাম। মাতৃভূমি ছাড়িয়া নূতন জগতে গিয়া নূতন জীবন যাপন করিবার একটা নূতন উত্তেজনা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল। তোমার পিতার সেই ভ্রাতৃপ্রেম-দীপ্ত মুখখানি, তোমার মাতার সরল পুণ্যময় চিত্র এবং তোমার পবিত্র ক্ষুদ্র সত্বাটা তখনও আমার মনস্থির করিবার বিষয়ে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বৎস! আমি যে রকম ভীষণ মানসিক সংগ্রাম করিয়া আপনার চরিত্র গঠন করিয়াছি, সেরূপ সংগ্রাম যেন ভগবান তোমাকে জানিতে না দেন। এই মুহূর্ত্তে যদি আমি অন্ধ হইয়া যাই বা একটী দুর্ঘটনাবশতঃ আমার পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া আমাকে অবশিষ্ট জীবন খঞ্জ হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় আমি বিচলিত হই না। কিন্তু যে সময়ের কথা তোমায় লিখিতেছি, তখন আমি একটি বালিকা ছাত্রীর (school girl) মত কোমলহৃদয় ছিলাম।

পূর্ব্বে যে ভদ্রলোকটির কথা লিখিয়াছি, তিনি আমার সহিত যেন একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিলেন। আমি নির্জ্জন বাস করিবার জন্য জাহাজের যে সকল দিকে জনাভাব, সেই সকল দিকে বসিয়া বসিয়া সীমাশূন্য নীলিমার তরঙ্গরাশির ক্রীড়া দেখিতাম ও চুরুট মুখে করিয়া সমুদ্রের গাল (sea gull), আলবাট্রস্ (albatross) প্রভৃতি পক্ষীর কলহ নিরীক্ষণ করিতাম। লোকটা কেবল যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমার দিকে আসিত এবং আমাকে কথোপকথনের মধ্যে টানিবার চেষ্টা করিত।

দক্ষিণ ফ্রান্স ছাড়াইয়া আমরা আবার সেই তরঙ্গময় সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম। দক্ষিণ ফ্রান্সের হরিতবর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং দিব্য একটু উষ্ণ হিল্লোল আমার হৃদয়ে বেশ সুখের সঞ্চার করিতেছিল। হঠাৎ সেই পূর্ব্বোক্ত লোকটি (যাহার নাম জানিতে পারিয়াছিলাম মিঃ টমাস্) আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল। আমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া টমাস্ বলিল—মিঃ গ্রীভ্স্ আপনি ঐ মহিলাটিকে জানেন?

বলা বাহুল্য, আমি আপনাকে গ্রীভ্‌স্‌ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। আমি তাহার ইঙ্গিতমত রমণীর দিকে তাকাইয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। বারম্বার সেই পাটল বর্ণের (pink) পরিচ্ছদবিভূষিতা রমণীর প্রতি দেখিতে লাগিলাম। আজ তাহার চক্ষে সেরূপ অগ্নি ছিল না বটে, কিন্তু সে গভীর নীলবর্ণ চক্ষু, সে রাজহংস গ্রীবা, সে উন্নত দেহ আমি দেখিয়াই সন্দেহ করিলাম যে সার্লি'কে যে রমণী ছুরি মারিয়াছিল, এ সেই রমণী। আজিকার এ প্রশান্ত মূর্ত্তিতে কিন্তু সে প্রতিহিংসার জলন্ত চিত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। শেষে আমার বিশ্বাস হইল, যে আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

আমাকে এরূপভাবে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মিঃ সার্লি, এত চিন্তাশীল কেন? রমণীকে চিনিতেছেন?

বলা বাহুল্য,' সেই ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার মুখের কি রকম ভাব হইল বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বেশ স্মরণ আছে সে আমায় বলিয়াছিল—আপনি স্থির হ'ন, আপনাকে বড় পীড়িত বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমি ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া সেস্থল পরিত্যাগ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। মিঃ টমাস আমার হাত ধরিয়া বলিল—আপনি একটি শিশু। আপনার বুঝা উচিত যে আমি যখন এত কথা জানি, তখন ইহাও জানি যে আপনি নির্দ্দোষ। যদি কলঙ্কমুক্ত হইয়া আবার স্বদেশে ফিরিতে চান, আমার সহায়তা করুন।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম। টমাস বলিল—বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই। এখন আপনাকে অত্যন্ত উত্তেজিত বলিয়া মনে হইতেছে, পরে সকল কথা বলিব।

লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে চলিয়া গেল।

তাহার পর টমাসের উত্তেজনায় দুই, দিনের মধ্যে সেই রমণীর প্রতি আমার কিরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি না। আমাদিগের আত্মীয় জোসেফ সার্লির সহিত রমণীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহার প্রতি আমার এক প্রকার সহানুভূতি হইয়াছিল। কিন্তু পরে যখন সমস্ত বিষয় শুনিলাম, তখন আমার সহানুভূতি ঘৃণায় পরিণত হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম সে একজন অষ্ট্রেলিয়ার ধনী অশ্বব্যবসায়ীর কন্যা—বিলাতে বড় ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন। সে মিঃ সার্লিকে বিবাহিত জানিয়াও

আপনার স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ-পণ বিচ্ছিন্ন (divorce) করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সে একটা জঘন্য প্রকৃতির স্ত্রীলোক। আমি স্বচক্ষে তাহার সেই পৈশাচিক কার্য্য দর্শন করিয়াছিলাম। তাহার জন্য আজ আমি প্রিয় (dear) ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত নির্ব্বাসিতের মত পৃথিবীর অপরস্থলে উদরান্নের জন্য ভাসিতে যাইতেছি, একথা স্মরণ করিয়া বাস্তবিক রমণীর উপর আমার বড় ঘৃণা হইল। টমাসের কথামত রমণীর বিরুদ্ধে তাহার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ-দান করিলাম।

কয়দিন ধরিয়া যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলাম, শেষে জিব্রলটার আসিয়া সে সুযোগ পাইলাম। জিব্রলটারে সমস্ত ইংরাজ ও ঔপনিবেশিক যাত্রী আমাদের দুর্গ-পরিখাদি দেখিবার জন্য নামিল। রমণীর সহিত একটি ভারতবর্ষীয় সিভিলিয়ান ও একজন ভারতবর্ষীয় বৃদ্ধ নীলকর বেশ মিশামিশি করিয়া লইয়াছিল বলিয়া আমি সেদিকে বড় ঘেঁসিতে পারি নাই। জীব্রলটার দুর্গাদি দেখিয়া St. Mary Caves নামক গিরিগহ্বর দেখিবার জন্য পুরুষ দুইটি গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিল। রমণীটি বোধ হয় হাঁফাইয়া গিয়াছিল, সেই গহ্বরদ্বারে পাহাড়ের উপর ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

আমি তাহার নিকট গিয়া টুপী তুলিলাম। রমণীটি সুন্দরকণ্ঠে বলিলেন—মাপ করিবেন, আপনি ফ্লোরা নামক জাহাজে আমাদের সহযাত্রী না?

আমি উৎসাহিত হইয়া সেই স্থলে বসিয়া বলিলাম—হ্যাঁ।

রমণী বেশ সরল অমায়িকতার সহিত বলিল—বড় রহস্যের কথা। এই জাহাজের নাম ও আমার খৃষ্টান নাম এক—আমার নাম ফ্লোরা সল্ট (Flora Salt.)

রমণী-সম্বন্ধে যাহা জানিতাম, তাহার সহিত তাহার এই সরলতার ভাণ তুলনা করিয়া আমার হৃদয়ের ঘৃণাটা সেই মুহূর্ত্তে বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গেল। ফ্লোরাকে বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে, তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর সর্ব্বগ্রাসী বিষাদের-ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে আত্মগোপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় মনের ভাব লুকাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—বটে! এতো বেশ আশ্চর্য্যজনক মিল (strange coincidence).

তাহার পর মিস্ সল্ট আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

আমরা যেস্থলে বসিয়াছিলাম, সেস্থল হইতে সমস্ত পশ্চিম জিব্রলটার আনা-

দিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সে স্থলটি সমুদ্রকূল হইতে সহস্র ফিটের অধিক উচ্চ। পাহাড়টি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্তরে স্তরে কাটা হইয়াছে। নিম্নে জিব্রলটারবাসীদিগের বাটীসংলগ্ন কাননে কমলা লেবু, সেব, লোকাট প্রভৃতি বৃক্ষের শোভা অদূরে সীমাশূন্য নর্ত্তনশীল নীল সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া বেশ দৃষ্টি সুখকর হইয়াছিল।

রমণী সেই সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করিল,শেষে যেন একটু চিন্তামগ্নভাবে বলিল —আপনাকে কোথা যেন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

আমার সমস্ত সঞ্চিত ঘৃণা ও হৃদয়ের জ্বালা একত্রিত হইয়া আমার মুখ হইতে যে প্রত্যুত্তর জোর করিয়া বাহির করিল, তাহা টমাস আমাকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার পরিচয় গোপন করিতে বলিয়াছিল। আমি কিন্তু সে সময় তাহার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারি নাই। সুতরাং রমণীকে বলিলাম—আমাকে আপনি বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু আমি যে অবস্থায় প্রথম আপনাকে দেখিয়াছিলাম, সে অবস্থা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

রমণী আরও একটু চিন্তাকুল হইয়া বলিলেন—আমার তো কিছু স্মরণ নাই।

তাহার মুখের এই গম্ভীর ভাবের মধ্য দিয়া তাহার সেই মনের দৃঢ়তার ভাব কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইতেছিল। সে আমার শত্রু হইলেও সে সময় মনে মনে আমি তাহার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছিলাম, একথা আজিও আমার স্মরণ আছে।

রমণীকে বলিলাম—সার্লির সান্ধ্য ভোজের দিন মনে পড়ে?

রমণী একটু চমকিয়া উঠিল। আমাকে তাহার সুন্দর নীল চক্ষু দুটি দ্বারা শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম—যে সময় সার্লি আহত হয়, এই হতভাগ্যই তাহার সহিত কথা কহিতেছিল। তাহার পর—

যুবতী যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অতি মৃদুভাবে অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে বলিলেন—আপনি শ্যামুয়েল সার্লি?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ এই হতভাগ্যই সার্লি। জগত জানে আমি আমার আত্মীয়কে—

রমণী এবার একটু সাহস করিয়া বলিল—'আপনার আত্মহত্যার কথাটা তাহা হইলে অলীক।' বুঝিলাম প্রথম উত্তেজনার ভাবটা কাটিয়া যাওয়ায় রমণী বল পাইয়াছে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ।

রমণী বলিল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মিঃ সার্লি, আপনার দুষ্ট (black guard) আত্মীয়কে মারিয়াছি বলিয়া কোন দিন অনুতাপ করিব না। কিন্তু আমার জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তি মাথায় নরহত্যার কলঙ্ক লইয়া জীবন নষ্ট করিয়াছে, এ চিন্তা দিবানিশি আমায় যাতনা দিতেছে। আজ আপনি আমার জীবনের একটা ভার নামাইলেন।

রমণী একটু হাসিয়া তাহার হস্ত প্রসার করিয়া আমার হস্তধারণ করিল। বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দরী, পরদুঃখকাতরা রমণীকে এক দেবী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সম্বন্ধে টমাসের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলাম। তখন ভাবিলাম, স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিশাচীরাও মনোভাব গোপন করিয়া কেমন দেবী সাজিতে পারে!

আমাকে এইরূপ প্রহেলিকায় ফেলিয়া ফ্লোরা বলিল—বুঝিতেছি আমারই জন্য আজ আপনি গৃহত্যাগী। কিন্তু আজ হইতে আমাকে আপনি বিশেষ বন্ধু বলিয়া পরিগণিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

ছিল এ পিরীতি মম।

ছিল এ পিরীতি মম
বন-যূথিকার সম,
নশ্বর পল্লব-থরে, ক্ষুদ্র এক বৃন্ত ধরি';
রূপে রসে থরথর,
সহে না বায়ুর ভর,
অতি শুভ্র, সুকোমল, পরশে পড়িবে ঝরি'!

চারিধারে আশেপাশে
তরল জোছনা হাসে,
নীরব নিশুতি নিশি, আলস-শিথিল ধরা।

বহে বায়ু হেলিদুলি,
কাঁপে শাখা, পাতাগুলি ;
আধ-ঘুমে জাগরণে সে আছে স্বপনে ভরা !

যেন এ জগতে আর
কিছু নাই দেখিবার,
জীবন কল্পনা যেন—আপনারি ছায়ালোক !
নাহি বৃষ্টি, নাহি ঝড়,
নাহি রৌদ্র খরতর,
জীবন-মরণ-খেলা, মর্ম্মভেদী দুঃখশোক।

পাতায় ঢাকিয়া মুখ
গড়িতেছে নিজ সুখ,
খুলিয়া দিয়াছে বুক, ঝরিছে শিশির-কণা ;
মধুনিশি হাসি' হাসি'
ঢালিছে স্বপন-রাশি,
কোথায় গিয়াছে ভাসি'—বিভল ঘুমন্ত-জনা !

আসে দিবা যায় নিশা,
জাগিছে দুরন্ত তৃষা,
হে প্রিয়, বিদায় দাও, উঠে গ্রামে কোলাহল ;
ম্লান শশী অস্ত যায়,
বিহগ প্রভাতী গায়,
তারকা মুদিছে আঁখি, ঝরিছে যূথিকা-দল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সাময়িক সাহিত্য।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ও সম্পাদক

তাম্রকূট-প্রসঙ্গ।

তাম্রকূট বা তামাক বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর জনসমাজে অবাধে নিজ প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছে। সিগার, সিগারেট, মাখা তামাক, দোক্তা, সুরতি, নস্য প্রভৃতি ইহার নানাবেশ। তামাকের কথা এ দেশীয় কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হইবে না; ইহা মানবের মজ্জাগত এবং আফিমের ন্যায় অপরিত্যাজ্য। তবে মানবমাত্রেই তামাক ব্যবহার করে না। তামাকে আসক্ত ও অনাসক্ত দুই শ্রেণীর লোকই সমাজে আছে, তবে পূর্ব্বোক্তেরই সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। তামাক সেবনে যে তৃপ্তি সাধারণে ভোগ করেন তাহা মনের, দেহের নহে। যিনি নির্জ্জনে একাকী বাস করেন, তিনি তামাকের বিশেষ ভক্ত। তামাকের গুণাগুণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোক পরস্পর পরস্পরের বিরোধী মত প্রদান করেন।

তাম্রকূট-দ্বেষকের মতে—"ধূমপান, দোক্তা সেবন ও নস্য গ্রহণে নাইকোটিন্ (Nicotine), এমোনিয়া (Ammonia), কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic acid), প্রুসিক এসিড্ (Prussic Acid) প্রভৃতি যাবতীয় বিষাক্ত পদার্থগুলি দেহমধ্যে প্রবেশ করে। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়, হৃদ্‌পিণ্ড, রক্তনলী প্রভৃতির কার্য্যকরী ক্ষমতার বিশৃঙ্খলতা, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি নানা ব্যাধি তাম্রকূট ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত হয়। তামাক কি এমন সুমিষ্ট দ্রব্য যাহার জন্য মানব এতগুলি ভীতিপ্রদ ব্যাধি-শত্রুকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অবহেলে অকুতো-সাহসে তাহাদের সম্মুখীন হইতেছে!"

তাম্রকূট-স্তাবক বলেন———

"অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে তামাক দেহের সকল স্থানের সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উপকারী, কচিৎ কোন ব্যাধি দৃষ্ট হয় যাহা তামাক ব্যবহারে নিরাময় হয় নাই। পক্ষাঘাত, মৃগীরোগ, স্নায়বিক বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে তামাক ব্যবহারে উপকার হইয়াছে। কাহারও বিশ্বাস ক্ষয়রোগেও তামাক ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ তামাকসেবনকারী নরনারী দেশব্যাপী মহামারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে, এ কথা শত শতবার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাসিলি (Vassali) বলেন—"১৮৮৯ খৃঃ অঃ জেনোয়া (Genoa) প্রদেশে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী (Influenza) ব্যাপক হইয়াছিল, তখন দেখা গিয়াছিল যে তামাকের আড়তে যে সমস্ত শ্রমজীবী কার্য্য করিত, তাহাদের

মধ্যে কেহই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় নাই। তামাকের ধূম দন্তকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া সুদৃঢ় করিয়া দেয়।

দ্রব্যাদির পচন-নিবারণ করিবার পদার্থও তাম্রকূটে আছে কি না এই কথা লইয়া অনেক গবেষণা ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। মিলার (Miller), তাসিনানি (Tassinani) পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে তাম্রকূটের ধূমে ব্যাধির অঙ্কুর-নিবারক পদার্থ আছে।

একশত ভাগ তামাকে ৪ হইতে ৪৪ ভাগ নাইকোটীন্ (Nicotine) আছে। কেবল নাইকোটীন্ (Nicotine) থাকিলেই তাম্রকূট যে নরম বা কড়া হইবে, এমন কোন কথা নাই। পণ্টের (Pontay) মতে ৩া০ আউন্স তামাকে ১২৫ গ্রেণ এবং হ্যাবারমানের (Habermann) মতে $\frac{৩}{১০}$ হইতে $১\frac{১}{৪}$ গ্রেণ প্রুসিক এসিড্ আছে। তাম্রকূটে অগ্নি সংযোগকালে প্রুসিক এসিড্ উৎপাদিত হয়। পণ্টের (Pontay) মতে ১৫·৪৩২ গ্রেণ তামাকে ২া০ ঘন ইঞ্চি (Cubic inch) এবং টথের মতে (Toth) ·০৩১ ঘন ইঞ্চি (Cubic inch) কার্ব্বনিক এসিড্ উৎপাদিত হয়। হ্যাবারম্যান (Habermann) বলেন—যে পরিমাণ নাইকোটীন্ তামাকে থাকে, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ ধূমের সহিত নির্গত হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক ভাগ সিগারে বা সিগারেটে থাকে। মুখের মধ্যে তাম্রকূটের ধূম প্রবেশ করিলেই যে দেহমধ্যে নাইকোটীন সঞ্চারিত হইবে, এমন কোন কথা নাই। তাম্রকূট পান করিয়া মুখের লালাটা গলাধঃকরণ করিলে যত অনিষ্ট হয়, ফুসফুস অবধি ধূম প্রবেশ করিলেও তত টা হয় না। কারণ ঐ লালাতে তাম্রকূটের যাবতীয় অনিষ্টকর পদার্থসমূহ দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হয়।

ব্যবহার-বিধি।

তাম্রকূট সেবন করিতে হইলে উহাতে মৃদুমন্দ টান দেওয়াই শ্রেয়ঃ। যে পরিমাণ জোরে তামাকে টান দেওয়া যায়, বিষাক্ত পদার্থসমূহ সেই পরিমাণ অধিক মাত্রায় দেহমধ্যে প্রবেশ করে। একটু তামাক পনের মিনিটে সেবন করিলে যে পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, পাঁচ মিনিটে সেই তামাকটুকুই নিঃশেষ করিলে বিষাক্ত পদার্থ তাহার তিনগুণ অধিক পরিমাণ নির্গত হয়। চুরুট বা সিগারেটের শেষাংশে নাইকোটীন্ (Nicotine) সঞ্চিত হয়। ইহার শেষাংশটুকু সেবন করা অনুচিত। প্রাচ্য দেশবাসীরা তামাকু মাখিয়া উহার ধূম জলের মধ্য দিয়া কতকটা সংশোধন করিয়া ব্যবহার করে। উহাতে বিশেষ অনিষ্টকর পদার্থ থাকিতে পায় না। প্রাচ্যেরা ইহা বুঝে।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার পরামর্শদাতাগণের (Hygienist) মতে—"খালিপেটে তামাকু সেবন অবিধেয়।" আসল তামাকখোরের নিকট এ কথা বলিলে বোধ হয় হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

যাহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল, যাহাদের ফুসফুসের দোষ আছে এবং যাহারা মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদগ্রস্ত* তাহাদের তামাক সেবন না করাই উচিত; অন্যথা ক্ষতি সামান্য ও পরিমিত

* আমাদের দেশে এই দুই অবস্থাতেই লোকে তাম্রকূট সেবন করে। তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা অবসাদের পর আরাম এবং মানসিক উত্তেজনার পর শান্তি আনয়ন করে।

—লেখক।

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা উক্ত ব্যাধিসমূহকর্ত্তৃক আক্রান্ত নহেন, তাঁহারা তামাক সেবন করিলে বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু এই ব্যবহারবিধি জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদিও তাম্রকূট-সেবন পরিত্যাগ করিলে কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না, তত্রাচ ইহা ত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই শ্রেয়ঃ। সভ্যতালোকে আলোকিত মানব ইহা ত্যাগ করেবে না, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। ইহা ছাড়িবার প্রসঙ্গ উঠিলেই তামাকসেবনকারীরা হয়ত উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিয়া কহিবেন—যিনি তামাকু সেবন করেন না, তাহার অপেক্ষা তামাকুপায়ী কি অল্পদিন বাঁচিয়া থাকেন? অতিরিক্ত মাত্রায় তামাকখোরকেও সুদীর্ঘকাল বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর লোকের অদৃষ্টের ও জীবনের গতির কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

পরিমিতরূপ তামাক সেবনই বিধিসঙ্গত। নিজের শক্তি ও দেহের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিমিতরূপ তামাকসেবনে তৃপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার অনিষ্টকারিতার হস্ত হইতেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই মধ্যপন্থাবলম্বনই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও সঙ্গত।

প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতসন্তানগণ তথাকার ঔপনিবেশিক-শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার লাভ করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবাসীদিগের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে যেরূপ বৈষম্য ও নির্য্যাতনমূলক বিধির প্রচলন করিতেছেন, তাহাতে স্বতঃই আমাদের মনে এইরূপ একটী প্রশ্ন উদিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যাদি-উপলক্ষে যে সকল বৈদেশিক বাস করিতেন, তাঁহারা ভারতীয় নরপতিগণের নিকট কীদৃশ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহাদিগের জন্য কিরূপ বিধি-ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমিতে বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্যার্থ আগমন ও অবস্থান করিত। মৌর্য্যগণের শাসনসময়ে বহুসংখ্যক গ্রীক ব্যবসায়ী আর্য্যাবর্ত্তের তদানীন্তন সমৃদ্ধিশালী পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগরে বাস করিত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বৈদেশিকগণের প্রতি যেরূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাতে বোধ হয় তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তৎকালীন নৃপতিগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভারতীয় রাজশক্তি তাহাদিগের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ও তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বৈদেশিকগণের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ অমাত্যবর্গের উপর ভার থাকিত। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পর্য্যটক মিগাস্থিনিসের লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের রাজশক্তি অপরিচিত বৈদেশিক অতিথিগণের সেবা করিতেন, তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিশিত করিয়া দিতেন। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রকৃষ্টরূপ অবগত হইবার জন্য ও পীড়ার সময় তাহাদিগকে শুশ্রূষাদি করিবার জন্য স্বতন্ত্র অনুচরবর্গ নিযুক্ত ছিল। প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রতিগমনের সময়ে তাহাদিগের সহিত সশস্ত্র প্রহরী গমন করিয়া তাহাদিগকে

সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিত। মৃত্যু হইলে শব-সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা ছিল; উত্তরাধিকারী না থাকিলে প্রবাসী বৈদেশিকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার জন্মভূমিতে প্রেরিত হইত। বাণিজ্যের জন্য আগমন বা রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে কোন প্রকার নির্য্যাতনমূলক বিধির প্রচলন আদৌ ছিল না। বরং বৈদেশিকগণ যাহাতে বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা লাভ করিতে পারে, রাজার তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্যের উপর অযথা শুল্ক বা কর-স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করা হইত না। স্থানীয় অধিবাসিগণের অংশীদার হইয়া বৈদেশিকগণের বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যে সকল বৈদেশিক স্থানীয় অধিবাসীগণের সহিত ব্যবসায়ে অংশ রাখিতেন না অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে স্বীয় ব্যবসায় পরিচালন করিতেন, তাহাদিগকে অধমর্ণ বা ঋণী বলিয়া অভিযোগ করিবার অধিকার ভারতীয় প্রজার ছিল না।

পংক্তি-ভোজনে অধিকার না থাকিলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে নিমন্ত্রিত করিয়া ভোজ দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুরুচি ও উন্নতসভ্যতাবিধায়ক শিষ্টাচার প্রদান করিতে ভারতবাসী মাত্রেই উন্মুখ ছিলেন। বিদেশী বলিয়া ঘৃণা বা একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল না; সাম্য ও মৈত্রীর সুশীতল ছায়াতলে নির্ব্বিকার চিত্তে ভারতবাসী প্রবাসী বৈদেশিক ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত থাকিতেন। ইহাত হইল আর্য্যাবর্ত্তের কথা। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু নরপতিগণও তাহাদের বৈদেশিক অতিথিগণের সহিত সভ্যতা-সম্মত শিষ্ট ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগের ধর্ম্ম, উপাসনায় আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইত না। মধ্যযুগেও বৈদেশিকগণের প্রতি মোগল বাদসাহগণের উদার ব্যবহার প্রত্যেক ইতিহাস পাঠকের সুপরিচিত। বাস্তবিকই প্রাচীন ভারতে বৈদেশিকগণের যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা ছিল, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত।

ইন্দোরের হোলকার কলেজের অধ্যাপক গোকুলদাস বাবু "লিডার" নামক সংবাদপত্রে ইন্দোর প্রদেশে প্রচলিত এক ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সহৃদয় মিশনারী ও শাসকসম্প্রদায় তথা শিক্ষিত হিন্দুদিগের সমবেত চেষ্টায় চড়ক সংক্রান্তির "বাণ ফোঁড়া" পদ্ধতি বন্ধ হইবার পরও এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তবিধি অদ্যাপি ইন্দোর রাজ্যে কিরূপে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ইন্দোরের মহারাজার মাণিকবাগ কোঠা নামক গ্রীষ্মাবাসের অনতিদূরে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে এই নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হয়। স্ত্রীলোকেরাই এ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মীয় পুরুষগণ সমবেত হইয়া এই নৃশংস কার্য্য দর্শন করে ও রমণীকে উত্তেজিত করে। সূর্য্যদেবের মন্দিরে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলিয়া রবিবারই ইহার পক্ষে প্রশস্ত দিন; তবে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী বা চম্পা ষষ্ঠীর পরবর্ত্তী রবিবারই এই প্রায়শ্চিত্ত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভদিন।

যে রমণী প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তিনি এক চতুর্দ্দোলা চড়িয়া মহাসমারোহে মন্দিরে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতাগণ সেই চতুর্দ্দোলা বহন করেন। রমণী দুই মুখ সূচের মত সরু একটা ৬ ইঞ্চি শলাকা হস্তে করিয়া লইয়া মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। অবশেষে পূজাদির পর সেই তীক্ষ্ণ শলাকা সেই রমণীর মেরুদণ্ডে এক পার্শ্ব দিয়া ফুঁড়িয়া অপর পার্শ্ব হইতে বাহির করা হইলে একটা চড়কগাছে তাহাকে ঝুলাইয়া পাক দেওয়া হয়। সেই চড়কগাছ হইতে রমণী ফল নিক্ষেপ করে। সমবেত দর্শকমণ্ডলী সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শন করে ও রমণীকে উত্তেজিত করে।

মহাপুরুষ চার্ব্বাক।

(প্রতিবাদ।)

দার্শনিক যে সমস্ত গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহাদের মীমাংসা দূরে থাকুক, তাহাদের দুরূহতা উপলব্ধি করাই যে কত কঠিন, তাহা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত দু একটি প্রবন্ধপাঠে ও দার্শনিক তর্কাদি-শ্রবণে বেশ বুঝা যায়। ফাল্গুন মাসের অর্চ্চনায় প্রকাশিত "চার্ব্বাক দর্শন" নামক প্রবন্ধটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি।

উক্ত প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, "প্রকৃতির লীলাভূমি সিন্ধু-জাহ্নবী-প্রবাহিত বিহঙ্গম-কূজিত ভারতবর্ষে মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তা-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াই অসম্ভব"। লেখক বোধ হয় অবগত আছেন যে যাহা চিরদিন লোক বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে সন্দেহের কারণ দেখিতে পাওয়া প্রতিভার অন্যতম চিহ্ন, এবং যাহা আমি চিন্তাতেও সম্ভব মনে করি না, তাহাই হয়ত সত্য।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে বাদানুবাদ এত প্রাচীন ও এত জটিল যে তাহার পুনরুক্তি বা সিদ্ধান্ত এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাহার দুরূহতা সম্যক উপলব্ধি করিলে চার্ব্বাক দর্শনকে অত তুচ্ছ মনে হইবে না।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রচলিত অনুপ্রাসগুলি বাদ দিয়া দেখিতে হইবে যে প্রশ্নটি কি? প্রশ্নটি এই, আমরা এই যে বিচিত্র ও বিশাল জগত দেখিতে পাই, তাহা কি? তাহা—

(ক) নিত্য, সুতরাং কারণহীন

অথবা (খ) উৎপন্ন, সুতরাং কোন নিত্য আদিকারণ হইতে প্রসূত।

যদি জগৎ প্রসূত হয়, তাহা হইলে ইহার আদিকারণ কোন্ গুণবিশিষ্ট? যদি ইহা অচেতন শক্তিমাত্র হয়, ইহা ঈশ্বর নহে। যদি ইহা মনুষ্যের মনের ন্যায় কিন্তু অনন্ত শক্তিশালী, জ্ঞানবুদ্ধিদয়াধর্ম্ম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট দেহহীন সর্ব্বব্যাপী কোন পুরুষ হন, তবে ঈশ্বর আছেন।

কিন্তু কেমন করিয়া জানিব জগতই নিত্য নহে? জগতের মধ্যে সর্ব্ববস্তুই উদ্ভূত, পরিবর্ত্তিত ও লুপ্ত হইতেছে, কিন্তু সমগ্র পরিবর্ত্তনসমষ্টি কি চিরন্তন নহে? ধরিলাম তাহাও উদ্ভূত, কিন্তু কোন্ আদিকারণ হইতে? সেই আদি কারণের কি গুণ তাহা আমরা কি করিয়া জানিব? আমাদের জ্ঞান জগতের মধ্যে নিবদ্ধ। যদি বলেন আমি অনুভব করি যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক মহাপুরুষ, অচেতনশক্তি নহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে আমার অনুভূতি সেই অনুভূতির অস্তিত্ব ভিন্ন আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম কি না? আমি যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি যে আমি কবি, তাহা হইলে কি প্রমাণ হইবে যে আমি যথার্থ কবি, না শুদ্ধ আমি কবি, এই অনুভূতি আমার আছে। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করি' ইহাতে শুদ্ধ প্রমাণ হয় যে বক্তার অন্তরের ঐরূপ একটা অনুভূতি আছে—অনুভূতির বাহিরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হইলে প্রমাণ আবশ্যক। অনুভূতিদ্বারা আমার মানসিক অবস্থা ভিন্ন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কি প্রমাণ আছে? এই জগত যে মানসিক গুণসম্পন্ন কোন বস্তু ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারিত না, তাহার প্রমাণ নাই। মানসিক বৃত্তিগুলি আমাদের জ্ঞানে আমরা উচ্চশ্রেণীর পশুতে ভিন্ন দেখি নাই, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত। দেহহীন মন আমাদের জ্ঞানবহির্ভূত। ধরিলাম, ভগবান দেহহীন মন। কিন্তু এই একক সর্ব্বব্যাপী মনদ্বারা সৃষ্টির সম্ভাবনা কল্পনাতীত। সেই মনের মধ্যে ভাবের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? বাহ্যবস্তুভিন্ন ভাবোৎপত্তি আমরা দেখি নাই, অভাবভিন্ন ইচ্ছা দেখি নাই। পরিবর্ত্তনভিন্ন সুখদুঃখ দেখি নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই এক মনের মধ্যে ভাব, ইচ্ছা, সুখ, উৎপত্তি কল্পনার অতীত। যদি বলেন সেই অনাদি মনের মধ্যে ভাবনিচয় স্বতঃই উৎসের ন্যায় উঠিতেছে, আর সেই ভাবনিচয়ই এই নিখিলবিশ্ব, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্ব বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা ঈশ্বরে নাই এবং এইটি যে আমাদের

কল্পনা নহে সত্য তাহার প্রমাণ কি? 'আমি অনুভব করি ইহা সত্য' ইহাতে অনুভূতিরই সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান, তাঁহারা নীচান্তঃকরণ নহেন। তাঁহারা সত্যের পিপাসু। আমাদের সুখদুঃখ-প্রার্থনা মনুষ্যভিন্ন এক মহাপুরুষ জানিতেছেন, এই বিশ্বাসে কে না উৎফুল্ল হয়েন? কিন্তু যে বিশ্বাস সুখকর, তাহাই কি সত্য বিশ্বাস? বিশ্বাস কি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে? যাঁহারা সত্যের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা গড্ডালিকাপ্রবাহের মত পরম তৃপ্তির সহিত প্রচলিত বিশ্বাস বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করেন না।

এই কথাকয়টিতে লেখক বোধ-হয় বুঝিতে পারিবেন, যে চার্ব্বাক প্রচলিত বিশ্বাস-স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি মহাপুরুষ। তাঁহার আবির্ভাব "ক্ষোভের বিষয়" অথবা তাঁহার মত "সামান্য জ্ঞানযুক্ত হিন্দুবালকের"ও খণ্ডনীয় নহে।*

শ্রীপান্নালাল বসু।

কবিতা-কুঞ্জ।

অকূলে কেন?

রক্তপিণ্ড জড়দেহ, কত না মায়ায়—
সযত্নে বহিছ তুমি, কতকাল ধরি'!
মুদেছ নয়ন দু'টী দিব্যজ্ঞান ছাড়ি,
বিপথে চলিবে কত এমনি বৃথায়!
অনিমিখে হেরে তোমা', নয়ন মেলিয়া
ঊর্দ্ধে অধে আশেপাশে স্বরগে ধরায়
অগণিত মুক্ত-আত্মা অতি শূন্য কায়
বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করে তব হিয়া।
আর কেন? অসাড় কি নবনীত দেহ?
বিভোল পাগলপ্রায় নাহি সংজ্ঞা জ্ঞান!
চেন শুধু আপনারে, আপনার গেহ—
মনুষ্যত্ব আত্মজ্ঞান সব তিরোধান।
ঢাল বিশ্বজনে তব দয়া-মায়া-স্নেহ
শত প্রাণে মিশে যাক্ তব ক্ষুদ্র প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

প্রিয়-সম্মিলনে।

একা নহ ভাগ্যবতি! আমিও গো জানি
কি অমিয়া উছলিছে হৃদি পারাবারে—
ঐশ্বর্য্যশালিনী অয়ি প্রিয় হৃদি রাণি!
কত সুখ বাঁধা আজি তোমার দুয়ারে!
অনিল উড়ায়ে তব নীলাঞ্চলখানি
মন্দার সুষমা কত সুধীরে সঞ্চারে—
ও শশী শীতল কত তাও ওগো জানি
কি আবেশে মদালসে ও তনু শিহরে!
বয়েছিল সেই নদী খাদ যে পড়েছে—
শুকায়েছে যত ফুল সুরভি ছেয়েছে—
বেজেছিল যেই বাঁশী শ্রবণে শুনেছে—
অতীত স্মৃতির ধারে হৃদয় প্লাবিছে—
কান্না নাই ভাষা নাই অনুভবে রয়েছে
বাহিরে তোমার প্রিয়—অন্তরে জাগিছে!

শ্রীউমাচরণ ধর।

---

* আমরা বসু মহাশয়ের 'প্রতিবাদ' সাদরে প্রকাশিত করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা তাঁহার মতের বিরোধী। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে বলিব।—অঃ সঃ।

অর্চ্চনা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রবাবু একদিন শ্রীচন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন হিং টিং ছট। আজি দেখিতেছি তিনি স্বয়ং ক্রমে ক্রমে সেই দলে ঢুকিতেছেন।

বৈশাখের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রবাবুর "বিরহ কাব্য" প্রবন্ধটি মেঘদূতের একটি কবিত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। লেখক যাহা বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে এই। মেঘদূত শুধু স্ত্রীর জন্য যক্ষের বিরহবর্ণনা নয়, সমগ্রের জন্য মানুষের বিরহ বর্ণনা। ব্যাখ্যাটি আধ্যাত্মিক। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলিবার জন্য ব্যাকুলতা পরম আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও শুনিতে বেশ। কিন্তু মেঘদূতে সে কথা নাই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর মীমাংসা *a priori.*

প্রথমতঃ লেখকের একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা আলোচনা করা যাউক। তিনি বলিতেছেন "ভালো কাব্যমাত্রেরই একটি গুণ আছে তাহার মধ্য হইতে লোকে নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং তাহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে" ইত্যাদি। এটি একটি universal proposition. রবীন্দ্র বাবুর মতে যাহা হইতে নানা লোক নানাভাব গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা ভালো কাব্য নহে। তাঁহার মত ঠিক হইলে "ভালো কাব্য" হইতে অনেক গুলি ভালো কাব্য বাদ যায়। যথা (১) Shakspeareএর জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলি; (২) Homerএর Iliad, বাল্মীকির রামায়ণ ইত্যাদি; (৩) Byronএর সমস্ত কাব্য, Shelleyর অধিকাংশ খণ্ড কবিতা, Wordsworthএর অধিকাংশ কবিতা, এবং হেমবাবুর সমস্ত কবিতা; এবং (৪) Marsailes, Home Sweet Home, Ye Banks and Braes, Maid of Athens ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত গান। কেহ যে জোর করিয়া সে'গুলি হইতে নানা অর্থ বাহির করিতে পারেন না তাহা নহে। তবে সে 'ধরেভদ্রে' ঘটানো। (যেমন Trojanএর সঙ্গে Greek এর যুদ্ধ ধরা যাইতে পারে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের যুদ্ধ। কিন্তু সব যুদ্ধইত তাই। ইহা Iliadএর ব্যাখ্যা নহে।)

রবীন্দ্রবাবু যে নিজেই প্রতিজ্ঞাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাহা বোধ হয় না। কারণ এই প্রবন্ধেই তিনি বলিতেছেন, "মেঘদূত যদি কেবল

এইরূপ একটি সাধারণ বিরহ-বর্ণনা হইত তাঁহাকে আমি দোষ দিতাম না।" কেন দিতেন না? তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা-অনুসারে ইহা ত তাহা হইলে "ভালো কাব্যে"র শ্রেণীতে পড়িত না। কারণ ভালো কাব্যমাত্রেরই গুণ তাহার "অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে" পায়। আর ভালো কাব্য না হওয়া কি কাব্যের গৌরবের কথা? রবীন্দ্রবাবুর কোন্ উক্তিটি ঠিক জানিতে ইচ্ছা করি।

লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন যে "রস যেখানে গভীর হয়, সেখানে আপনিই তাহা কোন একটি চিরন্তন তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।" "চিরন্তন তত্ত্ব" বুঝিলাম না। প্রত্যেক তত্ত্বই চিরন্তন। রবীন্দ্রবাবু একটি তত্ত্ব কথা বলুন দেখি যাহা চিরন্তন নহে। তত্ত্ব সহজ বা নিগূঢ় হইতে পারে। কিন্তু কোন তত্ত্ব সাময়িক তত্ত্ব হয় না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রবাবু Eternal Truthএর তর্জ্জমা করিয়াছেন, "চিরন্তন তত্ত্ব।" তাঁহার অর্থ বোধ হয় "পারমাত্মিক তত্ত্ব" অর্থাৎ পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সত্য আছে সেই সকল সত্য। যদি তাহাই তাঁহার বক্তব্য হয় তবে মানুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলি সে তত্ত্বের অন্তর্ভূত কি না? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে গভীররসাত্মক কাব্যের মধ্যে Paradise Lost এবং ভগবদ্গীতা। অন্য সমস্ত কাব্য গাধরসাত্মক (অর্থাৎ যদি পরব্রহ্মরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ তাহা হইতে টানিয়া বাহির করা না যায়) —Shakspeare গেলেন!

তাহার পরে মেঘদূতের ব্যাখ্যা। তিনি এ কাব্যে "সমগ্রের" জন্য মানুষের বিরহ-বেদনা দেখিতেছেন।

প্রথমতঃ বুঝিয়া লই রবীন্দ্রবাবু 'সমগ্র' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। সমগ্রের অর্থ 'সমস্ত'—একটিকেও বাদ দিয়া নহে। তাহা যদি হয় "মানুষ" সেই সমগ্রের একটি অংশ!—যেমন সমুদ্রের জলবিন্দু সমুদ্রের অংশ। কিন্তু মেঘদূতে দেখি যক্ষ তাঁহার স্ত্রীর অংশ নহেন।. তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বিভিন্ন ব্যক্তি। বোধ হয় তিনি 'সমগ্র' শব্দ বহির্জগৎ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বাহিরের প্রতি, মানুষের আকর্ষণেরই বোধ হয় রবীন্দ্রবাবু সহজ অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। না পাইবার কথা। সমস্যা সত্যই বড় জটিল। কিন্তু তিনি যদি ইহার "অর্থ" চাহেন তাহা তিনি হয়ত বেদান্তে পাইবেন, মেঘদূতে পাইবেন না। সে তত্ত্ব লেখক যদি কাব্যেই চান ত তাহা Wordsworthএর Ode

on Immortality of the Soulএ পাইবেন, চিরঞ্জীব শর্ম্মার গীতে পাইবেন, মেঘদূতে পাইবেন না।

যে ধারণাগুলিকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রবাবু এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইয়াছেন, সে ভিত্তি বড় জীর্ণ, বড় দুর্ব্বল।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রবাবু দেখিতেছেন যে বিরহী যক্ষ "অভ্রভেদী শিখরে" বসিয়া আছে। অন্ততঃ তাঁহার ব্যাখ্যার জন্য এরূপ দরকার হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে যক্ষ নাই। যক্ষ "জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু" (পর্ব্বত-শিখরে জনকতনয়া স্নান করেন নাই) "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু" (পর্ব্বত-শিখর স্নিগ্ধচ্ছায় হয় না)* "রামগির্য্যাশ্রমেষু" বসতি করিতেছিল। পর্ব্বত-শিখর হইলে যক্ষ শিখর হইতে "আশ্লিষ্টসানু" মেঘকে দেখিতেছেন কি প্রকারে? মেঘ কি তাঁহার পদতলে?—উত্তম! কিন্তু তাহা হইলে "মেঘালোকে" যক্ষের চিত্ত-বিকার হইল কিরূপে? তাঁহার উপরে ত নির্ম্মুক্ত নীল আকাশ। বস্তুতঃ স্থানটির বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায় সে যক্ষ যেস্থানে আছেন তাহা পর্ব্বতের অধিত্যকা। সম্মুখে নদী, পার্শ্বে পর্ব্বতশৃঙ্গ, চারিদিকে ঘন বৃক্ষরাজি;—একটি রমণীয় স্থান। উপরে পর্ব্বতসানুলগ্ন মেঘ দেখিয়া (এও একটি রমণীয় দৃশ্য) যক্ষের প্রেমোন্মাদ হইয়াছে। সেখানে তাঁহার সঙ্গী কেহ ছিলেন কিনা তাহা কবি বলেন নাই। "জনশূন্য শিখর—" রবীন্দ্রবাবুর রচনা, কালিদাসের নহে। রবীন্দ্রবাবুর প্রথম যুক্তিই ভুল। অথচ এই যুক্তিটি রবীন্দ্রবাবুর প্রধান আশ্রয়। তিনি বলিতেছেন "এই জন্যই মেঘদূতে যে বিরহ বর্ণিত আছে তাহা কেবলমাত্র প্রণয়িনীর জন্য প্রণয়ীর বিরহ নহে, তাহার মধ্যে এই বিশ্বের বিরহটি রহিয়াছে।"—কিন্তু গোড়ায়ই গলদ।

তাহার পরে যক্ষের স্ত্রী স্বর্গে নাই, অলকায় আছেন। অলকা মর্ত্তেই হিমালয় পর্ব্বতে, অলকানন্দাতীরে অবস্থিত। "কুবের পুরীর সমস্ত সম্পদ" "তাহার" নহে। তাহার কেবল নিজের বাড়িখানি। বাড়িখানি জাঁকালো বটে, তবে "কুবের পুরীর সমস্ত সম্পদ" তাহাতে নাই। আর সে গৃহখানিও সম্পূর্ণ যক্ষের নিজের সম্পত্তি, তাঁহার স্ত্রীর নহে (অন্ততঃ শশীভূষণের স্ত্রীর মত স্ত্রী না হইলে)। তবে সেই স্ত্রী (পরমাত্মা বোধ হয়) সেখানে তাহার কুবে-

* এরূপ পাঠকের অভাব নাই যাহারা বলিয়া উঠিবেন কেন চট্টগ্রামের পাহাড়ের শিখরে ত বন আছে। কিন্তু তাঁহাদিগের "প্রতি নৈব বক্তঃ।"

রের সমস্ত সম্পৎ লইয়া যক্ষের জন্য (আত্মা বোধ হয়) অপেক্ষা করিয়া আছেন, এ কথা কি ঠিক?

তাহার উপরে স্ত্রী হইলেন "সমগ্র" আর স্বামী হইলেন "মানুষ"; এরূপ কল্পনা মহাকবি কালিদাস দ্বারা সম্ভবপর নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি বলিলে এ সম্বন্ধে যায় আসিত না। কিন্তু স্বামী "মানুষ" (বোধ হয় আত্মা) ও স্ত্রী "সমগ্র" (বোধ হয় পরমাত্মা)—হাস্যকর।

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রবাবু পূর্ব্বমেঘের যে "গভীর অর্থ" বুঝিয়াছেন তাহা বোধ হয় অত্যন্ত গভীর। পূর্ব্বমেঘে লেখক "পরমের পরিচয়মাত্র দেখিতেছেন, "চরমতা" দেখেন না। কেন? মেঘের যাত্রাপথে বহুস্থানই ত অতি সুন্দর। উজ্জয়িনীর বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতলোলাপাঙ্গী পৌরাঙ্গনাগণ লীলাকমলহস্তা বালকুন্দানুবিদ্ধকেশা অলকারমণীদিগের চেয়ে হীন কিসে? তফাৎ এই যে অলকারমণীগণ সমধিক সজ্জিতা, বিলাসিনী, কামরতা, চিরযৌবনা। আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসম্বন্ধেও উজ্জয়িনী অলকার চেয়ে হীন নহে। শুদ্ধ এক ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে বোধ হয় কুবেরের পুরী উজ্জয়িনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাহার পরে এই 'সৌন্দর্য্যের পরিচয়ের' মধ্য দিয়া যাইতেছেন মেঘ—যক্ষ নহে। যক্ষ সেই সৌন্দর্য্য মনে মনে ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যদি তাঁহারই চরম সৌন্দর্য্যে যাইবার পন্থা, তবে তিনি মেঘকে সেখান দিয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছেন কেন? তিনি শাপাবসানে নিজেই ঐরূপ যাইতেছেন না কেন? মেঘকে দৌত্যে পাঠাইবার কাব্যে সার্থকতা কি? তাঁহার নিজের ত এক শ্লোকেই তাহার স্ত্রীর সহিত মিলন সম্পাদিত হইয়া গেল। রবীন্দ্রবাবুর কথিত উদ্দেশ্য কালিদাসের হইলে যক্ষ স্বয়ংই কি যাইতেন না?

বস্তুতঃ সমস্ত সমালোচনাটি লেখকের কষ্ট কল্পনা। তিনি যাহা ধরিয়াছেন তাহা সাদৃশ্য মাত্র, ব্যাখ্যা নয়। এ বিরহকে যদি বিশ্ববিরহ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সব বিরহই তাই। Shelleyর বিরহ, বিল্বমঙ্গলের বিরহ, Romeoর বিরহ, রামের বিরহ, দুষ্মন্তের বিরহ, হরিশ্চন্দ্রের বিরহ, এই যক্ষের বিরহের ন্যায় বিশ্ববিরহ নহে কেন?—প্রত্যেক বিরহেই নিশ্চয়ই দেবতার অভিশাপ আছে। দুষ্মন্তের বিরহ ত সদ্যঃ ঋষির শাপে ঘটিত। যদি মেঘদূতে যক্ষের বিরহ বিশ্ব-বিরহ হয় তবে এগুলি কি অপরাধ করিল? ইহাদের বিরহ প্রেমিকের বিরহ ও যক্ষের বিরহ কামুকের বিরহ বলিয়াই কি? নহিলে অন্য কোন তফাৎ দেখি না ত!

রবীন্দ্রবাবুর মনে এ সাদৃশ্যটি উদিত হওয়ার কারণ—বোধ হয় প্রধানতঃ তৎকল্পিত যক্ষের জনশূন্য পর্ব্বতশিখরে অবস্থিতি, ও যক্ষপত্নীর স্বর্গে অবস্থিতি। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে নির্ব্বাসনস্থান অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখর নহে—সুশ্যামল মনোহর অধিত্যকা। আর যক্ষপত্নী স্বর্গে নাই, তিনিও মর্ত্তে। বস্তুতঃ যক্ষ বিন্ধ্যাচলে, তাঁহার স্ত্রী হিমালয়ে। যক্ষের বিরহে অন্য কোন বিশেষত্ব নাই। প্রত্যেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরই এইরূপ অবস্থা। রামচন্দ্র হইতে নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত সকলেই পূর্ব্ব সম্পৎ, যশ, সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আর যক্ষের স্ত্রীর বিরহ জগতে প্রত্যেক সাধ্বী স্ত্রীর বিরহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শকুন্তলা হইতে ভ্রমরের বিরহ এইরূপেরই বিরহ। সকলেই স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন ও দিন দিন বিরহে কৃশ হইয়া যাইতেছেন। বিরহিনীর দশ দশা প্রসিদ্ধ।

তাহার উপর যক্ষের স্ত্রীর অবস্থাটিও যক্ষের নিজের উন্মাদ কল্পনা—প্রকৃত নহে। যক্ষ অচেতন মেঘকে যে দৌত্যে পাঠাইতেছেন কবি তাহার এই কৈফিয়ৎ দিতেছেন যে "কামার্ত্ত" যক্ষ ত তখন একরূপ উন্মাদ; তাহার কথাই ধর্ত্তব্য নহে।

"অভিশাপে" যে মানুষ মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এরূপ প্রবাদ আমি শুনি নাই। থাকিতে পারে। বহুদিন হইতে হিন্দুর ধারণা অন্যরূপ—অর্থাৎ মানুষ স্বীয় কর্ম্মফলে বারবার মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। গীতায়ও এই কথা আছে। কালিদাসেরই শকুন্তলায়ও এই জন্মান্তরবাদ আছে। তাহার পরে, আমরা যে fallen angels, এ ধারণা শয়তানের পতনের অনুরূপ বটে, কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মেরও অনুযায়ী নহে। রবীন্দ্রবাবু অবশ্য মানুষকে—সে হাজারই খারাপ হোক—শয়তানের বংশ বিবেচনা করেন না। আমার মনে হইতেছে এই "অভিশাপ" ব্যাপারটিও তাঁহার নিজের সৃষ্টি। তিনি ইহা কোথা হইতে পাইলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

পৃথিবীর সম্বন্ধে, মানুষের সম্বন্ধে, এত খারাপ ধারণা কবিজনোচিত কিনা, বলিতে পারি না। Wordsworth, Browning ইত্যাদি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন। Wordsworth এমন কি বলিতেছেন "But trailing clouds of *glory* do we come from God who is our home" Miltonও "human face devine" দেখিয়া পুলকিত হইয়াছেন। আমি ত বিবেচনা করি যে মর্ত্তের মানুষ একটা মহা মহিমায় মহিমান্বিত সৃষ্টি। সে ধূলির

উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিতে পারে—"তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু তুমি মানুষ নও।" মানুষের স্নেহ-দয়া-কৃতজ্ঞতা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ত্যাগ—পরম সুন্দর। তাহার কাছে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছার। আমরা অভিশপ্ত ? না, ঈশ্বরীর আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে শতস্থানে শতরূপে অনাদিকাল হইতে ঘিরিয়া আছে। এই বুদ্ধি, এই বিবেক, এই ত্যাগ অভিশপ্তের ? অভিশপ্ত ব্যক্তির মত শাপাবসানে তৎক্ষণাৎ আমরা স্বর্গে ফিরিয়া যাই না। আমরা ধীর সহিষ্ণু উদ্যমভরে নিজের তেজে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছি।—আমরা অভিশপ্ত ?

রবীন্দ্রবাবুর theory মানিবার পূর্ব্বে "আমরা অভিশপ্ত নির্ব্বাসিত" এই ধারণাটি কাব্যরসে ভিজাইয়া রসাইয়া লইতে হয়। কিন্তু আমি ত তাহা করিতে প্রস্তুত নহি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের ধারণার বিপরীত এই ধারণাই আমার বিবেচনায় অভিশপ্ত ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের কল্পনা—কবির কল্পনা নহে। Byron সেরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া তিনি অতখানি শক্তিসত্ত্বেও কবিত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু এরূপ যদি আমরা স্বীকার না করি, তাহা হইলেও বিপদ। রবীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "নহিলে আমাদের চিত্তকে বাহিরের দিকে এমন করিয়া টানে কেন ?"—বল। জবাব দাও। আর তা যদি না পারো, তবে আমরা যে fallen angels মানিয়া লইতে হইবে।

আমি রবীন্দ্রবাবুকে বলি "ব্যস্ত হইবেন না। ইহার ব্যাখ্যা আছে,কিন্তু ইহার উত্তর পাইবেন দর্শনে, কবিতায় নহে।" আমি তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি যে, আমরা "অভিশপ্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা" এ ছাড়া ইহার অন্য ব্যাখ্যা আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না।

এই কালিদাসই রবীন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিয়াছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোপি জন্তুঃ
তচ্চেতনা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি।

জন্মান্তরবাদ—অভিশাপ নহে। এই কালিদাসই কি মেঘদূতে অভিশাপ রূপ অনার্য্য কল্পনা করিবেন ?—সম্ভব ?

ফলতঃ দুইটি ধারণা মিলাইবার জন্য রবীন্দ্রবাবু কতক একদিকে কতক আর একদিকে ধরিয়া লইয়াছেন। একে কি কাণ ধরিয়া মাথায় মাথায় এক-করা বলে না?

"আধ্যাত্মিক" বলিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। রবীন্দ্রবাবুও কথাটি বড় ভালো বাসেন না, তাহা তাঁহার প্রবন্ধের শেষে দেখিলাম। কিন্তু তাঁহার মেঘদূতের ব্যাখ্যা যদি আধ্যাত্মিক না হয় তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না।

কুক্ষণে চন্দ্রনাথ বসু এইরূপ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বেও অবশ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহাকে প্রথমে সাধারণপ্রিয় করিয়া তোলেন বোধ হয় বসুজ মহাশয়। তিনি যাহা আলোচনা করেন তাহারই আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করেন। বস্তুতঃ সব রচনারই কাণ ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমি একবার ব্যঙ্গচ্ছলে "ঘাটে ডিঙ্গে লাগায়ে বঁধু পান খায়ে যাও" ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আধ্যাত্মিক অর্থ যেখানে সত্যই আছে সেখানে সেই আধ্যাত্মিক অর্থই কবির অভিপ্রেত। সেখানেও সে কবিতার একই অর্থ, এবং সে অর্থ সহজেই বোঝা যায়। যেমন Shelleyর Prometheus Unbound বা Alastor. কিন্তু যদি কেহ Epps chidionএর আধ্যাত্মিক অর্থ দিতে চাহেন, আমায় বলিতে হইবে যে "খবর্দ্দার!"

যদি অলকাপুরী স্বর্গের একটি মহকুমা হইত তাহা হইলেও অভিশাপে যক্ষের মর্ত্ত্যে পতনে এমন কোন বিশেষত্ব থাকিত না, যাহাতে লেখককথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আসিতে পারে। অভিশপ্ত দেব-দেবীর নির্ব্বাসনস্থান ঋষিগণ মর্ত্ত্যেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মর্ত্তই তাঁহাদের আণ্ডামান। তাহা হইলেও যক্ষের 'রামগির্য্যাশ্রমেষু' বাসের কারণ আধ্যাত্মিক নহে, পৌরাণিক।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একটি প্রিয় ধারণার অনুরূপ কিছু মেঘদূতে দেখিয়াছেন। অমনি যেটুকু মিলেনা সেটুকু দুদিকেই কিছু কিছু যোগবিয়োগ করিয়া নিজের ধারণার সহিত খাপ খাওয়াইয়াছেন। এরূপ স্থলে তিনি বলিতে পারিতেন যে যক্ষের বিরহের সহিত, (তাঁহার মতে) বিশ্বের বিরহের কিছু সাদৃশ্য আছে। তাহা মেঘদূতের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সব বিরহই ঐ ধরণের।

"কামীর" বিরহ বর্ণনা করিবার জন্য কালিদাস "যক্ষ" আনিলেন কেন—ইহা প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার কারণ আমার বোধ হয় প্রধানতঃ এই যে

তাহা হইলে তিনি মেঘ দিয়া সম্বাদ পাঠাইতে পারেন—কারণ মেঘও ঊর্দ্ধে, তাঁহার বাসগৃহ অলকাও ঊর্দ্ধে। বস্তুতঃ মেঘ যাইতেছে বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমগিরিতে—স্বর্গে নহে।

রবীন্দ্রবাবুর সমালোচনায় প্রায়ই দেখি যে সমালোচনা করিবার সময়ে ক্রমে তিনি আর মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। নিজের কল্পনারাজ্যে উড়িতে থাকেন। তাহাতে নূতন একটি কাব্য হয়, সমালোচনা হয় না। তাঁহার নিজের কতকগুলি pet theories আছে। তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। গ্রন্থ সমালোচনা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। নহিলে, তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, একবার মেঘদূতের প্রথম দুইটি শ্লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে "অভ্রভেদী শিখর" (যাহা তাঁহার প্রধান যুক্তি) মূলে নাই। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে তিনি লেখনীকে চালান না, লেখনীই (যাহাকে তিনি বোধ হয় জীবনদেবতা বলেন আর Emerson "fatal facility of the pen" বলেন) তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার তাঁহার অবকাশ বা ধৈর্য্য থাকে না।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে ভালো কাব্য মাত্রেরই নানা প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমার বিবেচনায় যে ঠিক তাহার বিপরীত। প্রায় ভালো কাব্য মাত্রেরই একই অর্থ থাকে। নানাদিক হইতে তাহা দেখা যাইতে পারে বটে—যেমন "অন্ধের হস্তিদর্শন।" কিন্তু সমগ্র অর্থ একটি। কেবল, যে 'কাব্যের' অর্থ বাস্তবিক নাই, তাহারই নানাব্যক্তি নানা অর্থ বাহির করেন ও সেগুলি লইয়া আপনাদের মধ্যে বিতণ্ডা করেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার মতানুযায়ী গুটিকতক ভালো কাব্যের নাম করুন দেখি। Wordsworthএর Highland Girl হইতে Ode on the Immortality of the Soul পর্য্যন্ত,রামপ্রসাদের "আর কারে মা ডাক্‌বো শ্যামা" হইতে চিরঞ্জীব শর্ম্মার—"আমি জানি না চিনি না দেখি না তাঁহারে তথাপি তাঁহারে চাই" পর্য্যন্ত, Homerএর Iliad হইতে Shakspeareএর King Lear পর্য্যন্ত, সমস্ত ভালো কাব্যের একই অর্থ। অন্য অর্থ যদি কেহ বাহির করেন ত সে অর্থ কষ্টকল্পিত (যেরূপ অর্থ ইতর বিশেষ সব কাব্য হইতেই বাহির করা যায়)।

রবীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় প্রস্তাব যে রস গভীর হইলে তাহা চিরন্তন তত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়—এ কথা আমি মানি। রস গভীর কেন, চিরন্তন তত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না করিয়া দিলে রসই হয় না। আর, সব তত্ত্বই চিরন্তন। ঈশ্বরের সহিত মানবের মিলনেচ্ছাই চিরন্তন তত্ত্ব নহে, পুত্রের প্রতি মাতার

স্নেহও চিরন্তন তত্ত্ব। যে সেই সকল তত্ত্ব কাব্যে সরস করিয়া দেখায়, সেই কবি। ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া যে কবিতা রচিত হয় সেই কবিতাই যে শ্রেষ্ঠ কবিতা হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। মানুষের কৃতজ্ঞতা লইয়া যে কবিতা রচিত হয় (যেমন Wordsworthএর Wood cutter) তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়। রাশি রাশি সৌন্দর্য্য পৃথিবীময় বিকীর্ণ রহিয়াছে। যে সেই সৌন্দর্য্য যত সজীব করিয়া আঁকিতে পারে, সে তত বড় কবি।

মেঘদূতের সৌন্দর্য্য কোথায় তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাহা এখানে বোঝানো দরকার নাই। বহুঅর্থসমন্বিত কবিতা লিখিতে হয়—রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং লিখুন। মেঘদূত যেমন আছে থাকুক।

কুমারসম্ভব সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কৃপণের মন্ত্র।

গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পরদিন আমি গাংপুরে বন্ধুর আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, বন্ধুর বাড়ীটাই বোধ হয় দুই তিন বিঘা জমি লইয়া, তাহার পর বাগান পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে। এত বড় বাড়ী ঠিক মেরামত করিয়া রাখা অনেক টাকার কাজ, সুতরাং অধিকাংশ অংশই ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে—কেবল এক অংশ বাসের উপযুক্ত আছে; তাহাতেই বন্ধু শান্তশীল বসতি করেন।

"আমি একবার বাড়ীর চারিদিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আগে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বন্ধুর বাড়ীতে তিনটী স্বতন্ত্র রহস্য, অর্থাৎ (১) সরকারের নিরুদ্দেশ, (২) দাসীর অন্তর্দ্ধান (৩) আর এই কৃপণের মন্ত্র। এখন বুঝিতেছি, তিনটী রহস্য নহে, একটীই রহস্য। যদি আমি এই কৃপণের মন্ত্রের অর্থ স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে অতি সহজেই দাসী ও সরকারের নিরুদ্দেশ-রহস্যও ভেদ করিতে পারিব। এই জন্য এই মন্ত্রের অর্থ করিবার জন্যই আমার সমস্ত মনটা একদিকে নিযুক্ত করিলাম।

"কেন এই সরকার এই মন্ত্র বুঝিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিল? যাহা আমার বন্ধুর পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই, বা গুরুতর বলিয়া ভাবেন নাই, তাহাই এই সরকার নিশ্চয়ই নিতান্ত গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছিল; আরও নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, ইহাতে লাভের প্রত্যাশা আছে। কিন্তু এই লাভটা কি—আর লাভ হস্তগত করিতে গিয়া তাহারই বা কি হইয়াছে?

"ইহাতে নক্সার ব্যাপার থাকায় আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, এই মন্ত্রে এই বাড়ীর কোন একটা বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। যদি আমরা কোনরূপে সেই স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিব, কি জন্য বন্ধুর পূর্ব্ব পুরুষ এই অদ্ভুত উপায়ে তাহা গোপনে রাখিয়া গিয়াছেন।

"দুইটী বিষয় ধরিয়া আমরা এ অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারি—তালগাছ আর বটগাছ। তালগাছ সম্বন্ধে কথা নাই—বাড়ীর সম্মুখেই এক অতি প্রাচীন তালগাছ এখনও আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত পুরাতন তাল গাছ আমি আর কখনও দেখি নাই; যদিও দেখিলাম, ইহাতে এক্ষণে আর তাল ফলে না, তথাচ ইহা অতি পুষ্টভাবে জীবিত আছে।

"আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসিলাম, 'এই মন্ত্র যখন লেখা হয়, তখন এই তালগাছ এখানে ছিল?'

"তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'যে রকম আকার প্রকার তাহাতে মান্ধাতার স্বহস্ত-প্রোথিত বলিয়াই মনে হয়।'

" 'কোন পুরান বটগাছ কাছে আছে?'

" 'হাঁ—ঐ দিকে একটা ছিল। প্রায় দশ বৎসর হইল সেটা ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে।'

" 'ঠিক কোথায় ছিল জান?'

" 'হাঁ; তা ঠিক জানি।'

" 'আর কোন বটগাছ নাই?' "

" 'পুরাণো নাই—চারাগাছ আছে।'

" 'কোথায় পুরানো গাছটা ছিল, একবার দেখিতে চাহি।'

"বন্ধু আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, তাহা তালগাছ ও অট্টালিকার প্রায় মাঝামাঝি স্থান। আমি বলিলাম, 'গাছটা কত উঁচু ছিল, বোধ হয় তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই।'

" 'কেন, আমি বলিতে পারি—ঠিক চল্লিশ হাত উঁচু ছিল।'

" 'আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসে জানিলে ?'

"গুরু মহাশয় যখন কালি করাইতেন, তখন এই গাছটা কত উঁচু তাহার কালি করিতে আমায় প্রায়ই বলিতেন, সেজন্য আমার বেশ মনে আছে।'

"আমি মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম,—কাজের অনেক সুবিধা হইয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম 'তোমার সরকার কখন তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ?'

"বন্ধু বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; বলিলেন, 'তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া এখন মনে পড়িল। হাঁ, একদিন কি কথায়—হাঁ—মনে পড়িয়াছে, বৃদ্ধ খেতুবেহারার সঙ্গে তাহার তর্ক হওয়ায় নন্দলাল এই গাছ কত উঁচু ছিল, আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।'

"বলা বাহুল্য, এ কথা শুনিয়া বেশ বুঝিলাম যে, আমি এ ব্যাপারের আসল সূত্র ধরিতে পারিয়াছি, আর সেই সূত্র ধরিয়া ঠিক পথেই যাইতেছি।

"আমি আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্য ঠিক তালগাছের মাথার উপরে আসিবে। তাহা হইলে মন্ত্রের একটা কথা ঠিক হইবে। তাহার পর বটগাছের ছায়া—নিশ্চয়ই এই সময়ে বট-গাছের ছায়া শেষ যেখানে গিয়া পড়িবে, মন্ত্রের তাহাই অর্থ। এখন দেখিতে হইবে, তালগাছের মাথায় সূর্য্য গেলে, বটগাছের ছায়া পশ্চাদ্দিকে কোথায় গিয়া পড়ে।"

আমি বলিলাম, "সবই বুঝিলাম, কিন্তু বটগাছ যে নাই, এখন কিরূপে তাহার ছায়া পাইবে ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "শক্ত স্বীকার করি; তবে একটা সরকার যাহা পারে, আমি তাহা পারিব না, ইহা কখনই হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইহাতে কঠিন কিছুই নহে। আমি চারি হাত লম্বা একখানা বাঁশ ও কতকটা দড়ি লইয়া যেখানে বটগাছটা ছিল, ঠিক সেইখানে এই বংশখণ্ড পুতিলাম। যখন তালগাছের উপরে সূর্য্য আসিল, তখন ইহার ছায়া কোন্ দিকে পড়িল, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিলাম। তাহার পর এই ছায়া মাপিয়া দেখিলাম, ইহা ঠিক ছয় হাত লম্বা হইয়াছে।

"এখন দেখ, বাঁশটা ৬ ফিট, তাহার ছায়া হইল ৯ ফিট। যদি ৬ ফিট লম্বা বাঁশের ৯ ফিট লম্বা ছায়া হয়, তাহা হইলে ৬০ ফিট লম্বা গাছের ছায়া অবশ্যই ৯০ ফিট। ছায়া যে দিকে পড়িয়াছিল, দড়ি দিয়া মাপিয়া দেখিলাম, ছায়া

প্রায় বাড়ীর প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিল, আমি সেইখানে একটা খোঁটা পুতিলাম। ডাক্তার, তুমি আমার সে সময়ের আনন্দ বুঝিতে পারিবে না—যখন আমি আমার খোঁটার কাছে মাটি কতকটা নীচু দেখিতে পাইলাম, তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, সরকারও ঠিক আমার মত এখানে খোঁটা পুতিয়াছিল ; তাহা হইলে আমি ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।

"এখন এখান হইতে পা পা মাপ। আমি সেই স্থানের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম স্থির করিয়া লইলাম। দশ পা উত্তরে—আমায় দেওয়ালের ধারে ধারে লইয়া চলিল, দশ পা আসিয়া আমি আবার এক খোঁটা পুতিলাম। তাহার পর আমি পাঁচ পা পূর্ব্বে এবং দুই পা দক্ষিণে মাপিলাম ; ইহাতে আমি দেখিলাম, আমি একটা অতি পুরাতন দ্বারের চৌকাঠে উপস্থিত হইয়াছি। এখন এক পা পশ্চিমে অর্থাৎ দরজার ঠিক পরে গৃহমধ্যে : এখন বুঝিলাম, মন্ত্রে এই স্থানের কথাই বলিতেছে। কিন্তু এ কি ? এখানে কিছুই নাই! ডাক্তার জীবনে এরূপ হতাশার কষ্ট আর কখনও অনুভব করি নাই ; তবে কি আমার সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইল ? এই স্থানে বড় বড় পাথর দিয়া মেজে প্রস্তুত, কেহ যে কখনও এই পাথর সরাইয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন নাই ; নিশ্চয়ই সরকার নন্দলাল এখানে কিছু করে নাই, তাহা হইলে তাহার চিহ্ন থাকিত।

"আমি পাথরগুলি প্রত্যেক স্থানে ঠুকিয়া দেখিলাম। না—ভিতরে যে ফাঁক আছে, তাহা বলিয়া বোধ হইল না। আমি আরও হতাশ হইলাম। আমার বন্ধুও এক্ষণে কতকটা ব্যাপার বুঝিয়া ব্যগ্রভাবে আমার অনুসরণ করিতে-ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সেই রকম তো নীচে'—তুমি নীচের কথা ভুলিয়াছ।'

'আমার মনে হইয়াছিল, যে আমাদের এইখানটা খুঁড়িতে হইবে, কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়াছি ; তাহা হইলে ইহার নীচে একটা ঘর আছে।'

"শান্তশীল বলিল, 'হাঁ, অনেক দিন হইতে আছে, বাড়ী হওয়া পর্য্যন্তই আছে। আমরা কেহ ইহার ভিতরে কখনও যাই না ; দেখিতে চাওতো এস—এই দরজা দিয়া এস। আমি এখনই একটা লণ্ঠন আনিতেছি।'

"ক্ষণপরে বন্ধু লণ্ঠন লইয়া আসিলে আমরা উভয়ে ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; তাহার পর একটা ভাঙ্গা ঘরে আসিলাম, এই ভাঙ্গা ঘর হইতে সিঁড়ী দিয়া নামিয়া একটা অন্ধকার পূর্ণ ঘরে আসিলাম।

"এই ঘরে জ্বালানী কাঠ বোঝাই থাকিত; আমরা বুঝিলাম যে, আমরা প্রথম এখানে আসি নাই—আমাদের পূর্ব্বেও এ ঘরে কেহ আসিয়াছিল। কতকগুলা কাঠ কে এক পার্শ্বে সরাইয়া মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, এই পরিষ্কার স্থানে আমরা একখানি অতীব প্রকাণ্ড পাথর দেখিলাম; এই পাথরের মধ্যস্থলে একটা মর্চ্চেপড়া কড়া সংলগ্ন রহিয়াছে; তাহাতেই বুঝিলাম, সেই কড়া ধরিয়া সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর-ফলকটাকে টানিয়া তুলিতে পারা যায়।

"আমরা দুইজনে শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া সেই কড়াটা ধরিয়া অনেক টানাটানি করিলাম; কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিলাম না। তখন আমার বন্ধু তাঁহার দুই-তিন জন লোক ডাকিলেন। এই সময়ে গৃহতল হইতে বন্ধু শান্তশীল একটা গলাবন্ধ কুড়াইয়া বলিলেন, 'এ যে নন্দলালের গলাবন্ধ, এখানে আসিল কিরূপে? সে এখানে কি করিতেছিল?'

"সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া অবশেষে পাথরখানি একপার্শ্বে সরান হইল। পাথরের নিম্নে একটা অন্ধকারপূর্ণ গহ্বর দেখা গেল। এবং গহ্বরের ভিতর হইতে একটা দুর্গন্ধ নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু তখন সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর আমাদের আদৌ ছিল না। বন্ধু তাড়াতাড়ি সেই গহ্বরের মুখে লণ্ঠনটা প্রবেশ করাইয়া দিলেন; আমরা দেখিলাম, তাহার ভিতর একটী ঘর, বোধ হয়, উপর হইতে সেই গৃহতল পাঁচ হাত নিম্নে—একজন ইচ্ছা করিলে ইহার ভিতর লাফাইয়া পড়িতে পারে। আমরা আরও দেখিলাম যে, গৃহতলে একটা লোহার সিঁড়ি পড়িয়া আছে, যে লাফাইয়া নামিবে, ফিরিবার সময় এই সিঁড়ি লাগাইয়া উঠিয়া আসিতে তাহাকে আর কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না। গৃহমধ্যে তিনটা বড় বড় লোহার সিন্দুক রহিয়াছে, ইহার একটার তালা খোলা, সিন্দুকের আংটায় চাবিটা কলুপে লাগান রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আরও দুইটা চাবি ঝুলিতেছে।

"কিন্তু এ সকল বিশেষ করিয়া দেখিতে আমাদের সময় হইল না। আমাদের দৃষ্টি অন্য এক বিষয়ে আকৃষ্ট হইল—দেখিলাম, এক ব্যক্তি একটা সিন্দুকের পার্শ্বে জানুভরে বসিয়া আছে, এবং তাহার মাথা বুকের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, হাত দুইটা সিন্দুকের উপর দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা বুঝিতে পারিলাম, এ একটা মৃতদেহ, এবং দেহটা বিশেষরূপে পচিয়া উঠিয়াছে; সেই দুর্গন্ধই আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা

শীঘ্রই কোনরূপে এই দেহ সেই ভয়াবহ গৃহ হইতে বাহিরে আনিলাম। মৃতদেহটা পচিয়া এতই বিকৃত হইয়াছে যে, মৃতের মুখ দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই—এ কে; তবে ইহার কাপড়-চোপড় দেখিয়া সকলেই চিনিল, সরকার নন্দলাল ব্যতীত এ ব্যক্তি আর কেহ নহে। সে কয়েকদিন হইল মরিয়াছে, তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই।

"যখন তাহার দেহ আমরা বাহিরে আনিয়া পুলিশে সংবাদ দিলাম। সদল-বলে স্থানীয় দারোগা বাবুর আবির্ভাব হইল, তথনও এ রহস্যের সম্পূর্ণরূপে উদ্ভেদ হইল না। ডাক্তার, আমি যে আমার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা নহে। এখনও বুঝিতে পারি নাই, কিরূপে এই সরকার এই গৃহে প্রবেশ করিল, আর রঙ্গিয়াই বা এ নাটকের কোন্ অংশ কিরূপ অভিনয় করিয়াছে; তবে কৃপণের মন্ত্রের রহস্য পরিষ্কার হইল। সিন্দুক তিনটী খুলিয়া দেখা গেল, ব্যাগে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণের লোষ্ট্রাদি পূর্ণ ছিল, এই তিনটি সিন্দুকও সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণের লোষ্ট্র-রাশিতে পরিপূর্ণ।

"যাহারা ইহা দেখিল, সকলেই হাসিতে লাগিল। দারোগা বাবু হাসিয়া শান্তশীলকে বলিলেন, 'দেখিতেছি, আপনাদের বংশে একটী মহা পাগল কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, নতুবা এত নুড়ী পাটকেল কেহ এ ভাবে এখানে রাখে না।'

"সকলেই তাঁহার কথায় অনুমোদন করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি আমার বন্ধু শান্তশীলকে বলিলাম, 'পূর্ব্ব-পুরুষের কথা—পাগলই হউন, আর যাহাই হউন, যখন এগুলো কাহারই কোন কাজে লাগিবে না, তখন যেখানকার জিনিষ যেমন আছে, তেমনই থাক—কি জানি কি তুক্-তাক্ আছে।'

"সকলেই আমার কথায় মত দিলেন। আবার আমরা সিন্দুক বন্ধ করিয়া ঘরের সেই দ্বারে পূর্ব্ববৎ পাথর চাপা দিলাম।

"ডাক্তার, তুমি তো আমার অনুসন্ধানের প্রথা জান। যখন সহজে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারি, তখন অনন্যোপায় ভাবে আমি ঠিক অপরের স্থানে আমাকে ফেলিয়া দিই—সে সময়ে সে যাহা করিত, মনে মনে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা পাই। এই ব্যাপারে সে রাত্রে এই সরকার কি করিয়াছিল, তাহাই আমি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম।

"এই সরকার যে খুব বুদ্ধিমান্ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বাড়ীর কোন স্থানে খুব মূল্যবান্ কিছু লুক্কায়িত আছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার পর সে মন্ত্র ধরিয়া এই গুপ্তগৃহ আবিষ্কারও

করিয়াছিল। কিন্তু দেখিল একজনে কখনও এই পাথর সরানো সম্ভব নহে, সে এ বিষয়ে কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না—অথচ একজন বলবান্ লোক প্রয়োজন। রঙ্গিয়া হিন্দুস্থানী, দেহে বল আছে এবং সে তাহাকে ভালবাসে; এরূপস্থলে নন্দলাল মধ্যে তাহার সহিত বিবাদ হওয়া সত্বেও রঙ্গিয়াকে আবার হাত করিয়া এই কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাহাকে এই গুপ্ত গৃহের উপরে পাথরের নিকটে লইয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলেও এই পাথর দুইজনে সরানো সহজ নহে,—সুতরাং কোন উপায় আবশ্যক, বুদ্ধিমান্ সরকারের উপায় বাহির করিতে অধিকক্ষণ সময় লাগিল না—সে কি উপায়ে পাথর তুলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমি তৎক্ষণাৎ পাইলাম।

"আমরা যখন চারি পাঁচজনে কষ্টে এই পাথর তুলিয়াছিলাম, তখন নিশ্চয়ই দুই জনে—তাহার মধ্যে আবার একজন স্ত্রীলোক, এরূপস্থলে কখন কোনরূপ কৌশলাবলম্বন ব্যতীত এই পাথর তুলিতে পারে নাই। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাইলাম। দেখিলাম, দুইখানা কাঠ স্পষ্টতঃ এই পাথরে লাগানো হইয়াছিল। একদিক্ এই পাথরের গুরুভারে কাঠখানা একেবারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে।

"এখন বুঝিলাম, তাহারা কি করিয়াছিল; সরকার ও রঙ্গিয়া উভয়ে পাথর খানা টানিয়া একটু উচু করিয়া পা দিয়া দুইদিক হইতে দুইখানা কাঠ সেই ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল; এইরূপে একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে পাথরের নীচে কাঠ লাগাইয়া তাহারা একটা মানুষ গলিতে পারে পাথর সেইরূপ উঁচু করিয়া ক্ষুদ্র পথ করিয়া লইয়াছিল।

"সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জনে কি নাটক এইখানে অভিনীত হইয়াছিল, আমি মনে মনে তাহাই গড়িতে লাগিলাম। স্পষ্টতই বুঝিলাম, তাহারা পাথর সরাইয়া যে সংকীর্ণ পথ করিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া কেবল একজনই গৃহমধ্যে নামিয়াছিল। সে আর কে? এই হতভাগ্য সরকার নন্দলাল। রঙ্গিয়া উপরে অপেক্ষা করিতেছিল। নন্দলাল সিন্দুক হইতে মুড়ি ব্যাগে বোঝাই করিয়া ব্যাগ রঙ্গিয়ার হাতে দিয়াছিল, আবার মুড়ি সিন্দুক হইতে সংগ্রহ করিতেছিল, এই সময়ে কি ঘটিল, বলিতে পার, ডাক্তার?

"সহসা ভীষণ প্রতিহিংসায় রঙ্গিয়ার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল! নন্দলাল রঙ্গিয়াকে অবহেলা করিয়াছিল, তাহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার উপরে তাহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল; সহসা সেই আক্রোশবশে

অথবা সেই প্রতিহিংসাবৃত্তি তাহার হৃদয়ে বলবতী হওয়ায় নন্দলালের বাসনা ফলবতী হইল না ;—রঙ্গিয়া পাথর গহ্বরের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল। অথবা এমনও হইতে পারে, হঠাৎ পাথরখানা কোনরূপে আপনা হইতেই পড়িয়া গিয়া থাকিবে ; তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না ; তবে এটা স্থির, পাথর পড়িয়া দ্বাররুদ্ধ হইয়া গেলে রঙ্গিয়া ব্যাগ লইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সে স্থান হইতে পলাইয়া গিয়াছিল—হয় ত রঙ্গিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ীর অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিল, হয় ত নন্দলাল কাতরে পাথরে ঘা মারিতেছে, তাহাও সে শুনিতে পাইয়াছিল।

"এই জন্যই পরদিন রঙ্গিয়ার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বন্ধু তাহাকে পীড়িত মনে করিয়াছিলেন; এই জন্যই রঙ্গিয়া উন্মত্তার ন্যায় সহসা বিকট উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়াছিল। এই ভয়াবহ কার্য্যেই সে নিজের মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই। তাহার পর সে একটু ভাল হইবামাত্র সেই ব্যাগটা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন সকল রহস্যই পরিষ্কার হইয়া গেল।

"সকলে চলিয়া গেলে শান্তশীলকে লইয়া আমি তাহার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। শান্তশীল বিবণ্ণভাবে বলিলেন, 'পুরাতন ভৃত্যের এরূপ ভয়াবহ মৃত্যুতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। সিন্দুকে কি আছে জানিলে বেচারা এত কষ্ট করিয়া কখনও এ গুপ্তগৃহ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিত না, আর সেই চেষ্টার ফলে ভয়াবহ মৃত্যুমুখে ও পতিত হইত না।'

"আমি তাঁহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া মৃদুহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু কহিলেন, 'হাসিতেছ কেন? প্রকৃতই ইহার মৃত্যুতে আমি দুঃখিত হইয়াছি।'

"আমি বলিলাম, 'ইহার মৃত্যুতে আমিও দুঃখিত। বন্ধু! সেজন্য আমি হাসিতেছি না।'

"'তবে কিসের জন্য হাসিতেছ?'

" 'তুমি কি মনে কর যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে যিনি এই মন্ত্র তোমাদের ভাবী বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি উন্মত্ত ছিলেন?'

'কাজেই—না হইলে কে রাশীকৃত পাটকেল নুড়ী কুড়াইয়া এরূপভাবে সিন্দুক পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যায় ; তাহার পর এই দশ পুরুষ ধরিয়া সকলকে গাধা বানাইয়া এই অর্থশূন্য মন্ত্র আওড়াইয়াছে!'

" 'এগুলি ঠিক নুড়ী অথবা পাটকেল নয়!'

" 'তবে কি? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে নুড়ী—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

"আমি ব্যাগটা তুলিয়া লইলাম, একটী নুড়ী লইয়া কাপড় দিয়া খুব জোরে ঘষিতে লাগিলাম, তাহার পর তাহা বন্ধুর হাতে দিলাম, তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'এ যে হীরা!'

"আমি হাসিয়া বলিলাম, 'হাঁ—হীরা, আবার এটা দেখ।'

"যাহা তিনি পূর্ব্বে লৌহখণ্ড ভাবিয়াছিলেন; তাহার একটা কাপড়ে ঘষিয়া তাহার হাতে দিলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এ যে মোহর—'

" 'হাঁ—আসরফি—স্বর্ণখণ্ড! এই জন্যই পুলিসের সম্মুখে কিছু বলি নাই—আজ হইতে পৃথিবীর মধ্যে তুমি একজন মহাধনী লোক।"

'এত—এ সব হীরা—সব মোহর!"

" 'হাঁ—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কত কালে যে এ সকল তোমাদের বংশে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত ইহা কোন রাজার ধন, শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কোন পূর্ব্ব-পুরুষের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া দিয়াছিলেন—সেই পর্য্যন্ত ইহা এইখানেই রহিয়া গিয়াছে।"

" 'মন্ত্রের মানে কি!'

" 'কোথায় ধন লুক্কায়িত থাকিল, তাহাই সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দশপুরুষের মধ্যে তোমাদের কেহ এই মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে নাই—একবার ইহার গূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় নাই; দেখিতেছি, তোমার এই সরকার তোমাদের সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিল—সেই প্রথম বুঝিয়াছিল যে, এই মন্ত্রের এক গূঢ় অর্থ আছে, কেবল সে-ই বুঝিয়াছিল যে, ইহাতে কোন লুক্কায়িত গুপ্তধনের কথাই বলিতেছে! তাহাই সে এই গুপ্তধনের লুক্কায়িত স্থান বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; কৃতকার্য্যও হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতি বিরূপ, তিনি এরূপ অপহরণের প্রশ্রয় দেন না, তাহাই এই পরের ধন চুরি করিতে গিয়া বেচারা প্রাণ দিয়াছে।"

"আমার বন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'তাহা হইলে—তাহা হইলে—আমি—আমি কেমন—কেমন করিয়া জানিব যে, এই সকল ধনরত্ন আমি লইতে পারি?"

"আমি বলিলাম, 'মন্ত্রই তাহার প্রমাণ। মন্ত্র কি বলিতেছে—'

" 'কাহার ছিল?'

"অর্থাৎ—এ ধন কাহার ছিল।

" 'যে গিয়াছে।'

"অর্থাৎ—যাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"' কে পাবে?'

"যে পরে আসিবে। অর্থাৎ—তাহার পরে যে আসিবে—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র যে কোন উত্তরাধিকারী—তুমি এ ধন আবিষ্কার করিয়াছ—এ ধন এখন তোমারই।'

"ডাক্তার এই হইল কৃপণের মন্ত্রের রহস্য—এই রহস্যোদ্ভেদের সঙ্গে সঙ্গে আমি একজনকে অতুল ধনের অধিকারী করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সাময়িক সাহিত্য।

পরীক্ষা না প্রায়শ্চিত্ত?

(বিদেশী গল্প)

লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

১

ডারহাম্ নগরের খ্যাতনামা ডাক্তার গ্রে আজ গম্ভীরভাবে একটী চুরুট মুখে করিয়া একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট। অর্থচিন্তাই এই গম্ভীরভাবের কারণ। তিনি তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বত্তিল নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসী জেম্‌সের নিকট বাঁধা রাখিয়াছেন। আজ স্বয়ং জেমস্ সেই টাকা আদায় করিতে আসিয়াছেন। অন্যান্য বারে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দকে নানা অজুহাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন, আজ কি করিয়া সাক্ষাৎ যম-অবতার উত্তমর্ণের সম্মুখীন হন। যদি কোনক্রমে এই ঋণগ্রহণের একটী কথাও বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে। যাহা হউক উত্তমর্ণের রুদ্রমূর্ত্তি প্রশান্ত করিবার একটী কৌশল তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি জেম্‌সকে নিজ বাটীতে পানাহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। জেম্‌সও সাদরে উহা গ্রহণ করিলেন

রসনা তৃপ্তিকর নানাপ্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি আহার করিতে করিতে জেম্‌স ডাক্তারের অবিবাহিত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার বিষয় বারবার বলিতে লাগিলেন এবং নিজ জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের তুলনা করিয়া নিজেকে ধীক্কার দিতে লাগিলেন। ডাক্তার বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদিও আমার পক্ষে অনুচিত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি দিবেন কি যে আপনার জীবন এত কষ্টকর এবং দুর্ব্বিসহ হইবার কারণ কি?"

জেমস বলিলেন—"ডাক্তার তোমায় কোন কথা বলিবার আমার বাধা নাই। বিবাহের পর হইতেই স্ত্রীর সহিত আমার মনোমালিন্য চলিতেছে। যে কার্য্যে আমার অরুচি তাহাতেই তাঁহার অভিরুচি।" এই কথা বলিয়া নিজ বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলীর আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কহিলেন—"মিঃসেঁর সহিত আমার স্ত্রীর বন্ধুত্ব আছে—সেটা আমি ইচ্ছা করি না। আমার চক্ষে কেমন লাগে, তাহার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়।"

ডাক্তার কহিলেন—আপনি এক কাজ করুন না কেন—নিজেকে মৃত বলিয়া প্রচারিত করিয়া দিন এবং স্বয়ং আত্মগোপন করিয়া স্বচক্ষে তাহার কার্য্যাবলী ও গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। 'তাহা হইলে চোকে কাণে বিবাদ মিটিবে, এবং আপনার সন্দেহও দূর হইতে পারে।

জেমস্—কি বলব ডাক্তার আপনি একটা 'প্রতিভা'। আপনি কেবল শারীরিক ব্যাধিরই চিকিৎসক নহেন, মানসিক ব্যাধিরও বটে। অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন, এক্ষণে আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।

ডাক্তার—পাগলের ন্যায় কি বলিতেছেন? আমি পরামর্শ দিই নাই রহস্য করিয়াছিলাম মাত্র।

জেম্‌স—আমি পাগল নহি, ঠিক আপনারই ন্যায় সংজ্ঞাযুক্ত। আপনার নিকট রহস্য হইতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে উহা সৎপরামর্শ। আপনি সাহায্য না করিলে এ পরামর্শমত কার্য্য হতেই পারে না। আপনার ন্যায় আমার একজন পরম বন্ধু ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি আমার মৃত্যু-ঘোষণা করিবে এবং আমার মৃত্যু-নিদর্শন পত্র প্রদান করিবে?

ডাক্তার—তা বটে, তবে কি জানেন এসব মতলব সহজসাধ্য নহে। আজকাল সমাধির নিয়মাদি বিশেষ কঠোর হইয়াছে, আবার যদি ধরা পড়ি, দুই বৎসর শ্রীঘরদর্শনের ভয়ও আছে।

জেমস্—শুনুন ডাক্তার বাস্তবিকই আপনার আপত্তির কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা করি না আপনি নিঃস্বার্থভাবে আমাকে সাহায্য করেন। যদি আমার মৃত্যু হইয়াছে এই সমাচার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দিতে পারেন, আপনার বন্ধকী-পত্র আমি অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব।

এই বলিয়া ডাক্তারের উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তারের ইচ্ছা হইতেছিল যে, জেমসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন কথা সরিল না। এই বন্ধকী-পত্রই তাহার জীবনের ভারস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা যে এই ঋণ তিনি সারাজীবনেও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ঋণের সুদ দিবার সময়ও তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত।

দূরে বসিয়া জেমস্ ডাক্তারের চিত্ত-বৈলক্ষণ্য দেখিতেছিল।

গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাক্তার কহিলেন—"তাহা হইলে আপনার স্ত্রীর প্রতি কি আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে না? আপনার ইহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।"

শ্লেষপূর্ণস্বরে জেমস্ কহিল—"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ডাক্তার—আর এক কথা আপনার বিষয়ের তত্বাবধারক যদি আপনার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই বেচিয়া ফেলে?

জেমস্—তার বন্দোবস্ত আমি করছি। আমার উইলের সর্ত্তানুযায়ী তিন মাসের মধ্যে কেহ আমার বিষয় স্পর্শও করিতে পারিবে না। এই সময়ের মধ্যে আমার পত্নী জোসেফাইন বিবাহ করিবেই। এক্ষণে আপনি কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করুন।

ডাক্তার—অগত্যা সব বন্দোবস্তই আমাকে করিতে হইবে। হাঁসপাতাল থেকে একটা আত্মীয়-স্বজন-বিহীন মুমূর্ষু রোগীকে এনে একটা স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে হইবে। তাহার নাম বদলাইয়া আপনার নামে (উইলিয়ম জেমস্) নামকরণ করিব এবং হাঁসপাতাল হইতে রোগী আনিবার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, রোগীর উৎকট ব্যাধিটা আমি একটু বিশেষ পরীক্ষা করে দেখ্‌তে চাই। তাহার পর তাহার মৃত্যু হইলে সমাধিস্থ করিবার সময় প্রচার করিয়া দিব কোন একটী উৎকট রোগে জেমসের মৃত্যু হইয়াছে। আপনি তিনমাস পরে ফিরিয়া আসিলে বলিব নামের সামঞ্জস্যহেতু লোকের ধারণা হইয়াছিল বভিলের উইলিয়ম জেমসের মৃত্যু হইয়াছে।

জেমস্ ডাক্তারের পরামর্শে সানন্দে লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"ডাক্তার আপনি একজন প্রতিভাবান্ পুরুষ এবং আমার একজন প্রকৃত বন্ধু।"

২

যথাসময়ে একটী মুমূর্ষু রোগী জুটিল এবং শীঘ্রই সে মৃত্যুমুখে পড়িল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে, উইলিয়ম জেমস্ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মিসেস্ জোসেফাইনের নিকটও এই সংবাদ যথাকালে পৌঁছিল। তিনি শোক-বস্ত্রে দেহ আবরিত করিয়া স্বামীর সমাধিস্থলে আসিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন এবং সাশ্রুলোচনে স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জোসেফাইন বভিলে প্রত্যাগমন করিবার দুই সপ্তাহ পরে তাঁহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে লিখিত তাঁহার গুণ-গ্রাম-সমন্বিত একটি প্রস্তরখণ্ড সেই সমাধি-স্তম্ভের গাত্রে সংস্থাপিত করিলেন। তাহার প্রত্যেক অক্ষর বিধবার শোকার্ত্ত হৃদয়ের প্রমাণ দিতেছিল। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে উইলিয়ম জেমসের সহিত ডাক্তার সেই সমাধি-স্তম্ভে খোদিত লিপিগুলি পাঠ করিলেন। কম্পিতকণ্ঠে ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া জেমস্ বলিলেন—"আর পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন; আমি এই স্থল এখনি পরিত্যাগ করিয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিব।" ডাক্তার দেখিলেন, সব মাটি হয়, তাঁহার বন্ধকী-পত্র এখনও নাকচ করা হয় নাই; সুতরাং তিনি বলিলেন, "স্থির হউন, সমাধি-স্তম্ভে লেখা মামুলী প্রথানুযায়ীই হইয়াছে, ইহাতে নূতনত্ব কি দেখিলেন?" জেমস্ তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সমাধিস্তম্ভে খোদিত লেখাগুলি পাঠ করিলেন এবং তাহার সহিত ইহার কোন

অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন না, বুঝিলেন ডাক্তার ঠিকই বলিয়াছেন সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বাটী ফিরিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার পর দুই সপ্তাহকাল উইলিয়ম জেমস অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন, তিনি আত্মগোপন করিয়াও তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন নূতন কথা জানিতে পারিলেন না অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি একজন বে-সরকারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হইল না। গোয়েন্দাটি তাঁহাকে যে সমস্ত সংবাদ দিত, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিষ্টার মেয়ার্স কচিৎ জোসেফাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিত। তাঁহার স্ত্রীর দ্বিতীয় পতিগ্রহণ শীঘ্র হইবে না, এই সমাচার কতক ভয়ে, কতক আশায় জেমস শ্রবণ করিত। এই ঘটনার পর একমাস অতিবাহিত হইলে হঠাৎ একদিন জেমস্ শুনিল, যে জোসেফাইন সুইন্‌ডেনে একটি সুসজ্জিত বাটী ভাড়া লইয়াছেন, এবং মেয়ার্সও তথায় গমন করিয়াছেন। এই সমাচারে তাঁহার বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; তিনি সেই গোয়েন্দাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার স্ত্রীর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেন।

হঠাৎ একদিন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর পত্রে অবগত হইলেন, যে মেয়ার্সের সহিত জোসেফাইনের বিবাহ হইবে! উদ্বেগে, লজ্জায় এবং ক্রোধে তাঁহার শরীর ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, টেলিগ্রাম করিয়া বিবাহ স্থগিত করিবেন। আবার ভাবিলেন, না—তাহা হইলে তাহারা হয়ত মনে করিবে, ইহা কোন দুষ্ট লোকের খেলা; সুতরাং তাঁহার নিজের যাওয়াই উচিত। তিনি ভাবনা-চিন্তায় একেবারে উন্মাদ-প্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সুইন্‌ডেন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানা চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তিনি সুইন্‌ডেন ষ্টেশনে সমুপস্থিত হইলেন। গোয়েন্দাটি তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। জেমস্ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র গোয়েন্দা নিজের ঘড়ি খুলিয়া কহিল, "ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরে বিবাহ হইবার কথা। এখন ১১টা—৫৩ মিনিট।" উইলিয়ম্ জেমস্ তাহার কথার উত্তর দিবার অবসর না পাইয়া তাহার সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া একেবারে সেরিফের অফিসে উপস্থিত হইলেন। তিনি বরাবর অফিস-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "থামো, থামো! স্থগিত করো; আমি জীবিত! —জোসেফাইন আমি জীবিত!"

অদূরে টেবিলের পার্শ্বদেশে কয়েকজন নর-নারী সমবেত হইয়াছিল; এবং পশ্চাদ্দেশে সেরিফ মহোদয় দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে জোসেফাইন মেয়ার্সের হস্তধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। জোসেফাইনকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ার্সের হস্তধারণ করিতে দেখিয়া আকস্মিক ক্রোধে তিনি পরস্পরের হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং মেয়ার্সকে সবলে একটি ধাক্কা মারিয়া কম্পিত কলেবরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"ধন্য ঈশ্বর! আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।" বজ্রগম্ভীরস্বরে সেরিফ বলিলেন,

"কে তুমি? পাগলের মত কি বলিতেছ? সাবধান শান্তিভঙ্গ করিও না!" জেমস বলিল,—"না মহাশয়! আমি পাগল নহি; আমি এই মহিলার স্বামী। আপনাদের বিশ্বাস, আমি মৃত; বাস্তবিক আমি মৃত নহি, আমি জীবিত এবং সশরীরে এখানে উপস্থিত। এই অন্যায় বিবাহ প্রতিরোধ করিতে এবং এই পাষণ্ডকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।" তাঁহার এই কথায় জোসেফাইন ও মেয়ার্স একটু পশ্চাৎ হটিয়া গেল। জেমস জোসেফাইনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"তুমি এত শীঘ্র আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না; এস, আমার সহিত গৃহে চল।" এই কথায় জোসেফাইন একটি তীব্র কটাক্ষপাত করিল মাত্র,—কোন উত্তর দিল না এবং গম্ভীরভাবে সেরিফকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"আপনি এক্ষণে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।" জেমস উদ্বেগের সহিত কহিল—"সে কি জোসেফাইন! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না! ভাল করিয়া দেখ—আমি উইলিয়ম জেমস,—তোমার স্বামী, তাহার প্রেতমূর্ত্তি নহি!" জোসেফাইন অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে কহিল,—"ছি! ছি! তুমি পাগল নাকি? অপরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাকে স্ত্রী বলিয়া ভ্রম করা সভ্যতার বাহিরে। যাও আমি তোমায় চিনি না।" জেমস বলিল, "তুমি চেন না; আমি অসভ্য হইতে পারি কিন্তু আইনমতে তোমার বিবাহিত স্বামী! তুমি একেবারেই চেন না!" জোসেফাইন বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল,—"আমি তোমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং ভবিষ্যতেও যেন তোমার মুখদর্শন করিতে না হয়।" জেমস এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, সে পুনঃ পুনঃ জোসেফাইনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল, তাহার কি ভ্রম হইয়াছে? না—ভ্রম ত নহে; এ যে সাক্ষাৎ জোসেফাইন! এ যে জোসেফাইন না হইয়া অপর কেহ হইতেই পারে না!

সেরিফ জোসেফাইনকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"শুন মহিলা; এই লোকটি বলিতে চায় যে এ ব্যক্তি তোমার স্বামী।" জোসেফাইন কহিল,—'আমার স্বামী মৃত,—এই দেখুন তাঁহার মৃত্যুর নিদর্শন-পত্র (Death certificate) এই কথা বলিয়া সে পত্রখানি সেরিফের হস্তে দিল।

জেমস স্বরচিত জালেই জড়িত হইয়া পড়িল। সেরিফ পাঠ করিলেন, "ডারহামে উইলিয়ম জেমসের মৃত্যু হইয়াছে, সেই স্থানেই সমাধি হইয়াছে।" এবং জেমসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সার্টিফিকেট ঠিক আছে। তুমি জেমস হইতেই পার না।" এইবার মেয়ার্সের শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টি জেমসের উপর নিপতিত হইল এবং সে বলিল—"বোধ হয় এই অসভ্য নামবিশিষ্ট দুই ব্যক্তি থাকিতে পারে না।" এই কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া জেমস তাহার গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। ফলে মেয়ার্স দশ হাত হটিয়া পড়িল।

সেরিফ রুষ্ট হইয়া কহিলেন—"এ কলহের স্থান নহে" এবং তৎক্ষণাৎ কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন—'ঐ লোকটার উপর লক্ষ্য রাখ, যদি এ পুনরায় উপদ্রব বা শান্তিভঙ্গ করে ইহাকে গ্রেপ্তার করিবে।' পরে জোসেফাইনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ম্যাডাম, এই ব্যক্তি বলিতেছে যে ইনি আপনার স্বামী। আপনি আপনার স্বামীকে অবশ্য বিশেষ জানেন। আপনি যখন বলিতেছেন এ ব্যক্তি আপনার স্বামী নন এবং আপনার স্বামীর মৃত্যু হওয়ার নিদর্শনপত্রও যখন আপনি দাখিল করিয়াছেন—তখন আমরা

আপনার কথাই বিশ্বাস করিতে বাধা—আপনি যে প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। আমার মতে শুভকার্য্য চলিতে পারে।"

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সেরিফের মতের পোষকতা করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া মেয়ার্সকে সম্বোধন করিয়া জেমস বলিল—"আপনি বোধ হয় এক্ষণে আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং আপনি আমার উপর কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না। হে বন্ধু আপনি জানেন জোসেফাইন আমার স্ত্রী, আমিই উইলিয়ম জেমস। বলুন—দোহাই বলুন—এই কথাটা একবার বলুন!" অটলভাবে মেয়ার্স কহিল—"আপনাকে আমি জানি না, চিনি না, জীবনে আপনার সহিত এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।" এই উত্তরে পুনরায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জেমস মেয়ার্সকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু একজন পুলিস প্রহরী তাহাকে নিরস্ত করিল।

জেমসের কোন বাধাই টিকিল না। তাঁহার সম্মুখেই বিবাহ-কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রথম উন্মত্ততা তখন কতক কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা এক্ষণে অতি শোচনীয়। তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী ক্ষমতা এক্ষণে বিলুপ্ত। তিনি কেবল মাঝে মাঝে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং রুমালে মুখ মুছিতেছেন। পুলিস তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আর কোন কষ্ট দেন নাই। যথাসময়ে উদ্বাহকার্য্য সমাধা হইল এবং দম্পতী সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গাড়ীর শব্দে হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

* * *

সুইন্‌ডেনের সেই সুসজ্জিত বাটীর পার্শ্বে একটী ঝোপের মধ্যে জেমস লুক্কায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রবল বাসনা আর একবার তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। ভাবিতে লাগিলেন তাইত একি হইল! কোথায় জোসেফাইন তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবেন, কিম্বা তাহার অন্য কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য হইবে—কোথায় তাহাকে আনন্দিতা বিস্মিত বা দুঃখিতা হইতে দেখিবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একি! ক্রোধ বিস্ময় বা অন্য কোন মানসিক উদ্বেগ ত দেখিলাম না। তবে কি ডাক্তার গ্রে এই সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাহাকে পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া দিয়াছিলেন? আমি বিবাহস্থলে উপস্থিত হইব, জোসেফাইন কি এই আশা করিতেছিল? হইতেও পারে। আর এই বিবাহ? ইহা কি কৃত্রিম হইতে পারে না? এইরূপ নানা মানসিক চিন্তা ও উত্তেজনা তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি হঠাৎ ঝোপ হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন এবং একটী পথিকের হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাই এদেশের সেরিফের নাম কি?"

সে লোকটা হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"তুমি পাগল নাকি?" "দোহাই! বিশেষ প্রয়োজন বলুন। আপনাদের সেরিফ কি দেখিতে লম্বা এবং কৃশ? তাঁহার মাথার উপর কি টাক আছে?" "না না, তিনি কেন—তিনিত এই স্থানের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী গ্রীওলে।" এই বলিয়া লোকটী প্রস্থান করিল।

জেমস উল্লাসের সহিত বলিতে লাগিল—"গ্রীণ্ডলে। সেত আমার জোসেফাইনের খুড়া। তাহার মুখেত এ নাম বহুবার শুনেছি! এসবের অর্থ কি? এসব কি প্রহেলিকা?"

৪

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার সেস্থান আবৃত করিতে লাগিল। কতকগুলি গাড়ী আসিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইল। প্রথমে একজন সুসজ্জিতা সুন্দরী, তৎপরে একজন বৃদ্ধা এবং সর্ব্বশেষে মিঃ মেয়াস´ আসিয়া একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া অপরাপর গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল। বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিয়া জেমস দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যেত জোসেফাইন নাই! তবে কি গাড়ীর চালক তাঁহাকে ভুলক্রমে অন্য কোন বাড়ীতে আনিয়া ফেলিয়াছে? ক্ষুধায় ও চিন্তায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

হঠাৎ তিনি দেখিলেন বাটীর দ্বিতল হইতে তাহার মুখের উপর একটা আলোকরেখা আসিয়া পড়িল। তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন জানালায় দাঁড়াইয়া কে অতি পরিচিত মধুর কণ্ঠে বলিল—"প্রিয় উইলি ভিতরে এস—অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিবে।"

* * *

একখানি আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া চুরুট টানিতে টানিতে জেমস বলিল—"তা হ'লে বল তুমি আমাকে চিন্তে পেরেছিলে আর সর্ব্বদাই আমার খবরাখবর পেতে?"

জোসেফাইন মৃদুহাস্য করিয়া কহিল—"প্রাণাধিক তুমি কি ভুলিবার?"

তখনও জেমসের চক্ষে প্রহেলিকার অবসান হয় নাই, তিনি বুঝিতে পারিলেন না জোসেফাইনের উত্তরটা বিদ্রূপাত্মক কি ঠিক, এবং প্রকাশ্যে কহিলেন—"আমার বোধ হয় ডাক্তার গ্রে তোমাকে পূর্ব্বাহ্নে সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়াছিল।"

জোসেফাইন মৃদু হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, তবে তাহার বন্ধকী-পত্র ফেরত পাইবার পর।

জেমস—'বোধ হয় এই বিবাহটার ভিতর একটা ষড়যন্ত্র নিহিত ছিল, ইহা কৃত্রিম কেমন?'

জোসেফাইন তাঁহার আর একটু কাছ ঘেসিয়া বসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, তা ভিন্ন আর কি। তোমাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার জন্য।"

জেমস একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"তোমাদের অংশ অতি উত্তম অভিনীত হইয়াছিল।"

সোহাগে ঢলিয়া জোসেফাইন বলিল—"প্রাণাধিক, কেন তুমি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলে?"

এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া জেমস হঠাৎ একটী অবান্তর প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা বল দেখি, সত্যই যদি তুমি বিধবা হইতে, তাহা হইলে মেয়াস´কে বিবাহ করিতে কি?"

জোসেফাইন পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে কহিলেন—"তোমার কি এখনও সন্দেহ আছে?"

জেমস থতমত খাইয়া বলিলেন—"না-না, কিন্তু—"

গম্ভীরভাবে জোসেফাইন কহিল—'"আমার বোধ হয় আমার উপর তোমার এই নির্ম্মম ব্যবহার ব্যতীত জীবনে অন্য কোন অধিকতর ভুল কর নাই। মেয়াস´ অন্য লোকের প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহার গতিবিধি কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে পারি

না। যাহা হউক তুমি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে যে, মেরার্স তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বভিল ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর তিনি লণ্ডনে বাস করিবেন।

জেমস বলিলেন—"হাঁ ইহা একটা সুসংবাদ বটে! আমি বাস্তবিকই জীবনে একটা মস্ত ভুল করেছি। বোধ হয়, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে জোসী—"

জোসেফাইন একমুখ হাসিয়া কহিল—"না প্রাণাধিক না; এত শীঘ্র তুমি ক্ষমা পাইতে পার না।"

জেমস আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন—"তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তোমার মত স্ত্রী-রত্ন যথার্থই দুর্লভ।"

রাজকর।

(শেষ প্রস্তাব)

(৫)

প্রাচীন মুসলমান-জগতে কি বিধি-অনুসারে রাজকর গৃহীত হইত, তাহা অতি সংক্ষেপে আকবর-বন্ধু আবুলফজেললিখিত আয়নী আকবরীতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাজকর-বর্ণনা-কল্পে লেখক অতি সংক্ষেপে রাজকর-গ্রহণের আদর্শ ও মুসলমান-জগতে রাজকরের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। রাজকরগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আবুল ফজেল বলেন—"জীবিকা সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করিতে গেলে মানবকে উপযুক্ত খাদ্য দ্বারা পশু-শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রম সকল শ্রেণীর মানুষকেই করিতে হয়। সকল শ্রেণীর লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা-বিধায়ক এইরূপ পরিশ্রমের সফলতা নরপতিদিগের ন্যায়বিচার এবং রাজসচিব-দিগের সততা ও পারদর্শিকতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রদেশেরই এক একটি বিশেষত্ব আছে। কোন কোন ক্ষেত্র স্বতঃই শস্যোৎপাদন করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্র হইতে সবিশেষ পরিশ্রম ও কৌশলের দ্বারা শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। জলাশয়ের সান্নিধ্য বা দূরতার উপরও ভূমির উর্ব্বরতা অনেকটা নির্ভর করে। সহরের সান্নিধ্যও একটা বিবেচনার কথা। সুতরাং রাজকর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য যে তাহাদের নিজ নিজ জেলায় এই সকল বিষয়ে মনযোগী হওয়া এবং এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া রাজার অংশ স্থিরীকৃত করা।"

ভূমিকরসম্বন্ধে আবুল ফাজল বলেন—"প্রথমে হিন্দুস্থানের নৃপতিগণ মোট ফসলের এক ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করিতেন। তুর্কীসাম্রাজ্যে এক পঞ্চমাংশ, তুরাণে এক ষষ্ঠ, ইরাণে এক দশমাংশ। ইহা ব্যতীত ঐ সকল প্রদেশে লোক-সংখ্যানুসারে খেরাজ নামক এক প্রকার কর গৃহীত হইত। ক্রমে তুরাণ ও ইরাণে এক দশমাংশ ফসল হইতে গৃহীত হইত বটে, কিন্তু আরও কয়েক প্রকার করের জন্য মোটের উপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপার্জ্জিত শস্যের অর্দ্ধাংশ রাজকোষে প্রদান করিতে হইত।" মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতীয় প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে মুসলমান সুলতানগণ কর্ত্তৃক গৃহীত যে জিজিয়া করের কথা আমরা শুনিতে পাই, আবুলফাজলের ইতিহাসপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, খলিফ ওমর তাহা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে লেখক বলেন—"যে সকল লোক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিল না, খলিফ ওমর তাহাদিগের উপর একটি বাৎসরিক কর বসাইয়াছিলেন। ধনী লোককে ৪৮ দরহাম, মধ্যবিত্ত লোককে ২৪ দরহাম এবং অসম্পন্ন ব্যক্তিকে বাৎসরিক ১২ দরহাম কররূপে প্রদান করিতে হইত। এই করকে জিজিয়া বলা হইত।" পরে ভারতবর্ষে ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি বাদসাহগণ হিন্দুদিগের উপর এই ঘৃণ্য জিজিয়া বসাইয়া প্রজাবৃন্দের কিরূপ মনঃপীড়া উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ভূমিকর ব্যতীত পণ্যের উপর করগ্রহণপ্রথাও মুসলমান-জগতে প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সকল করকে তোমগা বলা হইত। ইরাণ ও তোরাণে, জেহাত, সয়ের জেহাত প্রভৃতি কর গৃহীত হইত। শিল্পজাত বস্তুর উপর করকে জেহাত বলা হইত এবং অন্যান্য করকে সয়ের জেহাত বলা হইত।

আকবর সাহ তোমগা সকল উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভূমিকরও যাহাতে ঠিক নিয়মিত ও সকলের নিকট হইতে সমভাবে আদায় করা হয় তাহারও সুবাবস্থা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমান ভূপতিগণ তীর্থযাত্রীদিগের নিকট হইতে কর্ম্মীনামক এক প্রকার কর গ্রহণ করিতেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে সম্রাট আকবর এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের নবমবর্ষে তিনি জিজিয়া নামক কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দু প্রজাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

কাফী খাঁ-কৃত মন্তাখাবুল লুবাব নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৎনামী নামক হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিদ্রোহের পর সম্রাট ঔরঙ্গজীব হিন্দুদিগের উপর আবার জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন। কোন কোন আধুনিক লেখক বলেন,

হিন্দুগণ যুদ্ধে যাইত না বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে জিজিয়া গৃহীত হইত। কথাটা একেবারে অলীক ও ইতিহাসের প্রমাণ বিরুদ্ধ। জিজিয়ার পুনঃ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কাফী খাঁ বলেন—"কাফেরদিগকে দমন করিবার জন্য এবং কাফেরদিগের দেশ হইতে বিশ্বাসী (মহম্মদীয়) দিগের দেশের পার্থক্য করিবার জন্য সমস্ত পরগণায় হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া বসান হইল।" কাফী খাঁ বলেন যে এই করের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার জন্য দলে দলে হিন্দু আসিয়া ঝরোকার নিকট দাঁড়াইয়া সম্রাটের করুণা ভিক্ষা করিত। সম্রাট কিন্তু তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন বাদসাহ যখন মসজিদে যাইতেছিলেন, তখন অসংখ্য হিন্দু আবেদনকারী আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। সম্রাট তাহাদিগকে সরাইয়া রাস্তা করিতে আজ্ঞা দিলেও তাহাদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ রাজাজ্ঞা পালিত হইল না; লোকসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সম্রাট আজ্ঞা দিলেন যে জনতার মধ্যে হস্তী ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে সকলে পলাইবে। অনেকে হস্তী ও অশ্বপদতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। তাহার পরও দুই চারিদিন হিন্দুগণ আবেদন করিয়াছিল। শেষে সকল প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা নিয়মিতরূপে রাজ-কোষে জিজিয়া প্রদান করিতে লাগিল।

সুলতান ঔরঙ্গজেবের সময় কেবল যে জিজিয়া সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের দেয় করের পার্থক্য ছিল, তাহা নহে। তাঁহার রাজত্বকালের পূর্ব্ব হইতেই পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক বা জকাত কর গৃহীত হইত। কাফী খাঁ বলেন যে সম্রাটের রাজত্বকালের দ্বাদশ বৎসরে তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে কোথাও মুসলমানদিগের পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইবে না। তাহার পর রাজস্ববিভাগের রাজপুরুষদিগের পরামর্শানুসারে তিনি নিয়ম করিলেন যে, অধিক মূল্যবান পদার্থের জন্য মুসলমানদিগকেও কর দিতে হইবে, কিন্তু স্বল্প মূল্যের সাধারণ পদার্থের উপর মুসলমানদিগের নিকট রাজস্ব গৃহীত হইবে না। এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর রাজস্ববিভাগের কর্ম্ম-চারীগণ বাদসাহের নিকট নিবেদন করিল যে কর দিতে হইবে না বলিয়া হিন্দু বণিকগণও তাহাদের মুসলমান বন্ধুদের হস্তে মাল চালাইতেছে। ইহা শুনিয়া সম্রাট এ আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত করিয়া নিয়ম করিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকট শুল্ক আদায় করা হইবে। তবে হিন্দুকে দ্রব্যের দাম হিসাবে শতকরা পঞ্চ মুদ্রা রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু মুসলমান শতকরা সার্দ্ধ দুই মুদ্রা শুল্ক দিলেই চলিবে।

এই সকল পার্থক্যের কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছে।

(৬)

ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে আদম্ স্মিথ্ প্রথম রাজকরগ্রহণের প্রকৃষ্ট বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। রাজকরগ্রহণে কোন্ প্রথা আদর্শ-স্বরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি চারিটী নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ প্রভৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী অর্থনীতিবিদ্‌গণ ঐ চারিটী নিয়মকে এ সম্বন্ধে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সকল নিয়মের মধ্য হইতে নানা প্রকার তর্কাদি উপস্থাপিত করিয়া রাজকরসম্বন্ধীয় প্রশ্নটীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। আদম্ স্মিথের বিধিগুলি এইরূপ।

ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রজাবর্গের পক্ষে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শক্তি-অনুসারে রাষ্ট্রকার্য্যের ব্যয় বহন করা উচিত। এই বিধি-অনুসারে রাজকর আদায় করিলেই রাজকর সমানভাগে সকল প্রজার নিকট হইতে লওয়া হয়। এই বিধি উপেক্ষা করিয়া রাজকর গ্রহণ করিলে রাজশক্তি পক্ষপাতিত্ব-দোষে দূষিত হয়।

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে পরিমাণে রাজকর প্রদান করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কদাচ এ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। করদানের সময়, কিরূপে কর প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিয়ম বা যে পরিমাণে কর দিতে হইবে তাহার হার স্পষ্টভাবে প্রত্যেক প্রজার নিকট জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, এ বিধির ব্যত্যয় ঘটিলে প্রজাবৃন্দকে রাজকরসংগ্রহ কর্ম্মচারীর হস্তে নিগৃহীত হইতে হয়।

(গ) যে সময়ে বা যে প্রণালীতে কর প্রদান করিলে প্রজার সুবিধা হয়, রাজকর সেই সময় সেই প্রণালীতে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) যাহাতে প্রজার নিকট হইতে যে পরিমাণে কর গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে যতদূর সম্ভব রাজকোষে অর্জ্জিত হয় এইরূপ ভাবে কর নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে কর গৃহীত হওয়া উচিত যাহাতে আদায় করিবার ব্যয় অধিক না হয়। এই জন্য এরূপ সকল দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ করা উচিত যাহা সহজেই প্রজার নিকট হইতে রাজকোষে আসিতে পারে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত নিয়মগুলি যে করগ্রহণসম্বন্ধে আদর্শস্থানীয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রাজশক্তির পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রত্যেক প্রজার সাধ্যানুসারে কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার

করিবেন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই বিধির অনুমোদন করিতে অনেক স্থলে গোল বাধিয়া যায়। প্রত্যেকে সমানভাবে রাজকার্য্যের ব্যয় বহন করিবে, ইহার অর্থ এই যে, তাহাদিগের নিজ নিজ শরীর, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য রাজশক্তি যেরূপ সমভাবে কার্য্য করে, সেই রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রত্যেক প্রজারও সমভাবে স্বার্থত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কিসে প্রত্যেকের পক্ষে সমভাগে স্বার্থত্যাগ করা হয়, সে প্রশ্নের মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ। মোটের উপর দেখিতে গেলে যে ব্যক্তি রাজছত্রের ছায়ায় বসিয়া শান্তি উপভোগ করিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করে, যে ব্যক্তি মাসিক ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করে সে ব্যক্তির তুলনায় প্রথম ব্যক্তির অর্দ্ধেক পরিমাণে রাজকর প্রদান করা উচিত। কিন্তু এরূপ ভাবে তাহাদিগের উপার্জ্জিত ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে উভয় পক্ষকে সমান স্বার্থত্যাগ করান হয় না। যে ব্যক্তি মাসিক ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করে তাহার নিকট ২৲ টাকার যে মূল্য, যে ব্যক্তি ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহার নিকট ৮৲ টাকা সে পরিমাণে মূল্যবান নহে। আবার ঐ হারে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জনকারীর নিকট হইতে ৪০৲ টাকা আদায় করা হইলে তাহাকে কোন প্রকারে স্বার্থত্যাগই করিতে হয় না। ৫০৲ মুদ্রা উপার্জ্জনকারীকে ২৲ টাকা দিতে হইলে তাহাকে হয়ত নিজের বা আত্মীয়দিগের কাহারও একটী আবশ্যক বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সহস্র মুদ্রা-উপার্জ্জনকারীকে স্বচ্ছন্দতার কোনও অংশই পরিত্যাগ করিতে হয় না। এইরূপ যুক্তি মানিয়াই আধুনিক সকল সভ্য প্রদেশে সামান্য ধনোপার্জ্জনকারীদিগের আয়ের উপর কর গৃহীত হয় না। অস্মদ্ দেশে প্রথমে বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা আয়ের উপর কর গৃহীত হইত। সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট শেষে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সুবিধার জন্য হাজার টাকা অবধি আয়কর মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামান্য মূল্যের হইলেও যদি তাহা দরিদ্রদিগের অত্যাবশ্যক হয়, সে সামগ্রীর উপরও কর না লইয়া বিলাসের দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আমাদিগের দেশে লবণের উপর যে কর গ্রহণ করা হইত, তাহার হার হ্রাস করিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এ বৎসরও শাসনকার্য্যে ব্যয়াধিক্য হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বিদেশী তামাক, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির উপর কর বসাইয়াছেন। ইহার মধ্যে কেরোসিন তৈলের উপর যে কর বসান হইয়াছে, তাহা ঠিক সমীচীন

হয় নাই ; কারণ ইহার দ্বারা দরিদ্রদিগের নিকট হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ গৃহীত হইবে। এদেশের অর্দ্ধবুভুক্ষু শ্রমজীবীকে যাহাতে আর কোনরূপ অর্থ ব্যয় করিতে না হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত। অপর সকল নূতন করগুলি শাসকসম্প্রদায়ের বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞদিগের অভিমত এই যে যাহাতে প্রজার স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশীলতার হানি না করিতে পারে সেইটুকু সম্পত্তির উপর রাজকর গৃহীত হওয়া উচিত নহে। তাহার ঊর্দ্ধে প্রত্যেকের যোগ্যতা-অনুসারে কর প্রদান করা উচিত।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ আদম স্মিথের প্রথম নিয়মটির সহিত দুইটী নিয়ম যোগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে লোকের মূলধনের উপর কর গ্রহণ করা একেবারে উচিত নহে। যাহা কিছু রাজকর গৃহীত হইবে, সমস্তই আয়ের উপর গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। মূলধন হইতে কর গ্রহণ করিলে দেশের শ্রমশিল্পের অবনতি হয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে এমন অনেক আয় আছে, যাহা লোকের চেষ্টা বা উদ্যম ব্যতিরেকে আপনা আপনি বাড়িয়া যায়। দেশ যতই সমৃদ্ধিশালী হয়, ভূস্বামীদিগের ভূমির ভাড়া ততই বাড়িয়া যায়। ইহার জন্য ভূস্বামীদিগকে কোনও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না বা তিলমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে হয় না। সুতরাং এই অর্থের কিয়দংশ রাজকার্য্যের জন্য প্রদান করিলে কাহারও কোনও ক্ষতি হয় না।

আদর্শ রাজকরসম্বন্ধে আদম স্মিথের অপর বিধিগুলির ব্যাখ্যা লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় না বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেশকালপাত্রভেদে সেগুলির ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজকরের নির্দ্দিষ্টতা থাকিলে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। তেমনি রাজকর ঠিক সুবিধামত গ্রহণ করা বড়ই হিতকর। এক স্থান হইতে অপরস্থলে কোনও পত্র লইয়া যাইতে হইলে শাসকসম্প্রদায় ডাক মাশুল বা কর গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ডাক টিকিট ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এ করগ্রহণ অপেক্ষা সরল ও সুবিধাজনক প্রণালী কল্পনা করা যায় না। আদম স্মিথের চতুর্থ নিয়ম কষ্টিপাথরে কসিয়া দেখিলে পূর্ব্ববর্ণিত অধিনীয়দিগের সম্পত্তির উপর কর কিরূপ বিধিবিরুদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি রাজকর আদায় করিতেই রাজকরের অর্দ্ধেক অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়,

তাহা হইলে অপর সকল বিভাগে রাজশক্তি কিরূপে ব্যয় সঙ্কুলান করিবে ইহা ভাবিবার কথা।

আমরা যে সকল নিয়ম বিচার করিতেছি, তাহা কেবল সরকারী ব্যয়ের জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের উপায়। আদম স্মিথ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মতে শুল্ক বা কর গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ করা। কিন্তু জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে শুল্কের দ্বারা এককালে রাজ তহবিলে অর্থাগম ও স্বদেশী শিল্পের উন্নতির বিধান করা হয়। তাঁহারা বলেন বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর অধিক পরিমাণে শুল্ক বসাইলে নিজদেশে বিদেশী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে তাহার প্রতিযোগিতায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রসার ও স্বদেশী শিল্পজীবীর আর্থিক উন্নতি হয়। কেবল, তাহাই নহে; স্বদেশী দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইবার সময় ইহারা ঐ সকল দ্রব্যের জন্য বণিকদের বাউণ্টি প্রদান করেন, অর্থাৎ যে দ্রব্য রপ্তানী হইবে তাহা উৎপন্ন করিবার সময় তাহার জন্য যে কর দিতে হইয়াছিল, রপ্তানি হইবার সময় সেই করের পরিমাণে অর্থ প্রত্যর্পিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্যের বিদেশে বিক্রয়াধিক্য হয়, বিদেশের অর্থ দেশে আমদানী হয়।

অবাধ বাণিজ্য ভাল অথবা শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিদেশী বাণিজ্য প্রতিরোধ করা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য; এ প্রশ্ন লইয়া আধুনিক রাজনৈতিক সমর-প্রাঙ্গনে বহুল পরিমাণে বাক্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ইংরাজ রাজ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী, জার্ম্মানী আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি এরূপ বাণিজ্যের বিরোধী। ইহার মধ্যে কোন্ মত ভাল এ প্রবন্ধে তাহার বিচার করিবার অবসর বা উদ্দেশ্য আমাদিগের নাই। তবে এক কথায় বলিতে পারি যে, সকল অনুষ্ঠানের মত এ অনুষ্ঠানও দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। অবাধ বাণিজ্যনীতির একজন প্রধান পরিপোষক জন,ষ্টুয়ার্ট মিলও বলিয়াছেন যে যতদিন দেশে শ্রমশিল্পের বিশেষ উন্নতি না হয়, ততদিন নবীন উপনিবেশে (young colony) পণ্যশুল্ক গৃহীত হইলে অপকার হয় না। এইরূপ যুক্তির দোহাই দিয়া অনেক ইংরাজ-উপনিবেশে এমন কি ইংলণ্ড হইতে আমদানী দ্রব্যের উপরও শুল্ক গৃহীত হয়। কেপ কলনী, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি উপনিবেশ অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী। অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডায় কেবল বিদেশী শিল্প বন্ধ করিবার জন্য বিদেশজাত পণ্যের উপর

কর গৃহীত হয়, তাহা নহে। বিদেশী শ্রমজীবী আসিয়া স্বদেশী শ্রমজীবীর রুটি মারিবে, এই আশঙ্কায় শ্বেতাঙ্গেতর বিদেশী তাহাদের দেশে থাকিলে তাহাদিগের নিকট হইতে এক প্রকার করসংগ্রহ করা হয়।

আমাদিগের দেশে শ্রমশিল্পের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করিলে এ দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি হইতে পারে। আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা নিজ দেশে তথা এ দেশে অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং এ দেশে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ হইবার প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। ভারতবর্ষে বিদেশজাত দ্রব্যের উপর মূল্যানুসারে (ad valorem) শতকরা ৫৲ টাকা অবধি গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাহা কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য, বিদেশী দ্রব্য আমদানীর বন্যা প্রতিরোধের জন্য নহে। কল, কয়লা ও তুলার মাশুল নাই।*

---

* ১৮৯৪ সালের ৮ আইন ও ১৯১০ সালের ৮ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত হারে মাশুল গৃহীত হয়। যথা—

সুতার কাপড় বা পিস্‌গুড্—শতকরা ৩॥০ টাকা।

লোহা ও ইস্পাত— „ ১৲ টাকা।

পেট্রোলিয়ম—প্রতি গ্যালন দেড় আনা।

এল, বীয়ার, পোর্টার, সাইডার প্রভৃতি মদ্য—প্রতি গ্যালন ৴০ তিন আনা।

স্পিরিট—প্রতি প্রুফ্ গ্যালন ৯।৶০।

লিকিয়ার মদ্য—প্রতি প্রুফ্ গ্যালন ১৩৲।

স্পার্কলিং মদ্য—প্রতি গ্যালন ৩৸০।

ষ্টিল মদ্য—প্রতি গ্যালন ১॥০।

সণ্ট ওয়াইন—একসাইজ ডিউটির সমতুল।

রূপা—আউন্স প্রতি।০।

আফিম ও তদজাত দ্রব্য—প্রতি সের ২৪৲।

কাঁচা তামাক—প্রতি পাউণ্ড ১॥০।

সিগার—প্রতি পাউণ্ড ২॥০।

৩ পাউণ্ড হইতে ১০০০ পাউণ্ড অবধি সিগারেট—প্রতি পাউণ্ড ২৲।

অপর প্রকার প্রস্তুত তামাক—১॥৶০।

খুনের দায়ে।

(গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়)

প্রথমার্দ্ধ।

কয়েক দিন হইতে বন্ধু গোবিন্দরামকে দেখিলাম, বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছেন; তিনি প্রায়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত; আমি বুঝিলাম যে, তিনি কোন গুরুতর অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার ছদ্মবেশের রকমও অসংখ্য, তা ছাড়া এই কলিকাতা সহরে কম পক্ষে তাঁহার পাঁচটা বাসা ছিল, তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে এই সকল বাড়ীতে বাস করিতেন।

তিনি কি কাজে নিযুক্ত আছেন, তাহা তিনি একদিনও আমায় বলেন নাই, আমিও তাঁহার স্বভাব জানিতাম, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

একদিন সকালে আমি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তিনি এক বৃহৎ বল্লম স্কন্ধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি ভয়ানক, তুমি এই বল্লম কাঁধে করিয়া কাঁধে বাড়ী বলরামের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছ!"

গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিলেন, "এটা ঠিক বল্লম নয়, এটাকে খোঁচা বলিতে পার, পূর্ব্বদেশে এই খোঁচা দিয়া লোকে বড় বড় মৎস্য শীকার করিয়া থাকে, তাল শক্ত জাল ছিঁড়িয়া যে মাছ পালায়, সে মাছও এই খোঁচার হাতে রক্ষা পায় না।"

"তুমি এটা লইয়া কি করিতেছিলে?"

"মেছুয়াবাজারে একটা মুসলমান কসাইয়ের দোকানে গিয়াছিলাম।"

"কসাইএর দোকানে?"

"হাঁ—আমি এটা লইয়া তাহার দোকানে কি করিতেছিলাম, তাহা তুমি যে কিছুতেই বলিতে পারিবে না, তাহা আমি জানি।"

"আমার পক্ষে তোমার কার্য্যকলাপ অনুমান করা অসম্ভব।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি সে সময়ে তাহার দোকানের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে, আমি তাহার একটা

বড় লম্বমান আস্তো পাঁটার দেহে এটা বিঁধিবার চেষ্টা পাইতেছিলাম। দেখিলাম শত চেষ্টা করিয়াও আমি সেই পাঁটার দেহে এ খোঁচা কিছুমাত্র বসাইতে পারিলাম না। তুমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, ডাক্তার ?"

"রক্ষা কর, আমার আবশ্যক নাই। কিন্তু তুমি এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন ?"

"চিংড়িঘাটার সেই খুনের জন্ত—এই যে অক্ষয়বাবু স্বয়ং উপস্থিত। আসুন —আসুন।"

ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়কুমার আমাদের অপরিচিত নহেন, তিনি প্রায়ই গোবিন্দরামের নিকট আসিতেন, এইজন্য তাঁহার আগমনে বিশেষ বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তিনি বসিলে গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু করিতে পারিলেন ?"

"বিন্দুমাত্র কিছু নয়।"

"কিছু না ?"

"কিছুমাত্র না।"

"তাহা হইলে আমাকে দেখিতে হইবে ?"

"হাঁ নিশ্চয়ই, সেইজন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, আসুন, একবার আপনি নিজে সব দেখিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

"আমি ব্যাপারটার অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। হুঁকোটার বিষয় কি ভাবিতেছেন ?"

অক্ষয়কুমার বিস্মিতভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "কেন, হুঁকাটা নিশ্চয়ই তার।"

"অথচ সে তামাক খাইত না।"

"হাঁ লোকে ত এই রকম বলে, তবে হয় ত অন্য কেহ আসিলে তামাক দিত, তাহাদের জন্যই হুঁকাটা রাখিয়াছিল।"

"যাহাই হউক, আমি হইলে এই হুঁকা হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতাম। যাক্‌, আমাদের ডাক্তার বাবু সব কথা শুনেন নাই, অক্ষয়বাবু, ব্যাপারটা কি সব ইঁহাকে বলুন, তা হলে আলোচনার সুবিধা হয়।"

অক্ষয়কুমার পকেট হইতে একখানা কাগজ লইয়া সেইখানা দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটার নাম কালু বিশ্বাস—লোকে তাহাকে কালো মাঝি

বলিয়া ডাকিত। লোকটা নৌকার মাঝি ছিল। যে সকল নৌকা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইত, কালু বিশ্বাস সেই সব নৌকার একখানার মাঝি ছিল। সুন্দরবন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বেলেঘাটা উল্টাডিঙ্গিতে বিক্রয় করিত। এখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। বছর পাঁচেক হইল, সে মাঝির কাজ ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর চিঙ্গিড়িঘাটায় আসিয়া বাস করিতেছিল। এইখানে দুই-তিন বৎসর বাস করিতেছিল, আর এইখানেই গত শনিবারে সে খুন হইয়াছে।

"সে চিঙ্গিড়িঘাটার বাড়ীটা কিনিয়াছিল, অনেক দিন ধরিয়া কাঠের ব্যবসা করিয়া সে যে বেশ দুই পয়সা করিয়াছে, তাহা সকলেই জানিত। সে এখানে একটা স্ত্রীলোক লইয়া বাস করিত, বলিত সে তাহার স্ত্রী; কিন্তু কালু এত মদ খাইত যে, সময়ে সময়ে তাহার কোন জ্ঞান থাকিত না, স্ত্রীকে বিষম প্রহার করিত। পাড়ার লোকে সকলেই ইহা জানে, সকলেই তাহাকে ভয় করিত, প্রকৃতপক্ষে তাহার ন্যায় ভয়ানক লোক আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। তাহার মৃত্যুতে সকলেই খুসী হইয়াছে।

"সে বাড়ীর বাহিরে একটু দূরে একখানা ঘর বাঁধিয়াছিল, অধিকাংশ সময় এই ঘরে থাকিত, এ ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না, এমন কি তাহার স্ত্রীকেও নহে। রাত্রে এই ঘরে ঘুমাইত। এই ঘরের দরজা ছাড়া দুইটা ছোট জানালা ছিল, একটা রাস্তার দিকে, ঘরের ভিতরে আলো জ্বলিলে সে আলো রাস্তা হইতে দেখা যাইত। রাস্তা হইতে পাড়ার লোকে আলো দেখিয়া বলিত, 'কালু মাঝি আজ খুব মদ চালাইতেছে।'

"পাড়ার সনাতন বলিয়া একটা লোক খুনের দুই দিন আগে—রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাস্তা দিয়া যাইবার সময় এই জানালা দিয়া দেখিতে পায় যে,ঘরে আলো জ্বলিতেছে—সে আরও দেখিতে পায় যে,ঘরের ভিতরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কে দাঁড়াইয়া আছে, সে যে কালু মাঝি নহে, সে বিষয়ে সে শপথ করিতে পারে, সে লোকটার দাড়ী ছিল, কিন্তু কালো মাজির দাড়ী ছিল না।

"গত শনিবার কালু মাঝি সমস্ত দিনই মদ খাইতেছিল, তাহার স্ত্রী ভয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে পালাইয়া গিয়াছিল, বাড়ীতে কেহই ছিল না। ক্রমে রাত্রি হইলে কালু মাঝি তাহার বাহিরের ঘরে প্রবেশ করে, আর বাহির হয় নাই। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, তাহার স্ত্রী বাড়ীতে ফিরিয়া

আসে। তাহার পর রাত্রি প্রায় একটার সময়ে এক বিকট চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চীৎকার কালু মাঝির ঘর হইতে উঠিয়াছিল; কিন্তু মদ খাইলে সে প্রায়ই নানারকম চীৎকার করিত, তাহাই তাহার স্ত্রী আর সে রাত্রে কোন সন্ধান করে নাই।

"সকালে তাহার চাকর দেখিল যে, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু কালু মাঝির ভয়ে সে ঘরের দিকে আর শীঘ্র গেল না। এই রকমে প্রায় ১২টা বাজিল, তখন তাহার স্ত্রী তাহার সন্ধানে আসিয়া ঘরের ভিতর উঁকি মারিল, সে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই চীৎকারে পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহার পর তাহারা পুলিসে খবর দিতে ছুটিল, সংবাদ পাইয়াই আমি চিঙ্গিড়িঘাটায় উপস্থিত হইলাম।

"যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমারও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ঘরটায় মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে, সমস্ত ঘর রক্তে পূর্ণ, স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া রহিয়াছে। কালু মাঝি প্রাচীরের নিকট তক্তপোষের উপরে বসিয়া আছে, তাহার বুকের ভিতর দিয়া এক বল্লম বুক ভেদ করিয়া মাটির দেওয়ালে বসিয়া গিয়াছে। তাহার মুখের এমনই বিকট ভাব হইয়াছে যে, আমি তেমন ভয়াবহ মুখ জীবনে আর কখনও দেখি নাই। দেখিয়া বুঝিলাম, বহুক্ষণ হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"গৃহমধ্যে একটা বড় কাঠের বাক্স ভিন্ন আর কিছু নাই। গোবিন্দরাম বাবু, আমি আপনার প্রথা অবলম্বন করিয়া, ঘরটা আর ঘরের বাহিরে চারিদিক্ বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু বাহিরে কোন পায়ের দাগ দেখিতে পাইলাম না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "অর্থাৎ আপনি কিছু দেখিতে পান নাই।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিতে পারি যে, কোন পায়ের দাগ সেখানে ছিল না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "অক্ষয়বাবু, আমি অনেক খুনের অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হাওয়ার উপর দিয়া কেহ আসিয়া কাহাকে খুন করিয়াছে, এমন দেখি নাই। যখন এই লোকটা খুন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই খুনী তাহার চরণযুগল রীতিমত ব্যবহার করিয়া তাহাকে খুন করিয়া গিয়াছে। এই রক্তাক্ত ঘরে খুনীর যে কোন চিহ্ন নাই, ইহা কখন হইতেই পারে না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনাকে আমার সেইদিন ডাকিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, যাক্ এখন আর উপায় নাই, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন ঘরের মধ্যে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি; প্রথম যে বল্লমে কালু মাঝি খুন হইয়াছে, সেটা ঘরের কোণেই ছিল; সেখানে ঠিক এই রকম আর একটা বল্লম আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, খুনী পূর্ব্ব হইতে খুন করিবার অভিপ্রায়ে আসে নাই; তাহা হইলে কোন অস্ত্র সঙ্গে করিয়া আসিত। কোন কারণে সে হঠাৎ রাগত হইয়া হাতের নিকট যে অস্ত্র পাইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া কালু মাঝিকে খুন করিয়াছিল। আরও এক কথা, কালু মাঝির পায়ে জুতা ও গায়ে জামা ছিল, তাহাতে বোঝা যায় যে, সে অত রাত্রেও শোয় নাই, জুতা পায় দিয়া কেহ শোয় না, ইহাতে বোধ হয় যে; হয় ত লোকটার আসিবার কথা ছিল, ইহা যে কেবল অনুমান নয়, তাহার প্রমাণ খাটের উপর এক বোতল মদ আর দুইটা গেলাস ছিল, বোতলের অর্দ্ধেক মদ নিঃশেষ হইয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয় যে, তাহারা দুইজনে মদ খাইতেছিল।"

"মদটা দেশী না বিলাতী?"

"দেশী।"

"আর কোন মদ ঘরে ছিল?"

"হাঁ, এক বোতল ব্রাণ্ডীও ছিল। তবে এ বোতলটা আঁটা ছিল, খোলা নয়, সুতরাং এ বোতলে যে আমাদের অনুসন্ধানের কোন সুবিধা হইবে, তাহা বলা যায় না।"

"তবুও ইহার একটা অর্থ আছে। তাহার পর বলুন, আর কি সে ঘরে ছিল?"

"সেই হুঁকাটা—"

"ঘরের কোথায় হুঁকাটা ছিল?"

"ঘরের মধ্যে মাটিতে পড়িয়াছিল।'

"আর কিছু?"

অক্ষয়কুমার পকেট হইতে একখানা নোটবই বাহির করিলেন; তাহাতে কতকগুলি নোট ও কোম্পানি কাগজের নম্বর লেখা রহিয়াছে। গোবিন্দরাম নোটবইখানি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই মলাটটায় দাগ লাগিয়াছে দেখিতেছি।"

"হাঁ, এটা রক্তের দাগ, ঘরের মেজের এখানা আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

"তখন রক্তের দাগ উপরের মলাটে না নীচের মলাটে ছিল ?"

"নীচের মলাটে।"

"তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে, খুন হইবার পরে এখানা ভূমে পড়িয়াছিল।"

"নিশ্চয়ই। খুনী তাড়াতাড়ি পালাইবার সময় তাহার পকেট হইতে এখানা পড়িয়া গিয়াছিল, বইখানা দরজার কাছে পাইয়াছি।"

"যে সব নোট বা কাগজের নম্বর এই নোটবুকে লেখা রহিয়াছে, তাহার কোনখানা কালু মাঝির ঘরে পাওয়া যায় নাই ?"

"না—কিছু নয়।"

"চুরি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ?"

"না—তাহার ঘরের কোন জিনিষ যে কেহ লইয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।"

"তাইতো—একখানা ছোরা না পাওয়া গিয়াছে ?"

"হাঁ, কালু মাঝির মৃতদেহের কাছে একখানা ছোরা পড়িয়াছিল, তাহার স্ত্রী বলিয়াছে ছোরাখানা তাহার স্বামীর।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "দেখিতেছি, আমাকে নিজেই একবার চিঙ্গিড়িঘাটায় যাইতে হইবে।"

অক্ষয়কুমার আনন্দিত স্বরে বলিলেন, "আসুন—ইহাতে আমার যে কি উপকার করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

গোবিন্দরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "প্রায় সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে, গোড়ায় হইলে কাজ সহজ হইত, তবুও হয় ত কিছু না কিছু জানিতে পারিলেও পারিতে পারি—কি বল ডাক্তার, যাবে ? এস। অক্ষয়বাবু, একখানা গাড়ী দেখুন—"

আমরা তিনজনে কালু মাঝির বাড়ীতে পৌঁছিলাম। অক্ষয়কুমার প্রথমেই আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন, সেখানে কালু মাঝির স্ত্রীকে দেখিলাম। সে স্বামীর মৃত্যুতে দুঃখিত নহে, বরং সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল।

তাহার পর আমরা কালু মাঝির সেই ঘরে আসিলাম। দ্বারে চাবি

দেওয়া ছিল, সেইদিন হইতে পুলিস এ ঘর বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অক্ষয়কুমার চাবি খুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি—এ যে দেখিতেছি, কে দরজা খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

আমরা দেখিলাম, যথার্থই কেহ কোন যন্ত্র দিয়া দরজাটা খুলিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু খুলিতে পারে নাই। গোবিন্দরাম পশ্চাদ্দিকের জানালাটা দেখিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "এ জানালাটা খুলিবারও কেহ চেষ্টা পাইয়াছে দেখিতেছি। সে যে-ই হউক, এ সকল কাজে পরিপক্ক নয়।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার। কালও আমি এ ঘর দেখিয়াছি, কাল দরজায় এ সব দাগ ছিল না।"

আমি বলিলাম, "এখানকার কোন লোক হয়তো—"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "সম্ভব খুব কম—গোবিন্দরাম বাবু, কি বলেন?"

তিনি বলিলেন, "ইহা আমাদের খুব সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনি মনে করিতেছেন, লোকটা আবার আসিবে।"

"খুব সম্ভব, সে মনে করিয়াছিল দরজাটা সহজেই খুলিতে পারিবে, পকেটে যে ছোট ছুরি ছিল তাহাই দিয়া দরজা আর জানালাটা খুলিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। এ অবস্থায় তাহার কি করা সম্ভব?"

"কোন ভাল যন্ত্র লইয়া আবার আসা।"

"ঠিক তাহাই—সে নিশ্চয়ই আজ রাত্রে আবার আসিবে, তখন আমরা তাহাকে ধরিবার জন্য যদি এখানে না থাকি, তবে সে দোষ আমাদের, যাহা হউক, এখন ঘরের ভিতরটা দেখা যাক্।"

অক্ষয়কুমার দরজা খুলিলেন। ঘরের ভিতর হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলা হইয়াছে, তবে খাট বিছানা ঠিক অবস্থায় আছে। বহুক্ষণ ধরিয়া গোবিন্দরাম ঘরটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন, "এই কালু মাঝি লিখিতে পড়িতে জানিত দেখিতেছি; অনেক খাতাপত্র বাক্সের উপর রহিয়াছে।"

"হাঁ, একটু-আধটু জানিত।"

"বাক্সের উপর হইতে কোন কিছু তুলিয়া লইয়াছেন কি, অক্ষয়বাবু?"

"না, কিছু নয়।"

"কেহ কিছু তুলিয়া লইয়াছে, বাক্সের উপর এইখানটায় ধূলা নাই, হয় কোন খাতা বা ছোট একটা বাক্স এইখানে ছিল, কেহ তুলিয়া লইয়াছে—এখন আর এখানে কিছু দেখিবার নাই, কিছুক্ষণ আমি আর ডাক্তার

এইদিকে বেড়াইয়া আসি, একটু পরে আবার অক্ষয়বাবু আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করিব, তাহার পর বিবেচনা করা যাইবে যে, কাল রাত্রে যে লোকটা আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পারা যায় কিনা।”

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা তিনজনে এই গৃহে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন, “ঘরের দরজাটা খোলা থাক।”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “না, তাহা হইলে লোকটার মনে সন্দেহ হইবে। যেমন বন্ধ আছে, তেমনই থাক, আমরা এই ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, তাহার পর দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।”

বহুক্ষণ আমরা তিনজনে নিঃশব্দে সেই ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কে আসিবে, তাহা জানিবার জন্য আমার হৃদয় দারুণ কৌতূহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অথবা কেহই আসিবে না, আমাদের এই রাত্রি জাগরণ, কষ্ট ভোগ সমস্তই বৃথা হইবে।

চারিদিক্ একান্ত নিস্তব্ধ, কোনদিকে কোন শব্দ নাই—প্রায় দুইটা বাজে, এই সময়ে আমরা তিনজনেই চমকিত হইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দিকে আসিতেছে। আমরা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু আবার বহুক্ষণ কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না।

সহসা আবার পায়ের শব্দ হইল, এবার স্পষ্ট শব্দ, লোকটা ঘরের দরজার কাছে আসিয়াছে, শব্দে বুঝিলাম যে, সে কলুপটা খুলিবার শব্দ করিতেছে, পরমুহূর্ত্তেই কড়াৎ করিয়া কলুপটা খুলিয়া গেল, লোকটা ঘরের ভিতর গিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া একটা বাতি জ্বালিল। সেই বাতির আলোকে ঘরের মধ্যস্থ সমস্তই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

আলোকে দেখিলাম, আগন্তুকটী ভদ্রবংশীয় যুবক, যুবকের দেহ কৃশ ও দুর্ব্বল, বোধ হয়, তাহার বয়সও চব্বিশ বৎসরের অধিক নহে। সে এত ভীত হইয়াছিল যে, তাহার কৃশ দেহ কম্পিত হইতেছিল এবং সে ভীত-নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছিল। তাহার পর সে গৃহের এককোণে বাতিটী বসাইয়া গৃহের অন্যদিকে গেল, আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে বাতির কাছে একখানা খাতা আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল; ক্ষণপরে বিরক্তভাবে খাতাখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল, তাহার পর বাতিটা নিবাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে-

ছিল, অমনই গোবিন্দরাম ব্যাঘ্রের ন্যায় গিয়া তাহার গলা ধরিলেন, সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অক্ষয়কুমার বাতিটা শীঘ্র জ্বালিলেন, আমরা দেখিলাম, যুবকের আপাদমস্তক বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে সে ব্যাকুলভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "বাপু হে, তুমি হও কে—আর এত রাত্রে এখানে কেন?"

যুবক অতি কষ্টে কতকটা আত্মসংযম করিয়া ও হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আপনারা পুলিসের লোক। আপনারা মনে করিয়াছেন যে, কালু বিশ্বাসের খুনে আমি জড়িত আছি; ইহা মনে করিবেন না—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা পরে দেখা যাইবে—এখন বল দেখি, তোমার নামটি কি।"

"সুধীরচন্দ্র সাহা।"

"কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছিলে?"

"আমি বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি কি?"

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এখানে নাই।"

"তবে আমি কি জন্য আপনাদের বলিব?"

"এখন না বল, বিচারের সময়ে তাহার ফল দেখিতে পাইবে।"

"আমি বলিতেছি,—সত্য কথা বলিব না কেন? আপনারা বেলেঘাটার গদিয়ান হরগোবিন্দ বীরগোবিন্দের নাম শুনিয়াছেন কি?"

"না হে বাপু—কে তারা?"

"তাহাদের বেলেঘাটায় সব চেয়ে বড় চাউলের গদি ও আড়ৎ ছিল, তাহারা ফেল হইয়া যান, সঙ্গে সঙ্গে বীরগোবিন্দ সাহা নিরুদ্দেশ হন। এই বীরগোবিন্দ সাহা আমার পিতা।"

যাহা হউক, এতক্ষণ পরে আমরা এ রহস্যের কতক ভিতরে প্রবেশ করিতেছি, কিন্তু বীরগোবিন্দ সাহার নিরুদ্দেশ ও কালু মাঝির খুনের সহিত যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

যুবক বলিতে লাগিল, "তখন আমার বয়স ১০।১২ বৎসর মাত্র। সব কথা আমি শুনিতে পাই নাই; তবে সে সময়ে সকলেই বলিয়াছিল যে, আমার পিতা আড়তের সমস্ত নগদ টাকা আর কোম্পানীর কাগজ লইয়া পালান,

একথা ঠিক নয়, সে সময় মা আমায় লইয়া কলিকাতায় থাকিতেন। যে রাত্রে তিনি চলিয়া যান, সে রাত্রের কথা ঠিক আমার মনে আছে, তিনি যে নোট ও কোম্পানি কাগজ সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত নম্বর একখানা নোটবইয়ে লিখিয়া রাখিয়া যান, বলিয়া যান যে, তিনি বরিশালে চলিলেন, সেখানে ঢের টাকা পাওনা আছে, তিনি সেই টাকা আদায় করিয়া আনিয়া সমস্ত দেনা শোধ দিবেন। সেই যে রাত্রে তিনি নৌকা করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই পর্য্যন্ত আর আমরা তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই; তাহাই ভাবিয়াছিলাম যে, বাবা নিশ্চয়ই নৌকাডুবী হইয়া মারা গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়ের কাছে সংবাদ পাইলাম যে, বাবা যে সব নোট সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, তাহার কতকগুলি কলিকাতায় কে ভাঙ্গাইয়াছে। সেইদিন হইতে কে এই নোট ভাঙ্গাইয়াছে, আমি সব কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনেক পরিশ্রমের পর জানিতে পারিলাম যে, কালু বিশ্বাস এই সকল নোট ভাঙ্গাইয়াছে।

"অনুসন্ধানে আরও জানিলাম যে, সে সুন্দরবনের কাঠের নৌকায় সে মাঝি ছিল; আমি ভাবিলাম, হয় ত বাবার নৌকার সহিত এই কালু মাঝির নৌকার দেখা হইয়াছিল, হয় ত বাবার নৌকা ঝড়ে ডুবিয়া যাওয়ায় কালু মাঝি কলিকাতায় ফিরিবার মুখে তাহার নোটের ব্যাগ জলে ভাসিতেছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়াছিল। যাহাই হউক, আমার বাবার সন্ধান সে কিছু-না-কিছু দিতে পারিবে ভাবিয়া, আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসি, কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, সে খুন হইয়াছে। তখন তাহার সঙ্গে দেখা হওয়ার আর আশা নাই জানিয়া মনে করিলাম, হয়তো তাহার নিকট বাবার আরও কোন কাগজপত্র থাকিতে পারে, তাহা হইতে বাবার কি হইয়াছে জানিতে পারিব, তাহাই কাল রাত্রে তাহার ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আজও সেইজন্য আসিয়াছিলাম, তাহার ঘরে কিছু না পাইয়া ফিরিতেছিলাম, এই সময়ে আপনারা আমায় ধরিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তোমার আর কিছু বলিবার নাই?"

"না—যাহা বলিবার সব বলিয়াছি।"

"এ ছাড়া আর কিছু বলিবার নাই?"

যুবক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "না, আর কিছু বলিবার নাই।"

"তুমি কাল রাত্রে এখানে এস নাই ?"

"না, কেন আসিব ?"

অক্ষয়কুমার তাহার সম্মুখে নোটবইখানি ধরিয়া বলিলেন, "বাপুহে, তোমার নাম লেখা বই তাহা হইলে এখানে কিরূপে আসিল ?"

হতভাগ্য যুবক এই কথায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এ বই কোথায় পাইলেন ? আমি মনে করিয়াছিলাম, এখানা আমি পথে কোনখানে হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

অক্ষয়কুমার কর্কশস্বরে বলিলেন, "ইহাই উপস্থিত যথেষ্ট, এ সম্বন্ধে তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে তাহা আদালতে বলিও, এখন থানায় চল।"

তাহার পর তিনি গোবিন্দরামের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে আমি বিশেষ উপকৃত হইলাম। তবে আপনাদের বৃথা কষ্ট দেওয়া হইল, আপনারা না আসিলেও আমি এই বদমাইসকে ধরিতে পারিতাম।"

এই বলিয়া অক্ষয়বাবু তাহার আসামী লইয়া একদিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কিয়দ্দূর আসিয়া গোবিন্দরাম আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার, এখন এ সম্বন্ধে তুমি কি বিবেচনা কর ?"

আমি বলিলাম, "দেখিতেছি, তুমি সন্তুষ্ট হও নাই।"

"না ডাক্তার, আমি সন্তুষ্ট হইব না কেন ? তবে অক্ষয়বাবু যত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তত আমি হই নাই। এসব অনুসন্ধানে হাতে একটা রাখিয়া কাজ করা উচিত।"

"কি হাতে রাখা উচিত ছিল ?"

"আমি যেভাবে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, হয়তো তাহাতে কোন কাজ হইত, কাজ যে হইত একথা আমি বলিতে পারি না, তবে এটা স্থির যে আমি সেই প্রথানুসারেই অনুসন্ধান শেষ পর্য্যন্ত করিব।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সোরাব ও রস্তম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমুদিত দিনকর দিক্‌চক্র ভেদি ;
কুঝটিআঁধার ঘন, যুঝি বহুক্ষণ
দিনকরকর সহ, ত্যজিয়াছে তনু ;
আমুর সলিলক্ষেত্রে, সৈকত পুলিনে,
পেতেছে সুখের রাজ্য বিজয়ী কিরণ।
তাতারের সাদিদল শিবির ছাড়িয়া,
বাহিরিছে দলে দলে আয়ত প্রান্তরে ;—
হেমন্তসঙ্গমে যেন সারসের দল,
দীর্ঘগ্রীব, হিমময় অচলপ্রদেশ
পরিহরি, চলিয়াছে সারি সারি সারি
পারস্যের উপকূলে সুখউষ্ণ দেশে !—
রাজার রক্ষকদল, আমুতীর-বাসী,
প্রথমে ; শিরস্ক শিরে, মেষচর্ম্মময় ;
করে, দীর্ঘ শক্তি-অস্ত্র ; বীর মহাকায়,
মহাকায় হয়বরে ;—বোখরানিবাসী।
তুর্কাসৈন্য তা'রপরে ; শূল-অস্ত্র করে ;
লঘুদেহ, লঘুগতি তুরগে আরূঢ় ;
তৃতীয়ে, বিবিধ সাদী, সুদূরনিবাসী,
সবে মহাবলবান্, সুদুর্দ্ধর্ষরণে !—
শ্রেণীরূপে সুসংযত, নদীস্রোত যেন
অবিরাম, বহিতেছে বিস্তৃত প্রান্তরে
যোধদল তাতারের অবিচ্ছেদস্রোতে !
হামান্ সবার নেতা, বীরবীর্য্যবান্,
যুবক, সেনানীগণে দ্বিতীয় বিক্রমে।

হোথায়, প্রান্তরপ্রান্তে, তাতারসমীপে
সজ্জিত পারস্যচমূ ; অশ্বারোহী শ্রেণী ;
জলদপাংশুল যেন, (খোরসোনবাসী,
মনে লয়) সর্ব্ব-অগ্রে ; পশ্চাতে তাহার
পারস্যরাজের সৈন্য—সাদী, পদাতিক ;
সজ্জিত, শাণিতঅসি-ঝলকে বিস্মিত !

হেনকালে উত্তরিলা তাতারসেনানী
পিরান্, দূতের সহ ; তাতারবাহিনী
ভেদিয়া, সবার অগ্রে দণ্ডাইল বীর ;
করে রাজদণ্ড করে শোভার বিস্তার !
পারসীকসেনানী ফেরুড্, নিরখিয়া
পুরোভাগে তাতার সেনানী, সসম্ভ্রমে
সেনামুখে উত্তরিলা আসি। করে শক্তি
সৈন্যশ্রেণী সুসংযত করি, যথাস্থানে
দৃঢ়তর স্থাপিলা বাহিনী। তবে বৃদ্ধ
পিরান্, দণ্ডায়মান সৈকত প্রান্তরে,
নীরব সৈন্যের মাঝে, কহিলা সম্বোধিঃ—
"ফেরুড্ ! তাতার ! শুন, পারসীকগণ !
ইচ্ছা মম, যুদ্ধে আজ নাই প্রয়োজন ;
পারসীকবীরদলে কর নির্ব্বাচন
এক বীরকুলেশ্বরে ; দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেই
যুঝিবে তাতারবীর সোরাবের সনে।"

শ্যামল প্রান্তরে যথা শারদ প্রভাতে
বহি যায় সমীরণ, সুখের লহরে
কাঁপাইয়া শস্যচয়, তুহিনের মালা—
মুক্তমালা—ঝলঝলে বাল-সৌরকরে,
সেরূপ আশার বায়ু বহিল হরষে,
দর্পের তরঙ্গ তুঙ্গ আচাইয়া তুলি,

প্রতিশিরে তাতারের হৃদয়ে হৃদয়ে,
শুনি পিরানের মুখে স্পর্দ্ধা সোরাবের!
সোরাব — তাতারগর্ব্ব! — তাতার-
ভরসা!
তাতারের প্রিয়তম!—তাতারের প্রাণ!
যেমন কাবুলবাসী ব্যবসায়িদল,
অতিক্রমে সারি সারি যবে হিমালয়,—
অভ্রভেদী শৃঙ্গ যার তুষারে মণ্ডিত—
আরোহিয়া গিরিপথ উচ্চ-উচ্চতর,—
বোধ হয় যেন মৃত বিহঙ্গের শ্রেণী
তুষারভূমিতে—লঘুবায়ু, শ্বাসকষ্ট,
তৃষ্ণায় কাতর (নাহি অবসর তিল
নাশিতে সে শোষ দ্রাক্ষারসে), বদ্ধশ্বাস
মহাভয়ে,—হিমরাশি পাছে কক্ষচ্যুত
নিষ্পেষিত করে গিরিপথে নিরায়ত—
সেইরূপ সোরাবের স্পর্দ্ধার বারতা—
গরল জঙ্গম তীব্র—শ্রুতিপথে পশি
পারসীক দেহে, দেহ করিল মলিন,
অর্দ্ধপথে মহাভয় রোধিল নিঃশ্বাস!
পারস্যসেনানী সব মিলিল সত্বর
করিতে মন্ত্রণা তবে ফেরুডের সনে!
কতক্ষণে কহিলেক গুডুর্জ;—
"ফেরুড্!
দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রত্যাখ্যান—লজ্জার নিরয়!
পারসীকদলে কিন্তু নাহি হেন বীর
যুঝে সমকক্ষ যুবা সোরাবের সনে!
সোরাব-বিক্রমে সিংহ, বনমৃগ যথা
লঘুগতি! আর কথা, বিগত রজনী
আইলা রস্তম্ হেথা; ক্রুদ্ধ উদাসীন,
বৈসেন স্বতন্ত্র বার আপন শিবিরে;
অন্বেষণ কর তাঁর, শুনাও তাঁহারে
তাতারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যুবকের নাম;
মনে লয়, ভুলি রোষ আসিবেন পুন,
যুঝিবেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাতারের সনে!
দিলা হেন পরামর্শ গুডুর্জ। ফেরুড্
বিমুক্তকণ্ঠ, উঠি সৈন্যমাঝে, কহিলা —
"আপনার ইচ্ছা যাহা, সেনানী স্থবির,
আমাদেরো সেই মত; সাজুন সোরাব,
যুঝিতে একাকী রণে পারসীক সনে।"
নীরব ফেরুড্। তবে পিরান উইসা
দ্রুতপদে সৈন্যপথে পাশিলা শিবিরে।
হেথায়, চিন্তিত, ভেদি পারসীকগণে,
গুডুর্জ, শিবিরমালা অতিক্রম করি
মহাবেগে, উত্তরিলা রস্তম্‌শিবিরে,
স্থাপিত সৈকতে; রক্তপট-বিরচিত,
শিবির সকল সমুজ্জ্বল তেজোময়;
মধ্য পটবাসে বৈসেন আপনি বীর,
রস্তম্; চৌদিকে রহে অনুচরচয়।
বীরের সে পটবাসে পশিলা গুডুর্জ,
হেরিলা রস্তমে; করি প্রভাতভোজন,
বসিয়া আছেন বীর; তখনো রয়েছে
সম্মুখে ভোজনশেষ—সিদ্ধ মেষমাস,
তরমুজ, গোধূমের পিষ্টক; রস্তম্,
বসি তথা শান্তমন, বসাইয়া শ্যেনে
প্রকোষ্ঠে, ক্রীড়ায় মত্ত বিহঙ্গের সনে;
হেনকালে দাণ্ডাইলা সম্মুখে গুডুর্জ!
সেনানী দণ্ডায়মান নিরখি সম্মুখে,
সসম্ভ্রমে মহোল্লাসে ত্যজিয়া আসন,
উঠিলেন, ছাড়িলেন বিহঙ্গমবরে
বীরবর; পসারিয়া দীর্ঘ করযুগ,

করিলেন সেনানীর সম্মান উচিত !
কহিলেন, "মিত্রলাভ ! এর চেয়ে আর
কি আছে ভাগ্যের কথা ! কহ, কি সংবাদ ?
কিংবা, লহ,শূরশ্রেষ্ঠ,আতিথ্য প্রথমে।"
শিবিরের দ্বারদেশে কহিলা গুডুর্জ,
"রথিবর ! নহে এবে আতিথ্যের কাল ;
আসিবে সে কাল, তাত, কিছুকাল পরে ;
আজ নহে ! আছে আজ কার্য্য গুরুতর!
উভয় দলের সৈন্য সুসজ্জিত এবে
রণবেশে, কিন্তু সবে নিবারিত রণে !
কহিল তাতারগণ, পারসীকদলে
বীর এক, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিযোধরূপে
যুঝিবে তাতারবীরে ; জানেন আপনি
সোরাব তাহার নাম, গূঢ় জন্ম তা'র,
বীরবীর্য্যে আপনার সোসর, রস্তম্ !
সোরাব গমনে মৃগ ! বিক্রমে, কেশরী !
যুবক সে বীরবর বৃদ্ধ ! পারসীক,
অথবা দুর্ব্বল ; চাহি আছে পথ তব
পারসীকগণ উৎসুক, বালক যথা
চাহে পথপানে জননীর, যান যবে
মাতা গৃহমাঝে, আনিতে সুমিষ্ট কিছু
সন্তানের তরে ! শূরবর, কর কৃপা,
সহায়স্বরূপে পারস্যের, সর্ব্বনাশ
ঘটিবে নতুবা ; মজিবে পারস্য আজ !"
নীরব গুডুর্জ। হাসিয়া ঈষৎ হাসি—
করুণার প্রস্রবণ, ক্ষোভের সাগর—
উত্তরিলা বীরবর, ধীরে ধীরে ধীরে
উগারিয়া ক্ষোভরাশি,—"গুডুর্জ,শিবিরে
যাহ চলি ! বৃদ্ধ যদি পারসীকগণ,
আমি বৃদ্ধতর তবে ! যুবক দুর্ব্বল,
বীর ! যদি, অহো ভ্রান্তি পারস্যরাজের !
যুবক পারস্যরাজ, পূজেন যুবকে ;
বৃদ্ধের শরীর মাত্র সমাধির ধূলি ;—
পারে কি সহিতে সমরের মহাশ্বাস ?
রস্তমের শৌর্য্যে তাঁর নাই প্রীতি আর ;
যুবক তাঁহার প্রিয় ; যুবকের বল
চূর্ণিবে সোরাব দর্প, নারিবে রস্তম্ !
যদ্যপি পৃথিবী গায় সোরাবের যশ
কি ক্ষতি আমার ! যদ্যপি হইত পুত্র !
(হায়সে, দুহিতা ! আপনা-রক্ষিতে তা'র
নাহি শক্তিকণা !) কীর্ত্তিমান্, বীর্য্যবান্,
সমরকুশল, যুবক সোরাব যেন,
পারিতাম থাকিতে যদ্যপি পিতা সহ,
(বৃদ্ধ পিতা ; শুভ্র কেশ তুষারের সার !)
রক্ষিতে সহায়রূপে দীন বৃদ্ধকালে,
আফ্‌গানদস্যুর করে, (দুষ্ট দস্যুদল
নিপীড়িত করে মোর প্রাচীন জনকে,
কাড়ি লয় পশুপাল !) ত্যজিতাম তবে
বর্ম্ম চর্ম্ম, রাখিতাম বৃদ্ধ জনকেরে,
কীর্ত্তিপরিখার মোর সুদৃঢ় বেষ্টনে,
জীবনের কয়দিন যাপিতাম সুখে,
ব্যয় করি ধনরাশি ধর্ম্মে উপার্জ্জিত ;
শুনিতাম সোরাবের রণকীর্ত্তি-গাথা ;
না নিতাম অসি আর রক্তরক্ত-করে,
যেতো রসাতলে সৈন্য কৃতঘ্ন রাজার !"
নীরব হইলা বীর ঈষৎ হাসিয়া।
উত্তরিলা সবিস্ময় গুডুর্জ ;—"রস্তম্ !

এ কি কথা! ঘুষিবে কি সংসার অযশ?
সোরাব তাতারবীর, পারসীকগণে
আহ্বানিল প্রতিযোধ, চাহিল বিশেষে
রস্তমে, যাহার কীর্ত্তি ব্যাপিল মেদিনী,
সে রস্তম—সোরাবের যশের নিকষ—
রহিবে ভীরুর মত গৃহকোণে বসি
লুকাইয়া মুখ ভয়ে, পেচকের প্রায়?
কর অবধান, নতুবা রটিবে লোকে—
রস্তম, কৃপণ যথা প্রাচীন, কেবল
উপার্জ্জেন যশোরাশি, যুবকের সনে
যুঝিতে অক্ষম, পাছে অকলঙ্ক যশে,
কলঙ্কের মালিমা লাগে, বৃদ্ধকালে!"

সেনানীর বাক্য শুনি, রস্তমের মনে,
জ্বলিল ক্রোধের বহ্নি, উত্তরিলা বলী;—
"গুডুর্জ! কি হেতু, কহ, কহ হেন ভাষা?
হেন কথা তব মুখে শোভা নাহি পায়!
যুঝিলাম শত শত তুমুল সমরে
জয়শীল; এক যদি ন্যূনাধিক তাহে,
কে করে গণনা তা'র? হউক সে বীর
খ্যাত বা অখ্যাত, শূর কিংবা কাপুরুষ,
যুবক অথবা বৃদ্ধ? নিদাঘে প্রাবৃষে,
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি সাগরে, সরিতে যথা!
আর বলি, ধরাতলে কেবা নহে মর?
আমিও অমর নহি!—নিশ্চয় মরণ
তা'র বা আমার!—অসার মানব কিন্তু
যাহারা, গুডুর্জ! কে যুঝে তা'দের তরে?
তবু দেখাইব তোমা, কেমনে রস্তম্
সঞ্চিয়াছে যশোরাশি!—এক কথা বলি,
যুঝিব অজ্ঞাত, সাজি সামান্য সজ্জায়!
না ঘোষে জগতে যেন,—যুঝিল রস্তম্,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীর্য্যহীন বালকের সনে!

এতেক কহিল বীর; ভ্রুকুটি কুটিল
করিল প্রগাঢ়তর মুখের কালিমা!
গুডুর্জ, ফিরায় মুখ; অতি দ্রুতগতি
তড়িতের গতি যেন জলদমণ্ডলে,
মিলিল স্বগণে ক্ষণে, শঙ্কিত—হর্ষিত;
শঙ্কিত, নিরখি ক্রোধ রস্তমের মুখে;
হরষে ভাসিল, বলী আসিবেন বলি!

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক সাহিত্য।

পাটলীপুত্র।

(কিম্বদন্তী)

অধ্যাপক মহেশ্বরপ্রসাদ প্রাচীন পাটলীপুত্রসম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী লিখিয়াছেন, আমরা "অর্চ্চনা"র পাঠক-পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য তাহার ভাবানুবাদ করিয়া দিলাম।

অতি প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি তপশ্চারণ দ্বারা পাপপ্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কনখাল নামক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু

হইলে তাঁহাদের তিন পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ রাজগৃহে গমন করেন। পুত্রত্রয় অতীব দরিদ্র ছিলেন; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাদিগকে নানাস্থান পর্যটন করিতে হইত। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী চিঙ্কিনী নামক নগরে সমুপস্থিত হইলেন। এই নগরে ভোজিক নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তিন ভ্রাতা একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজিকের তিনটি কন্যা ছিল; তিনি ভ্রাতৃত্রয়কে বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিলেন। বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিবেন বলিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে চিঙ্কিনী নগরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনশনক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তিন ভ্রাতা স্ব স্ব পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। অসহায়া ভগিনীত্রয় তাঁহাদের পিতৃবন্ধু যজ্ঞদত্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এখানে দ্বিতীয় ভগিনী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ভগিনীত্রয়ের সমুদয় স্নেহ-বাৎসল্য এই নবপ্রসূত পুত্ররত্নের উপর কেন্দ্রীভূত হইল। তাঁহারা পুত্রটির নাম রাখিলেন পুত্রক। এই পুত্রক হইতেই তাঁহাদের ভাগ্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। অতি অল্পকালের মধ্যেই পুত্রক অপরিমিত ধনশালী হইয়া উঠেন এবং রাজোপাধি গ্রহণ করেন। যজ্ঞদত্তের পরামর্শানুসারে এই নবনৃপতি ব্রাহ্মণমাত্রকেই অপরিমিত ধনদান করিতে লাগিলেন,—উদ্দেশ্য ধনপ্রাপ্তির আশায় যদি তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যগণ এখানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। অতি সত্বরেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল—তিনি পিতা ও পিতৃব্যগণের সন্দর্শনলাভ করিলেন।

পুত্রকের এই ধনসম্পদ্ দেখিয়া তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যগণ তাঁহার উপর অতীব ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং কিরূপে পুত্রককে বধ করিয়া এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায় উদ্ভাবিত হইল। এই উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা পুত্রককে বলিলেন, "চল বৎস! বিন্ধ্যাচলে ভগবতীর আরাধনা করিতে গমন করি।" পুত্রকও দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। বিন্ধ্যাচলে পুত্রকের প্রাণবধার্থ কয়েকজন হত্যাকারী পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত ছিল,—তাহারা পুত্রকের জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে তিনি স্বীয় গাত্রের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাময় আভরণ তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন; ঘাতকেরা রত্ন পাইয়া তাঁহাকে বধ করিল না। পুত্রক এই ঘটনায় বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কৃতঘ্নগণের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। যখন পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণ কৃত্রিম শোকপ্রকাশ করিতে করিতে পুত্রকের নিধনবার্ত্তা লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজার অনুপস্থিতিহেতু অমাত্যবর্গ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণকে দেখিবামাত্রই তাহাদের প্রাণবধ করিল এবং এই ব্যক্তিশূন্য রাজ্য আপনাদের করতলায়ত্ত করিয়া লইল।

এদিকে পুত্রকও বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্যবশতঃ একজোড়া চন্দনকাষ্ঠের পাদুকা প্রাপ্ত হইলেন। এই কাষ্ঠ পাদুকার অপূর্ব্ব গুণ—ইহা পায়ে দিলে যথেচ্ছা গমন করিতে পারা যায়। পুত্রক ইহার সাহায্যে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে আকর্ষিকা নাম্নী নগরীতে অবতরণ করিলেন। এই নগরীর অধিপতির পাটলী নামে এক কন্যা ছিল। কন্যাটির অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনিয়া পুত্রক রাজদুহিতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কাষ্ঠপাদুকার সহায়তায় প্রহরীবেষ্টিত রাজান্তঃপুরে পুত্রক গোপনে সেই রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল; গোপনে তাঁহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে পুত্রক রাজকন্যাকে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইলেন এবং বহুদূর অতিক্রম করিবার পর তাঁহারা জাহ্নবীকূলে এক পরম রমণীয় স্থান দেখিতে পাইয়া সেখানে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা এই স্থানে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে পাটলী ও পুত্রকের নামানুসারে এই নগর পাটলীপুত্র নামে অভিহিত হইল।

অপর একটি কিম্বদন্তী এইরূপ। রাজগৃহের অধিপতি সুদর্শন এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা সুদর্শনের এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম পাটলী। কন্যাটি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষচিত্তে বাস করিতেন। রাজা স্বীয় কন্যার চিত্ত হইতে এই বিমর্ষতা দূর করিবার জন্য গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটি মনোহর নগর সংস্থাপন করেন। নৃপতি সুদর্শনের কন্যা পাটলীর নামানুসারে এই নব-নির্ম্মিত নগরের নাম পাটলী-পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

বায়ুপুরাণে কথিত আছে, অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয়াশ্ব পাটলীপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। অজাতশত্রু গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ অজাতশত্রু খৃষ্ট জন্মের ৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তিনি তদীয় অমাত্যদ্বয় সুনিথ ও ভাষাকরের পরামর্শক্রমে পাটলী নগরীতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এরূপ প্রবাদ যে বুদ্ধদেব নালন্দা হইতে বৈশালীতে আসিবার সময় পথিমধ্যে পাটলী-দুর্গ দেখিয়া বলেন—"এই স্থান উত্তরকালে অতীব প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হইবে। যাবতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য স্থানের মধ্যে ইহা অগ্রগণ্য হইবে। কিন্তু এই তিনটি উপদ্রব ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে,—অগ্নি, জলপ্লাবন এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি।" বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী তিব্বতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে ও মহানির্ব্বাণ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃই প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরী যে অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্য স্থান ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেব বলেন,—যে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া উদয়াশ্বের রাজত্ব সময়ের শেষভাগে উহা শেষ হয়। নগর-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইতে ৬০ বৎসর লাগিয়াছিল।

বৌদ্ধ নীতি সুধা।*

একজন দেবতা মহামতি গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সুখলাভ করিবার পক্ষে নানা দেব ও নানা লোক বিভিন্ন বিষয়কে মঙ্গলময় বলিয়াছেন। যাহা প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলময় আপনি আমাদিগকে তাহা শিখাইয়া দিন।

ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—

(১) মূঢ়জনের পূজা করিওনা, বিজ্ঞজনের দাস হইও, যাহারা সম্মানের যোগ্য তাহাদিগকে সম্মান করিও, তাহা হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল পাইবে।

(২) মনোজ্ঞ স্থানেতে বাস, পূর্ব্বজন্মের ইষ্ট কাজ, হৃদয়ের শুভ বাসনা প্রকৃত মঙ্গল-বিধায়ক।

(৩) মহৎ অন্তর্দৃষ্টি এবং শিক্ষা, আত্মপ্রসাদ এবং মনোজ্ঞ ভাষা অভ্যাস করিবে আর কথা কহিলেই সুকথা বলিবে—তাহা হইলেই মঙ্গল পাইবে।

(৪) পিতামাতার ভরণপোষণ করিবে, স্ত্রী ও সন্ততিকে পালন করিবে, শান্তিময় বৃত্তি অবলম্বন করিবে—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশীষ।

(৫) দান করিবে ও পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিবে, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করিবে, যে কার্য্য নিন্দনীয় নহে তাহা করিবে—ইহাই সর্ব্বাধিক আশীষ।

(৬) পাপকে ঘৃণা করিবে ও পাপ হইতে বিরত হইবে, পানাসক্তি থাকিবে না, হিতকার্য্যে ক্লান্তিবোধ করিবে না—ইহাই সর্ব্বাধিক আশীষ।

(৭) ভক্তি ও নম্রতা, সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা, উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইষ্টজনক।

(৮) খুব সহ্য করিবে এবং নম্র হইবে, ধীর ব্যক্তিদিগের সহিত বসবাস করিবে, যথাসময়ে ধর্ম্মকথা কহিবে তাহা হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা আশীষ প্রাপ্ত হইবে।

(৯) আত্মসংযম ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্যের জ্ঞান, নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশীর্ব্বাদ।

(১০) পরিবর্ত্তনশীল জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে মন যেন বিচলিত না হয়, শোক বা কামাদি বর্জ্জন কর—তাহা হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশীর্ব্বাদ পাইবে।

(১১) যাহারা এইরূপ ভাবে কার্য্য করে তাহারা সকলদিকে অজেয়, তাহারা প্রত্যেক পথে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারে—জীবনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশীর্ব্বাদ।

অন্যান্য স্থলে নানা গ্রন্থে বৌদ্ধ নীতি কথা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে অনেক নীতিকথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা তাহার কতকগুলি অনুদিত করিয়া দিলাম।

---

* শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, এম্ আর এ, এস কর্ত্তৃক Buddha, His Life, His Teaching, His order নামক অমূল্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের সৌরভ বা বর্ণ নষ্ট না করিয়া কেবল মধু আহরণ করিয়া উড়িয়া পলায়, যে ব্যক্তি জ্ঞানী সে এইরূপে পৃথিবীতে বাস করুক।

এক ব্যক্তি যুদ্ধে সহস্র যোদ্ধাকে জয় করিতে পারে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিতে পারে সেই সর্ব্বাপেক্ষা বিজয়ী।

মন কেবল উড়িয়া বেড়ায়, যথা ইচ্ছা ছুটিয়া যায়, ইহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত। মনকে বশীভূত করাই শ্রেয়। কারণ বশীভূত মন হইতেই আনন্দ উৎপন্ন হয়।

জগতে ঘৃণার দ্বারা কখনও ঘৃণা বন্ধ করা যায় না। প্রেমের দ্বারাই ঘৃণা বন্ধ করা যাইতে পারে।

মনুষ্য দয়ার দ্বারা ক্রোধকে জয় করুক, হিতের দ্বারা অহিত জয় করুক। কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করুক।

জন্মের দ্বারা কেহ ইতর জাতীয় হয় না, জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কেবল তাহার নিজের কার্য্য দ্বারাই লোকে ইতর জাতীয় হয়, কার্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়।

বাস্তবিক কেবল যে মাংসাহারের দ্বারা মানুষ অপবিত্র হয় তাহা নহে। ক্রোধ, সুরাপান, একগুঁয়েমি, গোড়ামি, প্রবঞ্চনা, হিংসা, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, কুশিক্ষা দিলে কুকথা কহিলে মানুষ অপবিত্র হয়।

মৎস্য মাংসাহার হইতে বিরত হইলে, নগ্নদেহে ভ্রমণ করিলে, মুণ্ডিত মস্তক হইলে বা শিরে জটাধারণ করিলে, মোটা কাপড় পরিলে বা অগ্নিতে যাগ করিলেই মানুষ শুদ্ধ হয় না বা মায়া কাটাইতে পারে না।

সে আমাকে গালি দিয়াছিল, সে আমায় প্রহার করিয়াছিল, সে আমার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিল—যাহারা মনে এ সকল কথা স্মরণ করে তাহারা ক্রোধ জয় করিতে পারে না। ক্রোধের দ্বারা কখনও ক্রোধের উপশম হয় না, নম্রতার দ্বারা হয়। প্রাচীনদিগের ইহাই মত।

মানুষ চিন্তা করে না যে আমরা শীঘ্র মরিব। যদি কেহ এইরূপ চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার বিপদ শীঘ্রই মিটিয়া যায়।

যেমন উত্তমরূপে চাল ছাওয়া না থাকিলে গৃহে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে তেমনি যে মন চিন্তা দ্বারা আবৃত না থাকে সে মনকে কাম সম্পূর্ণরূপে জয় করে, যেমন ভালরূপে আবৃত গৃহে জল প্রবেশ করিতে পারে না তেমনি চিন্তাশীল মনকে কাম জয় করিতে পারে না।

পাপ দশ প্রকারের;—

(ক) তিনটি দেহের যথা—

(১) জীবহিংসা করা। (২) যাহা দান করা হয় নাই তাহা গ্রহণ করা।
(৩) পরদাররত হওয়া।

(খ) বাক্যের চারিটি যথা—

(১) মিথ্যা বলা। (২) পরনিন্দা করা।
(৩) অপরকে গালি দেওয়া। (৪) গর্ব্বিত কথা বলা।

(গ) মনের তিনটি—

(১) লোভ। (২) হিংসা। (৩) অবিশ্বাস।

যদি।

১

আমি যদি হ'তাম ভূপতি,
তুমি হ'তে দুখিনী রমণী ;—
দাঁড়ালে আমার দ্বারে,
দিতাম যে একেবারে,
তোমার চরণতলে সমস্ত ধরণী !

২

আমি যদি হ'তাম দেবতা,
তুমি, নারী, কেঁদে একবার
চাহিলে আকাশ-পানে !
আমি যে বিহ্বল প্রাণে
পড়িতাম স্বর্গ হ'তে চরণে তোমার !

৩

তুমি যদি হইতে পুরুষ,
আমি যদি হইতাম নারী !
দেখিলে ও ম্লান মুখ,
শতধা হইত বুক,
শতকণ্ঠে বলিতাম,—'আমি যে তোমারি !'

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চার্ব্বাকে ব্রাহ্মণ।*

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তিনিই যে ব্রাহ্মণ, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। অতএব ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ বর্ত্তমান থাকা উচিত ও সম্ভব

---

* ১৩১৬ সনের ফাল্গুন সংখ্যার অর্চ্চনায় "চার্ব্বাক দর্শন" পাঠে লিখিত হইল। লেখক।

তাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, জগতের আদি কারণ যাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যাঁহার হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণকে চার্ব্বাক সম্প্রদায় যে কেন গালি পাড়িলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। আবহমানকাল যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতীয় অপর হিন্দু জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাক বলিলেন "অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং অনুতাপের সমস্ত ধূলা ভস্ম, বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বহীন ব্রাহ্মণের জীবন ধারণ করিবার পন্থা মিলাইয়া দিবার উপায় মাত্র অর্থাৎ এই সকলের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে।" কি ভয়ঙ্কর কথা! ব্রাহ্মণ 'মনুষ্যত্বহীন' এবং "স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের" জন্য অপর সকল হিন্দুকে কি তবে ইহারা অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শুনিও না। ব্রাহ্মণের নিন্দা শ্রবণেও পাপ, আইস, আমরা যাহা বলি তাহাই কর, তোমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছি।"

একদিন ছিল যেদিন চার্ব্বাকের কথা সকলেই ঘৃণার ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। একদিন ছিল যেদিন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব সদর্পে বলিয়াছিলেন, "স্বাধীন চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। নীচজাতির যাহাতে স্বাধীন চিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একেবারে গ্রন্থাদি পাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন চিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আনিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারও একপদ যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।"

ঘটিয়াছিলও তাহাই। পুরাণ প্রভৃতি পাঠ কর, দেখিবে ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণ গুরু অর্থাৎ কর্ণধার! ব্রাহ্মণ উঠিতে বলিলে রাজা কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত উঠেন, আবার ব্রাহ্মণের ইঙ্গিতে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া মহারাজ কর্ণকে বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ—ক্ষুধার্ত্ত! এ ক্ষুধার শান্তি অন্য ভোজ্য বস্তুতে হইবে না? তুমি দাতা, তুমি বীর, সেই জন্য

সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হইয়াছ! আমি অতিথি তদুপরি ব্রাহ্মণ. আজ আমার ক্ষুধা শান্ত কর! তুমি স্বয়ং তোমার পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসে আমাকে পরিতৃপ্ত কর!” কর্ণ তখন জানিতেন না, যে ভগবান তাঁহাকে ব্রাহ্মণ রূপে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; তিনি এই মাত্র জানিতেন যে ইনি অতিথি এবং তদুপরি ব্রাহ্মণ! কর্ণ পুত্র হত্যা করিয়া সেই মাংসে ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিলেন! সকলেই স্তম্ভিত হইল! মহারাজ ব্রাহ্মণ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বীয় পুত্রকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিলেন। তিনি কোন অধিকার-মদে যে পুত্র হত্যা করিতে পারেন. আপনার দান-শীলতার পরিচয় দিয়া কোন স্বর্গ লাভের আশায় যে এমন পশুবৎ কর্ম্ম করিতে পারেন, এসকল বিষয়ের আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। আমরা শুধু ইহাই দেখাইব যে, ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎকালীন প্রায় সকল গ্রন্থেই এইরূপ উৎকট দৃষ্টান্তের বাহুল্য ঘটিয়াছে। এমন কি, কালি-দাসের কাব্যেও মহারাজ দীলিপকে ব্রাহ্মণ আদেশে পুত্রার্থে গরু চরাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল!

এই সকল ব্রাহ্মণের অত্যাচার দেখিয়াই চার্ব্বাক সম্প্রদায় যে সাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহা অমূলক হইতেই পারে না। কিন্তু কালপ্রভাবে চার্ব্বাকশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহা প্রতিভা হইতে উৎপন্ন, সত্যের উপর যাহার ভিত্তি তাহার কদাপি মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই। ‘ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে চার্ব্বাক সম্প্রদায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার উপর কাহারও আস্থা থাক বা না থাক এখন প্রায় সকলেই যে সেই মতাবলম্বী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে যে ভারতীয় হিন্দুর এই দুর্দ্দশা ইহা “সামান্য জ্ঞানযুক্ত হিন্দু বালকে”ও বলিবে। হায় ব্রাহ্মণ! বিষদন্ত হীন হইয়াও মানবের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার প্রথম ও প্রধান সোপান সত্য। সেই সত্য হইতে আনন্দ ও সুখের অভ্যুদয়। সত্য মানবকে মহীয়ান করে, আলোকে উপনীত করে, মনুষ্য বৃত্তি সমুদয় পবিত্রীকৃত করে। এই মহাসত্য-নির্ণয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। সেই সত্য-অনুসন্ধিৎসু পথিককে বাধা বিঘ্ন দ্বারা হতশ্বাস করিও না! তাহার সে উন্নত বৃত্তি অকালে উন্মূলিত করিও না! তাহার উন্নতির পথ, সত্য অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া

আপনার হীন প্রাণের পরিচয় দিও না! জগতের সাহিত্যে, জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাহাকে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। সাহিত্য ব্যক্তি বা জাতিসম্প্রদায় বিশেষের জন্য হয় নাই। যাহা জ্ঞানপূর্ণ, যাহা উন্নত, যাহা সত্য তাহার উপর দাবী করিবার অধিকার সমগ্র মানব জাতিরই আছে। যাহা সত্য তাহা শুদ্ধ। সেই সত্য, সেই জ্ঞান সমগ্র জগতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই জ্ঞান ভাণ্ডার দর্শনে বা শ্রবণে কখনই কলুষিত হয় না। যাহার সংস্পর্শে হীন প্রাণ উন্নত হয়, যাহার অধ্যয়ন ফলে মানসিক তমোরাশি দূর হইয়া যায়, যাহার আলোচনায় অনন্ত সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দ, তাহা কদাপি বিকার প্রাপ্ত হয় না! সেই বেদ বেদান্ত কেবল মাত্র উপবীতধারীর জন্য রচিত হয় নাই। কণ্ঠের উপবীত যাহাদের চরণমূলে শৃঙ্খল রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, যাহাদের হৃদয় কন্দর ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পুরীষ পরিপূরিত, যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের ক্রীতদাস, যাহাদের সত্য ও ধর্ম্ম কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদের নিমিত্ত বেদ বেদান্ত রচিত হয় নাই। যাহারা সেই পরম সত্যের আলোক অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুল তাহারাই বেদ পাঠের অধিকারী, তাহারাই ব্রাহ্মণ।

আর তোমরা অন্ধকারের অন্ধকীট! আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র সংসারকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করিয়া জ্ঞানালোক হইতে দূরে রাখিয়াছ। যাহারা অন্ধভাবে তোমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যুর পর উৎকোচ স্বরূপ স্বর্গলাভের আশ্বাস দিতেছ; আর যাহারা সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তোমাদের হীন কথায় কর্ণপাত করে না, তাহাদিগের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেছ! এই সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির মধ্যে এক মাত্র ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান উপবীতধারী ব্রাহ্মণই কি অপর সকলের অদৃষ্টে স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা দান করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? এবং ইঁহাদেরই উপর সেই ভার অর্পণ করিয়া কি ভগবান সুখে নিদ্রিত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন? এই বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণই কি বিধাতার প্রেরিত পুরুষ? ইউরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় মনুষ্যই ম্লেচ্ছ; অধিক কি হার্ব্বার্ট স্পেন্সর অথবা মিল্ অথবা কমটে (Comte) অবধি যদি বেদ বেদান্ত শ্রবণ করেন, তবে তাঁহাদেরও কর্ণে তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিবার জন্য এই আজিকার নিরক্ষর, স্বার্থান্ধ, ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জীব তৎপর হইয়া রহিয়াছে।

বর্ণের গুরু হইবার শক্তি অর্জ্জন কর, আপনাকে মনুষ্যত্বের আদর্শে লইয়া যাও—গুরুগিরির জন্য লালায়িত হইতে হইবে না! সত্য কথা—কঠিন কথা! চার্ব্বাকের কথা রূঢ় ঠেকিতে পারে; কিন্তু সংযত হইয়া বিচার করিয়া দেখিও—চার্ব্বাক সত্যবাদী।*

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

বিচিত্র পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জিব্রলটারে মিস্ সণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে আমি এক নূতন উত্তেজনার মধ্যে পতিত হইলাম। আমি পূর্ব্বে যেমন জাহাজের মধ্যে একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম, এখন তেমনি সকল দর্শকের দর্শনীয় (observed of all observers) হইয়া উঠিলাম। মিস্ সণ্ট আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সেই সঙ্গী দুইজনও মুখে আমার প্রতি বন্ধুত্বের ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে আমি স্পষ্টভাবে একটি বিদ্বেষের ভাব দেখিতে পাইতাম। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ভারতবর্ষের সিবিলিয়ান। বুঝিলাম তিনি গভীর ভাবে মিস্ সণ্টের প্রেমে পতিত হইয়াছেন। অপর ব্যক্তিও তাঁহার সহিত এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন দেখিয়া অনুমান করিলাম যে রমণী কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই। সার্লির গুপ্তচর টমাস আমায় বলিত যে রমণী অতি কুটিলা। সে চাতুরী-জাল বিস্তার করিয়া যুবক দুইটীর নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিতেছে। মিস্ সণ্ট ঐ ভদ্রলোক দুইটীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার অষ্ট্রেলিয়াস্থিত ভ্রাতার পরম বন্ধু। এতদিন তিনি তাহা জানিতেন না। আমার সহিত পরিচয় হওয়ায় একথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। যদি ইহা বলিয়া তিনি আমার সহিত সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে কোনও কথাই থাকিত না। তিনি প্রায়ই আমার সহিত

---

* বলা বাহুল্য, লেখকের মতামত তাঁহার নিজস্ব। আমাদের বক্তব্য পরে বলিব। —সম্পাদক।

কথোপকথন করিতেন, গোপনে আমাকে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং যাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তুমি যুবা পুরুষ—এ সকলের ফলে ঐ ভদ্রলোক দুইটি আমাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা কল্পনা করিতে পারিবে।

আমরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। বোম্বাই বন্দরে ঐ ভদ্রলোক সহযাত্রী দুইটির নামিয়া যাইবার কথা ছিল। তাহারা উভয়ে মিস্ সণ্টকে ভারতবর্ষে নামিবার জন্য বোধ হয় বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিল। মিস্ সণ্ট আমার নিকট আসিয়া ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি একেবারেই অষ্ট্রেলিয়া যাবেন ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ যতদূর সম্ভব। এ জাহাজ তো একেবারে অষ্ট্রেলিয়া যাইবে না। কলম্বোতে জাহাজ বদলাইয়া একেবারেই অষ্ট্রেলিয়া যাইব।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ফ্লোরা বলিলেন—কেন ভারতবর্ষ দেখিয়া যাইবেন না ? একটা প্রাচ্য সভ্যতার আদিম স্থল দেখিবেন, সেখানকার রীতি নীতি আচার পদ্ধতি আমাদিগের রীতি, নীতি, পদ্ধতি অপেক্ষা কত বিভিন্ন।

আমি বলিলাম—মিস সণ্ট আপনি তো জানেন আমার পক্ষে ইংলণ্ড হইতে যত অধিক দূরে যাইতে পারিব ততই মঙ্গল। আর বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া শীঘ্র একটা জীবিকার উপায় করিয়া লইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মিস সণ্ট একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—অবশ্য আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে চাহিনা। বুঝিতেছি আপনি অর্থের কথা ভাবিতেছেন। ভারতবর্ষে আপনার যাহা কিছু ব্যয় হইবে আমি তাহা আপনাকে ধার দিব এখন। তাহার পর যদি আমার সহিত অষ্ট্রেলিয়ায় যান আমি পিতার দ্বারা আপনার কাজ কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিব, এ আশা আছে। আমার অনুরোধ মিঃ সালি আমার সহিত একত্র ভ্রমণ করুন।

অপরের অসাক্ষাতে মিস সণ্ট আমাকে প্রকৃত নামে অভিহিত করিতেন। সাধারণের সম্মুখে তিনি আমাকে গ্রীভস বলিয়া ডাকিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সহিত একত্র যাত্রা করিবার সম্বন্ধে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার এই সুন্দর শ্রী আমোদপ্রিয় যুবতীর উপর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। আমি স্বদেশে সে শ্রেণীর বিলাসপ্রিয় রমণীকুলকে বিশেষরূপে চিনিতাম। কথায় কথায় তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়, এ জ্ঞান আমার বিলক্ষণ ছিল। যে দুইটি ভদ্রলোক সর্ব্বদা তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাইবার জন্য পরস্পর

পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল. আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে একজনের সহিত নিশ্চয়ই ফ্লোরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। এ সকল কারণ ব্যতীত রমণীকে ভারতবর্ষে নামাইয়া দিবার আমার একটী বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লিখিতে লজ্জা করে আমি সেই টমাস নামক ব্যক্তির সহিত এক নীচ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। টমাস বলিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঐ রমণীকে কোনও প্রকারে নিগৃহীত করা। রমণী যে সার্লিকে ছুরি মারিয়াছিল এ কথা সে জগত সমক্ষে জানাইতে চাহে না। অথচ অত বড় একটা গর্হিত কার্য্য করিবার জন্য রমণী যাহাতে কোনরূপ শাস্তি পায় সেই উদ্দেশ্যে সে তাহার অনুসরণ করিতেছিল। সে যখন আমাকে মিস সন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত তখন আমি তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইতাম। কিন্তু ফ্লোরার সেই সরল মধুর প্রকৃতির প্রভাবে, তাহার সেই শিষ্টাচার পূর্ণ ব্যবহারে আমার হৃদয়স্থিত বিদ্বেষ বহ্নিটুকু ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। যে পরিমাণে আমার হৃদয়ে ফ্লোরার প্রতি সদ্ভাব জন্মিতেছিল ঠিক সেই পরিমাণে টমাসের প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব আমার মনোমধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি যে সার্লিকে মারিয়াছি এ মিথ্যা কথাটা ইংলণ্ডের বাহিরে কেবল সেই টমাস জানিত। আমি ভাবিলাম মিস সন্টের সহিত নিশ্চয়ই টমাস ভারতবর্ষে বেড়াইবে। আমি সেই অবসরে নূতন স্থলে গিয়া নূতন জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিব। ফ্লোরার সঙ্গে থাকিলে হয়ত তাহার পিতার সাহায্য পাইতে পারিতাম কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে টমাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব ইহা অধিক মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া মনে করিলাম।

আমাকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া ফ্লোরা বলিল—আপনি কি মনে করিতেছেন বলিতে পারি না; কিন্তু আপনি আমার ভারতবর্ষ ভ্রমণের সাথী হইলে যে আমি বিশেষ সুখী হইব তাহা বোধ হয় আপনাকে বলিতে হইবে না।

আমি মিস সন্টের মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার সেই গভীর নীলচক্ষে একটা কাতর অনুরোধের ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল।

আমি বলিলাম—মিস সন্ট, ক্ষমা করিবেন। বোধ হয় ভারতবর্ষেই আপনার বিবাহ হইবে, তখন তো আমাকে একেলা—

মিস সন্ট আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন—মিঃ সার্লি হয়ত তাহাই হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও আপনাকে অষ্ট্রেলিয়ায় পিতার নিকট রাখিয়া আসিয়া তবে নিজের কথা ভাবিব। ভারতবর্ষে বিবাহ করিলেও এ যাত্রায় করিব না।

বলা বাহুল্য, একথায় রমণীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমার একবার ইচ্ছা হইল যে টমাস সম্বন্ধে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না। অথচ তাহার অনুরোধে স্বীকৃতও হইলাম না। তাঁহাকে বলিলাম—এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া পরে বলিব। যুবতী একটু বিমর্ষ ভাবে চলিয়া গেল।

তাহার পরেই টমাস আমাকে ধরিল। আমি কাজ আছে বলিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে ছাড়িল না। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিয়া সে আমাকে তাহার প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল।

বেশ সাবধানতার সহিত দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে বলিল—ভারতবর্ষে নামিবে ?

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—বোধ হয় নামিব।

টমাস নিঃশব্দে একটি বাক্স হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া নিজের হাতে রাখিয়া বলিল—পড়।

কাগজ পড়িয়া আমার হৃদকম্প হইল। শিলমোহর প্রভৃতি দেখিয়া সে কাগজ খণ্ড প্রকৃত বলিয়া বোধ হইল। পুনঃ পুনঃ পড়িয়া দেখিলাম, সার্লিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গুরুতর আঘাত করার অপরাধে আমার নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট।

আমার প্রথম উত্তেজনাটা কমিয়া গেলে আমি অবজ্ঞার ভাবে তাহাকে বলিলাম—বেশ তার পর ?

একটা বিশ্রী হাসি হাসিয়া টমাস বিজয় গর্ব্বিত ভাবে বলিল—তার পর সত্য কথা বলি শুন। আমি পুলিস কর্ম্মচারী, তোমার নামে ওয়ারেণ্ট জারী করিবার উদ্দেশ্যে আমি ইংলণ্ড ছাড়িয়াছি। কিন্তু আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ। মিঃ সার্লি আমার পরম বন্ধু, তাঁহার কর্ম্মচারী আমাকে সকল কথা বলিয়াছে। সুতরাং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া।

আমি বলিলাম—বেশ।

সে বলিল—আমা অপেক্ষা ভাল রূপে তুমি জান কে সার্লিকে আহত করিয়াছে।

আমি বলিলাম—বেশ, তাহার পর ?

সার্লি বলিল—তাহার পর আমার নিকট অপর একখানি তল্লাসী ওয়ারেণ্ট আছে। আমি ইংরাজ শাসিত যে কোন প্রদেশে ইচ্ছা করিলে এই ওয়ারেণ্ট

জারী করিবার সাহায্য পাইতে পারি। ইহা তোমাদের বংশে বহুদিনের বহুমূল্য সম্পত্তি সার্লি মুকুতার মালা (Shirley Pearl necklace) নামক অপহৃত অলঙ্কারের জন্য। আমি যাহার নিকট এ অপহৃত দ্রব্য পাইব তাহাকে স্থানীয় পুলীশের সাহায্যে গ্রেপ্তার করিতে পারিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই হার আমাদের বংশের একটি বহুমূল্য পদার্থ। সকলেই ইহার কথা শুনিয়াছ। প্রবাদ আছে, রাজ্ঞী এলিজাবেথ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ এডওয়ার্ড সার্লিকে ঐ হার উপহার দিয়াছিলেন। আহত সার্লি অধুনা সেই হারের অধিস্বামী হইলেও উহার জন্য সার্লি নামধারী সকলেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিত। সুতরাং এই হার অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া আমি সেই বিপদের সময়ও মর্ম্মপীড়িত হইলাম।

টমাস আবার সেই সয়তানী হাসি হাসিয়া আমায় বলিল—অবশ্য ইহা অপহৃত হয় নাই। ইহা তোমার হস্তে দিব, তুমি যদি আপনার মান এবং জীবন বাঁচাইতে চাও তাহা হইলে উহা মিস্ সণ্টের বাক্সের মধ্যে কোনরূপে রাখিয়া দিও। আর যদি স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এ কার্য্যে স্বীকৃত না হও তাহা হইলে বোম্বাই বন্দরে নামিয়াই এই ওয়ারেণ্ট জারী করিব এবং সার্লি মতিমালাও তোমার নিকট হইতে বাহির করিব। তখন লোকে বুঝিবে যে এই বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিবার জন্য তুমি তোমার আত্মীয়কে আঘাত করিয়াছ।

তাহার কথা শুনিয়া আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। তাহার ভীষণ সয়তানোচিত কথার প্রত্যুত্তর দিবার কোনও শক্তি আমার ছিল না। আমি ভয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলাম। কি যেন যাদুবলে সেই নারকী লোকটা আমাকে (hypnotise) মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং সে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন পারিবে তো?" আমি যেন স্বপ্ন রাজ্যের অধিবাসীর মত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম।

সার্লি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স হইতে বাহির করিয়া আমাদিগের বংশের মর্য্যাদা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের হস্তে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ প্রদত্ত সেই বহুমূল্য মতির মালা আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সয়তানের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম।

তখন প্রায় মধ্য রাত্রি হইবে। ধীরে ধীরে টমাসের (cabin) প্রকোষ্ঠের দ্বারে গিয়া কান পাতিলাম। একটি ছিদ্র আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সেই ছিদ্র দিয়া দেখিলাম গৃহে আলো জ্বলিতেছে, লোকটা ঘুমাইতেছে, একখানা

সংবাদ পত্র তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। জাহাজের এ অংশ একেবারে নির্জ্জন ছিল, নর্ত্তনশীল আরব সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালা জ্যোৎস্নাকরের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। আমার মনোমধ্যে ও আলোকে আঁধারে—তরঙ্গে জ্যোৎস্নায় এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া চলিতেছিল। শেষে জ্যোৎস্নার জয় হইল, আমি সিদ্ধান্ত করিলাম—নিজের যাহা হয় হইবে। ইংলণ্ডের স্বজাতীয় জুরি যদি আমার মত নিরপরাধকে দোষী সাব্যস্ত করে, না হয় কারাগারে যাইব। কিন্তু এক জন ললনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া আপনার জীবন বাঁচাইয়া চিরকাল বিবেকের কষাঘাত সহ্য করিতে পারিব না। সেই তরঙ্গের উপরে সেই রমণীর সুন্দর মুখখানি ভাসিতেছিল। আমাকে ভারতবর্ষে নামাইবার জন্য তাহার সেই কাতর অনুরোধ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। জিব্রলটারের পাহাড়ের উপরের সেই বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা আমার কানে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ বাণীর মত বাজিতেছিল। আমি কাপড়ের ভিতর হইতে সেই হার বাহির করিলাম। চন্দ্রালোকে মুকুতা গুলা ঝলসিতে লাগিল। এক অকৃতী বংশধরের হস্তে পড়িয়া এই গৌরবমণ্ডিত মুকুতাহারের শেষে ঈদৃশ গতি হইবে ভাবিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলাম। ভাবিলাম নিরপরাধ রমণীর বাক্সের ভিতর ইহা রাখিয়া তাহার অপরাধের মিথ্যা সাক্ষ্য হওয়া অপেক্ষা সিন্ধুর অগাধ জলে প্রত্যাবর্ত্তন করা এ মতিগুলির পক্ষে গৌরবকর। ইহাতে রাজ্ঞী এলিজাবেথের আত্মা ও আমার পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা সন্তুষ্ট হইবে। সার বেডিভিয়ার যেমন আর্থারের এক্সকালিবার নামক খড়্গকে অবশেষে জল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আমিও সেই রূপে আরব সাগরে এই বহুমূল্য মুক্তাহার নিক্ষেপ করিলাম। চন্দ্রিমালোকে মতিগুলা ঝলসিত হইল, শেষে তরঙ্গ রাশি তাহাকে গ্রাস করিল।

হঠাৎ কে যেন আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—নৈশ সজ্জায় সজ্জিত প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি সদৃশ ফ্লোরা। সেই চন্দ্রালোকে তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ফ্লোরা বলিল—বংশের গৌরব গেল, প্রাণে কষ্ট হইল না।

আমি কম্পিতকণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম—তুমি কিরূপে জানিলে? বংশের গৌরব যাক আমি এখন সন্তুষ্ট চিত্তে কারাগারে যাইতে পারিব। তুমি কিরূপে জানিলে?

ফ্লোরা ধীরে ধীরে বলিল—আমি দরজার ছিদ্র দিয়া সমস্ত শুনিয়াছিলাম।

কিন্তু আমার দ্বারা দ্বিতীয় বার তোমার জীবন বিঘ্ন সঙ্কুল হইবে জানিতাম না। ভাবিয়াছিলাম তুমি টমাসের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—সে প্রতিজ্ঞা প্রাণ হইতে করি নাই—

রমণী বলিল—কেন এ বিপত্তি শিরে লইলে ?

আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—ফ্লোরা, মিস সণ্ট আমি কি নির্ম্মল বিবেক লইয়া নির্য্যাতন সহ্য করিব ?

তাহার নীল চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত হইল। আমি ধীরে ধীরে তাহার কোমল অঙ্গুলি গুলি তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলাম।

ফ্লোরা ডেকের দক্ষিণ প্রান্তে চাহিয়া চমকিত ভাবে বলিল—ও কে ?

সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম টমাস সরিয়া গেল। সে কতক্ষণ সে স্থলে ছিল, বুঝিতে পারিলাম না।

(ক্রমশঃ।)

কবি ও সমালোচক।

সংবাদপত্রের সমালোচক সহ গ্রন্থকারের দেখা—
ব্যস্তভাবে কহিছে কবি, বদনে উৎসাহ-রেখা—
'বৎসর গত, সমালোচনার্থ পাঠায়েছি কাব্যগ্রন্থ,
পড়িলেন কি ? পাইলেন তাহে কিছু মৌলিকত্ব ?'
গম্ভীর ভাবে কহিলা critic সজল নয়ন দু'টী—
'গ্রন্থমধ্যে প্রতি spelling, full of originality.'

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

মানসী—ফাল্গুন ১৩১৬। "আগন্তুক" কবিতাটি মধুর হইয়াছে। "নববর্ষে" প্রবন্ধে মানসীর প্রথম বর্ষের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। লেখক একস্থলে লিখিতেছেন—"ছ-মাসের শিশু (অর্থাৎ মানসী) কেবলমাত্র উঁ-আঁ করিতে শিখিয়াছে,—এমন সময় মহীয়ান সাহিত্যের পৃষ্ঠার একটা ঘোর হুহুঙ্কার শুনিয়া অল্পপ্রাণ শিশুটী যে ভাবে চমকাইয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল,তাহাতে সমস্ত সাহিত্য-কানন বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।" সত্যের অনুরোধে লেখকের লেখা উচিত ছিল "কপ্‌চাইতে শিখিয়াই ঠাকুরদাদার সম্পর্ক ধরিয়া বয়োজ্যেষ্ঠকে ইতর ভাষায় গালাগালি দিয়া এক লম্ফে শিশু মানুষ (?) হইবার সহজ উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছিল এমন সময় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বুড়োর দল চালাকীটা বুঝিয়া মানসীর কর্ণমর্দ্দনরূপ মহৌষধি প্রদানে তাহার বাচালতা থামাইয়া দিল।" তাহার পর মানসী কি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে নিজের ঢাক ঢোল বাজাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে কিরূপ গাহিবেন তাহারও আভাস দিয়াছেন। এসবের মধ্যেও বিনয় আছে! যথা "মানসীর অধিকাংশ লেখক নবীন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অল্প, ক্ষমতাও অল্প।" ভাল, এ কথা স্মরণ করিয়া গত বৎসর কার্য্য করিলে মানসী সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বলিতে হইত না। "জীবন পথিক" কবিতা শ্রদ্ধেয়া লেখিকার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। "অর্থনীতি"—এই ধরণের প্রবন্ধের এ সময় একান্ত প্রয়োজন। আমরা এ প্রবন্ধ সুখের সহিত পাঠ করিয়াছি। দেশপূজ্য রবীন্দ্র বাবু "গানে" লিখিয়াছেন—

> কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে
> তাহার পায়ের ধ্বনি খানি।

আমরা কবি নহি "ধ্বনি খানি" কি পদার্থ তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। দুই একটা কবিতা লেখে, কুঞ্চিত কেশ ধারণ করে, সার্টের এক হাতের বোতাম দেয় না এমন একজন যুবক কবিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়া দিল "ধ্বনি খানি" ধ্বনিমাত্র তবে পূর্ব্বছত্রের শেষ অক্ষর "বাণী"র সহিত মিলাইবার জন্য রবি বাবু "খানি" কথার ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। "বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে হিন্দুজাতির আদর্শ" প্রবন্ধটি গবেষণা পূর্ণ হইলেও তেমন সুস্পষ্ট হয় নাই। তবে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়। "আপনার ও পর" প্রহেলিকাময় রচনা। "ডাক্তার" গল্পটী বেশ হইয়াছে। "জ্যোতির্ম্মণ্ডল" চিত্র ও কবিতা। চিত্রের মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র,মাইকেল, অক্ষয় কুমার প্রভৃতি। চিত্র ব্যাখ্যা কবিতায়। লেখক লিখিয়াছেন—

> "মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
> সৌর জগতের সত্য সাহিত্য জগতে, দেখি আজ।'

তাহার পর রাজা রামমোহন অক্ষয়চন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়া লেখক লিখিয়াছেন—

"রবির দক্ষিণে ওই বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি
বামে মধু শুক্র গ্রহ।

তবু ভাল, শেষে লিখিয়াছেন—

"—নিম্নদেশে নীহারিকা-সেতু
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

উল্কা গ্রহ প্রভৃতি বোধ হয় দীনবন্ধু, নবীন, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গিরিশ প্রভৃতি কারণ তাঁহাদের চিত্র এই অদ্ভুত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের নিম্নস্তরে বিরাজিত। তবে সপুচ্ছ ধূমকেতুটি কে? কেহ বলিতেছে মানসীর সম্পাদক, কেহ বলিতেছে লেখক। আমরা বলি বাস্তবিক ধূমকেতু বলিয়া কেহ চিত্রিত হন নাই। সেতুর সহিত মিলাইবার জন্য "ধূমকেতু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মানসীর "রবি"-উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। ব্রাহ্মণে বিষ্ণু উপাসনা করে, "পণ্ডিত" শীতলা পূজা করে, কেহবা মনসা পূজায় সন্তুষ্ট। তবে গরীব বঙ্কিম, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে নিগ্রহ করিবার কারণ কি?

কুশদহ—চৈত্র। "সঙ্গীত"—গানে নূতনত্ব নাই। 'বর্ষশেষে প্রার্থনা'—লেখক প্রার্থনা করিয়াছেন,—"বর্ষশেষে এবং নববর্ষারম্ভে মানব-অন্তরে শুভবুদ্ধির উদয় হউক"—"কেন নাহি মরিলাম"—কবিতা—আমরা বলি—বালাই বাট ষষ্ঠির দাস, তাহা হইলে পাঠককে জ্বালাতন করিত কে? 'শাস্ত্র সঙ্কলন'—বেশ হইতেছে; ব্যাখ্যা আরও বিশদ হইলে ভাল হয়। 'অজ্ঞেয়বাদ' মন্দ নহে। 'কুশদহ'—স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলন। ইহা ক্রমশঃ চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস আছে লেখক এই প্রবন্ধটি শেষ করিয়াই এঁড়েদহ, খড়দহ, পোড়াদহ, ঝিনাদহ এবং সর্ব্বশেষে কালীদহের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন। "ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে লবণ"—লেখক বলেন,—"একটি পাঁইট বোতলে বড় চামচের এক চামচ লবণ দিয়া পরে নির্ম্মল শীতল জলে উহা পূর্ণ কর। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ বোতলস্থ জল এক ছটাক লইয়া তিন ছটাক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান কর। উহার স্বাদ মন্দ হইবে না, ম্যালেরিয়া জ্বরের এমন অমোঘ ঔষধ আর আছে কি না সন্দেহ।" 'হিমালয় ভ্রমণ'—এই নব-জলধরের হিমালয়-ভ্রমণ ক্রমশঃ চলিতেছে; আমরা শেষ অবধি পাঠ করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। "ভগ্ন-তরী" কবিতাটি মন্দ নহে।

মোটের উপর এই নূতন মাসিকখানি সুখপাঠ্য হইতেছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

খুনের দায়ে।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ।
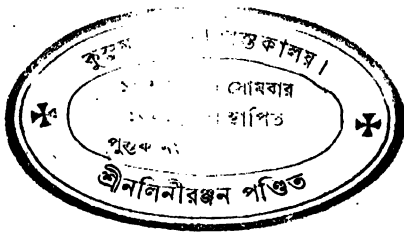
পর দিবস গোবিন্দরাম একখানি পত্র পড়িয়া অত্যন্ত উল্লাসের সহিত বলি-লেন, "ডাক্তার—আমি বলিয়াছিলাম, সব অনুসন্ধানেই একটা কিছু হাতে রাখিয়া কাজ করা ভাল, এ দেখ আমার কথা ফলিতেছে। একখানা পত্রে লেখ দেখি, ' "হারু দাঁড়ী মাঝির সর্দ্দার—বেলেঘাটা—তিনজন সুন্দরবনে কাঠ কাটিবার দাঁড়ী কাল এখানে পাঠাইয়া দিও—গোবিন্দ।" '

"হারু আমার ঐ নামই জানে,—আমি সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে নৌকা লইয়া যাইব, আমার তিনজন দাঁড়ী দরকার, তাহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পাঠাইতে লিখিতেছি।

"আর একখানা পত্র অক্ষয়বাবুকে লেখ, তিনি যেন অবশ্য অবশ্য কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করেন। কয়দিন হইতে এই ব্যাপারটা লইয়া মাথা খারাপ করিতেছিলাম, বোধ হয়, কাল ইহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।"

পরদিন প্রাতে অক্ষয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এত বড় খুনের আসামী ধরিয়াছেন, ইহাতে অক্ষয়কুমার অতিশয় আনন্দিত চিত্ত ছিলেন।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "অক্ষয়বাবু আপনি কি মনে করেন যে, আপনি ঠিক খুনী ধরিয়াছেন?"

"ইহা অপেক্ষা প্রমাণ শুদ্ধ মোকদ্দমা দেখা যায় না।"

"আমার তাহা মনে হয় না।"

"মনে হয় না? আর ইহাপেক্ষা কি অধিক প্রমাণ আপনি চাহেন?"

"আপনি যে প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে কি সকলই প্রমাণ হয়?"

"নয় কেন? চিঙ্গিড়িঘাটায় আসিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হইয়াছে। খুনের রাত্রে সে যে কালু মাঝির সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহার ঘরের মধ্যে তাহার নোট-বইএ পাওয়া গিয়াছে। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে যে, তাহার

পর দুই জনে এই টাকা লইয়া ঝগড়া হয়, তখন সুধীর বল্লমটা ঘরের কোণ হইতে লইয়া কালুকে খুন করে। ইহাপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ আপনি কি চাহেন?"

গোবিন্দরাম মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অক্ষয়বাবু, ইহার ভিতর একটা বড়ই গোল রহিয়া গিয়াছে,—আসল কথা হইতেছে যে, সুধীরের পক্ষে কালুকে এরূপ ভাবে খুন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি কি কখনও এই রকম বল্লম দিয়া কখনও কাহারও দেহ বিদ্ধ করিয়াছেন? না—অসম্ভব, ডাক্তার জানে, আমি একটা মরা ছাগলের গায়ে এই বল্লম কিছুতেই বসাইতে পারি নাই। আর যে এই বল্লম ছুড়িয়াছিল, তাহার গায়ে এত জোর যে, বল্লমটা কালু মাঝির দেহ ভেদ করিয়া আধহাত প্রাচীরে বসিয়া গিয়াছিল! আপনি কি মনে করেন, সুধীরের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ রুগ্নের জীববৎ বালকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব? সেই কি কালুর সঙ্গে রাত্রে দেশী মদ খাইয়াছিল, দুই দিন আগে তাহার ঘরে রাত্রে যে লোক আসিয়াছিল, যাহার কথা একজন বলিয়াছে, তাহার চেহারার সঙ্গে কি সুধীরের চেহারা মিলে? না অক্ষয়বাবু, খুনী সুধীর নহে, খুনী একজন মহা বলবান ব্যক্তি, কোন কেহই নহে, যে এই বল্লম ছুড়িতে সিদ্ধহস্ত, যে বহুবার এই বল্লম বা খোঁচা দিয়া বড় বড় মাছ বিঁধিয়াছে—সুধীর খুন করে নাই।"

গোবিন্দরামের এই কথায় অক্ষয়বাবুর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসিতে ছিল, ক্রমে তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইতেছিল, কিন্তু তিনি তবুও সহজে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন না, তিনি বলিলেন, "সুধীর যে সে রাত্রে কালুর ঘরে গিয়াছিল, তাহা আপনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার নোট-বইই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। যাহাই হ'ক, আমি আমার আসামী গ্রেপ্তার করিয়াছি, আপনার এই মহা বলবান্ লোক কোথায়?"

গোবিন্দরাম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বোধ হয় দরজায়—ডাক্তার পিস্তলটা হাতের কাছে রাখিও, বিশ্বাস নাই।"

এই সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বলিল—"তিন জন লোক গোবিন্দবাবুকে খুঁজিতেছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহাদের এক এক জন করিয়া এইখানে নিয়ে আয়।"

প্রথমে যে আসিল, সে সে মুসলমান। গোবিন্দরাম একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন "তোমার নাম?"

"খোদাবকস্"।

"খোদাবকস, বড় দুঃখিত হইলাম. তুমি আগে এসো নাই—আমার লোক হইয়া গিয়াছে। কষ্ট করিয়া আসিয়াছ, এই টাকাটা লও, ঐ পাশের ঘরে একটু বসো।"

পরে যে আসিল সে হিন্দু—নাম বলে গোবিন্দরাম, তাহাকেও একটা টাকা দিয়া পাশের ঘরে চালান দিলেন।

তাহার পর যে আসিল সে খুব বলবান, খুব বেঁটে, ভয়ানক কালো, অনেক দিন মোল্লার কাজ করিয়াছে, তাহা তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তোমার নাম?"

"নইমদ্দীন।"

"সুন্দরবনে আর কখনও গিয়াছ?"

"অনেক বার।"

"খোঁচায় মাছ ধরিতে পারিবে?"

"খুব।"

"কালই রওনা হইতে পারিবে?"

"হাঁ—পারিব।"

"মাহিনা কত চাও?"

"খাওয়া-দাওয়া ছাড়া পাঁচ টাকা।"

"তোমায় কাজের লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজি হইলাম। সই করিতে জান?"

"না—লিখিতে পড়িতে জানিলে মাঝিগিরি করিব কেন?'

"তবে এই কাগজখানায় ঢেরা সই কর।"

"কোথায়—এইখানে?"

"হাঁ—এইখানে।"

তাহার পর মুহূর্ত্তেই কটাস করিয়া কি একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট চীৎকার—তাহার পর দেখিলাম, নইমদ্দীন ও গোবিন্দরাম দুইজনে ভূমিসাৎ হইয়াছেন। তাহার গায় এত বল যে, হাতে হাতকোড়ি থাকা স্বত্বেও সে প্রায় গোবিন্দরামকে চাপিয়া মারিতেছিল, আমি ও অক্ষয়বাবু গিয়া তাঁহাকে

রক্ষা করিলাম। গোবিন্দ সুকৌশলে নইমদ্দীর হাতে হাতকোড়ি পরাইয়া না দিলে আমরা তিন জনেও তাহাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না। আমি তাহার কপালে পিস্তলটা চাপিয়া ধরিলে তবে সে স্থির হইল, আমরা সুদৃঢ় দড়ী দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলাম।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "অক্ষয়বাবু, একটা লড়ালড়ি হইল বটে, কিন্তু আপনি আপনার প্রকৃত খুনীকে পাইয়া নিশ্চয়ই খুব খুসি হইবেন।"

অক্ষয়কুমার বিস্মিতভাবে বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, আমি কি বলিব, বুঝিতে পারিতেছি না। এখন বুঝিতেছি যে, আপনি গুরু, আমি শিষ্য, তবে আপনি কিরূপে কি করিলেন, তাহার আমি এখনও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বহুদর্শিতায়ই জ্ঞান জন্মে। আপনি সুধীরকে লইয়া এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, নইমদ্দীনের কথা একবারেই মনে স্থান দেন নাই। কালু মাঝির প্রকৃত খুনীর কথা একবারও বিবেচনা করেন নাই।"

এই সময়ে নইমদ্দীন কর্কশস্বরে বলিল, "তোমরা আমায় ধরেছ, তাতে আমি দুঃখিত নই, তবে আমি খুনীও নই—আমি তাকে মেরেছি সত্যি, আমি খুনী নই—আমি জানি তোমরা আমার কথায় হাস্‌বে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাসবো কেন? তোমার কি বল্‌বার আছে শুনি।"

নইমদ্দীন বলিল, "বেশী কথা নয়, কালু বিশ্বাসকে আমি অনেক দিন হতে জানতেম, তার সঙ্গে আমি অনেক বার সুন্দরবনে কাঠ কাট্‌তে গিয়াছি, তাকে আমি খুব জানি, তাই যখন সে ছোরা হাকাল, তখন আমি খোঁচা চালালেম, না হলে তার বদলে আমিই ঘাল হতেম।"

"তুমি তার ওখানে কি করতে গিয়েছিলে?"

"সব বলছি। আমরা একবার সুন্দরবনে কাঠ কাটতে যাই, সেই সময়ে খুব ঝড় হয়, একদিন দেখি বড় নদীর ধারে একখানা নৌকা উল্টিয়ে পড়ে আছে, কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম নৌকায় মোল্লারা পাণি খেছে বা ঝড়ে ডুবে মরেছে, কেবল একটা লোক আধমরা হয়ে পড়ে আছে, আমরা সেই লোকটাকে আমাদের নৌকায় তুলে নিলাম, নৌকায় তার একটা বাক্স ছিল, তাও তার সঙ্গে নিলাম।

"তার নাম কি এখন মনে নাই, পর দিন সকালে তাকে নৌকয় আর দেখা গেল না, কালু বলিল, 'হয়তো লোকটা কেমন করে জলে পড়ে গেছে, কিন্তু

আমি জান্‌তেম তা নয়, কেবল আমিই দেখেছিলাম, কালু মাঝি তার হাত পা মুখ বেঁধে বড় গাঙ্গে ফেলে দিয়েছিল।

"আমরা কাঠ নিয়ে বেলেঘাটায় ফিরলেম, সে লোকটার কথা কেহ কোন খোঁজ নিল না, এবং দিন কত পরে কালু মাঝিগিরি ছেড়ে কোথায় চলে গেল। অনেক দিন আর কোন সন্ধান পেলাম না। তবে আমি বুঝিলাম লোক্‌-টার বাক্সে যা ছিল, তারই জন্যে কালু মাঝি তাকে খুন করেছিল।

"অনেক দিন পরে তার সন্ধান পেলেম। তখন শুনলেম, তার অনেক টাকা হয়েছে, তার টাকা কোথা হতে এসেছে, তা বুঝ্‌তে আমার দেরি হ'ল না, তাই আমি তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করবার জন্যে তার কাছে গেলেম। প্রথম রাত্রে সে আমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছিল, বলেছিল যে, হাঁ কিছু টাকা দিবে, এমন কিছু দিবে যে,আর আমায় খেটে খেতে হবে না,সে আমাকে দুদিন পরে দেখা কর্‌তে বলেছিল, আমি সেই মত তার সঙ্গে দেখা কর্‌লেম, কিন্তু সেদিন দেখ্‌লেম সে ভারি মাতাল হয়েছে, এখন আমাকে গাল দিতে আরম্ভ করলে, তার পর ছোরা হঠাৎ বার করে আমার বুকে বসাতে ছুটলো। আমি লাফ দিয়ে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে খোঁচা তুলে নিলাম, তার পর সেই খোঁচা তার শরীরে বিঁধে দেয়ালে গিয়ে বস্‌লো, ঘরটা রক্তে ভেসে গেল, আমি খানিকটা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর তাড়াতাড়ি আসবার সময় হুঁকোটা ভুলে ফেলে রেখে পালালেম।

"বাহিরে এসে কার পার শব্দ শুনতে পেলেম, তখন ভয়ে এক কোণের মধ্যে লুকালেম, দেখি একটা লোক পা টিপে টিপে সেই ঘরে গেল, তারপর একটা শব্দ করে প্রাণপণে ছুটে পালাল। সে কে আর কি জন্য এসেছিল তা আমি জানি নে। সে চলে গেলে কোন দিকে কেউ নেই দেখে, আমি অন্ধকারে পলালেম।

"আমার কোন কাজই হল না,অথচ একটা খুন হলো.এখানে থাকলে গোলে ধরা পড়্‌তে পারি ভেবে আমি দিন কতকের জন্যে আবার সুন্দরবনে কাঠ কাটতে যেতে ইচ্ছে কর্‌লেম। হারু সর্দ্দার আমাকে চিনতো. তার কাছে গিয়ে বল্‌লেম সে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সব বল্‌লেম, কালুর মত বদমাইসকে আমি যে মারিয়াছি এতে তোমাদের আমার সুখ্যাতি করা উচিত।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তুমি সব সত্য কথাই বলিয়াছ, অক্ষয়বাবু এখন আপনি আপনার আসামী লইয়া যাইতে পারেন, নইমদ্দীনকে রাখিবার স্থান আমার এই ক্ষুদ্র ঘরে নাই।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন "আপনার কাছে কত যে বাধিত রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তবে আপনি কেমন করিয়া ইহাকে ধরিলেন, তাহা আমি এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

গোবিন্দরাম বলিলেন "বিশেষ কঠিন কিছু নাই। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম হইতে ঠিক সূত্রই আমি ধরিতে পারিয়াছিলাম। হয়তো গোড়ায় এই নোট বইয়ের কথা জানিতে পারিলে আমারও সুধীরকেই খুনী বলিয়া বোধ হইত। প্রথম আমি কি দেখিলাম—কালু মাঝির মত একজন বলবান্ লোকের দেহে কেহ বল্লম মারিয়াছে, সে লোকটা মহা বলবান্ না হইলে কখনও এ কাজ করিতে পারে না। নিশ্চয়ই সে এই খোঁচা দিয়া বহুবার মাছ ধরিয়াছে তাহার পর হুঁকা, দেশী মদ, ইহাতে বুঝিলাম, এ লোকটা একজন মোল্লা, নিশ্চয়ই কালুর সঙ্গে পূর্ব্বে সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইত। পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে আলাপ ছিল, সুতরাং বুঝিলাম খুনী কালুর পুরাতন আলাপী মোল্লা।

"কিরূপে আপনি ইহাকে খুঁজিয়া পাইলেন?"

"তখন ইহাকে ধরা বড় কঠিন হইল না। কতকটা লোকের চেহারাটাও জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই হারুসর্দ্দারের কাছে গিয়া একটু সন্ধান লইলাম, আমি জানিতাম, লোকটা যখন খুন করিয়াছে, তখন অন্ততঃ দিনকতকের জন্য অন্যত্র যাইতে ব্যগ্র হইবে, এরূপ লোকের কোথায় যাওয়া সম্ভব! সেই সুন্দরবনে; তাহাই হারু সর্দ্দারকে বলিলাম যে, আমি একখানা নৌকা লইয়া সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইব, অন্য লোক জুটিয়াছে, কেবল তিনজন মাল্লা কম আছে। তাহাকে জোগাড় করিয়া দিতে বলিলাম। তাহাই ইহারা তিন জনে আসিয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য।"

গোবিন্দরাম বলিলেন "সুধীরকে ছাড়িয়া দিন, শেষ মোকদ্দমায় আমাদের দরকার হয়, সংবাদ দিবেন।

সম্পূর্ণ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

হৃদয়লক্ষ্মী।

একদা সাধিনু আমি পায়ে ধরে কাঁদি
হে অন্তরলক্ষ্মী মম, দাও মোরে দেখা,
দেহ ধরি এস ওগো বক্ষোমাঝে বাঁধি'
কাছে মোর থাক' সদা আমি যেগো একা।
হৃদয় আবেগে—প্রেমে বাড়াইনু হাত—
দু'খানি ব্যাকুল হাত আলিঙ্গন ভরা,
সহসা শিহরি' চেয়ে দেখি অকস্মাৎ
লতাইছ বুকে মোর—দিয়েছো গো ধরা!
হৃদয়ের দ্বার খুলি' ধীরে চুপে চুপে,
এসেছ হৃদয়লক্ষ্মী—গৃহলক্ষ্মী রূপে!

শ্রীনিরঞ্জন বসু।

স্বামীজির স্মৃতি।

একদিন মঠে স্বামীজির সহিত নানা কথা হইতেছিল। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে। কথা হইতেছিল আমাদের জাতীয় ভাব কি, কি উপায়ে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতা আসিবে। স্বামীজি বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "আমাদের হয়েছে কি জানিস্—একেবারে আমরা কিছুই নই, মহা হীন, এটা করতে পারব কি? আমার দ্বারা আর কি হবে? এই সব অধম সংস্কার এসে পড়েছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমনটা হয়ে পড়বার কারণ কি?"

স্বামীজি উত্তর করিলেন,—"সে ঢের কথা। তবে এসে পড়েছে। অনেক ঘা খেয়েছে, তাই নিজের আত্মমর্য্যাদাটা ভুলে গেছে। কাজেই নিজের শক্তিটাও ভুলে গেছে। সব জাতের মনে আত্মমর্য্যাদা ব'লে একটা বস্তু আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তা মহারাজ! আমরা বিজিত দাস জাত, আমাদের গরব করবার আছে কি?"

স্বামীজি কহিলেন,—"বিজিত তা হয়েছি কি? আমাদের মত গরব করবার

বস্তু আছে কার? ওরে দুনিয়ায় কারুর নেই। হিঁদুর পূর্ব্ব পুরুষেরা যে অদ্ভুত উপকার জগতের করেছে, সমস্ত দেশে গেছে, তাদের ধর্ম্ম দিয়ে সভ্য করেছে, মানুষ করেছে। তেমনটী কোন জাত করেনি। আর করতেও কখন পারবে না।”

বলিলাম,—“হ্যাঁ, অবিশ্যি খুব পুরাকালে অন্য জাতদের উপকার করেছে, তাদের ধর্ম্ম দিয়ে মানুষ করেছে। সে ত স্বামীজি পুরন কথা। আর সে কথা এখন কটা লোক জানে; জানলেও কজন মানে? অনেকে সে সব কথা শুনতেই চায় না। কেমন যেন তাতে রুচিই হয় না, বলে,ও গাল-গল্প। স্বামীজি পূর্ব্বেকার নজির থাক আর নাই থাক বর্ত্তমানে তুমি যেমন দিগ্বিজয় করে এলে, তেমনটী যে ভারতের অদৃষ্টে কোনও কালে হয়ত ঘটেনি। বুদ্ধ, শঙ্কর, এঁরাত ভারতের গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে দিগ্বিজয় করে-ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি তুমি পৃথিবীর সুধী মণ্ডলীর জয় করে এলে তাতে যে ভারতবাসীর কালামুখ অনন্ত কালের মত উজ্জ্বল হয়ে গেল, এই অতুল আত্মমর্য্যাদা ভারতবাসী বুঝতে পারলে কৈ? সে টুকু বুঝলে যে ভারতের অনন্তমুখী উন্নতি এসে পড়ে।

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “সময় হলেই বুঝবে রে। কিছুই বৃথা হবে না। তার কাজ কি বৃথা হবার যো আছে। এই দেখনা China still wor-ships India—চীনেরা আজও ভারতবাসীকে পূজো করে।” এই বলিয়া এখান হইতে চিকাগো যাইবার পথে চীন প্রদেশের তাঁহার একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

তাঁহাদের জাহাজ যাইয়া হংকংএ তিন দিবস রহিল। হংকং পরিদর্শন করিবার পর আর একটী জাহাজে উঠিয়া ক্যাণ্টনে গেলেন। সেখানকার প্রধান বৌদ্ধমন্দির দেখিয়া তিনি তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন, “তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের স্মরণার্থ উৎসর্গী-কৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি; তাঁহার নীচেই সম্রাট বসিয়াছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সবগুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর রূপে খোদিত।”

এই মন্দির দেখিয়া ক্যাণ্টনের বাহিরের মন্দির সকল এবং তথায় বিদেশী সংস্পর্শ বর্জ্জিত হইয়া নিভৃতে চীনে বৌদ্ধ সাধুরা কি অবস্থায় কেমন ভাবে থাকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে দুই জন জার্ম্মান সহযাত্রী গিয়াছিল। ক্যাণ্টনে জাহাজ খানি থামিবামাত্র দলে দলে দোভাষী,

দালাল প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদের ছাঁকিয়া ধারল। স্বামীজি তাহার মধ্যে একজন দোভাষীকে পছন্দ করিয়া লইয়া ক্যাণ্টনে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীদের ক্যাণ্টনের বাহিরে মন্দিরাদি দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহারা সম্মত হইল, কিন্তু দোভাষী আপত্তি করিল। আপত্তির কারণ একটুকরা জমী বিদেশীদের থাকিবার ও ব্যবসা করিবার জন্য চীন গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত আছে, তাহাদের ঐ গণ্ডীর বাহিরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ! স্বামীজি কিন্তু দোভাষীকে কহিলেন, "আরে বাপু, তার আর কি, আমরা ত দেশ লুট করতে যাচ্ছি নি, সাধুর মত দেখ্‌তে যাচ্ছি। তুমি আমাদের নিয়ে চল। তাতে কোন দোষ হবে না।"

দোভাষী তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, "না মশাই, ওখানে যাওয়া হবে না। যদি কখন কোন বিদেশী এই গণ্ডীর বাইরে গিয়ে পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই সাজা পায়। গ্রামের লোকেরা মার ধোর করে, সময়ে সময়ে প্রাণে মেরেও ফেলে।"

স্বামীজি হাসিয়া দুজন জর্ম্মাণকে বলিলেন, "তোমরা কি এর কথা শুনে ভয় পাচ্ছ? আমিত যাবই মনে করেছি। তোমাদের ভয় হয়ে থাকে ত যেও না।"

জর্ম্মাণ দুইজনের এ প্রকার কথায় রাজি হওয়া ব্যতীত গতি ছিল না।

তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া নিকটেই একটি আশ্রম বা মঠ দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র দুই তিন জন হৃষ্ট পুষ্ট লোক আশ্রম হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল। দোভাষী চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মশাই পালান পালান, ঐ সব আমাদের গালাগালি দিতে দিতে আসছে। নিশ্চয়ই আমাদের মেরে ফেল্‌বে।" ইহা শ্রবণ মাত্রেই জার্ম্মাণ ভদ্রলোকেরা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। এই স্থলে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! তারা কি সত্যি লাঠি শোঁটা নিয়ে আসছিল?"

স্বামীজি কহিলেন "হাঁরে বাপু, এক এক শোঁটা হাতে চীৎকার করতে করতে আসছেল। আর তাই দেখে জার্ম্মাণ ভায়ারা চোঁচা দৌড়। ভোঁষের লেগে কি জান হারাবে বাবা।"

দোভাষীও সেই বীর পুরুষদ্বয়ের অনুসরণে উদ্যত হইল। স্বামীজী তাহার হস্ত ধারণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরে যাও কোথা? আগে

Indian monk (ভারতীয় সন্ন্যাসী) কে ওদের ভাষায় কি বলে বল, তার পর পালিও।"

দোভাষী তাহা বলিতে বলিতেই তাহারা মহা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। স্বামীজি তাহাদের বলিলেন যে তিনি একজন Indian Monk (হিন্দু সন্ন্যাসী)। এই কথা বলিবামাত্রই তাহাদের ভীষণ মুখাবয়বের পরিবর্ত্তন হইল, তাহারা অতি বিনীত ও ভক্তিভাবে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিল, পরে উঠিয়া কতকগুলি কথা বলিয়া অঞ্জলি করিয়া কি চাহিতে লাগিল। স্বামীজি তাহাদের কথার মধ্যে কেবল 'কবচ' কথাটী বুঝিতে পারিলেন এবং দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কি চায়?"

দোভাষী বলিল "মশাই এরা উপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কবচ চাইছে।" দোভাষী এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া আর পলায়নতৎপর হয় নাই।

স্বামীজি কি দিবেন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া খণ্ড খণ্ড কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহাতে প্রণব লিখিয়া তাহাদের হাতে দিলেন। তাহারা কবচ পাইয়া মস্তকে স্পর্শ করিয়া পুনরায় স্বামীজিকে প্রণাম করিল এবং নিজেরাই তাঁহাকে আশ্রম দেখিতে আমন্ত্রণ করিয়া অতি যত্ন-সহকারে মঠের মধ্যে লইয়া গেল। একাদিক্রমে তাহারা তাঁহাকে তিন চারিটী বৌদ্ধমঠ দেখাইল। স্বামীজি আমাকে বলিয়াছেন তিনি প্রত্যেক মঠে বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় হস্তলিখিত অনেকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্র এবং প্রায় ৫০০ বাঙ্গালী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকের প্রতিকৃতিও দেখিয়াছিলেন। এই সকল বস্তু তাহারা অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করে। কোন বিদেশীকে দেখিতে দেয় না। খৃষ্টীয় মিশনারি শ্যামুয়েল বীল প্রভৃতি যে সকল মন্দির হইতে পুরাতন গ্রন্থাদি আবিষ্কার করিয়া চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহা ছাড়া সেখানে এমন অনেক মন্দির এখনও আছে যেখানে বিদেশীদের একেবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। স্বামীজির বিশ্বাস ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীরা তথায় যাইলে সে সকল মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন এবং হস্তলিখিত পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদির আবিষ্কারও করিতে পারেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

বিচিত্র পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বোম্বাই বন্দরে আমাদিগের জাহাজ আসিয়া দাঁড়াইল। ভারতবর্ষের বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিহিত মানুষগুলা, তথাকার অভিনব দৃশ্য প্রভৃতি আমাদের মনে কিরূপ নূতন ভাবের হিল্লোল তুলিল, আমার আপনার বিপদ চিন্তার উত্তেজনা কিরূপ হৃদয়কে আলোড়িত করিল, সে সব কথা তুলিয়া এ পত্র বাড়াইবার ইচ্ছা নাই। বৎস্য জানি তুমি বুদ্ধিমান। সুতরাং এ সকল বিষয় সামান্য কল্পনাদ্বারা তুমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবে। জাহাজের বহুদিন আবদ্ধ নরনারী আবার মুক্তি পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। আমার মানসিক উত্তেজনার অনুরূপ উত্তেজনা বহির্জ্জগতে দৃষ্ট হইল। যাহাতে বাহ্যিক আকৃতিতে আমার মনোভাব ব্যক্ত না হয় তাহার চেষ্টা করিয়া ডেকের প্রাচীরে হাত দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

তুষার-শুভ্র বেশ পরিধান করিয়া ফ্লোরা আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল। যুবতীর পরিহিত বস্ত্রের মত তাহার সদাই লোহিতাভ গণ্ডদ্বয় শুভ্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি পীড়িতা ?

যুবতী কষ্ট করিয়া হাসিয়া বলিল—সামান্য অসুস্থ বটে। এইবার তোমাকে তোমার নির্বুদ্ধিতার ফলভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছি।

আমি বলিলাম—আমার কার্য্যের ফলাফল মৃত্যুর পর বুঝা যাইবে। মানুষের বিচারে যাহাই হউক না, ঈশ্বরের বিচারে—

ফ্লোরা হাসিয়া বলিল—ওঃ! এটা স্থানের দোষ। ভারতবর্ষে পাদরীদের বেশ পশার হয়। তুমিও কি সেই ব্যবসায় অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছ নাকি ?

আমি বলিলাম—ইহা পরিহাসের সময় নয়। তুমি যাও। আমাকে পুলিশ আসিয়া নামাইলে নামিয়া যাইব। ঐ দেখ তোমার সঙ্গী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

দূরে সিবিলিয়ানটি অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লোরা তাড়াতাড়ি তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। সিবিলিয়ান তীরে নামিয়া গেল।

আমি বলিলাম—সে কি নামিলে না যে ?

ফ্লোরা বলিল—না, আমি শীঘ্র বাটী যাইতে চাই। আর ভারতবর্ষে সময় নষ্ট করিব না।

আমি বলিলাম—মাপ্ করিও, তোমার বিবাহ—

ফ্লোরা হাসিয়া বলিল—সে আশা ত্যাগ করিয়াছি। ভাবিয়া দেখিলাম সিবিলিয়ান বিবাহ করা সুখকর নহে। আহা বেচারা যখন বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং আমি যখন প্রত্যাখ্যান করিলাম তখন যদি তাহার মুখ দেখিতে তাহা হইলে তুমিও এ বিপদে হাসিতে।

আমি স্থির হইয়া রহিলাম। মনে মনে প্রশ্ন হইল—এ রমণী কে ?

আমরা জাহাজ হইতে নামিলাম না দেখিয়া টমাসও নামিল না। সেদিন সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। বুঝিলাম পরদিন প্রাতে সে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবে। ফ্লোরা সন্ধ্যার পর ডেকের উপর বসিয়া আমার সহিত নানা কথা কহিল। রাত্রি দশটায় পর সে আপনার প্রকোষ্ঠে শুইতে গেল। যাইবার সময় আমায় বলিয়া গেল—"রাত্রে দরজায় তিনটি শব্দ করিলে দরজা খুলিয়া দিও।"

তখন প্রায় রাত্রি একটা। দরজায় তিনটি টোকা পড়িল। আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। ক্রীড়াশীলা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ নৈশ ভ্রমণের কারণ কি ?

ফ্লোরা সংক্ষেপে আমাকে কারণ বুঝাইয়া দিল। আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া নৈশ পোষাক পরিয়া টমাসের প্রকোষ্ঠে গিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। টমাস দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল—কি চাও ?

আমি বলিলাম—স্থির হও। ভিতরে চল। বিস্মিত টমাস ক্যাবিনের ভিতর প্রবেশ করিল।

আমি বলিলাম—টমাস তোমার নিকট শেষ কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি জান আমি নিরপরাধ। আমাকে বৃথা কষ্ট দিয়া কি করিবে। ভগবানের বিষয় চিন্তা কর টমাস! এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, তবে কেন নিরপরাধকে দণ্ডিত করিয়া শয়তানের নিকট আপনার আত্মা বিক্রয় কর।

টমাস ভ্রূকুটী করিয়া বলিল—স্যামুয়েল শার্লি, সেই বহুমূল্য মতিমালা [illegible] তুমি কি অনিষ্ট করিয়াছ তাহা জান? এখন তোমায় না ধরাইলে আমাকে কারাগারে যাইতে হইবে। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাল তোমাকে ভারতবর্ষীয় পুলিসের হস্তে দিব।

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম। শেষে তাহাকে অর্থদান করিতে স্বীকৃত হইলাম। অর্থের কথা শুনিয়া হাসিয়া টমাস বলিল—ওঃ ঐ কুহকিনী-টাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া তুই আমাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইতেছিস ?

হতভাগ্য আপনার বাক্স খুলিয়া আবার সেই ওয়ারেণ্ট প্রভৃতি কাগজ গুলা হাতে লইয়া বলিল—এই কাগজের কাল সদ্ব্যবহার করিব। তখন বুঝিবে মায়াবিনী কপটাচারিনী ফ্লোরা সণ্টের অঙ্গুলিস্পর্শ সুখ মনোরম না কারা-গারের শীতল নিস্তব্ধতা অধিক উপভোগ্য।

দরজায় টিক টিক শব্দ হইল। আমি ক্যাবিনের দ্বার খুলিয়া দিলাম। ফ্লোরা অতি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল।

বিস্মিত টমাসকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া ফ্লোরা বলিল—মিঃ টমাস, আপনি ভদ্রলোক। আমি স্ত্রীলোক, মিঃ সার্লির স্বাধীনতা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

দুর্ব্বিনীত টমাস বলিল—সার্লির স্বাধীনতার সহিত আপনার কি সংস্রব আছে ?

ফ্লোরা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল—সে কথা পরে বলিব। এখন আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।

অশিক্ষিত টমাস বলিল—সার্লির সহিত কি আপনার বিবাহের স্থির হইয়াছে ?

পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ভাবে ফ্লোরা বলিল—সে কথা উত্থাপিত হয় নাই। শ্যাম সার্লি যদি আমাকে তাহার স্ত্রী করিবার জন্য প্রস্তাব করে, তখন এ কথার উত্তর দিব। আপাততঃ আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

হতভাগ্য এ দেবভাষার উত্তরে বলিল—তুমি ভিক্ষার পাত্রী নও।

তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই যুবতী এক লম্ফে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সেই নীল চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে একটি রিভলভারের ঘোড়া টিপিয়া মিস সণ্ট বলিল—যদি ভিক্ষা না দাও তো জোর করিয়া লইব। শীঘ্র ঐ কাগজগুলা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেল তাহা না হইলে আজ তোমায় মারিয়া পৃথিবীর একটা পাপ কমাইব।

আমার আত্মীয় সার্লির বাটীতে যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আজ এই আরব্যোপসাগরের উপর জাহাজের ক্যাবিনে সেই মূর্ত্তি দেখিলাম। কাপুরুষ

টমাস কাঁপিতেছিল। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রমণী তাহার গলা হইতে হাত উঠাইয়া লইয়া বলিল—তবে মরিতে চাস ? বেশ তোর শয়তানকে স্মরণ কর।

তাহার পিস্তলের নলের দিকে চাহিয়া অবাধে কাপুরুষ তাহার হস্তস্থিত কাগজ গুলা ছিঁড়িতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। ভীতিবিহ্বল টমাস সমস্ত কাগজ টুকরা টুকরা করিলে জলদগম্ভীরস্বরে রমণী বলিল—খাও।

কাপুরুষ আবার একবার তাহার চক্ষের দিকে চাহিল। সে অগ্নি সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহার হস্তস্থিত পিস্তলের নলের প্রতি চাহিল। তাহার পর একবার সকরুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হতভাগ্য সেই কাগজ গুলা গলাধঃকরণ করিল।

তাহার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইলে রমণী বলিল—সুপ্রভাত মিঃ টমাস, আজ আপনার প্রাতঃভোজনটা বড় শীঘ্র করাইলাম. ক্ষমা করিবেন।

আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া যখন ফ্লোরা বলিল—"শ্যাম এবার আমরা নিষ্কণ্টকে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে পারিব." তখন তাহার চক্ষে আবার সেই শান্ত হৃদয়োৎফুল্লকর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমি উত্তেজিত হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম—ফ্লোরা! প্রেমময়ি (my love) তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

ফ্লোরা কিছু না বলিয়া আমাকে বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। বাহিরে কি হইল শুনিতে চাও। এক কথায় বলি, আমার প্রস্তাব শুনিবামাত্র ফ্লোরা তোমার খুড়ি হইতে স্বীকৃত হইল।

* * * *

তাহার পর এই কয়েক বৎসর আমরা বেশ সুখে আছি। আমার শ্বশুরের চেষ্টায় আমরা কেপ টাউনে অশ্বব্যবসায় করিয়া খুব অর্থবান হইয়াছি। ইংলণ্ডে আর ফিরি নাই, ফিরিবার ইচ্ছাও নাই। তবে শুনিয়াছি সার্লি সে যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছিল এবং অনুতপ্ত জোসেফ সার্লি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও আর মোকদ্দমা করিতে দেয় নাই। তাহাকে তোমার খুড়ি ফ্লোরা কেন মারিয়াছিল তাহা বলিব না ভাবিয়াছিলাম। এখন কিন্তু সে কথা বলায় কোনও দোষ দেখি না। সে আপনাকে কুমার বলিয়া পরিচয় দিয়া দুর্বৃত্ত ফ্লোরার সহিত প্রেম করিয়াছিল। পরে তাহাকে বিবাহিত জানিয়া ফ্লোরা প্রতিহিংসা লইয়াছিল।

এ সকলই ঈশ্বরের কার্য্য ; তাহা না হইলে এ জীবনে ফ্লোরাকে জানিবার সুখ পাইতাম না।

বোধ হয় তুমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছ না যে এতদিন পরে বৃদ্ধের এ পত্র তোমার নিকট আসিল কেন ? আমাদের অর্থ উপভোগ করিবার অদৃষ্ট বোধ হয় ভগবান তোমাকেই দিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদিগকে একটি মাত্রও পুত্র কন্যা দেন নাই। বাছা তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্রের সমান। এই পত্র পাঠমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া তোমার বিষয় বুঝিয়া লও। শুনিয়াছি তুমি এখনও বিবাহ কর নাই। যদি কোনও যুবতীকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রকৃত প্রেমের জন্য বিবাহ করিতে চাও, তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিবে।

তোমার উপর জগদীশ্বর তাঁহার আশীষ বর্ষণ করুন। আশা করি, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইবে না।

তোমার চির স্নেহের খুড়া

শ্যাম সার্লি।"

(৪)

পত্র পাঠে কিরূপ মনোভাব হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে মস্ত একটা বিষয়ের অধিস্বামী হইতেছেন ইহা ভাবিয়া সুখী হইলাম। ধীরে ধীরে তাঁহার কুঠীতে গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গে বিল্ ছিল।

সাহেব হাসিয়া বলিল—বাবু আপনার কুকুরটা পলাইয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম—সাহেব আসিবার সময় এই চিঠি খানি চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল।

চিঠি খানি পাইয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—ও ডিয়ার ডিয়ার, এযে বড় দরকারী চিঠি। আপনি পড়েছেন ?

আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম—কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আপনার সুখে সুখ প্রকাশ (Congratulate) করিতেছি।

সাহেব বলিলেন—তাহা হইলে আপনি সকলই জানেন। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে যাইব। পরশু আমার বিবাহ।

সাহেব হাসিলেন। পরে তিনি বলিলেন—আমি আপনার পদোন্নতির

জন্য বলিয়া যাইব। যাহাতে আপনি একেবারে ষ্টেসন্ মাষ্টার হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব, কেমন?

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। সাহেব মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—কুকুর চুরির জন্য কিছু অর্থদণ্ড দিব। কিন্তু তাহা কেপে পৌঁছিয়া।

তাহার ছয় মাস পরে সার্লি সাহেব আমাকে দুই সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও তিনি মাঝে মাঝে পত্র লেখেন।

(সমাপ্ত।)

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

সম্প্রতি 'মেঘদূতে'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় যাঁহারা শিহরিয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা যে 'শৃঙ্গার রসে'র ওরূপ ব্যাখ্যায় মূর্চ্ছিত হইবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের নিয়ম লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। কালের নিয়মে মহাকবি কালিদাস 'শৃঙ্গার 'রসাষ্টকম্' লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালের নিয়মেই আমি আজ তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছি। দুরন্ত কাল প্রভাবেই তাহার পাঠকালে কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা ঘটিবেই। সে জন্য ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। আবার যখন আধ্যাত্মিক ভাব আসিয়াছে তখন তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই! হায় কালিদাস! হায় শৃঙ্গার রস! তোমার যে একদিন এমন কদর্থ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচারিত হইবে তাহা বাস্তবিকই স্বপ্নের অগোচর। যাহার প্রথম শ্লোক মানবের মোক্ষ লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে, তাহাকে কুরুচি পূর্ণ বলিলে নিজের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব বুঝিতে হইবে। যাহার প্রতি ছত্র রসভাবে পূর্ণ—তাহা আধ্যাত্মিক না হইয়া যায় না। যাহার প্রথম শ্লোক :—

অবিদিত সুখ দুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।

অর্থাৎ এই জগতে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই এইরূপ বলিয়া থাকে যে, যাহাতে সুখ দুঃখের জ্ঞান হয় না এবং নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয় বিরহিত এমত যে কোন বস্তু তাহাই মোক্ষ। এমন মোক্ষে কবির মন টলিল না। এমন মোক্ষ সন্ন্যাসীর—গৃহীর নহে! তবে কি গৃহীর মোক্ষ হইবে না?

কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সারা বিশ্বের মোক্ষ লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। মহাকবি কালিদাস মানবের জড় বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে ইহাকে প্রকৃত মোক্ষ বলা যায় না। তিনি বলেন

মম তু মতমনঙ্গস্মের তারুণ্য ঘূর্ণন—
মদকল মদিরাক্ষী—নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ॥

যদি প্রকৃত মোক্ষ লাভের বাসনা থাকে তবে মৃগনয়না স্ত্রীর যে নীবিমোক্ষ অর্থাৎ বসন গ্রন্থির মোচন তাহাই প্রকৃত মোক্ষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি জড়বুদ্ধি ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, এজন্য মৃগনয়না স্ত্রী শব্দের অর্থ প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির বসন গ্রন্থির মোচন অর্থাৎ যবনিকা মুক্ত না হইলে মানবের জ্ঞান লাভ ঘটিতে পারে না। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি কোথায়! কবি প্রকৃতি সুন্দরীর বসন গ্রন্থির উন্মোচন দেখাইয়া মোক্ষ লাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কবি ধন্য হইলেন। আমরাও পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। কবি এ স্থলে উন্মত্তের ন্যায় মুক্তি লাভের আশায় অনন্তের আস্বাদ পাইবার আশায় কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছেন,

কদা কান্তাগারে পরিমলমিলৎপুষ্প শয়নে
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্।

হায়! কবে আমার সেই দিন সেই প্রকৃতির শ্যামল তৃণশয্যা লাভ ঘটিবে যে দিন,

অয়ে কান্তে! মুগ্ধে! চটুলনয়নে! চন্দ্রবদনে!
প্রসীদোত ....

বলিতে বলিতে 'নেষ্যামি রজনীম্' জীবনের সকল মোহান্ধকার রূপ রজনীর অবসান করিব। অয়ি প্রকৃতি সতি! কবে তোমার কুচ সদৃশ পর্ব্বতশৃঙ্গে বক্ষ রাখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিব প্রসীদ অয়ি চটুল নয়নে প্রসীদ! আমার মোহ ও জড় বুদ্ধি দূর করিয়া দাও! আমি তোমাতেই লীন হইয়া থাকি। এমন ব্যাকুলতা, এমন মোক্ষ লাভের পিপাসা কুত্রাপি কোনও কাব্যে দৃষ্টি গোচর হয় কি?

মুক্তির আশায়, ভগবানে মিলিত হইবার বাসনায় কালিদাস উন্মাদ। চক্রবাককে কান্তা বিচ্ছেদ বিধুর দেখিয়া তিনি আপনার বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। আপনার প্রাণের কথা তখন তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; বলিলেন,

উন্মত্তবদ্ ভ্রমতি কুগতি মন্দ মন্দং।

প্রাণের এ ভাবকে চাপিয়া কে রাখিবে? বিশ্ব প্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত-সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, এই শৃঙ্গার রসেও তেমনি বাহিরে সংসারের বিরহ কথায় পূর্ণ, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে মোক্ষ লাভের জন্য কি উদ্দাম বাসনা! কিন্তু সাধারণে একথা বোঝে না ও বুঝিতে চাহে না—তাহারা ইহাকে অশ্লীলতা দোষ যুক্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহে। যদিচ কালিদাস এম-এ পাস্ করেন নাই, তথাচ ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অশ্লীল রচনা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল।

এ কাব্যের মত এমন উদ্দেশ্যহীন কাব্য আমি আর কখনও দেখি নাই। ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই বোধ হয় এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটী মায়াতরী;—কল্পনার হাওয়ায়, মোক্ষ লাভের বাসনায় ইহার সজল মেঘনির্ম্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটী বিরহী হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটী অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে! কবির হৃদয় ইহাতে বিরহী চক্রবাকের ন্যায় মোক্ষ বাসনায় উন্মত্ত হইয়া পদ্মিনীর ছায়াকে সন্দর্শন করিয়া এরূপ বিহ্বল চিত্ত হইয়া পড়িতেছে যে দিবসকেও 'রজনীং মন্যতে' রজনী বলিয়া তাহার ভ্রান্তি হইতেছে।

পরিশেষে কবি বলিতেছেন যে, প্রকৃতি সতী মানবকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যে কত যত্ন কত আয়াস করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, তথাপি জড় বুদ্ধিযুক্ত মানব চাহিয়াও চাহে না—মোহঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বৃথা কর্ম্মে যাহারা কালাতিপাত করিয়া থাকে তাহাদের মুক্তির আশা কোনো দিনও যে থাকিতে পারে এমত সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না। এ কাব্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতি কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি শব্দেই বিরহের দাবানল ফুটিয়া বাহির হইতেছে, প্রতি কথাতেই ভোগবাসনা দূর করিবার আড়ম্বর শূন্য আয়োজন চলিতেছে। কবি যখন তাহার অষ্টম অথবা শেষ শ্লোকে বলিয়া উঠিলেন:—

কা কাবলা নিধুবনশ্রমপীড়িতাঙ্গী
নিদ্রাং গতা দয়িতবাহু লতানুবদ্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদ্গমোহয়ং
সঙ্কেত বাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি॥

তখন বাস্তবিকই প্রাণে কেমন একটা আশার সঞ্চার হয়। মনে হয়, হায়!

এমন সঙ্কেত বাক্য মানব শুনিয়াও শুনে না কেন? যথার্থই কি তাহারা দয়িতবাহুলতানুবন্ধা রূপ বৃথা কর্ম্মে কালাতিপাত করিবে। আর, এই বায়সের দল 'গৃহং যাতু' 'গৃহং যাতু' অর্থাৎ হে মানব! তোমাদের সেই নিজ গৃহে ফিরিবার আয়োজন করো, আর নিধুবনাশ্রমে পীড়িত হইয়া রহিও না। উঠ! জাগ্রত হও! অনন্তের আস্বাদ পাইবার আয়োজন করো! ইহাই বলিয়া ফিরিয়া যাইবে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

স্মৃতি।

বহুদিন পরে কি দেখি আবার, সে দু'টী নয়ন সোহাগে মাখা;
সাধে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে, অলকায় আধ বদন ঢাকা।
সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে, সেই তো গোলাপ অধর-রাগে;
মৃদু হাসি সনে বিষাদ মিলিত, কেন হেন এতো দেখিনি আগে।
সেইতো তটিনী সাগরগামিনী, শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে;
সেইতো কলিকা ঈষৎ দুলিয়া, শিহরিছে ধীর সমীর-করে।
বাহুপাশে বাঁধি নয়নে নয়ন, যতনে দেখিছি বদনখানি;
আজ' ধরি ধরি ধরিতে না পারি, আমার আমার—আমিতো জানি।
এলো এলো এলো, আবার ফুরা'ল, চলে গেল কেন কি অভিমানে;
ছিলতো বেদনা মরমে লুকা'য়ে, কেন বারি-ধারা নয়নে আনে।
এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে, প্রাণে প্রাণ আজ' কাঁদে না কাঁদে;
কেঁদে গেছে সেতো দেখেছে কেঁদেছি, কাঁদিতে কাঁদাতে এলো কি সাধে
দিয়েছি আহুতি হৃদয় সুসার, দু'জনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী;
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি, তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্মৃতি!

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাময়িক সাহিত্য।

(লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।)

শিল্প-কথা।

ঢাকাই মসলীন।

প্রাচ্যের অতীত শিল্প-গৌরব-কাহিনীর আলোচনা করিতে গেলে অগ্রেই মসলীনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা মনোমধ্যে উদিত হয়। সম্ভবতঃ দামস্কসের তরবারি, চীনের মৃত্তিকা-দ্রব্যাদি এবং কাশ্মীরের শাল ব্যতীত অপর কোন শিল্পদ্রব্যের এতাধিক প্রসিদ্ধি ছিল না। ঢাকাই মসলীন সূক্ষ্ম সূত্রনির্ম্মাণ ও বয়ন-শিল্পের চরমোৎকর্ষ; অদ্যাবধি তেমন সূক্ষ্মতম ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বয়নশিল্প কোন আধুনিক সভ্যজাতি প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ঢাকাই মসলীন শিল্পজগতে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; সে প্রতিষ্ঠায় সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের গৌরব,—তাহাতে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত এবং বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর শিল্প বলিয়া সেই দেশ এবং জাতিরও গৌরব। আজ বাঙ্গালার সেই প্রাচীন শিল্পের আর সেইরূপ সমুন্নত ও সমৃদ্ধ অবস্থা নাই; তবুও ইহার অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে ক্ষতি কি?

মসলীনের গৌরব

মসলীন অতি সুপ্রাচীন শিল্প এবং প্রাচীন সভ্যজগতের বহুস্থানেই ইহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। শুনা যায়, প্রাচীন বাবিলন্ এবং আসিরিয়া দেশেও ইহার প্রচলন ছিল। সার জর্জ্জ বার্ডউডের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কথার সমর্থন করিলেও ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা কত দূর বলিতে পারি না। প্লিনি প্রাচীন মিশর এবং আরবদেশের আমদানীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় বাঙ্গলার মসলীন-শিল্পের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং সার্জ্জন জেমস্ টেলর তাঁহার "Topography and Statistics of Dacca" নামধেয় গ্রন্থে এরিয়ান (Arrian) নামক একজন মিশর-প্রবাসী গ্রীকের প্রণীত 'The Circumnavigation of the Erythrean Sea' নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার গ্রন্থকার ঢাকাই মসলীনের সূক্ষ্মতমত্ব এবং স্বচ্ছত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দুইজন মুসলমান পর্য্যটক ভারত ও চীনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (Accounts of India and China by two Mahomedan Travellers in the 9th Century, translated by Abbe Froissart) লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,—এদেশে তুলা হইতে প্রস্তুত সূক্ষ্ম সূত্রের যে সমস্ত সুন্দর পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হয়, পৃথিবীর

মসলীনের প্রাচীনত্ব

আর কোন স্থানে তেমন দেখা যায় না। এই সকল পরিচ্ছদের অধিকাংশ গোলাকার (?) * এবং এরূপ সূক্ষ্ম ও কোমলভাবে বয়ন করা যে একটি মাঝারি রকমের অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়া টানা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে য়ুরোপে ঢাকাই মসলীন সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। রোম সাম্রাজ্যে সে সময়ে ইহার বহুল ব্যবহার হইত। ডাক্তার য়ুর-কৃত (Dr. Ure) "Cotton Manufacturers of Great Britain" (published in 1836) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে, বঙ্গদেশের মসলীন তখন সম্ভ্রান্ত বংশের এবং রাজকুলের মহিলাগণ অতীব সমাদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। রোম তখন য়ুরোপে জ্ঞানে ও শিক্ষায়, সভ্যতায় ও বিলাসিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল; সেই রোমান্‌রা অতি শ্রেষ্ঠ ও অননুকরণীয় বস্ত্রশিল্প বলিয়া মসলীনের প্রশংসা করিতেন।

রোমসাম্রাজ্যে মসলীন

মোগল বাদসাহদিগের শাসনকালে ঢাকার মসলীন-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, সাজাহান এবং আরঙ্গজেবের শাসনসময়ে যখন প্রাচীন ঢাকা নগরী সমৃদ্ধি-সম্পদে গরীয়সী ছিল, তখন মসলীনের অবস্থাও তুল্যরূপ সমুন্নত ছিল। মোগল সম্রাটেরা তখন এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, প্রচুর মূল্য দিয়া শিল্পীকুলকে প্রোৎসাহিত করিতেন বলিয়া শিল্পীরাও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মসলীন প্রস্তুত করিত। সে অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ও কোমল বয়নশিল্প দর্শনে অনেক ইউরোপীয় মুগ্ধ-চিত্তে বলিয়াছিলেন, ইহাদের কোন কোন খানি দেখিয়া বোধ হয়, এ শিল্প মানুষের কৃত নহে, ইহা পরী বা কীটপতঙ্গের রচিত। † বাঙ্গলার এই অপরূপ শিল্প —বাঙ্গালীর এই মসলীন রাজদরবারে এবং রাজপরিবারে শ্রেষ্ঠ উপঢৌকনরূপে পরিগণিত হইত। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান মসলীনের বড়ই পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকতায় ইহার খ্যাতি সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখনকার মত সে সময়েও রাজদরবারই রুচি, বিলাস ও সৌখীনতার উদ্ভব-ক্ষেত্র ছিল এবং নূরজাহানের রুচি ও তাঁহার মনোনয়নই তদানীন্তন তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে অনুকৃত হইত। তখন যাঁহাদের মনে কথঞ্চিৎ সুরুচির অস্তিত্ব ছিল, অথবা যাঁহাদের সমাজে কিছু প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁহারাও নূরজাহানের দেখাদেখি ঢাকার মসলীন ব্যবহার করিতেন। সে সময়ে হিন্দুস্থানের সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের দরবারে মসলীনের পোষাকই ওমরাহগণ সুরুচিসম্মত এবং সম্ভ্রমবাঞ্জক বলিয়া বিবেচনা ও ব্যবহার করিতেন। পুরুষেরা যেগুলি ব্যবহার করিতেন, সেগুলির বয়ন মহিলাবর্গের ব্যবহারোপযোগী মসলীনের বয়নের মত সূক্ষ্মতর ছিল না। রাজকীয় মহিলাবৃন্দ যাহা ব্যবহার করিতেন, তাহার সূক্ষ্মতার তুলনা হয় না; বায়ুর সহিত তাহার উপমা হইত। সে শ্রেণীর মসলীনগুলিকে

মোগল দরবারে

---

* পাগড়ী নয় ত?—লেখক।

† Some of them might be thought the work of fairies, or of insects, rather than of men—*Baines.*

'আব-ই-রাওয়ান' বা বায়ুরূপ সূত্রে বয়িত বলা হইত। কোন কোন গুলিকে 'শাবনাম' বা 'স্রোতের বারি' এবং কোন কোন গুলি 'প্রভাত-শিশির' নামে অভিহিত হইত। এগুলি কিন্তু সম্রাটের অন্তঃপুরে বিলাসিনী বেগমগণের ব্যবহার্য্য ছিল। মোগলদিগের রাজত্বকালে-মসলীনের শিল্প-গৌরব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সুদূর স্পেন, প্রভেন্স, ল্যাঙ্গোয়েডক, ইটালি, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসীবৃন্দ ইহা ব্যবহারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং প্রতি বর্ষে বর্ষে প্রচুর পরিমাণে ঢাকাই মসলিনের থান ঐ সকল দেশে প্রেরিত হইত। ঢাকার এই প্রসিদ্ধ মসলীন প্রস্তুতের জন্য যে কত শিল্পী নিযুক্ত থাকিত, তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে ইহার জন্য যে বহুসংখ্যক শিল্পীর সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

কোন বাঙ্গালা কাব্যে মসলীনের উল্লেখ আছে কিনা জানি না; কিন্তু তদানীন্তন ঢাকা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসী মির আসরফ আলির প্রপৌত্র খ্যাতনামা কবি মৌলবী সৈয়দ মামুদ আজাদ প্রণীত 'সেরাজ-উল-খিয়াল' নামক পারস্য কাব্যে ঢাকার এই মসলীন-

কবির কাব্যে

শিল্পের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট মসলীন সাত প্রকারের ছিল। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে,—'সমুন্দর-লহর' (সাগর-তরঙ্গ), চিকণ, কাশিদা, তাঞ্জেব, আব্রিজুল্লা, জামদানি ও শাবনাম। প্রধানতঃ এই সপ্ত প্রকারের মসলীনেরই প্রভূত প্রচলন ছিল এবং এইগুলিই ঢাকাই বয়ন-শিল্পের চরমোৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেবল যে ভারতের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণই মসলীন ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে; য়ুরোপের বিলাস-ক্ষেত্রে মসলীন অতি উপাদেয় ও শ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত ছিল। তথাকার শিল্পীকুল ইহার অতুলনীয় সূক্ষ্মবয়নপ্রণালী দেখিয়া বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত হইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার য়ুর (Dr. Ure) লিখিয়াছেন :—ঢাকাই মসলীনের জন্য

শ্রেষ্ঠ-বয়ন-শিল্প

এখনও যেরূপ সূত্র প্রস্তুত হয় এবং যে প্রকার সূক্ষ্ম ভাবে ইহা বয়ন করা হয়, য়ুরোপীয় বয়নশিল্প তাহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারে না। তাহাদের বলবুদ্ধি ও শিল্পজ্ঞান ইহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। তিনি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিয়াছেন, কিরূপে এত সূক্ষ্ম সূতা বাঙ্গালার শিল্পীকুল প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা তিনি ধারণাতেই আনিতে পারেন না। ডাক্তার টেলর (Dr. Taylor) বলেন যে, ঢাকার মসলীন বরাবর তাহার গৌরব ও প্রতিপত্তি রক্ষা হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের বয়ন-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও উহা ঢাকাই মসলীন-শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সুচিকণ ও সূক্ষ্মতম বয়ন-পারিপাট্যে আজ পর্য্যন্ত ইহা সভ্যজগতের সকল বয়ন-শিল্পীকে পরাভূত করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

ঢাকাই মসলীনের শ্রেষ্ঠত্বের অনেকে অনেক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যালফোর-কৃত "Cyclopædia of India" পুস্তকে লিখিত আছে যে, মসলীনের জন্য যে তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত হইত, সেই তুলা মেঘনার তীরভূমিতে ফিরিঙ্গীবাজার হইতে

বাখরগঞ্জ-এদিলপুর পর্য্যন্ত প্রায় বিশ ক্রোশ পরিমিত স্থানে, ব্রহ্মপুত্র নদের পুরাতন খাদ এবং লাখিয়া ও বানার নামক নদীদ্বয়ের তীরবর্ত্তী স্থলসমূহে উৎপাদিত হইত। প্রচারভেদে নানা শ্রেণীর তুলার চাষ হইত, তন্মধ্যে 'ফোটি' নামক এক প্রকার তুলায় অতীব সূক্ষ্মতম সূত্র প্রস্তুত এবং ঐ সূত্র মসলিন-বয়নের জন্য ব্যবহৃত হইত।

শ্রেষ্ঠত্বের হেতু

বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশের উৎপন্ন তুলা হইতে এই তুলা বিভিন্ন ছিল; ইহা হইতে কোমলতম, দীর্ঘতম এবং সূক্ষ্মতম সূত্র প্রস্তুত হইত। বেনস্ (Baines) সাহেব তদীয় "History of Cotton Manufacture" নামক পুস্তকে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসের যাদুঘরে রক্ষিত এক প্রকার সূত্র মসলীন-সূত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সার জোসেফ ব্যাঙ্কস উহার ওজন ও পরিমাণ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—আধসের ওজনের সূত্র দৈর্ঘ্যে ১১৫ মাইল, ২ ফার্লঙ এবং ৬০ গজ মাত্র। শিল্পীকুলের কতিপয় ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও গুণরাশিও মসলীনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণীভূত—একথা অস্বীকার করা যায় না। মসলীনের সর্ব্বাপেক্ষা সুচিকণ ও পরিপাটী সূত্র প্রস্তুত করিত—অষ্টাদশ হইতে ত্রিংশ বর্ষ বয়স্কা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা। ত্রিশ বৎসরের উপর বয়স হইলে তেমন 'মিহি' সূতা প্রস্তুত হইত না। তাহারা প্রাতে ও বৈকালে চরকায় সূতা কাটিত; কারণ সে সময়ে সূর্য্যের কিরণে নয়ন ঝলসাইয়া যাইত না এবং তদুপরি প্রভাতে ও বৈকালে বায়ু জলকণাপূর্ণ থাকাতে সূতা ছিঁড়িবার আশঙ্কা ছিল না। যাহারা সূতা তৈয়ারি করিত, তাহাদের প্রকৃতি বা স্বভাব খুব মৃদু ছিল, চাঞ্চল্য এবং গরম মেজাজে এমন 'মিহি' সূতা তৈয়ারি করা অসম্ভব ছিল। প্রধানতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতির হিন্দু বিধবাগণের হস্তেই অতি 'চিকণ' ও 'মিহি' সূতা প্রস্তুত হইত। সংযত-প্রবৃত্তি ও স্থিরচিত্ত বলিয়া হিন্দু বিধবাগণের চিরপ্রসিদ্ধি। তাঁহারা এমন সূতা নির্ম্মাণ করিতেন যে, জগতে তাহার তুলনা ছিল না, এখনও নাই; সুতরাং ঢাকাই মসলীনের গৌরবে বাঙ্গলা গৌরবান্বিত হইলেও প্রধান গৌরবশালী বাঙ্গালার অন্তঃপুর। ডাক্তার য়ুর, ডাক্তার টেলর, হণ্টার-প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল কথার পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন,—সাত্ত্বিকস্বভাবা হিন্দুরমণীর সুকোমল ও মৃদু-কর-স্পর্শ বিনা তেমন সূক্ষ্মতম সূত্রের উদ্ভব আর কোন দেশে কোন জাতি করিতে পারে নাই—তাই ঢাকাই মসলীনের পারিপাট্য ও সূক্ষ্মত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। সার উইলিয়ম হণ্টার বলেন যে, পুরুষানুক্রমিক অনুশীলনবশতঃই ঢাকার বয়ন-শিল্পের এতাধিক উন্নতি। এই সূত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য অন্যূন ১২৬ প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

ঢাকাই মসলীন এত মিহি ও সূক্ষ্ম ছিল, যে উহার লঘুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বোনা এক খণ্ড মসলীন ডাক্তার টেলর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাকে খুব সাবধানে ওজন ও মাপ করা হইলে দেখিতে পাওয়া গেল, ইহার দৈর্ঘ্য দুইশত গজ এবং ওজন মাত্র ৫ গ্রেণ। ভারতের স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে সময়ে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ রূপে ভারত-পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তিন খণ্ড মসলীন উপহারস্বরূপ

বিস্ময়কর লঘুত্ব

দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকখানির দৈর্ঘ্য বিশ গজ এবং বিস্তার এক গজ এবং

ওজন ৩.৫ আউন্স অর্থাৎ পৌনে দুই ছটাক মাত্র ছিল! এরূপ শুনা যায়, যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে এক খণ্ড "আব-ই-রাওয়ান" মসলীন যাহা দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও বিস্তারে ২ হাত—তাহার ওজন ৫ সিক্কা বা ৯০০ গ্রেণ; উহার মূল্য চারি শত টাকা ছিল।

লোকমুখে ও গল্পে

মসলীন সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে; উহার সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে লোকমুখে এবং তদানীন্তন পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বিবরণীতে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। টাভারনিয়ার সাহেব বলেন "মসলীন পরিধান করিলে উহার মধ্য দিয়া ত্বক্ দেখা যাইত, মনে হইত যেন দেহ অনাবৃত রহিয়াছে। বণিকেরা মসলীন রপ্তানি করিতে অর্থাৎ বিদেশে পাঠাইতে পারিত না, ঢাকার শাসনকর্ত্তা মসলীন প্রস্তুত হইলেই মোগল অন্তঃপুরে ও প্রধান প্রধান অমাত্যগণের ব্যবহারের জন্য রাজধানীতে তাহা প্রেরণ করিতেন। বাদসাহের বেগম এবং ওমরাহগণের পত্নীগণ ইহা হইতেই গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন।" তিনি আরও বলেন যে, একবার এক পারস্য দেশীয় দূত ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে তাহার প্রভুকে অষ্ট্রিচ পক্ষীর ডিম্বের আকারের মত এক নারিকেলের মধ্যে করিয়া একটি মসলীনের পাগড়ী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, উহা দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত ছিল। উহা এত লঘু ও সূক্ষ্ম ছিল, যে উহা হাতে করিলে হাতে আছে বলিয়া বোধ হইত না! একবার এক খণ্ড মসলীন জলে কাচিয়া ঘাসের উপর শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল এবং গাভী তাহার উপর আসিয়াই ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে উহা শুকাইতে দিয়াছিল সেও জানিতে পারে নাই যে, ঐ স্থানে মসলীন শুকাইতেছিল। একবার এক মোগল রাজকন্যাকে পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া দেহের চর্ম্ম দেখা যাইতেছে বলিয়া তাঁহার পিতা তিরস্কার করেন, তাহাতে রাজকন্যা উত্তর দেন, "আমার কোন অপরাধ নাই; এই দেখুন, আমি উপরি-উপরি সাতটি পোষাক পরিয়াছি।"

ইংলণ্ডে মসলীন

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ ১৬৬৬—১৬৭০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে মসলীন সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। ঢাকাতে ইংরাজ কোম্পানির কুঠি নির্ম্মিত হয় ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবৃন্দ হুগলীর কাউন্সিলকে ১৬৬৭—৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল,—"ঢাকা সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই স্থানে অনেক য়ুরোপীয় দ্রব্যের কাট্‌তি হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তথাকার মল্‌মল্ (মসলীন) প্রভৃতিও আপনারা সংগ্রহ করিতে পারেন। অতএব আমরা আপনাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছি, আপনারা দুই তিনজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঢাকায় বাস করিতে প্রেরণ করুন।" এই সময় হইতে ইংরাজেরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া ঢাকায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজেরা ও সর্ব্বশেষে ফরাসীরা এখানে আসিয়া বিস্তৃতভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে ঢাকায় প্রায় বাৎসরিক এক কোটি টাকার বাণিজ্য হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল হইতেই মসলীন-শিল্পের অবনতির আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের মতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব বৎসর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মসলীন প্রস্তুতের জন্য বার্ষিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা দাদন প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দাদনের পরিমাণ কম হইয়া প্রায় দুই লক্ষ দশ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নটিংহাম নগরে সর্ব্বপ্রথম কলে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হয় এবং ইহার দুই বৎসর পরে মোটা ঢাকাই মসলীনের অনুকরণে ৫ লক্ষ খণ্ড বিলাতী মলমলের থান কল হইতে বাহির হয়। বিলাতে তখন ইংলণ্ডের সদ্যোজাত বয়ন-শিল্পের রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। ইহার ফলে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর শতকরা ৭৫ টাকা ডিউটি স্থাপিত করা হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেও ইংলণ্ডে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলীন প্রেরিত হইত, কিন্তু এই ডিউটি স্থাপনের পর হইতেই উহার রপ্তানি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮॥০ লক্ষ টাকা, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩।০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় এবং সর্ব্বশেষে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঢাকার কুঠিও উঠিয়া যায়।

মসলীনের অবনতি

ইহার পর ঢাকার মসলীন-শিল্পের ইতিহাস বড়ই করুণ, বড়ই দুঃখময় বর্ত্তমানেও উহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। সেই সুপ্রাচীন ও ভারত-গৌরব বয়ন-শিল্পের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আছে, এখনও পৃথিবীর কোন দেশের বয়ন-শিল্প তাহার সমকক্ষ নহে। এদেশের বস্ত্রব্যবসায়ীগণ এখনও দাদন দিয়া এ শিল্পকে আংশিক রক্ষা করিয়া আসিতেছে। *

সাহিত্যে সহযোগিতা। †

('আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'র প্রতিবাদ)

বঙ্গসাহিত্যের বয়ঃক্রম অধিক নহে। আজও ইহা কৈশোর অতিক্রম করে নাই। ইতিমধ্যেই ইহার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বাঙলার সাহিত্য-সেবকগণের স্বার্থত্যাগ ও সহযোগিতার ফল। বাঙলার সুসন্তানগণ বহু পরিশ্রমে আপন আপন সাধ্যমত নানাস্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর

---

* প্রধানতঃ শ্রীযুত সৈয়দ হোসেন-কৃত 'A famous Indian industry' নামক প্রবন্ধাবলম্বনেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ইহা 'Indian World' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

† মন্তব্যটি লেখকের নিজস্ব। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামতই ব্যক্ত হয় নাই।—অর্চ্চনা-সম্পাদক।

জন্য যে মন্দির-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আজও তাহার নির্ম্মাণকার্য্য বহুদূর অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় এই অসমাপ্ত মন্দিরের উপর হিংসা-দ্বেষ-অসূয়ার ঝটিকা-প্রবাহ মন্দিরের পক্ষে আদৌ শুভকর নহে।

আজ কিছুকাল ধরিয়া হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার বন্ধুবর্গের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উপর যে আক্রোশপূর্ণ আক্রমণের স্রোত চলিয়াছে, তাহাকে হিংসার ঝটিকা ভিন্ন কি বলিব বুঝিতে পারি না। গত কয়েক মাস ধরিয়া 'সাহিত্য' 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতিতে রবীন্দ্রবাবু-সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাদের অন্য কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা সুকঠিন। সমালোচনা যদি ইহার নাম হয়,তাহা হইলে সমালোচনার প্রথা বঙ্গসাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও বিশেষ হানি হয় না!

দ্বিজেন্দ্রবাবু "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করিতে গিয়া যাহা লিখিয়া ফেলেন "তাহাতে নূতন একটী কাব্য হয়, সমালোচনা হয় না।"

সমালোচনার উদ্দেশ্য বোধ হয় দ্বিবিধ (১) উৎকৃষ্ট রচনাবলীর বিশ্লেষণ দ্বারা সাধারণ পাঠককে রচনার রসগ্রহণে সাহায্য করা (২) অপকৃষ্ট রচনার দোষ প্রদর্শন দ্বারা সাহিত্যকে আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করা।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্ সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত "কাব্যে নীতি" নামক প্রবন্ধে তিনি শেষোক্ত উদ্দেশ্যের "ভাণ" দেখাইয়াছিলেন। "ভাণ" এইজন্য বলিতেছি যে, যদি সত্যই সাহিত্যকে কলঙ্কমুক্ত করিবার তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে "চিত্রাঙ্গদা"-সম্বন্ধে "রায়" প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি নিজের অনেকগুলি পুস্তককেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেন (?) তদ্ভিন্ন সুলেখক প্রিয়নাথ সেন "চিত্রাঙ্গদা"-সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক।

যাহা হউক, সে প্রবন্ধে ভাণও না হয় ছিল। কিন্তু এই "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা"র উদ্দেশ্য কি? যদি কোন দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রবাবুর ভ্রান্ত (?) ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া "মেঘদূত" কাব্যকে যক্ষের প্রণয়িনী-বিরহে ব্যাকুলতা না বুঝিয়া পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অন্তর্নিহিত মিলন-লালসা বলিয়াই বুঝিত, তাহা হইলে তাহার বা বঙ্গ-সাহিত্যের কি বিশেষ কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "আধ্যাত্মিক বলিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে!"

এবং যাহা সাধারণের মুখ দিয়া আসিলেই জ্বর উৎপাদন করে, তাহা রবীন্দ্রবাবুর মুখ দিয়া আসিলে বোধ হয় বিকার লইয়া আসে। কাজেই ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করা প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই সমালোচনা পড়িতে পড়িতে বার বার মনে হয় "Give the dog a bad name and then hang it"—ইহাই তাঁহার সমালোচনার মূল মন্ত্র।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ভালো কাব্য মাত্রেরই একটা গুণ আছে, তাহার মধ্য হইতে লোকে নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারেন" (এবং স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রবাবুও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন, যথা "প্রায় ভালো কাব্যমাত্রেরই একই অর্থ থাকে—নানা দিক হইতে তাহা দেখা যাইতে পারে বটে")। সুতরাং মেঘদূতে যক্ষের প্রণয়িনীর জন্য ব্যাকুলতাকে জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কালিদাস যে ঠিক এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই "কোমর বাঁধিয়া" মেঘদূত লিখিতে বসিয়াছিলেন, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ কুত্রাপি বলেন নাই। তিনি বলেন, কালিদাস হয়ত ইহা মনেও করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই চিরন্তন তত্ত্ব তাঁহার কাব্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ "রস যেখানে গভীর হয় সেখানে আপনিই তাহা কোন একটি চিরন্তন তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।" সুতরাং এরূপ স্থলে অজ্ঞাতসারে আবিষ্কৃত তত্ত্বটীর প্রত্যেক খুঁটি-নাটি যে কাব্যের সাধারণ অর্থের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, এমন কেহই আশা করিতে পারেন না। স্থূলত উভয় পক্ষের অর্থ মিলিয়া গেলেই এরূপ গূঢ় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট যে উভয় অর্থের মধ্যে মূলত সাদৃশ্য আছে কি না।

অলকাচ্যুত জনহীন পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত লুপ্তমহিমা যক্ষ এবং নিরানন্দ মোহমগ্ন আশ্রয়হীন জীবাত্মার মধ্যে সাদৃশ্য যথেষ্ট। এ কারণ পর্ব্বতের শিখর বা অধিত্যকার পার্থক্য মারাত্মক নহে। সুতরাং এ জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবুর অমূল্য যুক্তি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠাব্যাপী মুক্তাবর্ষণ নিতান্তই অপব্যয় মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অলকার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত পরমাসুন্দরী যক্ষপত্নীর সঙ্গে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরিপূর্ণ মহিমাময় পরমাত্মার সাদৃশ্যও তেমনি পরিস্ফুট। এ জন্য অলকাপুরীর স্বর্গে পরিণত হওয়া বা যক্ষপত্নীর পক্ষে কুবের-পুরীর সমস্ত সম্পদ-প্রাপ্তি আদৌ প্রয়োজনীয় নহে।

পরমাত্মাকে স্ত্রী এবং জীবাত্মাকে পুরুষরূপে কল্পনাও এইজন্য মারাত্মক নহে। দাম্পত্য প্রণয়ের সঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের সাদৃশ্যই ইহার জন্য যথেষ্ট। তবে একথাও বলা যায় যে, পরমাত্মাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা একান্ত হাস্যকর নহে। আমাদের দেশে শক্তিপূজকগণ ভগবানকে মাতৃভাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং "বাৎসল্য রসের" পরিণতি যে "মধুর রসে" তাহাও এদেশে সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং স্ত্রীভাবে পরমাত্মাকে কল্পনা করা নিতান্ত উৎকট নহে।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ যক্ষের অভিশাপের সঙ্গে অনায়াসে তুলিত হইতে পারে। অভিশাপকে এই ভাবে তুলনা করায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর ক্রোধোচ্ছ্বাস অনুচিত।

"অভিশাপে মানুষ মর্ত্তে আসিয়াছে—তবে মানুষ Fallen Angel—তবে মানুষ সয়তানের বংশ—তবে মানুষ"—ইত্যাদি।

জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ,—শুধু অংশ কেন পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নধর্ম্মা। সেই জীবাত্মা—অজ্ঞানান্ধ—বাসনাব্যাকুলিত—সংসার-কূপ-নিমগ্ন—জন্মমৃত্যুর অবিশ্রান্ত দোলায় আন্দোলিত! ইহাকে যদি অদৃষ্টের অভিশাপ বলা যায়, তাহা হইলে কি নিতান্ত অন্যায় হয়? বিচ্ছেদকে নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসনকে অভিশাপ বলা এমনি কি ঘোরতর অপরাধ?—"অভিশপ্ত ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের কল্পনা"?

যাহাদের হৃদয় পরমাত্মাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহাদের এইরূপই মনে হয়। তাহারা ইহকাল-সর্ব্বস্বদের মত "দুদিন বইত নয়" বলিয়া "হাসিয়া লইতে" পারে না।

মিলনোৎসুক জীবাত্মার সঙ্গে মানবের তুলনা অপেক্ষা যক্ষের তুলনাই কি অধিক "খাপ" খায় না? যে আত্মা সংসারের মোহে অভিভূত হইয়া পরমাত্মাকে একেবারে ভুলিয়া আছে, তাহা অপেক্ষা সংসার-মোহ হইতে কিয়দংশে মুক্ত ভগবৎমিলন-লোলুপ আত্মা উন্নততর। যক্ষ মনুষ্যের উচ্চ পদবীস্থ—দেবযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যক্ষের সঙ্গে উন্নত আত্মার তুলনা, হে কবিবর, সমীচীন নহে কি?

মানুষের মনে যখন ভগবানের আহ্বান-বাঁশরী বাজিয়া উঠে, তখন জগতের কোন মোহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, কোন সৌন্দর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করে না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত "ভূমা"কে না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। "পূর্ব্ব মেঘে" এই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। রাশি রাশি সৌন্দর্য্য-পরম্পরা যক্ষের মানসনেত্রের উপর অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠিতেছে. কিন্তু মিলনাকুল যক্ষ তাহার কোনটির দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছেন না। তিনি তাঁহার জীবন-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া মানসপ্রয়াণ করিয়াছেন, জগতের কোন সৌন্দর্য্য, কোন লোভনীয় বস্তু তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে না—"উজ্জয়িনীর বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত-লোলাপাঙ্গী পৌরাঙ্গনা"ও নহে। সকলে "পরমে"র পরিচয় দিতেছে, কেহই "পরম" বলিয়া তাঁহার পথরোধ করিতেছে না। এইরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুকূল বহু উপকরণই মূল কাব্যে রহিয়াছে। সুতরাং এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কি অপরাধ ঘটিতে পারে; তাহা সাধারণ চক্ষে ধরা পড়া অসম্ভব।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "এ বিরহকে যদি বিশ্ববিরহ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সব বিরহই তাই।" তাহাতে আপত্তিকর কিছুই নাই। মেঘদূত বিরহ কাব্যের আদর্শ—তাই মেঘদূতে এই তত্ত্ব এমন পরিস্ফুট। মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষাই অজ্ঞাতে ভগবানের দিকে ছুটিয়াছে, সকল ভাবই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই উথলিয়া উঠিতেছে। কবির ভাষায়

"নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি"—

সুতরাং "পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহও চিরন্তন তত্ত্ব" এবং "মানুষের কৃতজ্ঞতা লইয়া যে কবিতা রচিত হয়, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়।"

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রবাবু ক্রমে ক্রমে "হিং টিং ছট্" এর দলে ঢুকিতেছেন। রবীন্দ্রবাবু "হিং টিং ছটে"র দলে ঢুকুন আর না ঢুকুন, দ্বিজেন্দ্রবাবু ক্রমে যে বঙ্গসাহিত্যে "তিনকড়ি শর্ম্মায়" পরিণত হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি যাহা বুঝিতে পারেন না, তাহাতে যে কিছুমাত্র সার থাকিতে পারে, অথবা তিনি যাহা ভাবেন, তাহা যে সকল সময়ে "সূক্ষ্মতত্ত্ব-অনুপ্রাণিত দর্শন" নয়, এ কথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না।

তিনি নিজেই বলিতেছেন যে "আধ্যাত্মিক বলিলেই তাঁহার গায়ে জ্বর আসে" অথচ যাহার এরূপ মানসিক অবস্থা, সে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্যাসত্যতা-নিরূপণের আদৌ উপযুক্ত নহে, একথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না!

কবিবর একস্থানে বলিতেছেন, "কিন্তু আমি তাহা করিতে প্রস্তুত নহি;" আর এক স্থানে বলিতেছেন "ব্যস্ত হইবেন না, ইহার ব্যাখ্যা আছে।" এই পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর—এই শূন্যগর্ভ অহঙ্কার "তিনকড়ি শর্ম্মা"রই উপযুক্ত! কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে জগতে "তিনকড়ি শর্ম্মা"রাই গুরুস্বরূপে পূজিত হইবার একমাত্র যোগ্য পাত্র নহে।

প্রবন্ধের উপসংহারে দ্বিজেন্দ্রবাবু শাসাইয়াছেন—এইবার তিনি রবীন্দ্রবাবুর 'কুমারসম্ভব'সম্বন্ধে প্রবন্ধ লইয়া পড়িবেন। রবীন্দ্রবাবু বহু যত্নে বঙ্গ-সরস্বতীর কণ্ঠে দিবার জন্য যে অমূল্য মুক্তামালা গাঁথিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রবাবু নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত কৃপাণে তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না।

কিন্তু দরিদ্রা বঙ্গভাষার উপর এই কঠোর অত্যাচার ঠিক কবিজনোচিত হইতেছে কি? দ্বিজেন্দ্রবাবু নিজেও সুলেখক। তাঁহার উপরেও বঙ্গ-সরস্বতীর অনাস্থা নাই। দ্বিজেন্দ্রবাবু যদি অতঃপর পরের অর্ঘ্যের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অপেক্ষা নিজের অর্ঘ্যকে জননীর গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য অধিকতর মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এবং বঙ্গসাহিত্যের উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

যদি। *

(অনুকৃতি কবিতা)

১

আমি যদি হ'তাম আঙ্গুর,
তুমি হতে কৃষ্ণবর্ণ জাম,
তবুও তোমার রূপে,
রহিতাম মজে, ডুবে,—
হৃদি-পদ্মে পূজিতাম তোমার শ্রীঠাম।

২

আমি যদি হইতাম লুচি,
তুমি, গুড়, কেঁদে একবার,
আসিলে আমার কাছে,
রাখিয়া হৃদয়-মাঝে,
অর্পিতাম দেব-ভোগে, তৃপ্তি রসনার।

৩

তুমি যদি হ'তে খোয়া ক্ষীর,
হইতাম আমি মনোহরা,
হৃদয়ের অন্তস্তলে,
রাখিতাম কুতূহলে,
রত্নমত যত্ন করি', তুচ্ছ করি' ধরা।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

---

* জ্যৈষ্ঠের 'অর্চ্চনা'য় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'যদি'-শীর্ষক কবিতা-পাঠে।

তীর্থ।

ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বা প্রকৃতির লীলাভূমি-সদৃশ মনোজ্ঞ স্থানবিশেষ সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তজীবের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। স্থান-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস বা স্থানবিশেষকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করা যে কেবল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। ভাবপ্রবণ মানব মাত্রেরই হৃদয়ে এক একটি স্থানের নামোচ্চারণেই সেই স্থানের সহিত বিজড়িত সুখকর বা দুঃখাবহ স্মৃতির আবির্ভাব হয়। পরিবর্ত্তনশীল কালের অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রাচীন গ্রীক জগতের সমৃদ্ধিশালী স্থাবর-বিশেষের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখ করিয়া ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—ম্যারাথন ভ্রমণকালে যাহার হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতার ভাব উৎপাদিত হয় না এরূপ ভ্রমণকারী অতি বিরল। ম্যারাথনের সহিত গ্রীক ইতিবৃত্তে যে জ্বলন্ত স্বদেশভক্তির কাহিনী মিশ্রিত আছে, তাহার স্মৃতি আজিও সকল জাতীয় পর্য্যটকের হৃদয়ে স্বদেশভক্তি জাগরিত করে।

ধর্ম্মজগতে এই স্থানবিশেষের উপর অনুরাগ প্রদর্শন করাটা একপ্রকার ধর্ম্মাধিকরণের অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীবৃন্দাবন-ধামের নামোল্লেখ করিলে শ্রীকৃষ্ণজীবনের হর্ষোৎফুল্লকর অসংখ্য মধুর স্মৃতি আসিয়া তাহার সমগ্র হৃদয় আর্দ্র করিয়া দেয়। শ্রীক্ষেত্র পুরী-তীর্থের নামোচ্চারণে প্রতি ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় নাচিয়া উঠে। হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ ব্যাপকতা, ধীরে ধীরে সরস্বতী-বিধৌত ক্ষুদ্র স্থান হইতে বহুযুগ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া হিন্দুধর্ম্ম যেরূপে ইহার বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে মুনিপুঙ্গব ব্যাসদেব-পদরজঃপূত বদরিকাশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোষপাড়া অবধি শত শত তীর্থ-স্থান হিন্দুর নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে।

যাঁহারা প্রকৃত সাধক, যাঁহারা আধ্যাত্মিক তেজবলে প্রতিক্ষণে প্রতিস্থলে বিশ্বপাতার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য তীর্থ পর্য্যটন নিরর্থক। সেইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক যুগের কবিরঞ্জন গাহিয়াছিলেন—

কাজ কি আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারাণসী।

যে স্বয়ং মাকে দেখিতে পায়, যে ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত পার্থের মত সারা বিশ্ব-সংসার যে কেবল তাঁহার রূপ ব্যতীত অপর কিছু নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিতে পারে—

অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্।—

তাঁহার নিকট সমগ্র জগতই এক পবিত্র তীর্থ, জগতের প্রতিধূলিকণায় তাঁহার অস্তিত্ব, প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁহার সত্বা; তাঁহারা জগদীশ্বর যে অণো-রণীয়ান মহতোমহীয়ান, ইহা সম্যক অনুভব করিয়া সমান ভাবে সকল সৃষ্ট পদার্থে হৃদয়ের প্রেম ঢালিয়া দেন। তবে যাহার দিব্যজ্ঞান হয় নাই, যাহাকে পৃথিবীর মোহ প্রতিক্ষণে টানিয়া ধর্ম্মপথবিচ্যুত করিতে সদাই যত্নবান তাহার পক্ষে তীর্থপর্য্যটন বড় উপকারী। সেখানে প্রতি বায়ুকণা, প্রতি দৃশ্য তাহার হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার করে, তাহাকে মোক্ষপথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তীর্থ ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—জঙ্গম, মানস এবং স্থাবর। ঋষিবাক্যাদি শ্রবণই জঙ্গম তীর্থ।

ব্রাহ্মণাঃ জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকম্
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধন্তি মলিনো জনাঃ।

মানস তীর্থ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—

শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে
যেষু সম্যক নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম।
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থ মুচ্যতে
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম
তীর্থানামপি তৎতীর্থং বিশুদ্ধি মনসঃ পরা
এতৎ-স্তে কহিতং দেবিমানসং তীর্থলক্ষণম্।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে গেলে মহামুনি অগস্ত্য-বর্ণিত তীর্থাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ তীর্থ কোথা? পাপের বোঝা বহিতে বহিতে পৃথিবীর যত মোহ, যত প্রলোভন প্রত্যেকটার দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া তামসিক ভাবে সকল তীর্থ ঘুরিয়া মরিলেও মোক্ষপথের ত্রিসীমায় অগ্রসর হওয়া যায় না, অথচ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া, পৃথিবীর জীবনসংগ্রামের মধ্যে বসিয়া সত্য, ক্ষমা, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সদ্গুণ-বিভূষিত হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলে বা প্রকৃত জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে শত তীর্থের ফল পাওয়া যায়।

আমার বোধ হয় অনুন্নতমন সাধকের পক্ষে পৌত্তলিকতা যেমন ফলপ্রদ, তাহাদের পক্ষে তীর্থপর্য্যটনও তদ্রূপ মঙ্গলবিধায়ক। এই স্থলে প্রভু জন্মিয়াছিলেন, এই পুণ্য ভূমিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ কথা গুলা স্মরণ করিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতিতে যুগ যুগান্তর পরে অনুপ্রাণিত হওয়া মানুষের পক্ষে হিংসাদ্বেষকুটিলতাপূর্ণ জগত হইতে উপরের স্তরে উঠিবার যে একটি বিশিষ্ট উপায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক কীর্ত্তিকর স্মৃতিমণ্ডিত স্থানে ভ্রমণ করিলে প্রাচীন কীর্ত্তির স্মরণে মনের উন্নতি হয়, কিরূপে জীবনযাপন করিলে আমরাও পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারি তাহার পন্থা নির্দ্ধারিত হয়। মহাপুরুষ বা অবতারদিগের লীলাস্থল দর্শনে তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের ভক্তি প্রগাঢ় হয়। স্বভাবের নূতন দৃশ্য দেখিয়া আমরা জগদীশ্বরের সৃষ্টিমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি এবং হৃদয়ে ভক্তির বীজ বপন করিতে পারি।

তীর্থস্থল পর্য্যটন করা যে কেবল মাত্র অনুন্নত সাধকের পক্ষে হিতকর তাহা নহে। তাহাদের মতি স্থির করিবার পক্ষে তীর্থযাত্রা বড় হিতকর বটে, কিন্তু উচ্চদরের ভক্ত সাধকের নিকট তীর্থদর্শন এক পবিত্র অনির্ব্বচনীয় সুখের কারণ। প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবন তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দেখিয়া এই পাপ কলিযুগে কি স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিলেন এবং আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরভক্তবৃন্দকে কিরূপ অনৈসর্গিক সুখের আস্বাদন দিয়াছিলেন, সে কাহিনী বঙ্গবাসী এখনও বিস্মৃত হয় নাই। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়াও নিমাই সেই অনির্ব্বচনীয় হর্ষোৎফুল্লকর স্মৃতির মধুর রসে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। জগদীশ্বর

যখন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বশিষ্ঠ দেবের সহিত তিনিও প্রধান প্রধান ঋষিদের তপোবনাদিতে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

স্থাবর তীর্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচিন্মধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ
তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ
প্রভাবাদদ্ভুদাদ্ভুমেঃ সলিলস্য চ তেজসা
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা মতাঃ।

শরীরের মধ্যে কোন অবয়ব উত্তম, কোন অবয়ব অধম, তেমনি পৃথিবীর মধ্যেও কোন কোন স্থান অপর স্থানাপেক্ষা পবিত্র। অদ্ভুত ভূমি এবং সলিলের তেজের প্রভাবে অথবা মুনিদিগের পরিগ্রহ হেতু তীর্থের পবিত্রতা উৎপাদিত হয়। কেবল যে স্থানবিশেষের ঐতিহাসিক স্মৃতির জন্য তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নহে। যে সকল স্থলে স্বভাবের বিশিষ্ট কমনীয়তা বা উগ্রতা দর্শিত হয়, পৃথিবীর আদিম কাল হইতে জগদীশ্বরের সৃষ্টিমাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য মানবজাতি সেই সকল স্থলকে তীর্থস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল স্থানে প্রকৃতির নূতনত্ব দেখিয়া পুরাকাল হইতেই তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে প্রকৃতির মাধুরী দেখিয়া ঐ সকল স্থল নিভৃত সাধনার পক্ষে অতিশয় মনোজ্ঞ ভাবিয়া প্রাচীন কালে অনেক সাধু সেই সকল স্থলে বসিয়া আপনাদিগের আরাধ্যের উপাসনায় কালাতিবাহিত করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সকল স্থল তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। উৎকল প্রদেশে ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের সন্নিকটস্থ খণ্ডগিরি, উদয়-গিরির দৃশ্য-মাধুর্য্য এখনও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র পর্য্যটককে আকর্ষণ করে। লোলরসনা সদা-প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার অস্তিত্ব দেখিয়া যে জ্বালামুখী তীর্থস্থান হইয়াছে বা উত্তপ্ত বারিরাশির প্রস্রবণ জন্য যে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থল পুণ্যভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই যেমন অনুষ্ঠানের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তীর্থের সংখ্যা বা তীর্থযাত্রার বিধি-সম্বন্ধেও তেমনি বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তীর্থের সংখ্যা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

তিস্র কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানান বায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভূব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবী।

তীর্থযাত্রা সম্বন্ধেও সব অতি কঠিন নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে—

পুণ্যার্দ্ধং হরতে যানে তদর্দ্ধং ছত্র পাদুকে
তদর্দ্ধং তৈলমাংস্যাভ্যাং সর্ব্বং হরতি মৈথুনে।

ধর্ম্মশাস্ত্রে তীর্থগমন সম্বন্ধে ঠিক যেরূপ নিয়মাদি আছে, সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া তীর্থযাত্রা করা বড় কঠিন ব্যাপার। যেরূপ সংযতভাবে প্রত্যেক বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করা বিধেয়, তাহাতে তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা যে মানবের উন্নতি হয় তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ তীর্থযাত্রা না করিয়া গৃহে বসিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই পবিত্রতা লাভ করিয়া মানব মুক্তির সোপানে উঠিতে পারে।

তীর্থপর্য্যটনের অপর একটি উপকারিতা আছে। তীর্থস্থলে সাধু দর্শন হয়, আন্তরিক ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তীর্থক্ষেত্রে প্রকৃত ভক্তের মধুমাখা ভক্তির উৎসের স্নিগ্ধ পবিত্র রসের স্পর্শে পাষণ্ডেরও মনে যুগপৎ ভক্তি ও প্রেমের উদয় হয়। যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে স্থলে পৃথিবীমধ্যস্থ শ্রেষ্ঠভূমিবোধে ভক্ত ও জ্ঞানী জনের সমাগম হইতেছে, সে স্থলের ব্যোমপথ যে ধর্ম্মপ্রাণতায় পূর্ণ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সে সকল স্থলে পর্য্যটন করিলে যে মানবের প্রকৃত উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, এই সকল আদর্শ পুণ্যভূমিতে মানব-সংসারের কার্য্যাবলী, সাংসারিক জীবনসংগ্রাম, দলাদলি, দ্বেষ, দ্বন্দের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই প্রায় উন্নত চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হয়। তাই আমাদের নিত্য সাংসারিক লীলাভূমি অপেক্ষা তীর্থভূমিতে বাস করা, তীর্থপর্য্যটন করা আমাদের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সহধর্ম্মিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরকুমারবাবু পশ্চিমে ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। এখনও তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ না হইলেও দুই কারণে ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় লোয়ার সার্কিউলার রোডে একখানি সুন্দর বাড়ী কিনিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

এই দুই কারণের প্রথম কারণ—তাঁহার স্ত্রী চিররুগ্না, বহুকাল হইতে একরূপ শয্যাগতা, পশ্চিমের অত্যধিক গরমে থাকিলে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় ডাক্তারগণ এই কথা বলায় তিনি তাঁহাদের পরামর্শে পশ্চিম-বাস ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ তাঁহার একমাত্র কন্যা হেমাঙ্গিনী বয়স্কা হইয়াছে, তাহার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন।

হরকুমারবাবু চিরকালই ব্রাহ্মভাবাপন্ন; পশ্চিমে তিনি ঠিক সাহেবের ন্যায় বাস করিতেন; এখানেও তিনি পুরা সাহেব। এই জন্য কন্যাকে বাল্যকালে কম বয়সে বিবাহ দেন নাই, হেমাঙ্গিনীকে যতদূর সুশিক্ষিতা করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন। হেমাঙ্গিনী অলোকসামান্যা সুন্দরী, সে যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী। লিখিতে পড়িতে গাইতে বাজাইতে, সে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা। এক্ষণে তাহার বয়স ষোড়শবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেজন্য হরকুমার এইবার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

তাঁহার স্ত্রীও এই জন্য ব্যস্ত, তিনি কোন্ দিন আছেন, কোন্ দিন নাই; তিনি সর্ব্বদাই কন্যার বিবাহের জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন, এদিকে আবার হেমাঙ্গিনীর বিবাহের পাত্র এক প্রকার স্থির হইয়া আছে।

হরকুমার বাবুর বিশেষ বন্ধু অনন্ত বাবু কালিপুরের জমিদার, তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র সুপুরুষ সুশিক্ষিত যুবক। বহুকাল হইতে হরকুমার বাবুর ইচ্ছা যে সতীশচন্দ্রের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন। সতীশচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। তাঁহারা সকলেই সতীশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; হেমাঙ্গিনীর সহিতও তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল; হেমাঙ্গিনী যৌবন-

সুলভ ভালবাসায় তাঁহাকে না ভালবাসিলেও সে তাহার পিতা মাতার ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়াছিল যে, এক সময়ে তাহাকে সতীশচন্দ্রের স্ত্রী হইতে হইবে।

কিন্তু হরকুমার বাবু বা তাঁহার স্ত্রী কখনও এ পর্য্যন্ত কন্যার সম্মুখে এ কথা উত্থাপন করেন নাই, তবুও কন্যা বেশ বুঝিয়াছিল যে, তাহার মাতাপিতা উভয়েরই এই ইচ্ছা। সতীশচন্দ্রও ইহা জানিতেন, কিন্তু তিনিও এ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনীকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কেহ কিছু না বলিলেও হেমাঙ্গিনী ইহা বেশ জানিত, ইহাতে সে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট ছিল না—সতীশচন্দ্রের পিতা নাই, তিনিই এখন অতুল সম্পত্তির মালিক, মস্ত বড় জমিদার, হেমাঙ্গিনী সুশিক্ষিতা হইলেও বড় ঘরের ঘরণী হইবার জন্য বরাবরই তাহার একটা ব্যাকুলতা ছিল।

ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা পূর্ব্বে কে বলিতে পারে? হেমাঙ্গিনী তাহা জানিত না, তাহার পিতামাতাও তাহা জানিতেন না।

হেমাঙ্গিনী সতীশচন্দ্রকে ঠিক ভালবাসিত কিনা, তাহা সে জানিত না; তবে হেমাঙ্গিনী কখনও সতীশচন্দ্রকে অযত্ন করিত না; তবে সে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, সতীশচন্দ্র তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন; কিন্তু সহসা এক ঘটনায় তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে এক নূতন ভাবের সমাবেশ হইল। তাহার হৃদয়ের চিরশান্তি নষ্ট হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরকুমার বাবু ওকালতী ছাড়িয়া একটু খেয়ালী হইয়াছিলেন। কাজকর্ম্ম না থাকিবার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, অথবা তাঁহার স্ত্রীর নানা ব্যাধি বশতই হউক, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া না থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, তাঁহার দেহও ব্যাধির আকর হইয়াছে, এই জন্য কারণ ও বিনা কারণে তিনি ডাক্তার ডাকাইতেন, ও ঔষধ খাইতেন। যখন ঔষধ খাইতেন না, তখন চা-পান করিতেন, তাঁহার এই খেয়ালের জন্য ডাক্তারগণ বেশ দুই পয়সা পাইতেন, ভৃত্যগণও চা পানের জন্য কিছু যে লাভবান্ হইত না, তাহা নহে।

হরকুমার বাবুর স্ত্রী যখন শয্যাশায়ী থাকিতেন না, তখন একখানা আরাম-

কেদারায় বালিশে একরূপ মণ্ডিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আজও তাহাই ছিলেন, হেমাঙ্গিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মোজা বুনিতেছিল।

সহসা জননী বলিলেন, "হেম, কে এল।" একখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, সেই শব্দ তাঁহার কর্ণে লাগিল; কিন্তু কেহ আসিল না, তখন এ কথা তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল।

হরকুমার বাবুর চা পানের সময় হইল, ভৃত্য সেই ঘরে এক ক্ষুদ্র টেবিলের উপর চাএর সরঞ্জাম সকল রাখিয়া গেল; কিন্তু হরকুমার বাবু আসিলেন না। তাঁহার চা পান সম্বন্ধে সময়ের ব্যতিক্রম কখনও ঘটিত না, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী বিস্মিত হইলেন। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন, "তিনি বাহিরের ঘরে হয় তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, হেম, যাও দেখে এস।"

হেমাঙ্গিনী মোজা বোনা বন্ধ করিয়া উঠিল, বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে বলিল, "বাবা, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—তুমি এখনও——"

হেমাঙ্গিনী সহসা নীরব হইল। হরকুমার বাবুর পার্শ্বে উপবিষ্ট একটী ভদ্র লোক, সুপুরুষ যুবক, তিনি হেমাঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরকুমার বাবু বলিলেন, "রমেন্দ্র বাবু, এটী আমার কন্যা।" হেমাঙ্গিনী কোন কথা কহিল না, তাহার নীলোৎপলতুল্য বিশালায়ত নেত্রদ্বয় নত হইল, সে তৎক্ষণাৎ চঞ্চল চরণে তথা হইলে ছুটিয়া পলাইল।

রমেন্দ্রনাথ দরিদ্র-সন্তান, তাঁহার পিতা নাই, মাতা আছেন, তিনি নিজ অধ্যবসায়ে বৃত্তি পাইয়া এক্ষণে মেডিক্যাল কালেজে ডাক্তারী পড়িতেছেন আর কিছু দিন পরেই তিনি পাশ করিয়া ডাক্তার হইতে পারিবেন।

হরকুমার বাবু ডাক্তার দেখিলেই যত্নাদর করিতেন। রমেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় তিনি তাঁহার নম্র ভাব, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার চিকিৎসায় পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। রমেন্দ্র নাথ কালেজ বন্ধ হওয়ায় দেশে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরকুমার বাবু তাঁহাকে দিনকয়েক তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাই রমেন্দ্রনাথ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন।

তিন-চারি দিন মাত্র থাকিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক মাস কাটিয়া গেল, তবু তিনি হরকুমার বাবুর বাড়ীতে রহিলেন। ইহাতে প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কারণ ছিল। হরকুমারবাবু প্রথম হইতেই রমেন্দ্রের প্রতি প্রীত হইয়া-

ছিলেন; রমেন্দ্র একণে পাশকরা ডাক্তার না হইলেও শীঘ্রই হইবেন, তিনি নিজ স্ত্রীর ব্যাধির কথা সমস্তই রমেন্দ্রকে বলিলেন, রমেন্দ্র সকল শুনিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইল, ইহাতে তিনি রমেন্দ্রকে দিন কত তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, হেমাঙ্গিনীর মাতাও স্বামীকে অনুরোধ করিতে বলিলেন; রমেন্দ্রেরও ছুটি ছিল, কাজেই তিনি রহিয়া গেলেন।

প্রত্যহ হরকুমার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী রমেন্দ্রের উপরে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, রমেন্দ্রও এক জনের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, বলা বাহুল্য সে হেমাঙ্গিনী।

আর হেমাঙ্গিনী! সে প্রকৃত পক্ষে সতীশচন্দ্রকে ভালবাসিত না, তাহার যুবতী-হৃদয় সুপুরুষ সুন্দর নম্র রমেন্দ্রকে দেখিয়া ভুলিয়া গেল, এই এক মাস রমেন্দ্রের সহিত একত্রে বাস করিয়া তাহার মূর্ত্তি হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

তিনি কে, কোথায় বাড়ী, এ সকল হেমাঙ্গিনী একবারও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, সে ধীরে ধীরে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেছে, তাহাও সে নিজে ভালরকম বুঝিতে পারে নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে নাই। তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভাল লাগে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে মনে আনন্দ হয়, এই পর্য্যন্ত সে জানিত—আর কিছু ভাবিবার সময় তাহার ছিল না। কিন্তু রমেন্দ্র বুঝিল, তাহার হৃদয় আর একটা হৃদয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের স্বপ্ন চিরকাল থাকে না। ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে, রমেন্দ্রের বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। তিনি একদা গৃহমধ্যে নির্জ্জনে হেমাঙ্গিনীকে পাইয়া তাঁহার বিদায়ের কথা বলিলেন। হেমাঙ্গিনী অবনত মস্তকে তাহার হাতের পশমগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "এত শীঘ্র যাইতেছেন কেন?"

রমেন্দ্র বলিলেন, "এত শীঘ্র কই—আমি এখানে কেবল দুই-তিন দিন থাকিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, আর এই দেড় মাস রহিয়াছি।"

"আপনার ঔষধে মার অনেক উপকার হইয়াছে।"

"ভগবান করুন, তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন।"

"মার অসুখ কত দিনে সারিবে?"

ইহার উত্তরে রমেন্দ্র কি বলিবেন? তিনি মনে মনে জানিতেন, হেমাঙ্গিনীর মাতার জীবন ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এই জন্য তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এখন আবার কালেজের সেই দারুণ খাটুনিতে লাগিতে হইবে—এখানে বড়ই সুখে দিন-কতক কাটিল।"

হেমাঙ্গিনী অন্যমনস্কে দুই হাতে পশম আরও টানিতে টানিতে বলিল, "আপনি কি এখান হইতেই কালেজে যাইবেন?"

'না—এখনও সাত দিন ছুটি আছে, দেশে গিয়া মাকে একবার দেখিয়া আসিব।'

হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিল, বলিল, "আপনার মা! কই তাঁহার কথা তো এক দিনও বলেন নাই। আপনাদের বাড়ী কোথায়?"

"যশোহর জেলায়, আমাদের অবস্থা বড় ভাল নয়।"

হেমাঙ্গিনী কোন কথা কহিল না।

রমেন্দ্র বলিলেন, "ডাক্তারি পাশ হইতে পারিলে বোধ হয়, তাঁহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিব, সেই জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছি। মা আমাকে ওকালতী পাশ দিতে বলিয়াছিলেন।"

"তাহাই দিলেন না কেন? আমার বাবা উকিল ছিলেন।"

"ডাক্তারী আমি নিজে ইচ্ছা করিয়াই লইয়াছি, উকিলের অবস্থা এখন বড়ই খারাপ—ডাক্তারিতে যাহা হউক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"যা—পশমগুলা জড়াইয়া গেল!"

পশমের দোষ না হেমাঙ্গিনীর নিজের দোষে পশম জড়াইয়া গেল, তাহা বলা যায় না।

রমেন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আমি দেখি—আমি ছাড়াইয়া দিতে পারি কি না।"

হেমাঙ্গিনীর মুখ আরক্ত হইল। রমেন্দ্র পশমের এক দিক্ ধরিয়া পশমের পাক ছাড়াইবার চেষ্টা পাইলেন, অপর দিক্ হেমাঙ্গিনীর হাতেই রহিল, কাজেই তাঁহার মুখ অনেকটা হেমাঙ্গিনীর সন্নিকটবর্ত্তী হইল; ইহাতে হেমাঙ্গিনীর সুন্দর মুখখানি আরও রক্তিম হইয়া গেল—রমেন্দ্রের ঘাড় পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। শেষে উভয়ের মস্তক পরস্পর এত সন্নিকটবর্ত্তী হইল যে, তাহাদের মৃদু নিক্ষিপ্ত নিশ্বাস এক সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল।

তাঁহারা উভয়ে এতই অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, এই সময়ে আর এক ব্যক্তি যে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন না।

ইনি সতীশচন্দ্র। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা হেমাঙ্গিনী ও রমেন্দ্র চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। হেমাঙ্গিনীর রক্তিমাভ মুখ যেন একদম সাদা হইয়া গেল, কিন্তু সে আত্মসংযম হারাইল না, সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশচন্দ্র অগ্রসর হইলেন।

তখন রমেন্দ্র ও সতীশ উভয়ে মুখোমুখি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ। এই ছয় সপ্তাহ সতীশ দেশে গিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনী প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "সতীশবাবু, ইনি রমেন্দ্রবাবু।"

উভয়ে উভয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন; উভয়েই উভয়কে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্থির করিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "কখন আসিলেন? বাবার সঙ্গে দেখা হইয়াছে?"

"না। চাকর বলিল, তিনি এই ঘরে আছেন।"

রমেন্দ্র ভদ্রতার হিসাবে বলিলেন, "তিনি একটু আগে বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই।"

সতীশ তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া হেমাঙ্গিনীর দিকে ফিরিলেন। ইহা দেখিয়া রমেন্দ্রের মুখ লাল হইল, তিনি সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তখন সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম, এ লোকটা কে?"

হেমাঙ্গিনী মনে মনে রাগিয়াছিল, বলিল, "এইমাত্র ত বলিলাম, রমেন্দ্র বাবু।" স্বরটা একটু ঝঙ্কারের মত শুনাইল। নিজের স্বরে হেমাঙ্গিনী নিজেই চমকিত হইল, ভারি অপ্রস্তুত হইল, মনে মনে তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, "ইনি ডাক্তারী পড়িতেছেন, বাবার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বাবা দিন-কতক এখানে ইঁহাকে থাকিতে বলেন, তাহাই আছেন। বাবা ইঁহাকে খুব ভালবাসেন, আমরাও—"বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "ইনি বেশ ভাল লোক।"

সতীশচন্দ্র ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এস, তোমার মার সঙ্গে দেখা করি, তিনি ভাল আছেন ত!"

হেমাঙ্গিনী সতীশের কোন কথায়ই এ পর্য্যন্ত অমান্য করে নাই। কেবল আজ এই প্রথম তাহার হৃদয়ে এই বিদ্রোহাচরণ উপস্থিত হইল, সে

অস্বীকার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও আত্ম সম্বরণ করিল, কোন কথা না কহিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

* * *

পরদিন রমেন্দ্র হরকুমার বাবুর বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন হইতে সতীশের সহিতও হেমাঙ্গিনীর মনোবাদ ঘটিল, একদিন প্রায় কলহের মত হইল, তখন সতীশ ও হেমাঙ্গিনী দুই জনেই বুঝিলেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে। রমেন্দ্রের নাম উভয়ের কেহই করিলেন না সত্য, তবে উভয়েই বুঝিলেন যে, রমেন্দ্র না আসিলে কখনও এ অবস্থা ঘটিত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

বড়াল-কবি।*

বাঙ্গালা-সাহিত্যের সূত্রপাত কবিতায়। আর কবিতাতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি। এরূপ বিপুল বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন কবিতা-রাজ্য অন্যান্য সাহিত্যজগতে দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালার যে প্রাচীনসাহিত্য, তাহা পদ্য-সাহিত্য ;—তাহাই এক মহাসমুদ্রবিশেষ! প্রাচীনসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, এই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা এই কবিতা-বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন, অধিকতর বৈভবশালী। বঙ্গীয় উপন্যাস-রাজ্যে বঙ্কিমের মত প্রবল প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় রাজার সন্দর্শনলাভ অদ্যাবধি ঘটিল না। বঙ্কিমের সমকক্ষ হওয়াত দূরের কথা,—তাঁহার পদরেণু স্পর্শ করিতে সক্ষম, এমন ঔপন্যাসিকও বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল ;—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্যক্ষেত্রেও 'তথৈবচ'। নাট্যাকাশে একমাত্র গিরিশচন্দ্রই 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি' স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। অপরাপর নাট্যকারগণ ইহার তুলনায় ক্ষুদ্র জোনাকীবিশেষ!

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল-প্রণীত 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রত্যেকখানি ১।০।

কিন্তু কবিতা-কুঞ্জের অবস্থা এরূপ নহে। সুকণ্ঠ বিহগ-বিহগীর মধুর কল-কাকলীতে এ কানন সদা মুখরিত। এ সাম্রাজ্যের রাজ-সিংহাসন বড় একটা শূন্য রহে না। মধুসূদনই একা এখানকার 'সবে ধন নীলমণি' নহেন। ত্রয়াধিক সম্রাটের এখানে আবির্ভাব। তিন জন তিরোহিত হইয়াছেন,—সৌভাগ্য-ক্রমে এখনও একজন বিদ্যমান। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই সম্রাট চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই আপন আপন ভাস্বর প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণে সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কাহারও ছোট কিম্বা বড় নহেন;—সকলেই একাসনে বসিবার যোগ্য। কিন্তু এই কয়জনই কি এ কাব্যকুঞ্জের একমাত্র আশা-ভরসা,—একমাত্র সম্বল? এই কোহিনুর-চতুষ্টয় ব্যতীত অপর সকলগুলিই কি তবে ঝুটো? না,—তাহা নহে। 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র অনাদৃত দার্শনিক কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ,'সারদা মঙ্গলে'র বিহারীলাল, 'সদ্ভাব শতক'-প্রণেতা কৃষ্ণচন্দ্র, 'মহিলা'র সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও শ্রীমতী কামিনী সেন প্রভৃতি কবিগণ পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচ-নায় কেহ কাহারও ইতরবিশেষ হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা প্রায় সকলেই বঙ্গ সাহিত্যের এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্নবিশেষ। কিন্তু হায়! কয়জন পাঠক ঐ সকল কবিগণের কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আত্ম-পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন? কয়জন সাহিত্যসেবী উঁহাদের কবিতা-কুসুমের সৌরভ সঞ্চালন করিবার জন্য উদ্যোগী? স্বীকার করি, আগাছার প্রাচুর্য্য-প্রভাবে এই সকল পুষ্পিত তরু ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু আগাছা কোন্ সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বা না জন্মায়! বিলাতী সাহিত্যে এই আগাছা হইতে পুষ্পিত তরু পৃথক করিবার জন্য শত সহস্র সাহিত্যসেবী নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট,—নীরব! বঙ্গীয় পাঠকবর্গের দোষ যতটা হউক বা না হউক, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্যহীনতার দোষেই উঁহাদের কাব্যাবলী আলমারীর সর্ব্বোচ্চ কক্ষে অপাঠ্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। আজকাল যে দুই একজন লেখককে বঙ্গীয় কাব্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তাঁহারা কেবল রবীন্দ্র-নাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে লইয়াই টানাটানি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আলোচনা যদি প্রকৃত সমালোচনা হইত, তাহা হইলেও বাঁচিতাম। কিন্তু উহা সমালোচনার নামে নিছক স্তাবকতামাত্র। তাহাতে তৈলের গন্ধ ছাড়া আর কিছু বড় নাই। বঙ্গসাহিত্যের ইহা দুর্লক্ষণ সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালা সদ্গ্রন্থাদির আলোচনায় ব্রতী হইতে

আমরা অগ্রসর হইয়াছি। সফলতা লাভ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। আর বিফলমনোরথ হইলেও লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। কেন না, আমাদের দেশের নীতি-বাণীই আমাদের কর্ণকুহরে মন্ত্র দিয়াছে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"

কিছুকাল পূর্ব্বে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দুইটী বঙ্গীয় কাব্যাকাশে যেরূপ উদয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর দুইটী সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্য-গগনে সমুদিত। একজনের নাম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অন্যের নাম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল। বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের মত এই কবি দুইটী এক জোড়ার বটে; কিন্তু তাঁহাদের মত এক ছাঁচের নহেন। একজন optimist এবং অপর কবি pessimist. সেনকবির কাব্যে সদা আলোক প্রতিবিম্বিত। বড়াল-কবির কাব্য আক্ষেপময়,—তাহাতে অন্ধকারই অধিক প্রতিফলিত। তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রে কেমন একটা বিষাদ, অতৃপ্তি ও কাতরতাস্রোত অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত। প্রবন্ধান্তরে সেন-কবির কাব্যাবলীর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিব। এ প্রবন্ধে বড়াল-কবির কাব্যই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত।

কবিত্ব জিনিষটা কি, কবিতা কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে 'নানা মুনির নানা মত।' শুধু পাশ্চাত্য মতগুলি উদ্ধৃত করিলেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তক হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অসংখ্য অভিমত প্রচারিত থাকা সত্ত্বেও রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে কবিত্ব ও কবিতা জিনিষটার প্রত্যেকেই একটী জিনিষ ব্যতীত দুইটী জিনিষ নহে। কাব্যসমালোচনার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য বোধ করি।

কবিত্বের প্রধান উপকরণ—অনুভাবকতা এবং কল্পনা। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি বা তাহার কোন অংশের সহিত নিজ হৃদয়ের সম্বন্ধ সংস্থাপনের ক্ষমতা হইতেই এই অনুভাবকতা ও কল্পনার উৎপত্তি। অতএব বিশ্বপ্রকৃতি বা তাহার কোন অংশের সহিত নিজ হৃদয়ের সম্বন্ধ সংস্থাপনের ক্ষমতাকেই কবিত্ব বলা যাইতে পারে। এই অনুভাবকতা ও কল্পনাশক্তি একটু আধটু সকলেরি আছে, অর্থাৎ মানবমাত্রেই প্রায় অল্প বিস্তর কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন। তবে কি সকলকেই কবি বলিতে হইবে? বিশ্বচরাচর কবিতা ও সমগ্র মানবজাতি যে কবি, এরূপ একটা কথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু ওসব কথা কবিতাতেই শোভা পায়,—উহার মূল্য কিছুমাত্র

নাই। যাঁহার কবিত্ব আছে, তাঁহাকে ভাবুক বলিতে পারি, কিন্তু কবি বলিতে পারি না। অল্প বিস্তর সকলেই ভাবুক বটে; কিন্তু কবি সবাই নহেন। তবে ভাবুকের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা থাকিলেই কি সে কবি হয়? যিনি দেখেন ও দেখান, বুঝেন ও বুঝান, ভাবেন ও ভাবাইতে পারেন; তিনিই কি কবি? না!—তাঁহাকেও আমরা কবি বলি না। তিনি লেখক নামের যোগ্য বটে, কিন্তু কবি নহেন।

যাঁহারা বলেন যে, জনসাধারণের মনে জড়িত মিশ্রিত অবস্থায় সাধারণতঃ যে সকল ভাব থাকে, তাহাদিগকে আকারবদ্ধ ও পৃথক করার নামই কাব্য,—আমাদের মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কাব্যের অত বিস্তৃত ও উদার ব্যাখ্যার আমরা পক্ষপাতী নহি। তাহা হইলে প্রবন্ধের সহিত কাব্যের কোনই পার্থক্য থাকে না,—প্রবন্ধকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমাদিগের বিবেচনায় বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া ও বুঝাইয়া লিপিবদ্ধ করা, মানবহৃদয়ের ভাব সাধারণকে আকারবদ্ধ করা, লেখকমাত্রেরই কার্য্য। যিনি উহা না পারেন, তিনি লেখক নামের অযোগ্য। তবে যিনি মানবহৃদয়ের ঐ সকল জড়িত মিশ্রিত ভাবগুলি সরস করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লিখিতে পারেন, যিনি বর্ণনীয় বিষয় পাঠকের হৃদয়-পটে প্রতিবিম্বিত করিয়া পাঠক-হৃদয়ে রসোদ্ভাবন করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত কবি। আর তাঁহার সেই রসাত্মক রচনার নামই কাব্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, ভাব মহৎই হউক আর ক্ষুদ্রই হউক, উচ্চই হউক আর সামান্যই হউক, ভাবমাত্রেরই সরস অভিব্যক্তির নাম অথবা রসাত্মক বর্ণনা মাত্রেরই নাম কাব্য।

কবিতা কাব্যের অন্তর্গত হইলেও কবিতা-সম্বন্ধে এখনো একটু বলিবার আছে। কবিত্বসমন্বিত কবিতামাত্রই কাব্য বটে; কিন্তু কাব্যমাত্রেই কবিতা নহে। Wordsworth কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings." কিন্তু তাহা হইলে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে কবিতা বলিতে হয়। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কবিতা বলিব না। প্রকৃত নাটক নভেল প্রভৃতি গ্রন্থ কাব্যের অন্তর্ভূত হইলেও কবিতা নহে। কবিতার একটু বিশেষত্ব আছে। পরে তাহা দেখাইতেছি। তবে Wordsworthএর উপরিউক্ত কথাটী এক হিসাবে খুবই সত্য। কবিগুরু বাল্মীকির ক্রৌঞ্চবধদর্শন নিমিত্তক করুণোক্তি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আদি

কবির করুণার উৎস-মুখেই কবিতার জন্ম। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ঐ করুণোক্তি কি শুধু সাদাসিদা গদ্যভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছিল? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সেদিন কবিতার জন্মদিন এবং বাল্মীকিকে কবিতার জন্মদাতা বলিয়া কেহ স্বীকার করিত না। তীব্র অনুভূতি প্রকাশের জন্য সেদিন স্বতঃই বাল্মীকির মুখ হইতে এক অপূর্ব্ব ভাষা নিঃসৃত হইয়াছিল।

সেই ভাষা, ছন্দোময়ী ভাষা। এই ছন্দই কবিতার বিশেষত্ব। কথার যেটুকু অভাব, ছন্দ সেই অভাব পূরণ করিয়া থাকে। গদ্য রচনা হৃদয়াবেগ বা হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের যতই উপযোগী হউক না কেন, ছন্দোময়ী রচনা হৃদয়ভাব প্রকাশের তাহাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। পাঠকের মনে গদ্যাপেক্ষা পদ্যই বর্ণনীয় বিষয় অধিকতর প্রতিবিম্বিত করিতে সক্ষম। ছন্দকে কবিতার বাহ্যগঠন অথবা পরিচ্ছদজ্ঞানে উপেক্ষা করিলে ছন্দের মর্য্যাদা হানি করা হয়। ছন্দে মন আকর্ষণ করে। আর উহা ভাব সংযুক্ত হইলে উহা হৃদয় আলোড়িত করিয়া তোলে। ভাব কবিতার প্রাণ, আর ছন্দ তাহার দেহ। যাহা ভাবসংযুক্ত ও ছন্দবিশিষ্ট, তাহারই নাম কবিতা। এই উভয়ের সম্মিলনে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কবিতা হইতে ভাব বা ছন্দ যে কোন একটাকে বিচ্ছিন্ন করিলে কবিতা আর কবিতা থাকে না;—নির্জ্জীব ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে। তাই বড়াল-কবি 'কবিতা'র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন;—

"আহা, প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা
চারিদিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য্য অপার।" ইত্যাদি

কবিত্ব কি, কবি কে, কাব্য কাহাকে বলে ও কবিতা কাহার নাম প্রভৃতি একপ্রকার মোটামুটি সংক্ষেপে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন দেখা যাউক, অক্ষয়কুমার কিরূপ কবি, কোন্ ভাবের ভাবুক,—তাঁহার কবিত্ব কি!

বড়াল-কবির অনুভাবকতা ও কল্পনার প্রধান উপকরণ,—"রমণীর প্রেম-মুখ" এবং "প্রকৃতির শ্যাম বুক"। বিশ্বপ্রকৃতির প্রধানতঃ ঐ দুই অংশকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিত্ব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষায় দ্বারাই তাঁহার কবিত্বের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছি। কারণ, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য পাঠকসাধারণের নিকট অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে হয়। বড়াল-কবির কবিত্ব—

"একবার তব, নারি, প্রেম-মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যামবুক হেরি,
মনে হয়, দুইজনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি।
আমি বুঝি—আমি যেন একটী বিদ্যুৎমত
তোমাদের মাঝখানে চলি উছলিয়া,
মিশায়ে—মিলায়ে, মরি, মিশিয়া—মিলিয়া!"

এই কবিত্ব তাঁহার কোন্ জাতীয় পদ্য-কাব্যকে অবলম্বন করিয়া আকার লাভ করিয়াছে, এইবারে তাহাই আলোচ্য।

পদ্যকাব্যের নানা বিভাগ আছে। তন্মধ্যে গীতিকাব্য (Lyric) নামক যে এক শ্রেণীর কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে,' বড়াল-কবির কবিত্ব-কুসুম সেই শ্রেণীর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' নামক গীতিকাব্য দুইখানি এই কথা প্রমাণ করিতেছে। প্রমাণ পরে দেখাইতেছি। আপাততঃ গীতি-কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য মনে করি। কারণ, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের সহিত সাধারণ গীতি-কবিদিগের যে কি পার্থক্য এবং তাঁহার ঐ গ্রন্থ দুইখানি যে বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ মূল্যবান সম্পত্তি, তাহা পাঠক সাধারণের বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

ছবির যাহা উদ্দেশ্য, গীতিকবিতারও সেই ধরণের উদ্দেশ্য। চিত্র যেমন বহিঃ প্রকৃতির কোন একটী অংশের এক মুহূর্ত্তের অবস্থা প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অনন্তের আভাস দেয়; গীতিকবিতাও তেমনি অন্তঃ প্রকৃতির একটিমাত্র ভাবোচ্ছ্বাসকে গঠন দেয় এবং সেই সঙ্গে অনন্তের আভাস দিয়া থাকে। 'বুলস্ আই' লণ্ঠনের আলো যেমন কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিপতিত হইয়া সেই স্থানটির সমস্তটুকু সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে, গীতিকবিতাও সেইরূপ ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের খুঁটিনাটি শুদ্ধ সমগ্রটুকু পাঠকহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করে এবং উপরন্তু সেই সঙ্গে কতকগুলি ভাবের ইঙ্গিত দিয়া থাকে। গীতিকবিতার বিষয় ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু তাহার কবিত্ব প্রগাঢ়। বড়াল-কবি 'গীতি-কবিতা' সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"ক্ষুদ্র বন-ফুল বাসে,
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন;

ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে,
চির ঊষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন !"

* * * * *

"হৃদয়টা ভেঙে টুটে
তবে বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভিশ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল দুলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা।" ইত্যাদি

বড়াল-কবি 'গীতি-কবিতা' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে সে কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু আধুনিক গীতিকবিদিগের কবিত্বের প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে সন্দিহান্। তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' কোন একটী গীতিকাব্যের সমালোচনাকালে বৈষ্ণবকবিদিগের সহিত এখনকার গীতি-কাব্যলেখকগণের তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখনকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। নানাদেশ,নানাকাল,নানাবস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িনী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িনী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতি গুণহেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন বোধ করি, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কবিগণ নেহাৎ নাবালক,—তখনও সম্ভবতঃ তাঁহাদের কবিতা-শিল্প তেমন বিকাশ লাভ করে নাই। নহিলে বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে নিশ্চয়ই সঙ্কোচ অনুভব করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তিনি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রাদির গীতিকবিতাকেই আদর্শ করিয়া ঐকথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির এমন অনেকগুলি কবিতা আছে, যাহা বঙ্কিমের উপরি লিখিত উক্তিকে সগর্ব্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম। অক্ষয়কুমারের 'আসি তবে', 'নিশীথ গীত', 'সংসারে' 'রজনীর মৃত্যু' 'এই পথ দিয়ে গেছে'ও 'এই পথ দিয়ে যাবে' প্রভৃতি কবিতাগুলির প্রত্যেকটী শুধু এক একটী হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়াই যে

ক্ষান্ত, তাহা নহে। সেই সঙ্গে উহা পাঠকহৃদয়ে নানা স্মৃতি, নানা সুপ্তভাব জাগ্রত করিয়া তুলে। আসল কথা এই যে, যেখানে উপযুক্ত শক্তি বিদ্যমান, সেখানে দুই একটা প্রতিবন্ধ বড় বেশী কিছু করিতে পারে না। কেহ না মনে করেন, যে ইহাতে হেমচন্দ্রাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে। ছোট গল্প রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের অধিকতর শক্তি আছে বলিলে বঙ্কিমকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছোট লেখক বলা হয় না। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রাদির গীতি-কবিতা যে আদর্শ গীতকবিতা নহে, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

"সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী-ছবি
সেখানে আকুল।"

কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী। প্রকৃতির সহিত নিজ হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতাকেই কবিত্ব বলে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা সৌন্দর্য্য অনুভূতিরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং সৌন্দর্য্যঅনুভূতিকে কবিত্বের আর একটি সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। 'রমণীর প্রেমমুখ' ও 'প্রকৃতির শ্যামবুক'—বিশ্বপ্রকৃতির এই দুই অংশের সৌন্দর্য্যঅনুভূতি বড়াল-কবির কাব্যগ্রন্থে যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহাও বলিয়াছি। ঐ দুই সৌন্দর্য্যের মন্দিরেই তাঁহার কবিতার প্রতিষ্ঠা। এক্ষণে 'রমণীর প্রেম মুখ' দেখিয়া তিনি কি গাহিয়াছেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

'রমণীর প্রেম মুখ' দেখিয়া আমাদের দেশের যে সকল গীতিকবি নারী মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। সমগ্র নারীজাতির প্রতি এই দুই কবির অদম্য আকর্ষণ। সমগ্র নারী জাতি তাঁহাদের উপাস্যাদেবী,—তাঁহাদের কাব্যের নায়িকা। রমণী সম্বন্ধে এরূপ উচ্চভাবের এত অধিক গীতি আমাদের দেশে আর কেহ কখনও গাহিতে পারেন নাই। অন্যান্য সাহিত্যের কথা বলিতে পারি না। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, যে দেশে বঙ্গরমণীর অভাব সে দেশে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্র নাথের মত কবি জন্মাইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে বাঙ্গালী সে কবিতার আজও আদর করিতে শিখিল না। 'রমণীর অধর সুধা' ও 'পীন-পয়োধরের' প্রতি এই কবিদ্বয়ের ততটা লক্ষ্য নাই বলিয়াই বোধ করি তাঁহাদের কাব্য-রত্ন আবর্জ্জনাস্তূপেই ঢাকা পড়িয়া রহিল। যাহা হউক, এই দুই কবির

পর এ বিষয়ে বিহারীলালের অন্যতম শিষ্য বড়াল-কবির নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান গীতিকবিদেরশিরোমণি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য বটে; কিন্তু তাঁহার গীতি কবিতায় [অবশ্য তাঁহার কথা-কবিতা (narrative poems) ও সংলাপ-কবিতা (poems in dialogues) ছাড়া] তেমন উচ্চদরের নারী মাহাত্ম্য গীত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বড়াল-কবিতে গুরুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রমণী জাতিকে বলিতেছেন,—

"রমণি রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
যেন বিধাতার দৃষ্টি জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।

সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
শৃঙ্খলা দাঁড়ায়ে তোমা'পরে।
তপনের রশ্মি-বলে চলে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।

তোমারি ও লাবণ্য ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
মেঘ-ঘোরে স্বর্গের আভাস!

প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধকাম,
তোমা- মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি।

* * স্বর্গ চ্যুত, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত নরমতি

ভুলে গেছে জন্মগত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা,
পেয়ে তব প্রেমের আরতি।

দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা।
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা সুধা-সিন্ধু নাহি বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা!

নিজ করে গড়ি ও প্রতিমা,
নিজে বিধি মুগ্ধনেত্রে চাহি।
স্বর্গের স্খলিত ধরা আবার উঠিছে স্বর্গে
ও দেহে হৃদয়ে অবগাহি।"

এই উপরি উদ্ধৃত কবিতায় রমণীজাতি সম্বন্ধে যে মহান্ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

সাময়িক সাহিত্য।

বিভিন্ন দেশের পরিণয়-পদ্ধতি।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

ভারতবর্ষের ও পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানদিগের বিবাহ-পদ্ধতি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। ভারতবর্ষে অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের সাধারণ প্রথা ব্যতীত অনেকগুলি বাজে প্রথার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আবার এক জাতির মধ্যেও বিবাহে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। "স্ত্রী-আচার" বিবাহের অঙ্গীভূত না হইলেও, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহা বংশপরম্পরায় সংস্কার। উহা মজ্জাগত। কিন্তু নানাজাতির মধ্যে নানারূপ বিবাহের সংস্কার থাকিলেও মূল বিবাহের নিয়ম হিন্দুজাতির মধ্যে এক।

ভারতবর্ষীয় জাতিদিগের মধ্যে যাহা বিবাহের সংস্কার বা স্ত্রী-আচার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে তাহাই (অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়া) আসল বিবাহ। নিম্নে কয়েকটী প্রদেশের পরিণয়-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মরোক্কো—পাঠকের মধ্যে হয়ত অনেকেই জানেন না Bride Box কি। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী খাঁচা বিশেষ। ইহাতে রঙ বা বার্ণিসের পরিবর্ত্তে চুণ মাখানো হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বায়ু-সঞ্চালনের পথ খুব কম, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে বর চতুর্দ্দোলা চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। মরোক্কোর ক'নে খাঁচায় বসিয়া বিবাহ করিতে আইসে। চতুর্দ্দোলার আরোহণ আরামপ্রদ, খাঁচায় ভ্রমণ ক্লেশকর। বিবাহের সময় ক'নে সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া এই খাঁচায় আরোহণ পূর্ব্বক পতি-গৃহে গমন করে। সেই খাঁচার মধ্যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। বাদ্যকরগণ সুললিত সুর ছড়াইতে ছড়াইতে এই কান্যাযাত্রীদিগের প্রোসেসনের সহিত গমন করে। বরের বাটীর সম্মুখে আসিলে, ক'নে যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় খাঁচা হইতে অবতরণ করে।

বিবাহের পর দুইদিন ধরিয়া Honeymoon হয়, তৎপরে উক্ত বাক্স বা খাঁচাটী বাটীর সুউচ্চ ছাদের উপর এমন স্থানে রক্ষিত হয় যেখানে লোকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন উহা দেখিয়া বুঝে যে দম্পতী সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত এবং তাহারা দলে দলে দম্পতীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। ক'নেকে কিন্তু তখন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে দেওয়া হয় না। সে সময়টা সে নীরবে কাটাইয়া দেয় ও তাহার স্বামী বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করে।

মরোক্কোবাসীদের বিবাহে কেবল ঐ 'খাঁচা আরোহণ' ব্যতীত অন্য কোন অসভ্যজনোচিত আচার-ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

নিউহেব্রাইডস—(New Hebrides)—এই স্থানের বিবাহেচ্ছু রমণীকে অশেষ অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পাথর দ্বারা তাহার সম্মুখের দাঁতের পাটী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই দাঁত ভাঙ্গিবার ভারটী কোন বৃদ্ধা রমণীর হস্তে অর্পিত হয়। বৃদ্ধাও অতি প্রফুল্লিতচিত্তে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত এই পৈশাচিক কার্য্যটী সম্পাদন করে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে বাল্যকালে তাহার যে দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে এই বালিকার নিকট তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতেছে। কোন বালিকা ইহাতে অসম্মতা হইলে তাহাকে সকলের ঘৃণাস্পদ হইয়া চিরকাল অনূঢ়া থাকিতে হয়।

নিউ আয়র্ল্যাণ্ডে—(New Ireland) বালিকাদের উপর খুব অত্যাচার হইয়া থাকে। পিতা বা অভিভাবক অবস্থাপন্ন হইলে সে একটী খাঁচা প্রস্তুত করিয়া তাহার ৮।১০ বৎসরের বালিকাকে তন্মধ্যে পাঁচ বৎসর কাল আবদ্ধ রাখে। যেমন পাঁচ বৎসর অতীত হয় তাহাকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। এই খাঁচা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এত ক্ষুদ্র যে, অতি কষ্টে একজন উহার মধ্যে থাকিতে পারে।] দিনান্তে স্নানের সময় মাত্র একবার তাহাকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া আনা হয়।

এরোরিদ্বীপ—(Gilbert গিলবর্ট দ্বীপ-পুঞ্জস্থিত) ইহাদের বিবাহ প্রথা সভ্যজাতি-দিগের ন্যায় এবং পতি-বরণ আমাদের দেশের স্বয়ম্বর প্রথার ন্যায়।

করপ্রার্থিগণ সকলে সমবেত হইয়া ক'নের বাটীর একটী দ্বিতল কক্ষে বা পার্শ্বের ঘরে অবস্থান করে এবং ক'নে নীচের কক্ষে একাকী বসিয়া থাকে।

করপ্রার্থিগণ এক একটী করিয়া নারিকেল পত্র ক'নের ঘরে একটী গবাক্ষ দিয়া ফেলিয়া দিতে থাকে। ক'নে এক একখানি করিয়া পত্র টানিয়া লয় এব জিজ্ঞাসা করে উহা কাহার, তৎক্ষণাৎ আশাপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর আইসে। উত্তরে কণ্ঠস্বর বুঝিয়া ক'নে তাহার প্রণয় পাত্রকে নির্ব্বাচিত করে। যতক্ষণ না সে তাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়, ততক্ষণ সে পত্র তুলিতে থাকে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে পত্রটী কাহার। যদি পূর্ব্ব হইতে ক'নের কোন প্রণয়-পাত্র না থাকে সে উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়া স্বর-মাধুর্য্য লক্ষ্য করে এবং যাহার স্বর তাহার হৃদয় মুগ্ধ করে, তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করে।

জাপান—জাপানীদের বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন অনেকটা বাঙ্গালীর মত। তবে তাহাদের বিবাহ-রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। পাশ্চাত্য প্রদেশের ন্যায় জাপানে কোর্টশিপ-প্রথার প্রচলন নাই। সন্তান বিবাহোপযোগী হইলে তাহার পিতামাতা বা তাঁহাদের অবর্ত্তমানে কোন অভিভাবক কর্তৃক একজন ঘটক নিযুক্ত হয়। তাহার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন অভিভাবক কর্তৃক বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হয়। বলা বাহুল্য, বিবাহে পুত্রকন্যা কাহারও অভিমত গ্রহণ করা হয় না। যখন বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায় তখন ভাবী দম্পতী পরস্পর সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পায়।

ইহাদের বিবাহ-প্রথা খুব সোজা এবং আয়োজন অতি সামান্য। পাত্রের বাটীতে —যেখানে ভবিষ্যতে দম্পতীকে বসবাস করিতে হইবে—বিবাহের উৎসব হয়। পাত্রী রেশমের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে দেহ আবৃত করে। তাহার আত্মীয়বর্গ তখন হইতে তাহাকে মৃতজ্ঞান করিবে বলিয়াই এই শ্বেতবর্ণ শোকবস্ত্র ধারণ করা হয়। তাহার পর ঘটক ঘটকী এবং দুইজন যুবতী সহচরীর সমক্ষে দম্পতীর প্রত্যেকে তিনটী মদিরা-পাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক তিনবার করিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেন। ইহাই জাপানীদের বিবাহ-প্রথা।

কোরিয়া—(Korea) কোরিয়াবাসীদিগের বিবাহ-প্রথা কতকটা জাপানীদিগের ন্যায়। বিবাহ-দিনে দম্পতীর শুভদৃষ্টি হয়, তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ বা আলাপ থাকে না। বিবাহের দিন বর একটী সাদা টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া কন্যার বাটীতে গমন করে এবং তাহার ভাবী পত্নীর সহিত আলাপ-পরিচয়-অন্তে তাহাকে বিশ্বস্ততা ও নম্রপ্রকৃতির আদর্শ একটী রাজহাঁস স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার প্রদান করিয়া আসে।

তিব্বত—তিব্বতদেশে কোন যুবক বিবাহেচ্ছু হইলে সে তাহার পিতামাতার সহিত প্রণয়-পাত্রীর তাঁবুতে গমন করে। উভয় পক্ষের পিতামাতা পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলে, বরের পিতা পুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করে। কন্যার পিতা সম্মত হইলে, যুবক কতকটা মাখন লইয়া যুবতীর ললাটে লেপন করিয়া দেয়; যুবতীও ঐরূপে প্রত্যভিবাদন করে, ফলে মাখন-মর্দ্দিত যুবকযুবতী পতি-পত্নীতে পরিণত হয়।

মালয়প্রদেশ—(Malaya) মালয় প্রদেশের রাজপুত্রের পরিণয়ে 'গাঁটছড়া' বন্ধন-কার্য্য ও উৎসব শেষ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে। বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে

তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেওয়া হয় না। বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হইয়া গেলে ষোলজন স্ত্রীলোক তাহার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নববধূকে উপস্থাপিত করা হয় না।

সার্ভিয়া—(Servia) সার্ভিয়াবাসীর বিবাহ-পদ্ধতি একেবারে নূতন ধরণের। শ্বশুরবাটীতে আসিয়া ক'নে তাহার শাশুড়ী ও রন্ধনশালায় উনান তিনবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে। বিবাহ-উৎসবের সময় একজন ভাঁড়কে নিযুক্ত করা হয়। সে গৃহের যাবতীয় দ্রব্য, জ্বালানী-কাঠ প্রভৃতি নানাস্থানে নিক্ষেপ করিতে থাকে। বিরক্তির ভাব না দেখাইয়া ও দ্বিরুক্তি না করিয়া ক'নে সেগুলি যথাযথ স্থানে পুনঃ সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়া প্রমাণ করে যে, অতঃপর সে শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাহার নূতন-ঘরের কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিবে ও গৃহে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হইবে।

পরমায়ুঃ।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে আমাদের পৃথিবীর পরমায়ুঃ ১৯৫৬৩১২০০০ বৎসর। তাহার মধ্যে ভূসৃষ্টি কাল হইতে ১৯৫৫৮৮৫০০৮ বৎসর অতীত হইয়াছে আর ৪২৬৯৯২ বৎসর পরে কলিযুগ গত হইবে, তাহা হইলেই বোধ হয় এ পৃথিবীর অন্ত হইবে। খৃষ্টান শাস্ত্রমতে পৃথিবীর বয়স ইহাপেক্ষা কাঁচা, আবার পাশ্চাত্য জ্যোতিষের পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে মত এই দুই মত হইতে বিভিন্ন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কত সময়ে কতটা পাথর বাড়ে এই সব তত্ত্বের গবেষণা করিয়া বসুন্ধরার বয়স সম্বন্ধে নানারূপ প্রস্তাব করিয়া বসেন। এ সকল বিষয়ে বলিবার কিছু নাই। কারণ আমরা অজ্ঞ, এ সকল অঙ্ক ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি না। প্রাচীন কালের মুনি ঋষি বা অপরাপর লোকের পরমায়ুঃ সম্বন্ধেও নানারূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে মাত্র এইটুকু নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রাচীন কালের নরনারী আধুনিক সময়ের নরনারী অপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিত।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতে আমাদিগের সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ হইতে এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদ দীর্ঘায়ুঃ। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু জীব হস্তী ১০০—১৫২ বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। কিন্তু ৭০০, ৮০০ বৎসরের

অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষের আমাদিগের দেশে অভাব নাই। যদি প্রয়াগ-তীর্থের অক্ষয় বটের বয়ঃক্রম-সম্বন্ধে গল্প সত্য হয়, তাহা হইলে তো উহার প্রাচীনত্ব অত্যধিক বলিতে হইবে। ডি কণ্ডোল (De Condolle) নামক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কতকগুলি দীর্ঘজীবী বৃক্ষের একটি ফর্দ্দ করিয়াছিলেন। অকাল মৃত্যুতে নষ্ট না হইলে কোন বৃক্ষ কতদিন বাঁচিতে পারে, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যে বিস্ময়কর ফর্দ্দ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে গোটাকতক উদাহরণ দিলাম।

বাওবব (Baobob) বৃক্ষ	জীবনকাল ৫০০০ বৎসর।
ট্যাক্সোডিওম ডিস্‌টিসম (Taxodium Distichum	৩০০০ হইতে ৪০০০ বৎসর।
ইউ (Yew) ৪টি	১২১৪, ১৪৫৮, ২৫৮৮ এবং ২৮৮০ বৎসর।
ওক্ (Oak) ৩টি	৮১০, ১০৮০, ১৫০০ বৎসর।
সিডার (Cedar)	৮০০ বৎসর।
অলিভ (Olive)	৭০০ বৎসর।
তালবৃক্ষ	৬০০, ৭০০ বৎসর।
কমলালেবু	৬৩০ বৎসর।
আইভি (Ivy)	৪৫০ বৎসর।

বলা বাহুল্য, ডি কণ্ডোল সাহেবের তালিকা নির্ভুল হইলে স্বল্পায়ু মানবজাতি উদ্ভিদের পরমায়ু দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইতে পারে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল বৃক্ষ খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে তাহারা স্বল্পায়ু। অস্মদ্দেশের কদলীবৃক্ষ তাহার উদাহরণ। যে পাদপের কাষ্ঠ বেশ দৃঢ় ও সারবান হয় সে সকল বৃক্ষ দীর্ঘজীবী। আম, কাঁটাল, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ ঐ শ্রেণীর। অশ্বত্থ, বট, ওক বা বণি প্রভৃতি গাছ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বহুদিন প্রাণধারণ করে। আবার এই সকল বৃক্ষকে যত্ন করিয়া রোপণ করিলে অনেক সময় শৈশবেই কালকবলিত হয়। অনেকে বলেন, যে সকল বৃক্ষে অম্লরসযুক্ত ফল হয় সে সকল বৃক্ষ মধুর রসযুক্ত ফলধারী বৃক্ষাপেক্ষা অধিক্ দিন প্রাণ ধারণ করে। এ কথাটার সত্য মানবসমাজে নিত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দীর্ঘজীবী বৃক্ষসম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) দীর্ঘজীবী বৃক্ষ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(২) বড় হইলে তবে ইহা হইতে অপর বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং অল্পে অল্পে অপর বৃক্ষ উৎপাদন করে।

(৩) ইহার তনু শক্ত হয় এবং ইহার দেহে জলীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে।

(৪) দীর্ঘজীবী বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ হয় এবং অনেকটা স্থান অধিকার করে।

(৫) এ শ্রেণীর বৃক্ষ ভূমি ছাড়িয়া শূন্যমার্গে বহুদূর উঠিয়া থাকে অর্থাৎ উচ্চ হয়।

প্রাণীজগত এত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত যে, সকল শ্রেণীর জীবের জীবনকাল বর্ণনা করা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। একশত দেড়শত বৎসরের অধিক কোনও জীবকে দেহ ধারণ করিতে তো অন্ততঃ এ কালে দেখা যায় না। মনুষ্য ও হস্তীই প্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী এবং কীট পতঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পজীবী। ভগবান অনেক ক্ষুদ্র জীবের একদিনের অধিক পৃথিবীতে থাকিবার ব্যবস্থা করেন নাই। বিজ্ঞানবলে অসংখ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকায় জীব আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অথচ তাহাদিগের ক্ষুদ্রায়তন হেতু আমরা এমন কি অনুবীক্ষণ সাহায্যেও তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদিগের জন্য যে কতটুকু আয়ু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই।

শীতরক্ত জীবের অধিক পরমায়ু হয়। মৎস্য, ভেক প্রভৃতির কলেবর হিসাবে আয়ু যথেষ্ট দীর্ঘ। কোন কোন মৎস্যকে দেড়শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কচ্ছপ শতবর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে। আমাদিগের দেশের কুম্ভীরগুলা দীর্ঘজীবী। অনেক কুম্ভীর শত বর্ষ বয়সের,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ৫০, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কুমীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এমন ব্যক্তির দেহস্থিত অলঙ্কার কুমীর মারিবার পর তাহার উদর হইতে অবিকৃত পাওয়া গিয়াছে।

পক্ষীজাতির মধ্যে বায়স, ঈগল এবং শুকজাতির পরমায়ু অধিক। ১০০ বৎসরের পিঞ্জরাবদ্ধ কাকাতুয়া দেখা গিয়াছে। ইহা স্বাধীনভাবে বোধ হয় উহাপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে। ময়ূরও ২০ বৎসর দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকলেবর বিহঙ্গমাপেক্ষা বৃহদায়তন পক্ষীগণ

অধিককাল বাঁচিয়া থাকে। তবে এক একটা ক্যানারীকে ১৫, ২০ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

অপর প্রাণীদিগের জীবনকালসম্বন্ধে হিন্দুদিগের মত ঐরূপ—

শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ
পরমায়ুমিদং প্রোক্তং নরানাং করিণামিহ।

সচরাচর মানুষ কিম্বা হস্তী একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবনধারণ না করিলেও কেহ কেহ শব্দমালা-বর্ণিত পূর্ণায়ু উপভোগ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অস্মদ্দেশে আজকাল দীর্ঘায়ু ব্যক্তির উদাহরণ বিরল। এই মতে সারমেয় দ্বাদশ বৎসর প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু আমরা ১৫, ২০ বৎসর অবধি বয়সের কুকুর দেখিয়াছি। 'পঞ্চবিংশতি বর্ষাণি খরস্য করভস্য চ'-মত আদৌ নির্ভুল নহে। খর বা গর্দ্দভ, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বাঁচিতে পারে এবং করভ বা উষ্ট্র অন্যূন ৫০ বৎসর অবধি বাঁচে। কোন কোন উষ্ট্র ৮০ বৎসর অবধি বাঁচিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। বৃষ ও মহিষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে 'চতুর্ব্বিংশতিরব্দানাংবৃষস্য মহিষষ্য চ।' একথা ঠিক হইলেও 'মৃগশূকর বস্তাদি-পশূনাং ষড়দশান্বিতাঃ' মৃগসম্বন্ধে এমত নির্ভুল নহে। মৃগজাতি ২৫, ৩০ বৎসর প্রাণধারণ করিতে পারে। শৃগাল অত্যন্ত কার্য্যক্ষম ও কর্ম্মসহিষ্ণু হইলেও দশ বৎসরের অধিক প্রাণধারণ করে না।

অনেক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যে পরিমাণকাল গর্ভ মধ্যে বাস করে, তাহাদের জীবনও সেই পরিমাণে স্বল্প ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। যে সকল জীব অল্পদিন গর্ভবাস করে, তাহারা স্বল্পায়ু হয়। এ বিষয়েও আবার মতদ্বৈধ আছে। ম্যাককেণ্ড্রিক সাহেব একটি তালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এ মতের অসারবত্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

জীব	গর্ভধারণকাল	জীবনকাল।
হস্তী	৫৩৯ দিন	১০০ বৎসর
অশ্বী ও গর্দ্দভ	৫৩০ দিন	৩০—৪০ বৎসর
গাভী	২৮৬ দিন	১৫—২০ বৎসর
মানুষ	২৮০ দিন	৮০—১০০ বৎসর
মৃগ	২৮০ দিন	৩০ বৎসর
বানর	১৫০ দিন	১০ বৎসর
শূকর	১২০ দিন	১৫—২০ বৎসর

জীব	গর্ভধারণকাল	জীবনকাল।
বিড়াল	৫৬ দিন	১৫—২০ বৎসর
সারমেয়	৬৩ দিন	১৫—২০ বৎসর

কেহ কেহ বলেন, যে বয়সে জীব সন্তানোৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, সাধারণতঃ সে তাহার পাঁচ গুণ কাল জীবনধারণ করে। এ বিষয়েরও সত্য ঠিক কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে, এই নিয়মানুসারে তাহাদিগের জীবনের সীমা ৭০ বৎসর। যে দেশে একটু অধিক বয়সে বিবাহ হইবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে দেশের লোকের জীবনকাল একটু অধিক।

জগদীশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীর কার্য্য করিবার জন্য যে দেহ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ নষ্ট না করিলে শত বৎসরের অধিক রক্ষা করা যাইতে পারে। এ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, এ দেহ জীর্ণ হইলে জীর্ণ বস্ত্রের মত ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন দেহ ধারণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমরা এ দেহ যতদিন রক্ষা করা যাইতে পারে তাহাপেক্ষা অনেক অল্পদিন মাত্র রক্ষা করি। প্রাণীদিগের হিংসাবৃত্তির জন্য কত জীব পূর্ণ পরমায়ু উপভোগ করিতে পারে না, তাহা আমরা নিত্য অনুমান করিতে পারি, তাহার পর ঠিক উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া অনেক সময় জীবকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং যখন আমাদিগের স্নেহের পাত্রের অকালমৃত্যুশোকে অধীর হইয়া আমরা বিধাতাকে নিন্দা করি, তখন আমাদিগের বুঝা উচিত যে, আমাদিগের শোকদুঃখের বিধাতা ভগবানের নিকট হইতে যে পবিত্র আশীষকণা মরজগতে আসে,—তাহা কেবল মঙ্গলময়, কেবল আনন্দকর এবং আমাদিগের অযোগ্য হস্তে পড়িলে আমরা তাহাকে আমাদিগের শোকের কারণ গড়িয়া তুলি।

কবিতা-কুঞ্জ।

দুঃখের বোঝা।

দুখের উপর দুখ মোরে দিলে
তাহে ক্ষতি মোর নাই।
হারাই না যেন হে মধুর প্রভু!
তব পদে ভিক্ষা চাই॥
নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে
কিছু বাধা নাহি মানি।
তবেত পারিব হেলে বহিবারে
দুখের পাসরা খানি॥
চারিদিকে দেখ বেঁধেছে আমারে
জগত পাইছে ভয়।
আমার ত প্রভু কেহ নাহি আর
ভয়ের প্রসর নয়॥
যা' হবার হবে তুমি মোর রবে
তা'হলে থাকিব স্থির।
সব যদি আসে তুমি যদি যাও
তাহে কি পাইব তীর?
কাল সিন্ধুতীরে রয়েছি বসিয়া
পাতিয়া আপন কান।
লও যদি প্রভু ডাকিয়া আমায়
করিহে জীবন দান॥
কেন এ'রা বলে এ'টা কর তুমি
তোমারে ছাটিয়া ফেলি।
যা'করিবে নাথ তাহা মোর কাজ
দেখিব নয়ন মেলি॥
দুখ যে দুস্তর পেতেছি বিস্তর
তোমার অমৃত দান।
বড় ভাগ্যবান নহিলে যে দুখ
হয় না রে আগুয়ান॥
সুখ মোর যেন হয়েছে ভূষণ
পেয়ে তোমা হেন ধন।
চরণে রাখিও দয়াময় প্রভু
যাচি এই অনুক্ষণ॥

শ্রী অক্ষয়কুমার ঠাকুর।

ভগ্ন-গেহ।

১

চারিদিক নিঝুম-নিথর!
যামিনীর কণ্ঠচেপে, কে যেন বসিয়া আছে
শুষ্ক-হাস্য-সমভার পড়ে বালুচর!
হঠাৎ জাগন্ত বায়ু, কাননে শ্বসিয়া উঠে
পত্রে পত্রে ঢেউ তুলে বহে মর্-মর্।
অভিশাপ-বাণী কার, ভগ্ন-কণ্ঠে উচ্চরিয়া
কালো-ডানা ঝটপটি ওড়ে নিশাচর!
চুপি চুপি বহে নদী, কলরব ভুলে গিয়ে
সভয়-হিল্লোল ওঠে স্তব্ধবক্ষপর।
চারিদিক নিঝুম নিথর।

২

আলো-মাখা স্তম্ভিত ভুবন।
উচ্চ-ঝাউ-শিরে আঁকা চাঁদের রূপা'র থালা
নিশীথ-বাঁশীতে কার অস্ফুট রোদন।
মাঠ-শেষে কালি-ঢালা গ্রাম-খানি ঘুমে সারা
অলস-সুরভি ঢালে দূর নেবু-বন।
নদী-তটে শ্মশানেতে, জ্বলিছে কাহার চিতা
বিকট শৃগাল-নাদে ভরিছে গগন!
তার মাঝে ভাঙা-কুঁড়ে, প্রান্তরে দাঁড়ায়ে একা
অন্তকালে গর্ত-সঙ্গী বৃদ্ধের মতন!
আলো-মাখা স্তম্ভিত ভুবন।

৩

ভগ্ন-গেহ করিল বিমনা।
কে জানে উহারি মাঝে, কতকাল আগে হায়!
উঠেছিল হাস্য-রোল—গীতের গাহনা!
জনক-জননী-স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা—
সান্ত্বনা-আশীষ-ধারা বহেছে কতনা!
রমণী'র কত প্রেম, কত মান-অভিমান,
কত দান প্রতিদান, ভজনা—সাধনা!
কত দুরু দুরু বুক, কত বুকে বাঁধা থাকা—
পথ-চেয়ে নিশি-যাপা—বিরহ-বেদনা!
ভগ্ন-গেহ করিল বিমনা!

৪

এবে সব আঁধারে মগন!
আঙিনাতে ঝোপেঝাপে, ওঠে ঝিল্লী-আর্ত্তনাদ!
নিভৃত-আরামে শুয়ে সাপিনীসফণ।
ভাঙা-ছাদ রন্ধ্রে আসে, দীপ্ত এক চন্দ্রকর,
বিধবার দগ্ধ বুকে সন্তান যেমন।
ছেয়ে আছে মহাবট, বুকে অন্ধকার চাপি,
শাখায়-শাখায় তার কাঁদিছে পবন।
নিঃশেষ গরিমা তোর! রে নির্জ্জন ভগ্নবাস!
তোকে দেখে অশ্রুজলে ভরিল লোচন!
এবে সব আঁধারে মগন।

৫

এক রীতি সংসারে কেবল!
ভুবন-ভবনে এসে, কোথা থেকে কত নর,
ভাবে বিশ্ব কবিস্বপ্ন,—সুবর্ণকমল।
দু'দিন খেলিয়া খেলা, দু'দিন গাহিয়া গান,
দু'দিন করিয়া পান, মায়ার গরল।
রোদ-পোড়া খরা বুকে, সাঁঝের আঁচল-তলে,
গাছের ছায়ার মত মিলায় সকল।
জাগেপিছে অন্ধকার, চকিত তাড়িত যথা—
মাঝে সুধু ক্ষণদীপ্তি,—ক্ষণিক সম্বল।
এক রীতি সংসারে কেবল!

৬

ছোটে বিশ্বে সর্ব্বনাশা বাণ!
আবার গাহিবে পাখি, আবার গাহিবে নদী,
আবার গাহিবে বায়ু ঘুম-ভাঙা তান!
শূন্য হিয়া রে কুটীর! তোমার হৃদয়-মাঝে,
আবার উঠিবে কিগো মানবের গান?!
যতদিন ছিল নর, কঁড়ে তার সাজাইত—
বিজনতা সাথে আজ সব অবসান!
তেমনি গৌরব নাহি, তোমারি প্রণয়ী কাছে,
দেহ-গেহ ছাড়ি যবে চলি যায় প্রাণ!
ছোটে বিশ্বে প্রাণনাশা বাণ!

৭

সব যায়,—নাহি কারো ত্রাণ!
পতি ছেড়ে পত্নী যায়, ধন ছেড়ে ধনী যায়
কাঁথা ছেড়ে দীন যায়—নাহি কারো ত্রাণ!
অগ্নির ক্রপদ সুধু, কেঁপে কেঁপে ব'লে ওঠে—
যায়—যায়, সব যায়,—নাহি কারো ত্রাণ!
হাসি যায়, কান্না যায়, প্রেম যায়, কাম যায়—
গর্ব্ব যায়—ঘুচে যায় মিছে অভিমান!
আশা ভালবাসা যায়, যত্ন করা রত্ন যায়—
একটী পলকে সব ভেঙে খান খান!
যায়, যায়,—সব যায় নাহি কারো ত্রাণ!
বুকে বাঁধা মুখ যায়, মূর্ত্তিমতী প্রেম যায়,
ফোটা ফুল মুদে যায়, স্বপ্ন-লতা দান।
শৈশবে'র সখা যায়, কোল-আলো শিশু যায়,
প্রলয়ে'র ধারা একি বহে খরবাণ!
যায়, যায়,—সব যায় নাহি কারো ত্রাণ!

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত। প্রথম ভাগ। শ্রীগুরুদাস বর্ম্মণ প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

পরমহংসদেবের চরিত্র আলোচনা করিবার আমরা অনধিকারী, অন্ততঃ এখনও যে তাহার উপযুক্ত হই নাই; একথা প্রথমেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য মনে করি। কে কবে তর্জ্জনী ক্ষেপণ করিয়া মহাপারাবারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে? আত্মসুখসর্ব্বস্ব 'শিশ্নোদর পরায়ণ' আমরা,—আমাদের দ্বারা কামকাঞ্চনত্যাগী সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ দেবের যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণ কি সম্ভবপর? এই গ্রন্থের একস্থানে আছে যে, একদিন রামকৃষ্ণ দেব কেশবচন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে কেশবকে দুই একটি সাংকেতিক কথায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিলেন, তাহা কেবল কেশবই বুঝিলেন, আর কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না দেখিয়া রামকৃষ্ণ দেব সহাস্যে কহিলেন, "কালার কথা বোবায় বোঝে অন্যের লাগে ধাঁধা। এরা কি বুঝ্‌বে? এরা সব ভূত।" প্রকৃত কথাই তাই। মহাপুরুষগণের অনেক কথাই সাধারণের নিকট 'ধাঁধা' বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অনেক সময়েই সাধারণের চক্ষে 'বুজরুকি' বা 'পাগ্‌লামী' বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত পড়িয়া যতটুকু আমরা বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন খ্যাতনামা লেখকের ভাষার পুনরাবৃত্ত করিয়া শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে সাহস করি যে, "Sri Ramkrishna came to begin the consummation of the work of the previous heroes, and all the development of the previous two thousand years and more, since Buddha appeared, has been a preparation for the harmonization of spiritual teaching and experience by the avatar of Dakshineshwar"

মহাত্মাগণের জীবনীগ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের অধ্যয়নীয়। তাঁহাদের জীবনচরিত মানবের জীবনতরণীর কর্ণধার স্বরূপ; এমন কি জাতীয়জীবনের নিয়ামক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভ্রান্তপথের পথিকের ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে জীবনীগ্রন্থ যেরূপ সক্ষম; শত সহস্র উপদেশ বা বক্তৃতা সেরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যদি গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলেই তদ্দ্বারা মানবের উপকার সাধিত হইয়া থাকে;—নতুবা নহে। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবু বলিয়াছেন যে, "সাধারণতঃ জীবনীগ্রন্থের প্রধান এবং সুমহৎ গৌরব ও আকর্ষণশক্তি সত্যবিবৃতি; খাঁটি সত্য, নিরবচ্ছিন্ন সত্য, অসঙ্কোচ সরলতার সহিত বলিতে হয়; সরলতার সহিত সাহস এবং সাহসের সহিত সহানুভূতিপ্রবণ উদারতার উহাতে প্রয়োজন। সত্য

সঙ্কুচিত হইবে না, আবৃত হইবে না, তাহার অক্ষরার্দ্ধও অপ্রকাশিত থাকিবে না। জীবনী গ্রন্থের ইহা প্রথম অঙ্গ, এবং অতি প্রধান অঙ্গ।" বলা বাহুল্য, বাঙ্গালাসাহিত্যে এরূপ গুণসমন্বিত জীবনী গ্রন্থের একান্ত অভাব। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের লেখককে উক্ত অপরাধের অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার প্রবীণ ও লিপিশক্তিতে বিশেষরূপ পরিপক্ক। তিনি রামকৃষ্ণ দেবের জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনাবলীর সমাবেশে রামকৃষ্ণ দেবের চরিত্র দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া পরমহংস দেবের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের কোনস্থলে স্বীয় মন্তব্য বা বক্তৃতা দ্বারা পাঠকের বিরক্তিভাজন হইবার চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছি, এই উপাদেয় গ্রন্থের ২য় ভাগ যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয় তৎপক্ষে উদ্যোগী ও যত্নশীল হইবেন।

সাহিত্য-সমাচার।

উপাসনা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। "ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব" প্রবন্ধের এ সংখ্যায় '৩য় অংশ' প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের নিকট আমাদের প্রশ্ন এই যে, প্রবন্ধটি আর একটু বিশদ করিয়া লিখিলে ক্ষতি কি? যিনি দুরূহ তত্ত্ব সকল লিপিচাতুর্য্যগুণে পাঠক সাধারণের পাঠযোগ্য করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত লেখক নামের যোগ্য। সাধারণ পাঠকে এ গুরুগম্ভীর রচনায় দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের "ইউরোপীয়গণ ভারত সন্তান" নামধেয় প্রবন্ধের এবারে দ্বিতীয় প্রস্তাব বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "বিরহে" চলনসই কবিতা;—বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। "সিংহাচল-যাত্রা" একটি ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণ কাহিনীর আরম্ভ আশাপ্রদ। "উপনিষদের প্রতিপাদ্য" সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনের "স্তিমিতদীপ" ইতি শীর্ষক কবিতাটি সুরচিত, কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে সমাবৃত। "উপাসনা" বড়ই পিছাইয়া পড়িয়াছে।

বড়াল-কবি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবিঅক্ষয়কুমার সমগ্রনারীজাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক কবিতা রচনা করেন নাই বটে কিন্তু তিনি যাহা অল্প লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে অনেক। এত সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নারীমহিমা গাহিতে আমাদের সাহিত্যে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। তিনি আর একস্থলে নারীজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"নারি,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা;
উপচয়ে দশ হস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার বিহ্বলা।
তুমি স্বস্তি-শান্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুখ-হরা;
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষ-কাতরা।

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।
তুমি হেসে ব'সে বামে, সাজাইয়া ফুল-দামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর।
তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।
—" ইত্যাদি।

বড়াল-কবির চক্ষে রমণী বিলাসিতার উপাদান নহে। 'নারী কিবা গরীয়সী' একথা তিনি হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহার কবিতায় যখনি রমণীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, তখনি প্রায় তাহা সুন্দর ও পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার প্রেমেরকবিতাগুলি কামগন্ধ-দুষ্ট নহে,—তাহাতে লালসার চিহ্ন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমেরকবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। এ ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের প্রেমের কবিতা বঙ্গসাহিত্যের আদরের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা, তাঁহার কবিতায় প্রেমের সে মামুলী সুরের পরিবর্ত্তে একটু বিশেষত্ব, একটু নূতনত্ব আছে। তিনি 'চুম্বন' ও 'আলিঙ্গনে'র হরিরলুট করেন নাই। তিনি রমণীকে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর বিবেচনা করেন। তাই কবিকে তাঁহার 'নায়িকা'র প্রতি ব'লতে শুনি,—

"তুমি আমি কতভিন্ন, কতই অন্তরে !
তুমি—সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, কল্পনা-বাহিনী,
ছায়াময়ী মায়াময়ী, স্বপন-মোহিনী,
স্বরগের প্রতিরূপা কবিত্ব-অক্ষরে।

আমি—নিরাশার মূর্ত্তি, মরণ-দোসর,
দুরদৃষ্ট সনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে ;
অনুদিন অনুক্ষণ আপন ক্রন্দনে
হেরি আপনার সত্ত্বা, সন্তপ্ত কাতর।
—" ইত্যাদি।

যিনি নিজের প্রণয়িনীকে 'স্বরগের প্রতিরূপা' ভাবিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম-কবিতা শুধু 'গুমরে মরিছে কামনা কত'র মধ্যে কখনই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি মানবপ্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা সম্যকরূপে অবগত। সেইজন্য তাঁহার প্রেম-কবিতায় যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই,—তাহা পূর্ণ, বিশুদ্ধ ও গভীর। তাই তাঁহার মুখে নিজ প্রণয়িনীর প্রতি বলিতে শুনি,—

"তোমার বিরহে আমি হইব জীবন্তে মৃত,
সেত ছিল প্রথম সাধনা।
আমাতে তোমারে রাখা, আমাতে তোমারে ভাবা
সে ত ছিল প্রথম কামনা।
প্রেম ত আপনি চায় প্রেমাস্পদে মিশে যেতে
অসহ্য হইয়া আপনার ;
জগতেরে ছেড়ে দিয়ে, নিজেরে ভুলিতে গিয়ে
নিস্বার্থ বলিয়া স্বার্থ চায় !
দাও শিক্ষা যোগময়ি ! যেখানে থাক না তুমি,
কিসে দেখি সৌন্দর্য্য তোমার !
তোমাতে মগন হ'য়ে—সত্ত্বা তব ভুলে গিয়ে
একা হই পূর্ণ অবতার !
ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখারে শিখা সে প্রেম-যোগ।
ছিঁড়ে যাক নাভি-শিরা, ঘুচে যাক জীবনের
চির-জন্মগত স্বার্থ-রোগ।

জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হয়ে সহচর—
তুচ্ছ সুখে দুখে আর কেন আত্মহত্যা করি
আপনায় করিয়া নির্ভর ?
ক্ষুদ্র রূপ-শিখা ওই দাও দাও নিবাইয়া,
সম্মুখে উঠুক রবি হেসে !
ক্ষুদ্র তটিনীর কূলে ডুবায়ে রেখ না আর,
সম্মুখে সাগর যাক ভেসে।
চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গগিরি,
শিরোপরে অনন্ত আকাশ—
দাঁড়াও, শুভদে দেখি, মুক্ত কেশে হাসি মুখে,
কামনার হোক সর্ব্বনাশ।
দেহ সে অজর প্রেম, অমরের চির পূজা—
চির শুভ সুন্দর মহান !
লহ, এ জীবন লহ, জীবন সর্ব্বস্ব লহ—
পদে তব চির বলিদান।
—" ইত্যাদি।

এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে,—ইহা পরিণত মানব-জীবনের প্রেম।

কবি যে কেবলমাত্র পরিণতমানবজীবনের প্রেম অর্থাৎ প্রেমের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। নবীন প্রেমের মান-অভিমান,

জ্বালা-উপভোগ, বিরাগ-বিরহ এবং অধীরতা প্রভৃতিও তাঁহার প্রেম-কবিতাগুলিতে অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া যেমন প্রেমাসক্ত মানবহৃদয়ের 'ফটো' তুলিতেন, আধুনিক কবিগণ বড় একটা সে পথ অবলম্বন করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় চিত্রিত করেন না। তাঁহারা এক 'নায়িকা' খাড়া করিয়া নিজহৃদয়ের ভিতর দিয়া দাম্পত্য হৃদয়ের চিরন্তন হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি অক্ষয়কুমার কিন্তু উভয় পথই অবলম্বন করিয়াছেন। তবে উভয় পথেই সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন কিনা, সে কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে এই সমস্ত প্রণয়ের গীত তাঁহার বাঁশরীতে তিনি কোন্ সুরে আলাপ করিয়াছেন, সেইটা বলা প্রয়োজন বোধ করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রায় সমুদায় কবিতাতেই 'পেসিমিজমে'র প্রখর প্রবাহ প্রবাহিত। আজকালকার অনেক কবির লেখাতেই অল্প বিস্তর 'পেসিমিষ্টি'ক্ সুর বিদ্যমান, কিন্তু বড়াল-কবির কাব্যে 'আশা-ভগ্ন' হৃদয়ের যে অরুন্তুদ যাতনা, যে বুকভাঙ্গা নিশ্বাস দেখিতে পাই, তাহা নবীন বঙ্গসাহিত্যের কাব্যগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। এমন কি, অপ্রাপ্য বলিলেও অসঙ্গত বলা হয় না। তাঁহার প্রায় সমস্ত গীতি,—

"দগ্ধ নগরের মত উড়াইতে স্মৃতি-ভস্ম
কেন আছি পড়ি!
বর্ত্তমান হাহাকারে ভবিষ্যত অন্ধকারে
গত স্বপ্ন ধরি।

জীবনের মরুভূমে কোথা তুমি চির স্নিগ্ধ—
প্রেম-কল্লোলিনি!
হৃদয়ে চাপিয়া কর যেথা যাই—মরীচিকা—
মৃত্যুর সঙ্গিনী।—"

এই সুরে গ্রথিত।

বড়াল-কবির কবিতা পড়িবার সময় প্রাচীনবঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-কবি চণ্ডীদাসকে আমাদের মনে পড়ে। তাঁহার কাব্যপ্রকৃতি চণ্ডীদাসের কাব্য-প্রকৃতির মত। চণ্ডীদাস যেমন সুখের মধ্যে দুঃখের ছায়া এবং দুঃখের মধ্যে সুখের আলো দেখিতে পাইতেন, তিনি যেরূপ মিলনের মধ্যে ভাবীবিরহের ব্যথা ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িতেন এবং বিরহের মধ্যে মিলনের অসীম ও অনন্ত ছবি দেখিতেন; বড়াল-কবিতেও সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার প্রতি কবিতা যেন সুখ দুঃখের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রতিকবিতা যেন 'রৌদ্র মাখা বৃষ্টি'। তিনি 'সুখ'কে বলিতেছেন,—

"কখন সে ল'য়ে আপনারে
পারে না নিমেষ হ'তে স্থির।
কীট সম চাহে লুকাবারে
শতমুখ করিয়া বাহির।

রমণি; তোমার মুখ হেরে
সুখ বুঝি এত সুখ পায়—
অত সুখ সহিতে না পেরে
আত্মঘাতী হ'য়ে ম'রে যায়!
—" ইত্যাদি।

আবার দারুণ দুঃখেও কবি ভীত নহেন, বিষাদ ভারে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন না। বিরহদাহে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন,—

"মুছি তবে অশ্রুজল,
অদৃষ্টের এ বিপাক—
ভাঙিছে মরম-স্থল
কি করিব ভেঙে যাক!
প্রশান্ত রবির মুখ
ফোটে যে আঁধার ভিতে—
যুঝুক্ যুঝুক দুখ
সুখে মোর পথ দিতে

দহিয়া বিরহ-দাহে
হোক আরো শুদ্ধ প্রাণ,
প্রেমময়ি, পায় যাহে
করিবারে অধিষ্ঠান।
কত-যুগে—দাও ব'লে,
কিম্বা জন্ম পরে কত—
কত দুখে জ্ব'লে জ্বলে
হব তব মনোগত!
—" ইত্যাদি।

প্রণয়িনীর সহিত মিলনকালেও কবির সোয়াস্তি নাই। তিনি 'অতৃপ্তির খেদে তৃপ্তির নরকে' জলিয়া থাকেন। যখনি তাঁহার মনে হইল যে 'অসীম মিলন ক্ষরে সসীম বিচ্ছেদে' তখনি হৃদয় হইতে আগ্নেয় উচ্ছ্বাস নির্গত হইল—

"অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই তো প্রেমের বন্ধ—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ সশঙ্ক দুরাশা!
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ অপূর্ণ থাক্,
আজিকে কাঁদিয়া গেলে কাল হেসে আসা।
থাকুক পিপাসা।

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা!
মিলন চঞ্চল অতি
বিরাগ-সাগরে গতি;
আর জাগিবনা রাতি থাকিতে চেতনা!
দেখিছ না পলে পলে
প্রেম আত্মঘাতে চলে,
হৃদয়ে হ'তেছে ক্রমে বিরহ-ধারণা।
বিদায়, ললনা!
—" ইত্যাদি।

এ সৌন্দর্য্য বচনীয় নহে, কেবলমাত্র ধ্যানগম্য। কবিতাটির আমরা কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু ইহার আদ্যোপান্তই এইরূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব সমন্বিত। সমগ্র কবিতাটুকু উদ্ধৃত করা উচিত মনে করি না। কারণ, বড়াল-কবির কবিতায় আবর্জনার পরিমাণ এতই অল্প যে তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ দুইখানির অধিকাংশ কবিতাই উদ্ধৃত করিতে হয়। তাহা কর্ত্তব্য

নহে এবং তদুপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। তবে অল্পবিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। নহিলে সমালোচ্য গ্রন্থাদির বিশেষ আবার গীতি-কবিতার উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না। 'অমুক কবিতাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে', এরূপ একটা মাধুর্য্যবিহীনকথা বড় একটা কাহারও প্রাণকে স্পর্শ করে না; কিন্তু ঐ প্রশংসাবাদের সহিত যখন একটু নমুনা দেখানো যায়, তখনই পাঠকহৃদয় তৎপ্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং সে গ্রন্থ পড়িবার জন্য অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এ বাজারে নমুনা না দেখিয়া অধিকাংশ খরিদ্দারই জিনিষ কিনিতে চাহে না। কি সাহিত্য বাজার, কি অন্যান্য বাজারে জাল-জুয়াচুরীর যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে নমুনা না দেখিয়া লোকে কেনই বা স্বেচ্ছায় ঠকিতে যাইবে?

যাউক সে কথা। অক্ষয়কুমারের প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা সম্বন্ধে এখনো দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। এইবার তাহাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড়াল-কবি যে বীণা হস্তে করিয়া বঙ্গীয়কাব্যকুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে বীণার তার বিষাদের সুরে বাঁধা। আর সেই জন্যই বোধ করি, তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার নিরাশ-প্রেমের কবিতাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা—অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে,—সর্ব্বাপেক্ষা—অধিকতর পরিণত ও বিকশিত হইয়াছে। একে তাঁহার চাঁচা-ছোলা পালিশ করা ভাষা, তাহার উপর আবার তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন্ত-দার্পিত-গতি-বিশিষ্ট ছন্দ এবং সেই সঙ্গে তীব্র অনুভূতির তাড়না,—এই তিনের সমবায়ে কবির নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলিতে এক পাষাণভেদিনী শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বাঁধা বীণার এই জমাটবিষাদ সুর পাঠকহৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলে, সহানুভূতির পথে টানিয়া লইয়া যায়।

দ্বিপ্রহরা রজনীতে প্রেয়সীকে একাকিনী নিদ্রা যাইতে দেখিয়া কবির বাঁশরী আকুল সুরে গাহিয়া উঠিল,—

"ঘুমাও ঘুমাও, প্রিয়ে।
ঢাকিয়া তোমায় রাখুন দেবতা
আপনার বুক দিয়ে।
দেখো গো রজনি, ঘুমে যেন তার
নাহি পশে দুস্বপন।
সে অতি সরলা সমীরে বিহ্বলা,
কাছে নাই প্রিয়জন।

সুখদে রজনি, রাখ তারে রাখ
চির সুখ-স্বপ্নে ঢাকি।
বহ ধীরে বায়ু, উঠ গো চন্দ্রমা,
ডেকনা ডেকনা পাখী!
ঘুমাও, প্রেয়সি, ঘুমাও ঘুমাও,
আমি আছি তব বসি!
অশ্রু নয়—তুমি দেখিও প্রভাতে
শিশির পড়েছে খসি!

ঘুমাও, প্রেয়সি, আমি আছি বসি ;
সারা ধরা ঘুমাইয়া।
নহে দীর্ঘশ্বাস— বনান্তরে বায়ু
ওঠে বুঝি আকুলিয়া।
ওগো না না, আমি নাহি গণিতেছি
সময়ের প্রতি পল।
প্রাচী-কূলে রবি উঠনা উঠনা,
ফুটনা কমল-দল।

কেন ওগো বাজে মঙ্গল আরতি
এত কোলাহল করি!
কেন তুমি ধরা, হ'তেছ চঞ্চল ?
স্থির হও, পায়ে পড়ি।
ঘুমায় প্রিয়ার অধর-গোলাপে
নবীন যূথিকা-হাসি।
ঘুমায় প্রিয়ার নয়ন-নলিনে
উষার আলোক-রাশি।—"

প্রণয়ীহৃদয়ের যে আকুল উচ্ছ্বাস এই কবিতার প্রতি ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে,—ভাবিয়া বুঝিতে হইবে।

কবি বলিয়াছেন বটে ;—

"গীত-অবশেষে নিশ্বসিল কবি
বল কি গাহিব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার।—"

কিন্তু আমরা তাঁহার কবিতা পাঠে ইহার উল্টাই বুঝিয়াছি। তিনি প্রেমাসক্ত-হৃদয়ের মরমের গান যেরূপ মনোহর ভাবে ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, প্রণয়ের মাধুরী যেরূপ সুন্দর ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা পরমআদরের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

যাহাহোক, কবির ঐ প্রণয়-সাগরে কিন্তু নিরাশার শতসহস্র তরঙ্গ দেখা দিল। প্রণয়িনী দেখিলেন, তাঁহাদের মিলনের পথ কণ্টকময়। তিনি সাশ্রুনয়নে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে জানাইলেন ;—

কাঁদিতে পার'গো যদি চিরকাল নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিক সাধ,
সে কেবল অপবাদ ;
রব' মোরা দূরে দূরে, রবে শুধু সুখ-স্মৃতি।
... ...

মিলন নরক-দাহ—আজীবন হাহাকার,
নিমেষ-চঞ্চল-সুখ বুকে চির অগ্নিভার।
বিরহ মথিত প্রেম
অনল কষিত হেম।
কলঙ্কের ডালি তুলে দিওনা মাথে, অতিথি।
এ নহে প্রেমিক-রীতি।

'নায়িকা'র এসমস্ত কথা 'নায়কে'র কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিল কি না, জানি না। তিনি প্রিয়তমার চোখে জল দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রণয় পাত্রীকে বলিলেন ;—

'হৃদয়ে বেঁধেছি সখি বল।
... ...
মুছে ফেল নয়নের জল।
ওই বিন্দু মুকুতায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যায়,
আমি কোথা বল্।
এখনি সংযম হারা গ্রহ উপগ্রহ পারা
হৃদয়ে উঠিবে কোলাহল।
মুছে ফেল নয়নের জল।
—' ইত্যাদি।

হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! কি মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি! এরূপ আকুলতার ভাবপ্রকাশককবিতা রচনা করা কি সাধারণ লেখকের সাধ্যায়ত্ত? কবি নিজহৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রণয়ের নানা ভঙ্গী, নানা কথা যেরূপ সরস করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, রাধা কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কিন্তু সেরূপ প্রণয়-কবিতা লিখিতে পারেন নাই। এইবারে তাহাই বলিব।

পৃথিবীতে এমন কবি অদ্যাবধি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার সমস্ত কবিতাই অপূর্ব্ব কবিত্ব-সমন্বিত। সুতরাং বড়াল-কবিতে তাহা আশা করা দুরাশামাত্র। যদিও তিনি তাঁহার এই গ্রন্থ দুইখানিতে চুনিয়া বাছিয়া কবিতা সন্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার 'বৃন্দাবন গাথা' 'কনকাঞ্জলি' নামক কাব্য গ্রন্থে প্রবেশলাভ না করিলেই ভাল হইত। 'বৃন্দাবন গাথায়' রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া যে প্রেমগীতি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও এ কবিতাগুলিতে তাঁহার সুমধুর ভাষা আছে, যদিও ইহাতে তাঁহার তরঙ্গায়িতছন্দ দেখিতে পাই, তথাপি এ কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না। তাহার কারণ, এ ছন্দোময়ীরচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বড়াল-কবির যে বিশেষত্বে আমরা মুগ্ধ, ইহাতে তাহার বড়ই অভাব। তিনি এক্ষেত্রে তেমন কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য কবিতা-গুলি যেমন আবেগপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক সরল নির্ঝর, এগুলি সে শ্রেণীর নহে। ইহা কৃত্রিমতার উৎস। 'বৃন্দাবন গাথার' শুধু 'অবশিষ্ট' শীর্ষক কবিতাটী উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কবিতাগুলি তাঁহার লেখনীর যোগ্য হয় নাই।

বড়াল-কবির প্রেমকবিতার গুণাগুণ আলোচনা করা এক প্রকার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি 'প্রকৃতির শ্যাম বুকের' সৌন্দর্য্য তাঁহার কাব্যে কিরূপ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির

গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি।" * বঙ্কিমের এই বিবৃতি অনুসারে অক্ষয়কুমারকে বিলক্ষণ সুকবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি এই উভয়ের ছায়া উভয়ে নিপতিত হইয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতিকে প্রদীপ করিয়া, তদালোকে অন্তঃপ্রকৃতির 'গূঢ় তলচারী ভাব সকল' কেমন প্রস্ফুট করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলিই একথার চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিতেছে। উপস্থিত, বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় অন্তঃপ্রকৃতির কিরূপ ছায়া পড়িয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। এক আধটা উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে।

কবি 'হেমন্তে'র একটী চিত্র দিয়াছেন ;—

"আকাশ হ'তেছে ক্রমে ধূসর মলিন,
জোছনা হ'তেছে ম্লান, সুদীর্ঘ রজনী ;
নিশি-শেষে অশ্রুকণা ফেলিছে ধরণী,
সমীর হ'তেছে ক্রমে শীতল তিখিন।
সন্ধ্যার মলিন মুখ, তারা প্রভাহীন,
তরুলতা শুষ্ক দেহ—শুষ্ক পত্র মূলে,
নদী শীর্ণ-কলেবরা—হংসী নাহি কূলে,
ক্ষেত্র বিদারিত-দেহ, ক্ষুদ্র ক্রমে দিন।"

এই কয় ছত্রে হেমন্তের চিত্রটী সম্পূর্ণ। কিন্তু চিত্রটী সম্পূর্ণ করিয়াই কবি ক্ষান্ত নহেন। বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা তিনি অবগত। সেইজন্য তাঁহার 'হেমন্ত' বর্ণনায় তাঁহার হৃদয়ের ছায়াসমেত বর্ণনা দেখিতে পাই। তাই তিনি 'হেমন্তে' কবিতার শেষে বলিতেছেন ;—

"হৃদয়, উঠরে উঠ, বৃথা আর বসি,
বৃথা এ মমতা-গীত কাতর ক্রন্দন !
বৃথা এই সযতন স্বপন-কর্ষণ—
নির্গন্ধ কুসুম সম পথ চেয়ে বসি' !
দেখিবে না বুঝিবে না আমারি প্রেয়সী—
দুখেতে আমার যদি কাঁদে বিশ্বজন।

'বর্ষা নিশায়', 'নিদাঘে', ও 'শ্রাবণে' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, বাহ্যপ্রকৃতির নানা মাধুরী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি অতি নৈপুণ্যসহকারে মানবহৃদয়ের এক একটী ভাব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, এক একটী আবেগকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

---

* বঙ্গদর্শন।

বড়াল-কবির গ্রন্থদ্বয়ে শুধু প্রণয়বর্ণন ও প্রাকৃতবর্ণন কবিতা ছাড়া যে অন্য কোন বিষয়ের কবিতা নাই, তাহা নহে। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি বটে যে, 'রমণীর প্রেমমুখ' এবং 'প্রকৃতির শ্যামবুক' এই দুইটী বিষয়ই তাঁহার কবিত্বের প্রধান উপকরণ; কিন্তু তা' বলিয়া তিনি অন্যান্য বিষয়িণী কবিতা হইতে আমাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ 'কোথা-ভুমি', 'হৃদয় সংগ্রাম', 'দুঃখ জীবন'ও 'আবাহন' প্রভৃতি কতিপয় কবিতার আমরা নামোল্লেখ করিতে পারি। এই কবিতাগুলি উপরে উদ্ধৃত কবিতা সমূহ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্টতর নহে। আর একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার নামোল্লেখ করিতে আমরা ভুলিয়াছি। সে কবিতাটীর নাম "উৎসর্গ"। কবিবর বিহারীলালের মৃত্যুপলক্ষে ইহা রচিত। আমাদের সাহিত্যে মৃত মনীষীদিগের জন্য যে সকল শোক-গাথা রচিত হইতে দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ জ্বালাময় বিষাদ পূর্ণ কবিতা বড় একটা পড়িয়াছি বলিয়াত মনে হইতেছে না। মধুসূদনের তিরোভাবে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বীণার যে ঝঙ্কার শুনিয়াছিলাম, তাহাও মর্ম্মভেদী করুণ রসোদ্দীপক বটে। কিন্তু এ কবিতার তুলনায় সেগুলিও হীনপ্রভ হইয়া যায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।
এসেছিল শুধু গাহিতে প্রভাতি,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।
দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?
—" ইত্যাদি

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' রীতি থাকিলেও এক্ষেত্রে তাহার বিপরীত হইয়া গেল। বড়াল-কবির কবিতার প্রতিকূলে একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

তাঁহার দোষের মধ্যে তাঁহার গুটীকতক কবিতার স্থলবিশেষ কিছু দুর্ব্বোধ্য। উল্লেখ স্বরূপ 'কামে প্রেমে' ও 'অভেদে প্রভেদ' শীর্ষক কবিতার

নাম করিতে পারি। আজকালকার অধিকাংশ গীতি কবিদিগের কবিতার স্থূলভাব ধরিতে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, বড়ালকবির ঐ কবিতাগুলি সে শ্রেণীর নহে বটে। তবে তাঁহার ঐ সকল কবিতার পূর্ব্বাপর শ্লোকের সম্বন্ধের শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাই তাঁহার দোষ।

এইখানে প্রবন্ধ আমরা শেষ করিলাম বটে, কিন্তু আশা করি ইহাই যেন বড়াল-কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ রচনা না হয়। তাঁহার কবিত্ব শক্তির নিকট এখনও অনেক সুপদ্যের দাবী করি।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

সহধর্ম্মিণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দুই বৎসরে হেমাঙ্গিনীর জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তাহার চিররুগ্না মাতা এখনও তদবস্থায় জীবিতা আছেন, কিন্তু হরকুমার বাবু আর নাই। ছয় মাস হইল, একদা সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তাহার মা এখনও একেবারে শয্যাগতা, সুতরাং হেমাঙ্গিনীর স্কন্ধেই সংসারের সকল ভার পড়িয়াছে, তবে স্ত্রীলোক বই ত নহে। সে চিরকাল বাপ মায়ের আদরের পাত্রী ছিল, দুঃখ কষ্ট চিন্তা কাহাকে বলে, তাহা সে একেবারেই জানিত না ; এখন সংসারের নানা ভাবনা-চিন্তায় সে উৎপীড়িতা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জীবনে সুখশান্তি কিছুই ছিল না। জননী পীড়িতা —পিতা নাই, কোন নিকট আত্মীয় স্বজনও নাই—কে দেখে, কে শুনে!

বহুকাল আর সে রমেন্দ্রের কোনই সংবাদ পায় নাই। তিনি কোথায়, কি করিতেছেন, তাহাও সে জানে না।

সতীশ আর পূর্ব্বের ন্যায় আসেন না, সৌজন্য রক্ষার জন্য আসা নিতান্ত প্রয়োজন, কালে ভদ্রে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন ; তিনিও আর কখনও পূর্ব্বকথা উত্থাপন করেন নাই। এইরূপে বড়ই কষ্টে হেমাঙ্গিনী দিনের পর দিন কাটাইতেছিল।

এই সময়ে একদিন সতীশচন্দ্র তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ইদানীং যখনই আসিতেন হেমাঙ্গিনীর জননীর সংবাদ লইবার অজুহতে আসিতেন, আজও সেইরূপ আসিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি তাহার সম্মুখে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হেম, আমি বুঝিতেছি যে, তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, তাহাতে সংসারের ভাবনা-চিন্তা একাকী বহন করিতে পারিবে না।"

হেমাঙ্গিনী চমকিত হইয়া মুখ তুলিল—তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ নও—আমার উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারিতেছ। ইচ্ছা করিলে আমি অনেক দিন আগে বিবাহ করিতে পারিতাম। হেম, তুমি জান আমি তাহার অপেক্ষা তোমায় কত ভালবাসি।"

হেমাঙ্গিনী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "কাহার অপেক্ষা ?"

সতীশচন্দ্র সংক্ষেপে কহিলেন, "সেই ডাক্তার।"

হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠ যেন কে একটা দানব অলক্ষ্য হস্তে কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিল; অতিকষ্টে হেমাঙ্গিনী কহিল, "তুমি তাহার কথা বলিতেছ কেন ? সে আমার কে ?" স্বরটা যেন ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া আসিল।

"হেম, তাহা হইলে সম্মত হও—আমি বিবাহের আয়োজন করি। তুমি জান, তোমার বাবার কি ইচ্ছা ছিল।"

হেম কি উত্তর দিবে ? সে তাহার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল, দেখিল, সেখান হইতে রমেন্দ্রের মূর্ত্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না; গরিব অজ্ঞাতকুলশীল ডাক্তারকে সে কিরূপে বিবাহ করিবে ? সতীশ মস্তবড় জমিদার—হেমাঙ্গিনী সুখে লালিতা পালিতা—হেমাঙ্গিনী স্পন্দিতকণ্ঠে বলিল, "কাল পর্য্যন্ত আমায় ভাবিতে সময় দিন।"

সতীশ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বেশ তাই—না বলিও না—তুমি জান আমি তোমায় কত ভালবাসি; আমি তোমারই জন্য এপর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই, তোমাকে না পাই—কখনও বিবাহ করিব না; আর এখন তোমার মাকে—তোমাদের সকলকে দেখিবার একজন লোক আবশ্যক; তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে বেশি কি বলিব ?

* * * * *

বহুক্ষণ হেমাঙ্গিনী নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর সে ধীরে ধীরে

তাহার শয্যাগতা জননীর নিকটে উপস্থিত হইল। জননী তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

হেমাঙ্গিনী জননীর পার্শ্বে বসিয়া অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু যাহা বলিতে চাহিতেছিল, তাহা বলিতে পারিল না; বহুক্ষণ পরে হৃদয়ে সাহস বান্ধিয়া বলিল, "মা!"

মাতা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন; কিন্তু হেমাঙ্গিনী কোন কথা বলিতে পারিল না, তখন মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি বলিতেছিলে মা, হেম!"

"মা!"

"বল, কি।"

"সতীশ বাবু—"

"সতীশ বাবু কি? আমার কাছে আর তোমার লজ্জা করিলে চলিবে না।"

"তিনি বলিতেছিলেন যে—"বলিয়া হেমাঙ্গিনী চুপ করিল।

জননী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি বলিতেছিলেন—বুঝি বিবাহের কথা! তা ভালই ত—তুমি কি বলিয়াছ?"

"এখনও কিছু বলি নাই—তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কি বলিব?"

"সতীশের মত জামাই পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তুমি ত জানই তোমার পিতার ইহাই ইচ্ছা ছিল—আমারও ইচ্ছা।"

"তবে মা—"

"কি মা—এমন বিবাহে আপত্তি কি?"

"আমি সতীশ বাবুকে ঠিক সে রকম ভালবাসি না।"

"ও সব ছেলে মানুষের কথা, স্বামীকে স্ত্রীমাত্রেই ভালবাসিয়া থাকে, ইহাতে না বলিও না—এমন স্বামী দুর্লভ—আর সতীশকে পাইলে আমাদের সংসারের ভাবনা থাকিবে না।"

তাহাই হইল। পরদিন সতীশচন্দ্র হেমাঙ্গিনীর সম্মতি লাভ করিলেন। তিনি যথার্থই হেমকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারে নিয়তির লীলা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হেমাঙ্গিনী সুখী হইতে পারিল না—সে মনের সহিত দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু হৃদয় হইতে তবুও রমেন্দ্রের মূর্ত্তি উৎপাটিত করিতে পারিল না। যতই বিবাহের দিন সন্নিকট হইয়া আসিতে লাগিল, সে ততই আরও বিমর্ষ—ততই আরও অসুখী হইয়া পড়িল।

এই সময়ে—এই সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সময়ে নিয়তি সহসা এক দিন রমেন্দ্রকে হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে আনিয়া ফেলিল। যে রমেন্দ্রের দুই বৎসর কোন সন্ধান নাই—হেমাঙ্গিনীর বিবাহের কয় দিন পূর্ব্বে সেই রমেন্দ্র সহসা এক দিন হেমাঙ্গিনীদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

দুরু দুরু বক্ষে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত হেমাঙ্গিনী রমেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল। দুই বৎসরেও সে তাহাকে ভুলে নাই—সে তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না—অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেন্দ্র বলিলেন, "পাস হইয়া বর্ম্মায় একটা চাকরী পাইয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, এই দুই বৎসরের মধ্যে ছুটি পাই নাই।"

হেমাঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিল, "সংবাদ দেন নাই কেন?"

"সাহস করি নাই—আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করি নাই—কি জানি যদি বিরক্ত হন।"

হেমাঙ্গিনী কথা কহিল না, তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না—তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছিল।

রমেন্দ্র বলিলেন, এখন কিছু দিন কলিকাতায় থাকিব; পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের বাড়ীতে থাকিয়া আপনাদের সংবাদ লইতে পারি কি? আমি বড় লোক নহি—আপনারা বড়—"

হেমাঙ্গিনীর বিশালায়াত নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া রমেন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এ কি! আপনি কি—আমি আসায়—হয় ত বিরক্ত করিলাম!"

হেমাঙ্গিনী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না—বিরক্ত করেন নাই—আমি সুখী নই!"

"সুখী নই? কেন—কেন—আপনি কি জানেন না, আমি কি আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা পাইতে পারি না? আপনার মা এক সময়ে আমায়

পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। হেম—হেমাঙ্গিনী, আমি তোমায় তাহার নিকট চাহিলে তুমি কি অসন্তুষ্ট হইবে—রাগ করিবে ?"

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হেমাঙ্গিনী বলিল, "না—না—এমন কাজ করিবেন না। আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

রমেন্দ্র হতাশভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "স্থির হইয়া গিয়াছে!"

হেমাঙ্গিনী ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলিল "হাঁ, আমি সুখী নই, আপনি আর এখানে আসিবেন না—আর আমার সঙ্গে দেখা করিবেন না।"

"কে সে—কে তিনি—সতীশ—সতীশ বাবু।"

"হাঁ, তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে।"

"হেম—হেম, আমি তোমার মন কি জানি না—আমি কি এমনই অন্ধ ? আর আমি যে তোমাকে কিরূপ ভালবাসি, আজ দুই বৎসর ভালবাসিয়া আসিতেছি, তাহাও কি তুমি জান না ? নিশ্চয় জান—এখনও বিবাহ হয় নাই।"

হেম এবার মস্তক তুলিল, কহিল, "আমি অস্বীকার করি না—আমি তোমায় ভালবাসি, তবে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারে না—তুমি আর কখনও আমার সঙ্গে দেখা করিও না।"

"কেন—কেন ?"

এই বলিয়া রমেন্দ্র ব্যাকুলভাবে হেমাঙ্গিনীর দুই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে লইল। হেমাঙ্গিনী হাত টানিয়া লইতে চেষ্টা পাইয়াও হাত টানিয়া লইতে পারিল না; তাহার কমলায়ত চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ছেড়ে দাও—আমায় ভুলে যাও—আর কখনও দেখা করিও না!"

"যদি যাইতে হয়, তবে হেম—হেম, বিদায়।"

তিনি নিসংজ্ঞভাবে হেমাঙ্গিনীর একটা হাত টানিয়া লইয়া নিজের ব্যথিত বুকের উপরে চাপিয়া ধরিলেন। তখনই রুদ্ধশ্বাসে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

আর এক ব্যক্তি যে, এই দৃশ্য দেখিল, তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি সতীশচন্দ্র। তিনি জানিতেন না—আশঙ্কা করেন নাই যে, রমেন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনীর নিকটে রহিয়াছে।

তিনি সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে ক্রোধে, ঈর্ষায় স্তম্ভিত প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিল; তিনি তাহাদের সমস্ত কথা শুনিতে ও সমস্ত কার্য্যই দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহার সঙ্গে তাঁহার কয়েক দিন পরে বিবাহ হইবে, সে অপরের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে! তাহার মস্তক হইতে অগ্নিশিখা ছুটিল। তিনি হেমাঙ্গিনীর সহিত দেখা না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। কতক্ষণ তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না।

পথে পথে ঘুরিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক কতক প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি গৃহে ফিরিলেন। ক্রমে তিনি এ কথা নিজের মনেই রাখিলেন, হেমাঙ্গিনীকে কোন কথা বলিলেন না।

হেমও জানিতে পারিল না যে, রমেন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ-দৃশ্য সতীশ দেখিতে পাইয়াছেন। বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই উভয়ে উভয়ের নিকট এই কথা লুকাইলেন; এরূপ বিবাহে কিরূপ শুভ ফলে পরিণত হইবে, তাহা এখন কেবল নিয়তির তমোময় গর্ভেই লীন রহিল।

* * * * *

সতীশের সহিত হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেল। সতীশ, স্ত্রী ও শাশুড়ী উভয়কে লইয়া নিজের জমিদারী কালিপুরে চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর জননীকে আর বহুকাল শয্যাগত থাকিতে হইল না। তিনি স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন হেমাঙ্গিনী এক পুত্র ও এক কন্যার জননী হইলেন; কিন্তু দিন দিন তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। হেমও সম্মতা হইল, তখন তাহারই আয়োজন হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সাময়িক-সাহিত্য।

মহিলা-কবি ও অমরত্ব।

[লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

জাগতিক সাহিত্যে মহিলা-কবির অভাব নাই। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যেও মহিলা-কবিগণের প্রভাব অস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু তাঁহাদের কৃত-কার্য্যের পরিণাম-ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সাহিত্য-আচার্য্যগণ সন্দিহান্। এ ক্ষেত্রে, এ বিষয়ের আলোচনা, ভরসা করি, কাহারো অপ্রীতিকর হইবে না।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দি',—তাহার জন্ম অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক নয়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল-রত্ন "আনন্দময়ী" ও "গঙ্গাদেবী" প্রভৃতি মহিলা-কবিগণের নাম আজ কয়জনের নিকটে সুপরিচিত? "আনন্দময়ী"র

"কুটিলকুন্তল তার, বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়॥"

এবং "গঙ্গাদেবী"র

"মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভমাঝে মজিয়া রহিল॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবি'র কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা॥"

প্রভৃতি পদের কথা আজি কয়জনে জানেন? বঙ্গভাষার কবি-মহিলাগণের রচনাবলীকে বিস্মৃতির অন্ধতামসে এইরূপ মলিন হইতে দেখিয়া, আমাদের বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই। কারণ, বিপুলবিস্তারসুন্দর ইংরাজী-সাহিত্যেও কবি-মহিলাগণের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

ইংরাজী-সাহিত্যে

মিসেস্ হিমান্স-প্রণীত গ্রন্থাবলীর ভূমিকা-লেখক বলেন, "সভ্যতার প্রত্যেক বিষয়েই যেমন একটী রীতি দেখা যায়—কবিতাতেও তাহার অভাব নাই। এবং কি পুরুষ অথবা কি স্ত্রী-কবি,—যিনিই তাঁহার সমসাময়িক কালের তেজ বা শক্তিকে আপনার চিত্রপটে উজ্জ্বল-তররূপে প্রতিফলিত করিতে পারেন,—তিনিই সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়া উঠেন। কিন্তু এরূপ কার্য্য-সামর্থ্য কেবল মহাক্ষমতাবান্ লেখকগণেরই দেখা যায়; পরন্তু বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত কোন মহিলাকবিই এইরূপ সার্ব্বভৌমিক সমাদর প্রাপ্ত হন নাই।"

বাস্তবিক, ইংরাজী-সাহিত্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, দুঃখিনী অ্যানীবোলিন হইতে আরম্ভ করিয়া, লেডি উইন্‌চিল্‌শী, ডাচেস্ অব্ নিউকাসেল, এলিজাবেথ কার্টার, হ্যানামোর এবং মিসেস্ বার্‌বোল্‌ড্ প্রভৃতি সংখ্যাধিক স্ত্রী-কবিগণের নাম তাঁহাদের গণ-সাধারণের হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কাহারো রচনা শতাব্দীকালের অধিক স্থায়ী হয় নাই।

কেবলমাত্র মিসেস্ হিমান্স্ এবং এলিজা কুকে'র নাম উপরোক্ত অনাদৃতা স্ত্রীকবিশ্রেণীর মধ্য হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। "রিভিউ অব্ রিভিউ" সম্পাদক মিঃ ষ্টেড্, হিমান্স ও কুকের কাব্যালোচনাকালে বলিয়াছেন, "ইহাঁদের উভয়েই, আমাদের সাগরালয়ের,

—আমাদের পিতৃভূমির গায়কা। ইহাঁরা দুইজনেই সমুদ্রের কবি। ইহাঁরা সাগরের মহান্-সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন নন। সাগরের বিয়োগান্ত অংশই ইহাঁদের কবিতার বিষয়ীভূত। ইহার কারণ, এলিজাকুকের বক্ষ-চ্যুত শিশু, সাগরের তরঙ্গ-তাণ্ডব-তলে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছিল এবং মিসেস হিমান্সের রমণী-জীবনের ধ্রুব-তারকা স্বামী-দেবতা সাগর-গর্ভে সলিলসঙ্গশীতল চিরবিশ্রাম-শয্যায় নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন। * * উভয়েরই সঙ্গীত মধুর,—কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থাবলী অতিশয্য-দোষ দুষ্ট।"

সাগরের নামে, মিসেস হিমান্সের হৃদয়-বীণার কোন তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত, আমরা নিম্নে তাহার একটী নমুনা দিলাম।

সাগরে স্বদেশের চিন্তা।

সঙ্গিহীন সাগরের বুকে,
সন্ধ্যাঘণ্টা করিয়া রোদন,
অস্তসূর্য্যে দেয় পাঠাইয়া
বিদায়ের একটী বচন।

অতলের পাখিদের ডানা
ফেরে যবে কুলায়ে আপন।
জাগে যবে নাবিক-হৃদয়ে
প্রেমভরা সুপ্রিয় আনন।

ছায়া-সাথে হইয়া বাহিত;—
বায়ু যবে বেগে বহি যায়।
স্বদেশের প্রিয়তমা স্মৃতি
নেমে আসে সাগর-হিয়ায়।

সঙ্গিহীন সাগরের বুকে
সন্ধ্যা-মোহ করেগো যতন;—
মিষ্টস্বরে ফিরায়ে আনিতে;—
বিদায়ের নিখিল বচন। *

অস্থায়িত্বের কারণ।

কিন্তু, মহিলাকবিগণের অমরত্বের পরিপন্থী কি? অনেক লেখক বলেন, "ইহা অসম্ভব নয়,—যে বিদ্যমানযুগের কোন কোন মহিলা-কবির নাম কাল-জয়ী হইতে পারে। কিন্তু, কাল, অদ্যাবধি এ'কথা বলে নাই। মিসেস হিমান্স্‌, তাঁহার জীবনকালে, গণ-সাধারণের সমাদরলাভ করিয়াছিলেন। সে যুগের প্রসিদ্ধ সমালোচক জেফ্রী; কবি স্কট এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ; যাজক হিবার এবং হোয়েট্‌লী সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কবিত্বের সমর্থন করিতেন। কারণ হিমান্সের রচনায় যথেষ্ঠ মৌলিকতা ছিল।"

কিন্তু, একজনের দৃষ্টান্তে সকলের ভাগ্য-নির্ণয় চলে না। এইরূপ কথিত আছে, পুরুষ কবিগণ, তাঁহাদের করধৃত পিনাকে যে গম্ভীরোদাত্ত অনাহত নাদ উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলেন, মহিলাকবিগণের বীণায় তাহারই স্বল্পস্ফুট রিঞ্জিনী, প্রতিধ্বনির মত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। "মহিলারা, অনুকরণপ্রিয়। সমসাময়িক পুরুষ কবিগণের রচনাভঙ্গীই তাঁহাদের আদর্শ।" অপরের কথা দূরে যাউক,—মিসেস ব্রাউনিংও অনুকরণদোষমুক্তা নন। তিনিও, "an ultra-sensitive sister of Alfred Tennyson." (Leigh Hunt's "Men, Women, and Books," British Poetesses).

অনুকরণ সদাই অচিরকালস্থায়ী। তাহা তরুচ্ছায়াপ্রতিম চঞ্চল, দীর্ঘশ্বাসের মত স্বল্প-বাহিত। অনেকস্থলে, অনুকরণ সুন্দর হয়। অনেকস্থলে তাহা কিয়দাংশে সফল হয়। কিন্তু কদাপি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

এই অনুকরণের জন্যই, মহিলাকবিগণের রচনা কালজয়ী হইতে পারে না। মিসেস হিমান্সের অমরত্বের কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক কবিযুগল,—বাইরণ এবং সেলীর রচনার প্রতিধ্বনি বা ছায়াপাত, হিমান্সে নাই। তিনি আপনার কবিতায় কাহারো আলোক প্রতিফলিত করেন নাই।

আমাদের বাংলাসাহিত্যেও, একমাত্র কামিনী রায় ভিন্ন আর কাহারো কবিতা

---

* "A Thought of Home at Sea."

অনুকরণস্পর্শমুক্তা নয়। এই কারণেই, আমরা অনেক মহিলাকবির রচনা পাঠ করি বটে, কিন্তু পাঠশেষে মন, অতৃপ্তির অন্ধকারেই ডুবিয়া যায়। প্রকৃত কবিতা, পাঠকের মনের উপরে যে উজ্জ্বল রেখাপাত করে, তাঁহাদের রচনা, তাহা করে না। কিন্তু তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বিপুলপ্রসারসম্পন্ন ইংরাজী সাহিত্যে যাহা দুর্লভ, অপূর্ণাঙ্গ শিশু বঙ্গসাহিত্যে, তাহার আশা করাই অন্যায়।

সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসিত

রুসদেশের নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহা কিরূপ ভয়ানক এবং কষ্টকর, এ'কথা বোধ করি অনেকেই জানেন না। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত, আমরা জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর রচনা হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"মস্কোনগরে, আমি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলাম,—তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট্রাল প্রিসনের কথাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই কারাগার, কি রাজনৈতিক, কি অন্যবিধ অপরাধী,—যাহারা সাইবেরিয়ার মরুভূমিতে নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্যই নির্ব্বাচিত।

"এই কারাগারে দুইহাজার পাঁচশত বন্দীর স্থান সংকুলান হইতে পারে। সকল বন্দীই পারিপাট্যহীন দীর্ঘ কোট পরিধান করে। কারাগারে, দুইটী বিভাগ আছে। একদিকে সামান্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত বন্দী থাকে,—অপর ভাগ গুরুতর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর নিমিত্ত নির্ব্বাচিত। শেষোক্ত বন্দিগণের পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সেই শৃঙ্খলের সহিত একটী বারো পাউণ্ড ওজনের লৌহগোলক সংযুক্ত থাকে।

"সময়ে সময়ে,এই কারাগারে দর্শনদুঃখকর দৃশ্য দেখা যায়। নির্ব্বাসিতগণের স্ত্রী ও সুকুমার বয়স্ক শিশুবৃন্দ কারাগারে আসিয়া, তাহাদের স্বামী ও পিতার নিকট শেষবিদায় লইতে আসে! কোন কোন রমণী আবার ক্রোশের পর ক্রোশ,সঙ্কটজনক পথ অতিক্রমপূর্ব্বক দৈহিক কষ্টের একশেষ করিয়া, এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। আমার কারাগার দর্শনের চারিদিন আগে, এখানে রাজনৈতিক অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একটী সুপুরুষ যুবক আসিয়াছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র আমি যে দৃশ্য দেখিলাম,—তাহা কখনো ভুলিতে পারিব না।

"একটী ষোড়শী যুবতী, বাম-অঙ্কে একটী শিশুকে লইয়া এবং ডানহাতে সদৃঢ়-নির্ভরতার সহিত যুবকের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা উভয়েই সেই অবস্থায় ক্রন্দন করিতেছেন।

"সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, রমণী, যুবকের পত্নী। যুবক, সাইবেরিয়ার খনিতে দশ বৎসরের জন্য সপরিশ্রম নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুবককে, যখন তাঁহার দেশ হইতে, ট্রেণে করিয়া লইয়া আসা হয়, তখন তাঁহার স্ত্রীকে, তাঁহার সঙ্গে আসিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ধন্য রমণীর প্রেম! যুবকের এই কুসুমকোমলা স্ত্রী, স্বামীকে শেষদেখা দেখিবার জন্য, বক্ষে আপনার শিশুসন্তানকে লইয়া, একাকিনী পদব্রজে একশত সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রমণী, স্বামীর সঙ্গে থাকিবার জন্য, সুদূর নির্ব্বাসনে যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী সে কথায় সম্মত হইতেছেন না! আমি যখন কারাগার হইতে চলিয়া আসিলাম,—তখনো তাঁহারা উভয়ে—উভয়ের সপ্রেমবাহুপাশে সাশ্রুনেত্রে আবদ্ধ। তাহাদের সম্বন্ধে আমি পরে আর কোন সংবাদ পাই নাই। "রমণীর প্রেমের মত জিনিষ আর কিছুই নাই"—এ'কথা খুবই সত্য। আর জগতের সর্ব্বত্রই কি স্ত্রীলোকের ভালবাসা এক প্রকার!

"সাইবেরিয়ার পথে,—আমি দলে দলে বন্দিগণকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা তুষার স্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে—তাহাদের হস্তপদ ভারী লোহার শিকল দিয়া বাঁধা।

এক একদল বন্দীর সঙ্গে আগে ও পিছনে এক একজন করিয়া রক্ষী থাকে। আমি একজন রক্ষীর সহিত আলাপ করিয়া, নির্ব্বাসনসম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলাম।

"উক্ত রক্ষী, আমার কাছে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী-বন্দীকে লইয়া আসিল। পুরুষটীর পায়ের শিকল সরাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম,—তাহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। লোকটীর পায়ের মাংস ভারী শিকলের চাপে থেঁতলাইয়া গিয়াছে। এবং গলিত-কুষ্ঠে, দেহের মাংস যেরূপে গলিয়া পড়ে, তাহার পায়ের মাংস প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া, তাহার পর সেইরূপে হাড় হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থায়, লোকটী হাজার হাজার মাইল পদব্রজে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, আমি চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জল নিবারণ করিতে পারিলাম না—এবং শুধু আমি কেন,—বোধ হয়, মনুষ্যহৃদয়বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিই পারে না। আমি রক্ষীকে কিছু উৎকোচ দিয়া, যাহাতে সে ইহাকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় অবশিষ্ট পথটা না লইয়া যায়, তাহার জন্য সম্মত করাইলাম। কিন্তু কেবল এই ব্যক্তি নয়,—এমনি হাজার হাজার লোক দিবারাত্র এইরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। "উক্ত পুরুষটীর সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটীকে আনা হইয়াছিল, তাহার গলায় একটী ভারী লোহার চাকা ছিল। চাকার চাপে তাহার গলার মাংস ঝুলিয়া, কাটিয়া পড়িয়া যাইতেছিল।

"জেনিসিসক্‌এ একটী সোণার খনিতে আমি প্রায় চারিশত নির্ব্বাসিতকে কাজ করিতে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে জনকয়েক ছাড়া, সকলেরই পদদ্বয় বা কোমর সেই ভারী লোহার শিকলে বাঁধা। যাহারা মুক্ত, তাহাদের নির্ব্বাসনকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য এখনো তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাজ করিতে হইতেছে।

"মাঝে মাঝে, নির্ব্বাসনের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া, এক একজন বন্দী পলায়ন করে। কিন্তু পলাইয়া যাইবে কোথায়! চারিদিকে বিশাল—আকাশপ্রান্তচুম্বিত হিমানী-তাড়িত ধূ ধূ প্রান্তর! বসতি নাই—খাদ্য নাই—সাহায্য নাই! রক্ষীরা বন্দীর পলায়ন সংবাদ জানিতে পারিলেই পশ্চাদ্ধাবন করে। অনেক সময়ে তাহারা পলায়িতকে আবার ধরিয়া আনে;—কখনো কখনো গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে! যাহারা রক্ষীর হাত এড়াইতে পারে, তাহাদেরও নিস্তার নাই। তাহাদের কেহবা তুষারঝটিকায় ও অনাহারে, এবং কেহবা ভীষণপ্রকৃতি নেক্‌ড়েবাঘের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। কয়েদীরা পলায়ন করিলে, স্থানীয় গভর্ণরগণ, পলায়িত ব্যক্তির মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই তুষাররাজ্যে কয়েকটী অসভ্য জাতি আছে, তাহারা পশুপক্ষী শিকার করিয়া দিনযাপন করে। পুরস্কার লোভে, তাহারা অশ্বারোহণে পলায়মান কয়েদীর সন্ধানে ধাবিত হয়, এবং কাহাকেও দেখিতে পাইলেই, তখনি তাহার প্রাণবধ করে। হতব্যক্তির মস্তক তাহারা কোমরবন্ধে ঝুলাইয়া রাখিয়া, আবার নূতন শিকারের সন্ধানে ছোটে।—সাইবেরিয়ায়, ইহাদের নাম হইয়াছে,—মস্তকশিকারী. (Head-hunter)। এত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, একজন অসহায়, ভগ্নস্বাস্থ্য বন্দীর পক্ষে পলায়নপূর্ব্বক নিরাপদ-ব্যবধানে উপস্থিত হইতে পারা, বড় সহজ কথা নয়।

"বিশেষতঃ এই তুষারমরুভূমি যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা একটী সত্যকাহিনীর দ্বারা জানা যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার একদল সৈন্য, নিকোলেইফ্‌স্ক্‌ হইতে যাত্রা করিয়া, আমুরের দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। অনাহারে সৈন্যেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিল,—কিন্তু চারিদিক শূন্য,—শুধু বরফের পর বরফরাশি যেন ধবল মৃত্যুশয্যা রচনা করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা প্রাণরক্ষার্থ এক বিচিত্র কাণ্ডে লিপ্ত হইল। তাহাদের মধ্যে কে আত্মদান পূর্ব্বক, আপনার মাংসে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান সঙ্গিগণের প্রাণরক্ষা করিবে, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, সকলে লটারী আরম্ভ করিল! এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তি, গুলির দ্বারা প্রাণ হারাইয়া, তাহার সঙ্গিগণের উদরপূরণ করিল! এমন ঘটনা, জগতের কোথাও,—কখনো ঘটিয়াছে কিনা জানি না।

"কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে কঠিন-শৈলের মর্ম্মতল হইতেই ঝর্ঝর-নির্ঝর-ধারার উৎপত্তি হয়। তাই, এ'হেন মৃত্যুরাজ্যেও করুণার অভাব নাই। সাইবেরিয়ার কৃষক-সম্প্রদায় বড়ই অতিথি সৎকারপরায়ণ। তাহারা, পলায়িতগণকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে, চেষ্টার ক্রটী করে না, এবং সকলেই প্রতিরাত্রে আপন আপন গৃহ-গবাক্ষের ধারে কিছু কিছু খাদ্য রাখিয়া দেওয়া, একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করে,—যদি কোন নিঃসহায় পলায়িত তাহাদের প্রদত্ত আহার্য্যের দ্বারা আপনার অনাহার ক্ষীণদেহে বলসঞ্চার করিতে পারে।"

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

(কুমারসম্ভব)

কুমারসম্ভবের ব্যাপার এই।—দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করার পরে শিব সতীর দেহ স্কন্ধে করিয়া ভুবনময় ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং পরিশেষে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন—কি উদ্দেশ্যে কেহই জানে না। সতী হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পতি শিবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার সেবায় নিরত হ'ন। এদিকে ইন্দ্র তারকাসুর দ্বারা পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার কাছে গিয়া অবগত হ'ন যে শিবের ঔরসে পার্ব্বতীর গর্ভে যে পুত্র হইবে, একা সেই পুত্রই তারকাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। ইন্দ্র মদনকে শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য পাঠান। একদিন পার্ব্বতী যখন তপস্যারত শিবের সেবা করিতেছিলেন, মদন শিবের প্রতি তাঁহার শর নিক্ষেপ করেন। শিব ঈষৎ বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া পরে মদনকে দেখিতে পান এবং তাঁহাকেই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ জানিয়া ক্রোধে ভস্ম করেন এবং নারী-সঙ্গ পরিত্যাগমানসে অন্যত্র চলিয়া যান। পার্ব্বতী ক্ষোভে ও লজ্জায় পিতৃগৃহে আসিয়া পরে কোন নিষেধ না শুনিয়া শিবের জন্য ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। শিব শেষে দেবগণদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরীর গর্ভে পুত্রোৎ-পাদনের জন্য আসিয়া তাঁহার অনুরাগ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাহার পরে পিতার অনুমতিক্রমে গৌরী শিবকে বিবাহ করেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের সারাংশ এই।—দুষ্মন্ত মৃগয়াচ্ছলে তাপসী শকুন্তলার আশ্রমে আসেন। পরস্পর অনুরাগ ও পরে বিবাহ হয়। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে রাজধানীতে লইবার জন্য লোক পাঠাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া একাকী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। সে সময়ে কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলা একদিন তন্ময় হইয়া দুষ্মন্তের বিষয় ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে দুর্ব্বাসা সেখানে আসিয়া অতিথি হন। শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য না করায় দুর্ব্বাসা অভিশাপ দেন যে শকুন্তলা যাহার বিষয় ভাবিতেছেন তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া যাইবেন। পরে অনসূয়ার অনুনয়ে মহর্ষি বলেন যে কোন অভিজ্ঞান দেখাইলে বিবাহবন্ধন রাজার মনে পড়িবে। কণ্বমুনি আসিয়া গর্ভবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠান। পথিমধ্যে রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হয়। শকুন্তলা রাজসভায় প্রত্যাখ্যাতা হইয়া হেমকূট পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন ও সেখানে তাঁহার এক পুত্র হয়। পরে অঙ্গুরীয় পাওয়া যায় ও বিবাহবৃত্তান্ত রাজার স্মরণ হয়। ঘটনাক্রমে হেমকূট পর্ব্বতে শকুন্তলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হয়।

রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞান শকুন্তল, উভয় কাব্যেরই এক মর্ম্ম। অর্থাৎ মদন মিলন সম্পাদন করিতে ব্যর্থকাম হইলে তপস্যা সেই মিলন সাধন করিল। দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, কুমারসম্ভবে মদন হরগৌরীর মিলন সম্পাদন করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন—ইহা সত্য। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলে মদন ব্যর্থকাম হইলেন কোথায়? আসক্তি, বিবাহ ও পুত্রোৎপাদন যাহা যাহা মদন দ্বারা সম্ভব সমস্তই হইল। ইহাকে কি ব্যর্থকাম হওয়া বলে? মদন আর কি করিতে পারিতেন?

বিবাহের পরে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য মদন দায়ী নহেন। বিবাহের পরে সাবিত্রী বিধবা হইয়াছিলেন, দময়ন্তী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, সীতা নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। সে সব দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই মদনঘটিত নহে। কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলেই দুর্ঘটনা মদনঘটিত এরূপ বিবেচনা করিবার কি কারণ আছে? ইহা প্রমাণসাপেক্ষ। রবীন্দ্রবাবু কোন প্রমাণই দেন নাই।

রবীন্দ্রবাবু বলিবেন, যে, প্রত্যাখ্যানটি দুর্ব্বাসার অভিশাপে ঘটিত। এ বিবাহ মদনঘটিত বলিয়াই দুর্ব্বাসা এই অভিশাপ দিয়াছিলেন। অতএব প্রত্যাখ্যানটি মদনঘটিত।

এ বিবাহ মদনঘটিত বলিয়া দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিয়াছিলেন, একথা কাব্যে নাই। কাব্যে আছে যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় তন্ময় হইয়া দুর্ব্বাসার অথিতিসংকার করেন নাই বলিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিত॥

কণ্বমুনির মত দুর্ব্বাসাও নিশ্চয় বিবাহবৃত্তান্ত ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন, নহিলে কিরূপে বলিলেন "তুমি যাহার কথা ভাবিতেছ সে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।" কালিদাসের যদি এই উদ্দেশ্য থাকিত যে মদনঘটিত বিবাহ বলিয়াই দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহা হইলে অভিশাপে কি সেই কারণই উল্লিখিত হইত না? মহাভারতে আছে যে দুষ্মন্ত সত্য সত্যই কিছু শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি লোকলজ্জায় শকুন্তলাকে প্রথমে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কালিদাস অভিশাপের অবতারণা করিয়াছেন প্রধানতঃ দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য—অর্থাৎ এইটি দেখাইবার জন্য যে দুষ্মন্ত এত কাপুরুষ নহেন যে লোকলজ্জাভয়ে বিবাহ অস্বীকার করিবেন। দুষ্মন্তকে কবি কেন এরূপ বাঁচাইতে চাহেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিয়াছি।* এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যদি মদনঘটিত বিবাহ বলিয়া দুর্ব্বাসা এ বিবাহকে অভিশপ্ত করিতেন ত অভিশাপে তাহা উল্লেখ করিবার পক্ষে কোনই বাধা ছিল না।

প্রধান কথা, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম যে কোন কদর্থে মদন ঘটিত তাহাই বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। শকুন্তলায় 'মদন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে দেখি 'মদন' শব্দ প্রায়ই প্রেমের প্রতিশব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। দাম্পত্য আসক্তি অর্থে 'প্রেম' শব্দ সংস্কৃত কাব্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। ইংরাজিতে Cupid's arrow যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতে মদনবাণ সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'মদনবাণ' সংস্কৃত কবিদিগের একটি প্রচলিত প্রয়োগ। ইহার কোন মন্দ অর্থ নাই।

এই কুমারসম্ভবেই দেখি যে মদনবাণ শিবের হুঙ্কারে তাড়িত হইয়া পার্ব্বতীর হৃদয় ভেদ করিল। এসব স্থলে 'মদন' শব্দ 'প্রেমে'র প্রতিশব্দ স্বরূপ

* সাহিত্য বৈশাখ। "কালিদাস ও ভবভূতি" প্রবন্ধ।

ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ব্যর্থ হইবে কি অপরাধে ও কাব্যে তাহার সার্থকতা কি! শিবকে মদন বিচলিত করিতে পারেন নাই কেন তাহার কারণ আছে; তাহা পরে বলিব। কিন্তু স্বয়ং গৌরী মদনবাণে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। শকুন্তলা যে মদনবাণে বিদ্ধ হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর মদনবাণ সেখানে ব্যর্থ হইবে কেন!

সংস্কৃত প্রেমমূলক নাটক মাত্রেই প্রায় দেখি যে, নায়ক নায়িকা দর্শন মাত্রই স্মরশরে আহত হন। যথা বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটীক, কাদম্বরী, ইত্যাদি। ইহা ইংরাজিতে যাহাকে বলে love at first sight.

রূপজ মোহ অনেক সময়েই প্রেমের প্রথম সোপানস্বরূপ গণ্য হয়। কেহবা তাহার তাড়নায় পশুবৎ আচরণ করে, কেহবা তাহাকে বিবাহবন্ধনে শৃঙ্খলিত করে। দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমে এই রূপজ মোহের চেয়ে গর্হিত আর কিছুই দেখি না। বরং দেখি যে শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের প্রধান চিন্তা যে তাঁহার সহিত বিবাহ সম্ভবে কিনা। ইহা ধর্ম্মভাব, পাপ নহে। শকুন্তলাও দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে তবে তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিয়াছিলেন। এ বিবাহ যদি মদনঘটিত হয় তবে বহু সংস্কৃত নাটকে নায়ক নায়িকার মিলন মদন ঘটিত, Shakspeare এর অনেক নাটকে বিবাহ মদন ঘটিত এবং ইয়ুরোপে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বিবাহ মদন ঘটিত; এবং তাহা হইলে বলি মদনের জয় হোক!

আমরা দেখিলাম যে মদন যদিও শিবের কাছে ব্যর্থকাম হইয়াছেন গৌরীর কাছে হন নাই, এবং শকুন্তলা নাটকেও ব্যর্থ হন নাই বরং দস্তুর মত কৃতকার্য্য হইয়াছেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে, কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের পুরুষ প্রকৃতির মিলনে প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিকভাবে মিলন, অভিজ্ঞানশকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিকভাবে মিলন। এই প্রভেদ বশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞানশকুন্তলে মদন জয়ী হইল।"

তাহার পরে তপস্যা। গৌরী শিবের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা শিবকে পাইয়াছিলেন, সত্য। কিন্তু শকুন্তলা দুষ্মন্তের জন্য তপস্যা

করিলেন কবে? তিনি হেমকুট পর্ব্বতে পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়মক্ষামা বিরহব্রতধারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু আর কি করিতে পারিতেন! পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না, নিশ্চয়ই। পার্ব্বতীর দেখি—শিবের জন্য কঠোর তপস্যা, শকুন্তলার দেখি—আগ্রহহীন অনন্যোপায় বিরহযাপন। শকুন্তলার আচরণ প্রত্যেক বিরহিনী সাধ্বীর আচরণ। তিনি অভিশাপের সময়েও যাহা এখনও তদ্রূপ। বিরহব্রত ধারণের ফল দাঁড়াইল—প্রথম বারে অভিশাপ এবং দ্বিতীয় বারে মিলন! কোন্ নৈসর্গিক নিয়ম বলে?

রবীন্দ্র বাবুর যুক্তির অন্যান্য দোষ আছে। প্রথমতঃ পার্ব্বতী কামের সাহায্যে শিবকে লাভ করিতে চাহেন নাই, তিনি ঐকান্তিকী সেবাদ্বারা শিবকে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেবাদ্বারা (মদনের সাহায্য সত্ত্বেও) তিনি শিবকে পান নাই, তপস্যার দ্বারা পাইয়াছিলেন—প্রকৃত পক্ষে কুমারসম্ভবের এই ব্যাখ্যাই দাঁড়ায়। রবীন্দ্র বাবু, "সেবা" তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল না হওয়ায়, তাহার উল্লেখও করেন নাই! দ্বিতীয়তঃ কুমারসম্ভবের হরগৌরীর বিবাহের এত আয়োজন পুত্রোৎপাদনার্থে। শিব পরের হিতে পুত্রার্থে গৌরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, শুদ্ধ গৌরীর তপস্যার জন্য নহে। শকুন্তলা নাটকে তাহার ইঙ্গিতও নাই! রবীন্দ্রবাবু কুমারসম্ভব কাব্যের এই প্রধান কথার উল্লেখও করেন নাই।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক ও কুমারসম্ভব কাব্যের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। হরগৌরীর বিবাহ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর বিবাহ। তাহাতে কামের গন্ধ নাই। গৌরী তপস্যার দ্বারা শিবকে লাভ করিয়াছিলেন। শিব পরের হিতের জন্য (তাঁহার অনুরাগিনী) গৌরীকে বিবাহ করিয়াছেন! কুমারসম্ভবের উদ্দেশ্য সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর আদর্শ বিবাহ দেখানো—নারী তপস্যাদ্বারা মনোমত পতি লাভ করে, পুরুষ পুত্রার্থে বিবাহ করে—সে পুত্রও পরের হিতের জন্য। এই বিবাহ রবীন্দ্রবাবুর কাছে কুৎসিত বোধ হইতে পারে। মনে পড়ে তিনি শাস্ত্রের "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" বচনটি লইয়া এ বিবাহ কি কুৎসিৎ তাহা একদিন দেখাইতে বসিয়াছিলেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন! দেখিতেছি রবীন্দ্রবাবু এখনও বুঝেন নাই। শিব গৌরীর নগ্নমূর্ত্তি দেখিলেন না, কুমারীর ধর্ম্মনষ্ট করিলেন না, পুত্রার্থে বিবাহ করিলেন। কি কুৎসিত ব্যাপার! কিন্তু কালিদাস কি করিবেন! তিনি মূর্খ বর্ব্বর অকবি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেরই গঠিত আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন।

শকুন্তলা নাটকে কবি মানব ও মানবীর বিবাহ দেখাইয়াছেন। সেখানে প্রেমে কামগন্ধ আছে ও সে কাম বিবাহ সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই নাটকের যদি কোন নৈতিক উদ্দেশ্য থাকে তাহা এই যে আত্মীয় বন্ধু গুরুজনের অনুমতি না লইয়া গোপনে বিবাহ করিলে তাহার শাস্তি পাইতে হয়। গৌতমীও রাজসভায় রাজাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—"আপনিও বন্ধুবান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, শকুন্তলাও গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই।" এই poetic justiceএর নীতি অনুসারে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন ও দুষ্মন্ত যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, মিলনের অন্তরায় দূর হইলে, স্বাভাবিক নিয়মবলে দম্পতির পুনর্ম্মিলন হইল—তপস্যাবলে নহে। অর্থাৎ হরগৌরীর প্রেম দেব দেবীর প্রেম, দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম নর নারীর প্রেম। হরগৌরীর প্রেম আদর্শ প্রেম; দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম নৈসর্গিক প্রেম।

দুর্ব্বাসার অভিশাপকে চন্দ্রনাথবাবু ও রবীন্দ্রবাবু শকুন্তলা নাটকের কেন্দ্রস্থলীয় বলিয়া বুঝিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এ অভিশাপের অতখানি অর্থ নাই। কালিদাস দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য অভিশাপের অবতারণা করিয়াছেন। আমার একবার মনে হইয়াছিল যে এ অভিশাপের অবতারণায় কালিদাসের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি দুর্ব্বাসার দ্বারা গোপনে চোরের মত বিবাহ করাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ অভিশাপ অভিশাপ নহে, ভবিষ্যদ্বাণী—এরূপ বিবাহে যাহা ঘটিবে অভিশাপ তাহাই উচ্চারণ করিয়াছিল! কিন্তু তাহা হইলে দুর্ব্বাসা অভিশাপে তাহাই বলিলেন না কেন? সে পক্ষে কি বাধা ছিল? সেই জন্য আমার ইচ্ছার অনুকূল এই ব্যাখ্যাটি দিতে পারিতেছি না। উপরন্তু, অঙ্গুরীয় হারাইয়া যাওয়া অভিশাপের অন্তর্গত নহে। অভিজ্ঞান হারাইয়া যাওয়াতেই এই বিভ্রাট। কালিদাস স্পষ্টতঃ এই অভিজ্ঞানকেই নাটকের কেন্দ্রস্থানীয় করিয়াছেন। তাই তিনি নাটকখানির নাম দিয়াছেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্!

রবীন্দ্রবাবু কুমারসম্ভবের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে—তাহা প্রকৃত সমালোচনা। আমি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতি আক্রোশবশতঃ এই সমালোচনার ভ্রম দেখাইতে বসি নাই। তিনি অদ্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন কল্য তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ প্রয়োজনও নাই। কারণ তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। "বিরহ কাব্য" প্রবন্ধে তিনি কুমারসম্ভবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ

না করিলে আমি তাহার ভ্রম দেখাইবার জন্য এই সময় অপব্যয় করিতাম না। 'বিরহকাব্য' প্রবন্ধেরও ভ্রম দেখাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখিলাম রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে আমার 'সোণার তরী'র সমালোচনার উত্তর। নহিলে এত জোরের সহিত তাঁহার একথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না যে ভালোকাব্য মাত্রেরই একটি গুণ এই যে নানা লোকে তাহা হইতে নানা অর্থ বাহির করে। আমি এরূপ ভ্রান্তমতপ্রচার বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনা করি, সেইজন্য প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

উপসংহারে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

কাব্যে কোন একটি চরিত্র কিরূপ স্বাভাবিক চরিত্র বা কোন একটি ঘটনা কোন্ স্বাভাবিক নিয়মবলে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানোর নামই প্রকৃত সমালোচনা। তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। যখন কেউ বোঝান যে কাব্যের স্থূল অর্থ (যাহা বোঝা যাইতেছে তাহা) তাহার প্রকৃত অর্থ নহে, কিম্বা কবির অঙ্কিত চরিত্র—চরিত্র নহে, আর কিছু, তখনই তাহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলে। উদাহরণতঃ Hamlet চরিত্রটি কোন্রূপ স্বাভাবিক চরিত্র তাহা Voltaire ধরিতে, পারিলেন না, তাই তিনি নাটক-খানিকে ravings of a drunken maniac বলিলেন। তাঁহার মতে Hamlet নাটক নাটকই নহে। বিভিন্ন সমালোচক সে চরিত্র কিরূপ স্বাভাবিক চরিত্র তাহা নিজের নিজের মত অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। একজন হয়ত বলিলেন Hamlet একজন দার্শনিক, কেহবা হয়ত বলিলেন Hamlet বিশ্ববিদ্বেষী, কেহবা হয়ত বলিলেন তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে, ইহা চরিত্র বিশ্লেষণ। জটিল চরিত্র একজন একরূপ বুঝেন আর একজন অন্যরূপ বুঝেন। হয়ত দুই জনেরই ঠিক—যেমন অন্ধের হস্তি দর্শন। হয়ত একজনের ঠিক আর একজনের ভুল। হয়ত দুইজনেরই ভুল। তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। যদি কেহ বলিতেন Hamlet জ্ঞান, Ophelia প্রেম, King পাপ ; এ নাটকের উদ্দেশ্য দেখানো যে হৃদয়হীন জ্ঞান পাপকে নাশ করিতে সমর্থ হয় না, তবে তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইত।

একটি বর্ণিত ঘটনা আর একটি কল্পিত বা স্বাভাবিক ঘটনার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলি না। তাহা সাদৃশ্যমাত্র

(analogy)—আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি। সব প্রেমই সেই অনাদি প্রেমের অঙ্গ, তাই বলিয়া রামের প্রতি সীতার প্রেম, ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই নহে—যে মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসে। এ কথা বলিবার জন্য কালী ও কাগজ খরচ করার প্রয়োজনই নাই যে, মানুষের প্রেম বিরহ ইত্যাদি সেই অনাদি প্রেম বিরহ ইত্যাদির অঙ্গ। কারণ শেষোক্ত ধারণাটি পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক সত্যের generalisation. প্রত্যেক কাব্যের বর্ণিত ঘটনা সেই ঘটনাগুলির generalisationএর সহিত মিলিবেই। যাহা সাদৃশ্যমাত্র, তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে।

কতকগুলি কবিতার সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। সেই অর্থই তখন কবির অভিপ্রেত ও সে অর্থ সহজেই বোঝা যায়। এরূপ কবিতায় কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে সেরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ স্পষ্টতঃ হয় না বা তাহা কবির অভিপ্রেত নহে, সেখানেই এইরূপ ব্যাখায় আপত্তি। কালিদাস যে কোন আধ্যাত্মিক অর্থে মেঘদূত লিখেন নাই তাহার ভূরিভূরি নিদর্শন এই মেঘদূতেই আছে। যক্ষ কেন যে দৌত্যে জড় মেঘকে নিযুক্ত করিল তাহার কারণ কবি বলিতেছেন "কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচে তনেষু।"—তাহার পরেও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা! কালিদাস কি নিজের কাব্যের অর্থ নিজে বুঝেন নাই? সাদৃশ্য নির্দ্দেশকে কি ব্যাখ্যা বলে?

কবি নিজের যে কাব্যের অর্থ বুঝিতে পারেন না অথচ সমালোচকেরা তাহা বুঝিতে পারেন—কবির সে কাব্য না লেখাই শ্রেয়ঃ। সমালোচক যাহা বুঝিতে ও ভাষায় বুঝাইতে পারেন, তাহা কবিরও বুঝিবার ও ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত ছিল। যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে সে কাব্যটি কাব্য নহে, সমালোচনাটিই কাব্য। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে মহাকবি কালিদাস তাঁহার নিজের কাব্য বুঝিতে পারেন নাই বা তাঁহার ভাষায় কুলায় নাই। তিনি সমালোচকদিগের মনোমত ধারণা অনুসারে কাব্য লিখেন নাই। তিনি জন্মান্তর মানিতেন। তিনি কস্মিন্‌কালে রবীন্দ্রবাবুর অভিশাপরূপ প্রিয় ধারণা অনুসারে মেঘদূত লিখেন নাই। তিনি ঋষির অভিশাপ মানিতেন। তিনি তাই অভিজ্ঞানশকুন্তলে অভিশাপ—অভিশাপ হিসাবে লিখিয়াছেন; আধ্যাত্মিক হিসাবে লিখেন নাই। বেদের স্তোত্রগুলি অদ্য কবিত্ব হিসাবে আমরা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু সেগুলি সেই বৈদিক ঋষিদের কাছে সত্য ছিল। বেদকে যদি কেহ কাব্য বলেন তাহা মানিক না।

বেদ—ধর্ম্মগ্রন্থ। আবার বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমকে কুলটার প্রেম হিসাবে ধরিলে মানিব না। যাহা যে উদ্দেশ্যে যে অর্থে রচিত হইয়াছে, তাহাই তাহার উদ্দেশ্য বা অর্থ। সমালোচকের কাজ কবির অর্থ কি, তাহাই বাহির করা। তাঁহার নিজের মনোমত ধারণা অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পদে পদে বাধিবে!

স্বীকার করি রবীন্দ্রবাবুর ধারণাটি অতি উচ্চ। যাঁহার এরূপ উচ্চ ধারণা তিনি চিত্রাঙ্গদা লিখিলেন কিরূপে? সেখানে যে আদ্যোপান্ত মদনেরই জয় জয়কার ঘোষিত হইয়াছে।—এ শকুন্তলার মদন নহে। এ স্থূল পাশব সঙ্গমের মদন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন মদন। চিত্রাঙ্গদার নায়ক নায়িকার নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া কামে জর জর হন—নির্লজ্জ মোলায়েম ভাবে কুমারীর ধর্ম্মনষ্ট করেন। তাহাতে কিছু বাধিল না; কোন বিভ্রাট ঘটিল না; অনুতাপও হইল না। রবীন্দ্রবাবুর এই কুমারসম্ভবের সমালোচনা তাঁহার চিত্রাঙ্গদা কি ভীষণ ও কদর্য্য তাহাই দেখাইয়াছে। আর কিছু করিতে পারে নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্যে সুরুচি।

(প্রতিবাদ)

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম-এ মহাশয় "সাহিত্যে সুরুচি" শীর্ষক এক সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ লিখিয়া রুচি নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন! তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। অতএব, তাঁহার এই সাধু ও মহৎ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

লেখক মহাশয় বহুতর গবেষণার পর যে সকল অমূল্য (?) মত প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রবাসী সম্পাদক" মহাশয়ই তাহার দুই তিনটির সদুত্তর ফুট্‌নোটে দিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে, তাঁহাদের "সাহিত্যক্ষেত্রে জনকতকের রুচি বিকার লইয়া তাঁহাদের সকলকেই যখন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইতে হইয়াছে," তখন অন্ততঃ তাঁহাদের এই দারুণ চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য—এই এতটুকু

পরোপকার করিবার বাসনায়—আমি যদি তাঁহাদের সাহিত্যক্ষেত্রে trespass করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ গর্হিত কার্য্য হইবে না।

লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "সে দিন ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যে সুরুচির প্রতি দৃষ্টি রাখা একটি প্রধান কর্ত্তব্য। পত্রিকা বিশেষে কোনো কবির উপর রুচিবিগর্হনা দোষ আরোপ করিয়া জনৈক গ্রন্থকার সুরুচির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে একটু গোল বাধিয়াছে। গোল আর কিছু নয়, সুরুচি লইয়া।" আমরাও বলি, গোল বাধিবারই কথা। এবং এই সুরুচি ও কুরুচি লইয়া তিনি যে মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতেও যে তাঁহার গোল সোজা ও সরল হইয়াছে এমন বোধ হইল না। কারণ, তিনিই বলিতেছেন যে, "নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্যের প্রতি সমালোচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের সাহিত্যে এখন সুরুচির কথা অবতারণা করা শুধু যে অনিষ্টজনক হইবে তাহা নহে; কতকটা অনাবশ্যক।" কিন্তু, আমরা সমালোচক না হইলেও নিরপেক্ষ ভাবেই সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, সুরুচি অথবা সুনীতির কথা সমাজ বা সাহিত্য সম্বন্ধে অবতারণা করা কোনও কালেই অনিষ্টজনক হয় না। "সমাজই সাহিত্য গড়িয়া থাকে, আর সাহিত্যই সমাজের গতি নির্ণয় করে"* ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে, সাহিত্যের কলেবর পুষ্টির জন্য সুরুচি ও সুনীতির 'অনিষ্টজনক অবতারণা' না করিয়া "মালিনী মাসীর" আমদানিতে বঙ্গসাহিত্য জগত গুলজার করিলে এ সাহিত্য যে কিরূপ হৃষ্টপুষ্ট হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। 'সুরুচির কথা অবতারণা' না করিয়া লোক ও আত্মরঞ্জনের জন্য সাহিত্যকে যদি উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই আপনার পথে চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই অজস্র "চুম্বন" ও "পীন পয়োধরে"র ঠেলায় পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেই যে বিলক্ষণ নাকাল ভোগ করিতে হইবে ইহা স্থির নিশ্চিত!

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোলার অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ, ইহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। নতুবা রুচির কথা উঠিলেই 'অরুচির রুচি' স্বরূপ সেই গরীব জোলার ঘাড় ধরিয়া প্রতি মাসিকের পৃষ্ঠায় আনিবার কারণ কি? রুচির কথা

* বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়—আশ্বিন, ১৩১৬, অর্চ্চনা।

উঠিলেই এক সম্প্রদায় জোলার গলায় দড়ি দিয়া মাসিকের পৃষ্ঠায় 'হাডুডু' করিতে থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান সাহিত্যের আবশ্যকতা কিসের জন্য, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কলাবিদ্ রুচি অথবা কুরুচির মুখ তাকাইয়া আপনার শিল্পকে কখনই শ্রীহীন ও খর্ব্ব করিবেন না। রুচি অথবা কুরুচির সহিত শিল্পের মুখ্যতঃ সম্বন্ধ অল্পই। কেবলমাত্র নীতি কথার প্রচারের জন্যই যিনি শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনি নীতি-উপদেষ্টা হইতে পারেন—শিল্পী নহেন। তাহা হইলে 'মেঘদূতকে' ত্যাগ করিয়া চাণক্যশ্লোক লইয়া থাকাই উচিত! কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, যিনি ঠারে ঠোরে ও ইঙ্গিতে শিল্পের মধ্যে কুরুচি ও দুর্নীতির ভাবকে সজাগ করিয়া তুলেন, তিনি যত বড়ই শিল্পী হউন না কেন, তাঁহার সে গ্রন্থ ভদ্রসমাজে অপাঠ্য। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর Ingersollএর অভিমত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "The artist who endeavours to enforce a lesson becomes a preacher; and the artist who tries, by hint and suggestion, to enforce the immoral becomes a pander.

There is an infinite difference between the nude and the naked, between the natural and the undressed. The undressed is vulgar—the nude is pure."

এই শ্রেণীর পাঠক ও লেখকদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে বাস্তব চিত্রে দর্শক অথবা পাঠকের মনে কুপ্রবৃত্তির ভাব জাগাইয়া তুলে না বরং তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা কুরুচিপূর্ণ হয় না। কিন্তু 'মডেল ভগিনী' এই শ্রেণীর পুস্তক হইয়াও কতিপয় শিক্ষিতাভিমানী পাঠকের নিকট অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সমালোচক (?) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'কে সুরুচির খনি বলিয়া থাকেন এবং 'মডেল ভগিনী'কে নকারজনক কুরুচিপূর্ণ বোধে স্পর্শ করেন না। 'মডেল ভগিনী'র অপরাধ যে সে বাস্তবজগতের পাপচিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়—ইহার আর এক অপরাধ যে ইহা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানে না, 'চোখের বালি'র মত কুৎসিতকেও একটা সৌন্দর্য্যের আবরণ দিয়া, একটা ভাল মুখোস্ পরাইয়া জাহির করে নাই; বিড়াল কুকুরের নগ্নতাকে সকলের চোখের সম্মুখে বীভৎস করিয়া আঁকিয়া তাহার পর তাহার জন্য প্যাণ্ট্ কোটের ব্যবস্থা করে নাই! এ কথার অর্থ যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহারা

যেন "কোনো কবির" কাব্য পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই দেখিবেন যে, সেখানে অশ্লীলতা ভারতের মত স্পষ্ট ভাষায় লিখিত না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে একখান 'হাওয়ার কাপড়ের' আবরণের মধ্য হইতে আরও উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।

উপসংহারে লেখক বলিতেছেন, "এখন এই রবীন্দ্রীয় যুগে সাহিত্যে এমন কি কুরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া এখন এই সাহিত্যকে পরিমার্জ্জিত ও সুরুচি সম্পন্ন করিতে হইবে? এ কথা উঠেই বা কেন, তুলেই বা কে? একবার নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা বলুন দেখি যে, এই যুগে সাহিত্য সুসংযত, সুসমাহিত ও মার্জ্জিত হইয়াছে কিনা?" এতদুত্তরে আমরাও বিনীতভাবে বলিতেছি যে, এই "রবীন্দ্রীয় যুগে" "ভারতচন্দ্রীয় যুগে"র কুরুচির প্রকাশ পায় নাই, পাইতেও পারে না। এখনকার কালে সে 'বিদ্যা' থাকিলেও সে 'সুড়ঙ্গ' প্রস্তুত হইবার অবসর ঘটিবে না! আর হিন্দুর ঘরের বালবিধবা শিক্ষিতা 'বিনোদিনী' 'টি-কপ্' হস্তে করিয়া 'সুড়ঙ্গ' পথ দিয়া 'বিহারী'র বাড়ী যাইবার আয়োজন করিবে না! 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র ভারতের যুগের হইলে বিনোদিনীর জন্য যে কি করিত তাহা ভারতচন্দ্রই জানেন; তবে রবীন্দ্রীয় যুগে যে উচ্চ শিক্ষিত, বিবাহিত মহেন্দ্র কি করিতেছে তাহারই একস্থল আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; "মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জ্জন শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গত রাত্রে ব্যবহৃত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল—সেই কোমল আস্তরণকে দুই প্রসারিত হস্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে ঘ্রাণ করিয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল—"নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!" মহেন্দ্রের এই 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' 'বাস্তব' হইতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কুরুচিপূর্ণ কলুষিত চিত্র আর কি হইতে পারে? ইহার পরও লেখক বলিবেন "একথা উঠেই বা কেন, তুলেই বা কে? রবীন্দ্রীয় যুগে যে সাহিত্য সুসংযত…।" লেখক সাজিবার সাধ থাকিলে লিখিতে পার, কিন্তু না জানিয়া বড় কথা কহিয়া 'ফয়তা' মারিও না!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

আর্ত্তের আত্ম-নিবেদন।

ছিল দিন প্রভু নিখিল ভুবনে. চির-পূর্ণিমা ভাসিত নয়নে,
ফুটিত আঁধারে উজল চন্দ্র,
শ্রবণে শ্রাবণ-জলদ-মন্দ্র,
(তুমি) সহসা ছিঁড়িলে মরম-কেন্দ্র, আলো-পথ-হারা আমি।
আমার সকল গর্ব্ব, সম্পদ, মান, চূর্ণ করেছ তুমি ॥

দৈন্যে দীনতা, অর্থ-হীনতা, না ছিল লক্ষ্য তুমিতো জান তা',
জীর্ণ কুটীর অঙ্গনতলে,
শত উল্লাসে শুয়েছি ভূতলে,
সম্বল বাঁধা ছিল অঞ্চলে, হরি' অন্তরযামী।
নিমেষে আমার সম্পদ, মান. চূর্ণ করেছ তুমি ॥

এ হৃদি-কাননে নির্ম্মল যূঁথী, এ জীবন-রথে নিপুণ সারথী,
চন্দন-দীপ আঁধার-গেহে,
পরাণ-পুষ্প যা ছিল দেহে,
ছিঁড়িলে অকালে কেন তারে ওহে, জীবন-মরণ-স্বামী।
আমার শান্তি, গর্ব্ব, সম্পদ, মান, চূর্ণ করিলে তুমি ॥

চরাচর-পতি তুমি মহাবলী, দুর্ব্বল আমি পৃথ্বীর ধূলি,
তারকা, চন্দ্র, তপন-খচিত,
সকল বিশ্ব তোমারই রচিত,
প্রতিকূল যদি তুমি মোর নাথ— নির্ম্মম যদি তুমি।
তবে কাহারে জানাব আকুল-বেদনা, কোথায় দাঁড়াব আমি ?

দীনবন্ধু তুমি অনাথ-শরণ, তাপ-হরণ ও রাঙা চরণ,
উদ্ভূত তাহে লক্ষ বিশ্ব,
ছোটে শতধারে করুণা-উৎস,
ব্যথিত,আর্ত্ত, আমি যে নিঃস্ব, পদে আশ্রয়-কামী।
আমার সম্পদ, মান, গর্ব্ব লয়েছ—আমারেও লহ তুমি ॥

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভূমি।*

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি' ;
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী—
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,—
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা !
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পাদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা !
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;

---

* অর্চ্চনা-সাহিত্য-সম্মিলনীতে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

লুটে ভূমে শ্রী-অঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি!
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি!

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে,
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল!

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধূক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি';
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ ঘূৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী!

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে!

এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ মধু-বঙ্কিম-জননী।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহধর্ম্মিণী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন আশ্বিন মাসের প্রাতে কলিকাতা হইতে একখানা ট্রেণ মধুপুর ষ্টেশণে আসিয়া লাগিল। জন কয়েক লোক গাড়ী হইতে নামিলেন। গাড়ী আবার মহাবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। যাঁহারা নামিলেন, তাঁহারা আর কেহই নহেন, এক পরিবারভুক্ত—সস্ত্রীক সতীশচন্দ্র পুত্রকন্যাসহ মধুপুরে উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমাঙ্গিনী এখনও, পূর্ব্বের ন্যায়ই পরমসুন্দরী আছে, তবে সে এখন পূরামাত্রায় গৃহিণী হইয়াছে, আর তাহার সে যৌবনের বিলোল ভাব নাই।

কোন্ বাড়ীতে সতীশচন্দ্র বাস করিবেন, তাহা তিনি জানিতেন না; তাঁহার এক পরিচিত বন্ধু রাখাল বাবু মধুপুরে থাকেন, তাঁহাকেই পত্র লেখায় তিনি সতীশচন্দ্রের জন্য একটা বাড়ী ছয় মাসের জন্য ভাড়া করিয়াছেন; সে বাড়ী কিরূপ, ষ্টেশণ হইতে কতদূর. তাহার কিছুই সতীশচন্দ্র জানিতেন না। ভাবিয়াছিলেন রাখাল বাবু ষ্টেশণে আসিবেন; কিন্তু দেখিলেন, তিনি ষ্টেশণে আসেন নাই, একজন অপরিচিত লোক পাল্কী ও গরুর গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

রাখাল বাবুকে না দেখিতে পাইয়া সতীশচন্দ্র বিরক্ত হইলেন; স্ত্রীকে বলিলেন, "এ সব লোকের ভদ্রতা জ্ঞান একেবারে নাই!"

হেম বলিল, "কোন কাজে বোধ হয় তিনি আসিতে পারেন নাই, কোন লোক পাঠাইয়া থাকিবেন।"

এই সময়ে সেই অপরিচিত লোকটি আসিয়া বলিল, "সতীশ বাবু কি আপনার নাম?"

"হাঁ—এই রকম বোধ হয়।"

"রাখাল বাবু সকালে বিশেষ কাজে দেওঘর গিয়াছেন, আমি আপনার জন্য পাল্কী আর গাড়ী আনিয়াছি।"

"ভাল—চল। কতদূর যাইতে হইবে?"

"বেশী দূর নয়—পানিয়াখোলা।"

পানিয়াখোলা ব্যাপারটা কি, সতীশচন্দ্র ভাল বুঝিলেন না; নিজ ভৃত্য-দিগকে মাল-পত্র গাড়ীতে তুলিতে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া দ্বারবানকে পাল্কীর সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তাহার পর রাখাল বাবুর লোকের সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

* * *

নূতন বাড়ীতে উঠিয়া তথাকার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সতীশচন্দ্রের সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল। বৈকালে স্থানটা একটু দেখিবার জন্য তিনি বাহির হইলেন।

তিনি যে বাড়ীটি লইয়াছিলেন, তাহা অজয় নদীর ধারে; নিকটে একটা বাড়ী ভিন্ন আর বাড়ী নাই, আর সেই বাড়ীও খালি। অনুসন্ধানে জানিলেন, অন্যান্য লোক প্রায় সকলেই ষ্টেশণের নিকটে ও থানার নিকটে বা রেলের অপর ধারে বাস করেন; সুতরাং সতীশবাবু অতি নির্জ্জন স্থানেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি মধুপুরের ভিতরে আসিয়া রাখাল বাবুর বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। রাখাল বাবু তখন দেওঘর হইতে ফিরিয়াছিলেন। তিনি সতীশচন্দ্রকে অতি সমাদরে বসাইলেন; বলিলেন, "বিশেষ কাজে দেওঘর যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম; এইমাত্র ফিরিলাম, সেজন্য ষ্টশণে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। মধুপুর কিরূপ দেখিতেছেন?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "দেখিতেছি ভাল, তবে লোকজন বড় কম।"

"এখনও বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, ক্রমে অনেক লোক দেখিতে পাইবেন।"

"এখানে ভাল ডাক্তার আছেন ত?"

"হাঁ, ডাক্তারের অভাব হইবে না—রেলের ডাক্তার—"

"তাঁহাকে সব সময়ে ত পাওয়া যায় না।"

"হাঁ, তাঁহাকে লাইনে যাইতে হয়, তবে একজন বেশ ভাল ডাক্তার এখানে প্রাক্‌টিস করেন, বয়স বেশী নয়—"

সতীশ বাবু ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বয়স কম ডাক্তার, সে এখনও ডাক্তারীর কি শিখিয়াছে? আপনাকে প্রথমেই লিখিয়াছিলাম যে, আমার স্ত্রীর শরীর ভাল নয়, তাহার পর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে; এ অবস্থায় যেখানে ভাল ডাক্তার নাই, সেখানে আমার থাকা কিছুতেই হইতে পারে না। আপনি লিখিয়াছিলেন যে, এখানে খুব ভাল ডাক্তার আছে।"

"হাঁ, আমরা তাঁহাকে খুব ভাল ডাক্তার বলিয়াই জানি। এই প্রায় দুই বৎসর এখানে আছেন, তাঁহার খুব প্রশংসা, সকলেই তাঁহাকে ডাকে—রমেন্দ্র বাবু—"

সতীশ বাবু চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি নাম?"

"রমেন্দ্র বাবু।"

"কি— কি ?"

রাখাল বাবু, সতীশ বাবুর স্বরে বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; ভাবিলেন, সতীশ কি কানে এখন কম শুনে? পরে বলিলেন, "রমেন্দ্রনাথ ঘোষ—আপনি কি তাঁহাকে চিনেন?"

সতীশচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিলেন, "না—কই—ইঁহাকে চিনি ?, কতদূরে থাকেন?"

"এই—বেশী দূরে নয়। প্রয়োজন মত সকল সময়েই তাঁহাকে পাইবেন।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথা কহিয়া সতীশচন্দ্র বিদায় হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন স্থানে আসিলে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সতীশচন্দ্রের দাসদাসীগণও নানারূপে ব্যস্ত হইয়াছিল, খোকার ঝিও খোকাকে ভুলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু খুকীর ঝির সে উপায় ছিল না, কারণ খুকীর এখনও স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা লাভ হয় নাই। কাজেই সে সর্ব্বদা ঝির কোলে কোলে থাকিতে বাধ্য হইত। খোকার ঝির নিকটে খোকা নাই দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা বাবু কোথায়?"

খোকা বাবুর পা হইয়াছিল, খোকা বাবু পা ব্যবহার করিয়াছিলেন। খুকীর ঝির এই কথা শুনিয়া খোকার ঝি ভীতভাবে চারিদিকে চাহিল, খোকা বাবু নিকটে নাই। সে তাহাকে খুঁজিতে বাহিরের দিকে চলিল।

বাহিরে আসিয়া ঝি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদে সকলে বাহিরে ছুটিয়া আসিল; দেখিল, উচ্চ রোয়াকের উপর হইতে খোকা বাবু নীচে পাথরের মেজের উপর পড়িয়াছেন, জ্ঞান নাই, কপাল হইতে রক্ত ছুটিতেছে।

হেমাঙ্গিনীও ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে সত্বর খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল, তাহার পর অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "বাবু—বাবু কোথায়? তাঁকে—"

"তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন—কোন্ দিকে গিয়েছেন জানি না।"

"তবে যা, শীঘ্র একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।"

তখন একজন ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। হেমাঙ্গিনী উন্মাদিনী মত হইয়া সংজ্ঞাহীন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহমধ্যে আসিল।

ক্ষণপরে ডাক্তারও উপস্থিত হইলেন। তিনি হাঁপাইতেছিলেন, নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই খোকার সংজ্ঞালাভ হইয়াছিল। রমেন্দ্র বাবু যত্নে খোকার মাথা ধুইয়া বেণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "ইহাকে উঠিতে দিবেন না, আমি এখনই একটা ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি, কোন ভয় নাই, সামান্য লাগিয়াছে।"

এতক্ষণ হেমাঙ্গিনী বা রমেন্দ্রের পরস্পরকে দেখিবার সময় হয় নাই, বিশেষতঃ হেমাঙ্গিনী এক্ষণে প্রকৃতই রমেন্দ্রকে ভুলিয়া গিয়াছিল, রমেন্দ্রও যেরূপ ভাব দেখাইলেন, তাহাতে পূর্ব্বে যে কখনও হেমকে ভালবাসিতেন, তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখাইলেন না।

তিনি বলিলেন, "বহুকাল পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।"

হেম বলিল, "আমি আপনাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম।"

"আমি রাখাল বাবুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, আপনারা মধুপুরে আসিতেছেন।"

"খোকার বেশী কিছু লাগে নাই ?"

"কিছু নয়—সামান্য, আমি মনে করিয়াছিলাম গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, ছেলেপিলের এরূপ প্রায়ই হয়। এইটাই কি আপনার বড় ছেলে ?"

"হাঁ, আর একটী মেয়ে আছে।"

"আমি এখনই ঔষধটা পাঠাইয়া দিতেছি ; এক দাগ খাওয়াইয়া দিবেন। সতীশ বাবুকে আমার নমস্কার জানাইবেন।"

রমেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন। তিনি পথে কিয়দ্দূর আসিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী জানালায় দাঁড়াইয়া আছে। রমেন্দ্র আর তাহার দিকে চাহিলেন না। ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া সত্বর পদে চলিয়া গেলেন ; বোধ হয়, হেমাঙ্গিনীও আর তাঁহাকে দেখে নাই। প্রকৃতই তাহাদের উভয়ের মন হইতে পূর্ব্বকথা সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়াছিল।

কিন্তু একজন তাহা বুঝিল না। সতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছিলেন, তিনি দূর হইতে জানালায় দণ্ডায়মানা স্ত্রী ও পথে রমেন্দ্রকে দেখিলেন। তিনি রাখাল

বাবুর নিকট রমেন্দ্রের নাম শুনিয়া তাহারই কথা মনে আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছিলেন, আর সেই রমেন্দ্র—তাঁহার স্ত্রী মধুপুরে উপস্থিত হইতে না হইতে তাঁহার বাড়ীতে! তাহার অনুপস্থিতিতে গোপনে তাহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, এখন চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার স্ত্রী জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে!

রমেন্দ্র বাবু তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, অন্য দিকে কাজ থাকায় তিনি সত্বর পদে মাঠের পথে অদৃশ্য হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আমায় দেখিয়া পলাইল, আমার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস নাই, কেমন করিয়া থাকিবে। অনায়াসে গোপনে আমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া গেল, একদিন দেরি সহে নাই।"

এই সময় যদি কেহ সতীশচন্দ্রকে বলিত, রমেন্দ্র প্রকৃতই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, সেই দিকে কাজ থাকায় দ্রুত পদে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তখন সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াও সতীশচন্দ্রের মনের পরিবর্ত্তন হইল না; তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ব্যগ্র, ব্যাকুল ও চিন্তিত দেখিলেন; প্রকৃত তাহার এ ভাব তাহার পুত্রের জন্য হইয়াছিল; কিন্তু সতীশ ভাবিলেন, রমেন্দ্রের সহিত দেখা হওয়াতেই তাহার এ ভাব হইয়াছে।

স্বামীকে দেখিবামাত্র হেমাঙ্গিনী বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ! আমি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; একটা ভারি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

সতীশচন্দ্র রাগত স্বরে বলিলেন "খুবই দুর্ঘটনা, তাহা আমি জানি—বলিতে হইবে না।"

অসাবধানতার জন্য ছেলে আঘাত পাইয়াছে, ইহাতে স্বামী রাগত হইয়াছেন, ভাবিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "বেশি গুরুতর কিছু হয় নাই, রমেন্দ্র বাবু এই কথা বলিলেন। তিনি এখানকার ডাক্তার। নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাকে এখান হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছ।"

ক্রোধ দমন করিতে গিয়া সতীশচন্দ্রের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি—এখানে কি জন্য আসিয়াছিল?"

ভীত হইয়া হেমাঙ্গিনী কহিল, "আমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আমি—"

আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সতীশচন্দ্র কহিল, "তুমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে। কোন্ সাহসে তুমি তাহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে? আমি

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে-না-যাইতে তুমি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে ! বোধ হয় পূর্ব্বের মত দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

হেমাঙ্গিনী অতি বিস্মিত স্বরে বলিল "তুমি এ সব কি বলিতেছ ? এ সব কি—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সতীশচন্দ্র ভৎ‍র্সনা করিলেন, "তাহা পারিবে কেন ? তোমার আগেকার ভালবাসার পাত্র রমেন্দ্রের কথা বলিতেছি ! আমি একটু আড়াল হইবামাত্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছ ! খুব ভাল ! কে তোমায় ইহার মধ্যে সংবাদ দিল যে, সে এখানে থাকে ? এত শীঘ্র কিরূপে জানিলে ? না, বরাবরই জানিতে, আমায় বল নাই ?"

হেমাঙ্গিনী বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর মুখপ্রতি চাহিয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ স্বামী ও স্ত্রী একেবারে নীরব, কাহারও মুখে কথা নাই।

হেমাঙ্গিনী নিস্পলকনেত্রে ধীরে ধীরে বারংবার স্বামীর আপাদমস্তক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। সতীশচন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কথা নাই। অবশেষে সতীশচন্দ্র বলিলেন, "দেখ, তোমায় স্পষ্ট বলিতেছি—যদি আর কখনও এই রমেন্দ্রের সঙ্গে গোপনে দেখা কর. তাহা হইলে এবার তাহার রক্ষা থাকিবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।"

এবার হেমাঙ্গিনী সগর্ব্বে মস্তক তুলিল, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় বাজিয়া উঠিল, "গোপনে দেখা,—গোপনে দেখা করা কি ? খোকা পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইলে আমি চাকরদের শীঘ্র একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলি, তাহারা রমেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনে—আমি জানিতাম না যে, তিনি এখানকার ডাক্তার। তিনি আসিয়া খোকার মাথা বাঁধিয়া দিয়া ঔষধ দিয়া গিয়াছেন ; তিনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন নাই—তোমার ছেলেকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তুমি গোপনে দেখা করা কাহাকে বল ?"

এই বলিয়া সগর্ব্বে হেমাঙ্গিনী দৃপ্তপাদবিক্ষেপে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে যে কক্ষে ছেলে ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন যাহা যাহা হইয়াছিল, স্ত্রীর নিকটে সমস্তই শুনিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের শান্তি জন্মিল না; ঈর্ষা ও ক্রোধে তাঁহার হৃদয়ে লেলিহান নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—বহুকাল হইতে যে ঈর্ষানল তাহার হৃদয়ে তুষাবৃত অগ্নির ন্যায় এতদিন প্রধূমিত হইতেছিল, আজ তাহা যেন ঘৃতাহুতি পাইয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

তিনি বিবাহে সুখী ভিন্ন অসুখী হন নাই। হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে পূর্ব্বে যে ভাবই থাকুক না কেন, সে তাহা কখনও প্রকাশ করে নাই। সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করিয়াছিল, তবু ঈর্ষা এমনই ভয়ানক যে তাহা একবার হৃদয়ে স্থান পাইলে সহজে কিছুতেই যায় না। আজ বহুকাল পরে রমেন্দ্রকে দেখিয়া সুবিধা পাইয়া সেই ঈর্ষা কালসর্পের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিল।

স্বামী ও স্ত্রীতে সে দিন আর একটাও কথা হইল না। সতীশচন্দ্র বাহিরে রহিলেন; অভিমানিনী হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট আসিল না।

পরদিন সকালে রমেন্দ্রনাথ আসিলেন। তিনি সরলচিত্তে সতীশচন্দ্রের সহিত হস্তবিলোড়নের জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—হাত নাড়িয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু রমেন্দ্র বসিলেন না, বলিলেন, "একটু ব্যস্ত আছি, একটা রোগী দেখিতে এখনই যাইতে হইবে। আপনার পুত্র কেমন আছে?"

এই সময়ে রমেন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তথায় আসিল। আসিয়া বলিল, "এখন ত ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে—শুইয়া থাকিতে চায় না।"

সতীশচন্দ্র রাগত ভাবে বলিলেন, "এ রকম অসাবধান আমি দেখি নাই—আমি সব ঝি চাকর দূর করিয়া দিব বলিয়াছি। ছেলেটা হয় ত মারা যাইতে পারিত।"

রমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তাহাও যে বড় অসম্ভব ছিল, তাহা নহে। একবার দেখিব?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "এই পাশের ঘরে আছে—যান, আমি আসিতেছি।"

রমেন্দ্রনাথ ভিতরে চলিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বলিলেন, "এস, তুমি যাবে?"

সতীশচন্দ্র কেবল মাত্র রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, "না"।

হেমাঙ্গিনী ভিতরে গেল। একটু পরে সে ও ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন। রমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ আছে, তবে এখনও উঠিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়, একটু জ্বর হইয়াছে, জ্বর ছাড়িবার সম্ভাবনা—এই বিষয়ে একটু বিশেষ সাবধান থাকিবেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আর কোন বিপদ্ নাই ত ?"

"না, কিছুমাত্র না—তবে উঠিলে জ্বর বাড়িবার সম্ভাবনা; কিছুতেই অন্ততঃ আর একটা দিন উঠিতে দিবেন না। কাল সকালে আবার দেখিয়া যাইব। বসুন।"

রমেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার সরল সহজ ভাবে সতীশচন্দ্র একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

খোকা উঠিলে তাহার জ্বর হইবার সম্ভাবনা; যাহাতে সে না উঠে, হেমাঙ্গিনী দাসীদিগকে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিল কিন্তু ইহা সত্ত্বেও খোকা উঠিল—দাসীরা চিরকালই অসাবধান। খোকা বাবু ঘুমাইয়াছে, ভাবিয়া তাহারা পরস্পরে একটু গল্প করিতে বাহিরে গিয়াছিল, এই অবসরে খোকা বাবু একেবারে শয্যা হইতে উঠিয়া—বাহিরে রৌদ্রে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার ক্রন্দনে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; খোকা বাবু দুই হস্তে মাথা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিতেছেন, "মাথা গেল—মাথা গেল—বাবা গো—"

দাসী কম্পিত হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া খোকাকে ভিতরে আনিল। বলা বাহুল্য যে যথেষ্ট ভৎর্সিত হইল; কিন্তু তাহাতে খোকা বাবুর জ্বর বন্ধ হইল না—খোকা বাবু জ্বরে অজ্ঞান হইল। বাধ্য হইয়া সতীশচন্দ্র এবার স্বয়ংই রমেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রমেন্দ্রনাথ আসিয়া রোগী দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "উঠিতে দিয়াছিলেন ?"

সতীশচন্দ্র যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিলেন। শুনিয়া রমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "বড় অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, ভয় নাই—কয় দিন জ্বর থাকিবে; তবে খুব সাবধানে রাখা আবশ্যক। লোক সঙ্গে দিন, ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি।"

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কেরাণীর কীর্ত্তি

১

মাথায় একটী ছাতা, (মলিন, জীর্ণ ও শততালি যুক্ত) ঐ যে যিনি আস্তে আস্তে আপীসে ঢুকিলেন, উনি আমাদের চন্দ্রদাদা!

চন্দ্রদাদাকে, তোমরা কেউ মন্দলোক ঠাহরাইও না। উনি লোক ভাল, —অর্থাৎ কিনা চলনসই,—দোষের মধ্যে একটু কৃপণ। পরের বাড়ীতে ভোজনে কখনো তাঁহার উৎসাহের অল্পতা এবং অরুচির আধিক্য দেখি নাই, কিন্তু নিজের ঘরে পরকে খাওয়ানোটা তাঁহার নিকটে জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য!

এবার আপীসের সকলেরই মাহিনা কিছু কিছু বাড়িয়াছে। বেতন বৃদ্ধির সৌভাগ্যটা,—হ্যালীর ধূমকেতুর মত,—বড় বিলম্বে উদয় হয়,—সুতরাং এই আকস্মিক সুযোগ-লব্ধ আনন্দের জন্য আমাদের সকলকেই একটী কেরাণী ভোজে'র আয়োজন করিতে হইয়াছিল।

এবারে চন্দ্রদাদার পালা। তিনি প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি করিলেন! আমরাও নাছোড়বান্দা। তিনি বলেন 'না', আমরা বলি 'হাঁ'। এমনি মাস তিনেক 'না-হাঁ'র ক্রমিক অভিনয়ের পরে, চন্দ্রদাদা অবশেষে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সম্মতি দানে তুষ্ট করিলেন। আগামী শনিবারে, তিনি ভোজের টাকা আমাদের হাতে দিবেন,—এইরূপ ভরসা দিলেন।

শনিবার আসিল। কিন্তু চন্দ্রদাদা আসিলেন না। তাঁহার পরিবর্ত্তে এক খানি পোষ্টকার্ড আসিল! তাহাতে লেখা :—"পেটের অসুখের জন্য তিনি আজ আপীসে আসিতে পারিলেন না।" বলা বাহুল্য, চন্দ্রদাদার পেটের অসুখের কারণ বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। আপীসের কৃষ্ণবাবু,—চন্দ্রদাদার বাসার পাশেই থাকিতেন,—তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন "চন্দ্রদাদা স্বশরীরে আহার করিতেছেন এবং তাঁহার তৃতীয় পক্ষের অপরার্দ্ধোত্তমা তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছেন।"

২

এমন অবস্থায়, আমাদের মনের অবস্থা, চন্দ্রদাদার উপরে যেমন হইতে হয়, তেমনই হইল। সোমবারে তিনি আপীসে আসিলেন। কিন্তু সেইদিন হইতে আমরা কেউ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম না। বোধ হয়, ইহাতে

তিনি আরো খুসী হইলেন। কারণ, আমাদের মুখবন্ধ থাকিলে, তিনি অনুরোধের হাত এড়াইবেন। তাহার পরের শুক্রবারে, রিফ্রেসমেণ্ট রুমে, আমাদের এক গুপ্তসভা বসিল। এ সভায়, ২০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী হইতে,—বড়বাবু পর্য্যন্ত, সকলেই হাজির ছিলেন।

সভায় আমাদের যে পরামর্শ হইল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। তবে, আপাততঃ ইহাই ঠিক হইল, আগামী কল্য, শনিবারে, আমাদের সকলকেই আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে, ভবিষ্যতে এই আয়োজনের পরিণামে যে আনন্দ উপভোগ করিব, তাহা কল্পনা করিয়া, কেরাণী সংসারের এক দিনের খরচ, আটগণ্ডা পয়সা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল।

৩

শনিবার আপীসের ছুটীর পর, সকলেই একে একে চলিয়া গেল। চন্দ্রদাদাও উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময় আপীসের হেডক্লার্ক গোপালবাবু তাঁহাকে ডাকিলেন।

চন্দ্রদাদা তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, গোপালবাবু বলিলেন, "আপনি এখন যেতে পাচ্ছেন না চন্দ্রবাবু!"

চন্দ্রদাদা বলিলেন, "কেন?"

লালফিতা বাঁধা একতাড়া বৃহৎ কাগজ সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া গোপালবাবু বলিলেন, "এই কাজ শেষ না ক'রে যাওয়া চলবে না।"

চন্দ্রদাদা কাগজের তাড়াটী দেখিয়া শুষ্কমুখে বলিলেন, "আজ্ঞে এযে বজেটের কাজ! রাত ৮টার কমে এ কাজ সেরে উঠতে পার্ব্ব না।"

খবরের কাগজের স্তম্ভে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া, গোপালবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, "তা পার্ব্বেন না।"

চন্দ্রদাদা বলিলেন, "সেকি মশাই! আপনি কি বলিতে চান আমি, রাত আটটা পর্য্যন্ত আপনার এই কাজ নিয়ে আপীসে প'ড়ে থাকবো?"

গোপালবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাজ আমার নয়, সাহেবেরও নয়, কোম্পানীর। আপনার উপরে কাজের ভার দেওয়া হোলো—আপনি যদি না করেন, সাহেবের কাছে আপনিই তা'র উত্তর দেবেন!"

৪

ড্যালহাউসী স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়া চাঁদা সংগ্রহ করা হইল। পনেরটী টাকা উঠিয়াছে। গোপালবাবু বলিলেন, "আপাততঃ এতেই কাজ চ'লে যাবে।"

আমরা সকলে হক সাহেবের বাজারে গিয়া হাজির হইলাম এবং সেখান হইতে কিছু ঘৃত, কিছু ময়দা, কিছু মাংস ও তরীতরকারী কিনিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী পড়িল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। এবং আমাদের আপীসে একটী ৪০৲ টাকার কেরাণীগিরি করিতেন।

নগেন্দ্রবাবু, আমাদের দল ছাড়িয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন কেরাণীর পোষাকে —এবং ফিরিয়া আসিলেন রঁাধুনী ব্রাহ্মণের বেশে! তাঁহাকে বড় চমৎকার মানাইয়াছিল। এতক্ষণে আমাদের এদিককার আয়োজন-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

তাহার পর আমরা আর কোনোখানে না থামিয়া বরাবর একেবারে চন্দ্রদাদার বাসার সম্মুখে গিয়া হাজির হইলাম। আমাদের আগে পাচকব্রাহ্মণ-বেশী নগেন্দ্রবাবু। তাঁহার পিছনে মুটের মাথায় ঘী, ময়দা ও মাংস প্রভৃতি। চন্দ্রদাদার বাড়ীর দরোজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। নগেন্দ্রবাবু, বাঙালীর 'কলিং বেল',—দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

অনতিবিলম্বেই একটী পরিচারিকা ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা?" তাহার পর, যখন সম্মুখে আপীসের এতগুলি বাবুকে দেখিল, তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, বেচারী একেবারে চমকিয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ঝী, বাইরে বেরিয়ে এস, শোনো!"

আস্তে আস্তে বলিল, "কি বোল্‌বে বলনা!" সে নগেন্দ্রবাবুকে একটী আস্ত রঁাধুনী বামুন ঠাহরাইয়াছিল নিশ্চয়!

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমরা তোমার বাড়ী লুঠ কর্ত্তে আসি নাই। শোনো, তোমাদের কর্ত্তা,—চন্দ্রবাবু এই বাবুদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন!"

ঝী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "নিমন্ত্রণ? কৈ আমরা ত একথা শুনিনি!"

"তা শুন্‌বে কেমন কোরে বাছা। ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে গেছে। আমি রঁাধবো আর এই সব জিনিষপত্রগুলো বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও। আর শোনো, তোমাদের কর্ত্তাবাবু বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁর হাতে আর টাকা না থাকাতে সব জিনিষ এখনও কেনা হয় নি। সেই জন্য তিনি বাড়ী থেকে আরো গোটা পঁচিশ টাকা মা ঠাকরুণের কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছেন। বাড়ীর ভিতর মা ঠাকরুণকে গিয়ে তুমি একথা বলো।"

মুটেরা মোট মাথায় করিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। আপীসের ছোটবাবু ঝীর হাতে একটী আধুলী দিয়া বলিলেন "বাছা, তুমি সব গোছগাছ ক'রে দাও —যাবার সময় আরো কিছু দিয়ে যাব।"

ঝী একটী আধুলী বখশিস পাইয়া ভারী খুসী হইয়া গেল। আমাদের ডাকিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গেল।

৫

চন্দ্রদাদার তৃতীয় পক্ষের পত্নীটীর সাধ্য কি যে আপীসের বাঙালী কেরাণীর প্ল্যানের ভিতরে ঢুকেন। বিশেষতঃ এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদের চাঁদার টাকায় কেনা জিনিষগুলি দেখিয়াই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল আমাদের সকল কথাই সত্য। কারণ, পকেটের পয়সা খরচ করিয়া, এরূপভাবে যে কেহ কখনও নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে, তাহা কোথাও শোনা যায় না। সুতরাং পঁচিশটী টাকা বাহির হইতে বড় বিলম্ব হইল না।

বড়বাবু ১৫টী টাকা পকেটে রাখিয়া, বাকী দশ টাকায় মিষ্টান্ন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য একজন বাবুকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, যে ১৫ টাকা রহিল, তাহা আমাদিগকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হইল, আমাদের চাঁদার টাকা আবার ঘরে ফিরিল!

গোপালবাবু বলিলেন, "ঝী! আমাদের একটু তামাক সেজে দাও ত!"

শুনিয়াছি, চন্দ্রদাদার একটীমাত্র সখ ছিল, তামাক। তিনি কখনও বাজারের তামাক খাইতেন না। নিজেই, ঘরে তামাক তৈয়ারী করিতেন। সুতরাং তামাক খুব ভালই হইত।

বাহিরের ঘরে, একটী টীনের বাক্সে, তাঁহার সেই স্বহস্তে প্রস্তুত তামাক মজুত ছিল। আমরা সেই তামাক এমন উৎসাহের সহিত ঘন ঘন খাইতে লাগিলাম, যে টীনের বাক্সটী খালী হইয়া যাইবার যোগাড় হইল।

এদিকে বাড়ীর ভিতরে মহাসমারোহ লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের আপীসের পাঁচজন হিন্দুস্থানী চাপরাসীকে সঙ্গে আনা হইয়াছিল, তাহারা উনান ধরাইয়া, জল তুলিয়া দিল।

নগেন্দ্র ঘটক কাঁধে গামছা ফেলিয়া, হাতে হাতা ও ঝাঁঝরা লইয়া উনানের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। চন্দ্রদাদার তৃতীয় পক্ষের অমূল্য রত্নটী নিজেই লুচি বেলিতে বসিয়া গেলেন, তিনি সরাসী ফ্যাসানে ছাঁটা দাড়ীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুকে সত্য সত্যই পাচক ব্রাহ্মণ ঠিক করিয়াছিলেন।

লুচি বেলিতে বেলিতে চন্দ্রদাদার স্ত্রী নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ঠাকরুণ! আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?"

"এই চন্দননগরে।"

"তা হ'লে দেখচি আমাদের দেশেই আপনাদের বাপের বাড়ী।"

"সত্যি নাকি? আপনি কোন্ পাড়ায় থাকেন ঠাকুর?"

নগেন্দ্রবাবু একটা মিথ্যা ঠিকানা বলিলেন। চন্দ্রদাদার গৃহিণী দুঃখ করিতে লাগিলেন, "আমি বিয়ে হবার পর থেকে আর বাপের বাড়ী যেতে পারি নি। বাপ মার জন্যে মন কেমন করে, কিন্তু কি কর্ব্ব উপায় নেই!"

এইরূপে নগেন্দ্রবাবু বেশ গল্প জমাইয়া তুলিলেন।

৬

ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। আমরা সকলে একটা মূর্ত্তিমান ঝটিকার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

আপীসের নীলধনবাবু বলিলেন, "চন্দ্রদাদা শেষকালে পুলিশ ডেকে বস্‌বেন না ত! যে লোক,—বিশ্বেস নেই!"

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। চন্দ্রদাদা এটুকু বেশ বুঝবেন, পুলিশ ডাক্‌লে, তাঁর চাকরীটুকু ট্যাঁকা শক্ত।"

এমন সময়ে চন্দ্রদাদা আসিয়া হাজির! শনিবারে, আপীসে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খাটিলে, কেরাণীর মনের অবস্থাটা যেরূপ হয়, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। গোপালবাবুর নির্ম্মম ব্যবহার তাহার হৃদয় তোলপাড় করিতেছিল! সে ভাবিতেছিল, হায় অনূঢ় গোপালবাবু তুমি না হয় ভাগ্যগুণে কেরাণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ কিন্তু তুমি প্রেমের কি ধার ধার! কেমনে বুঝিবে তুমি যে দু'টী ব্যাকুল নয়ন আকুল হইয়া আমার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে!

বাড়ীর ভিতরে এত লোক সমাগম দেখিয়া চন্দ্রদাদা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাহার পর যখন দেখিলেন, লোকগুলির সকলেই তাঁহার পরিচিত, তখন তাঁহার মুখ এমন চমৎকার হইল যে, বেশ বোঝা গেল, জীবনে তিনি আর কখনও ইহার অধিক বিস্মিত হন নাই।

ফণীবাবু তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া চন্দ্রদাদার মুখের উপর অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "চন্দ্রদাদা, তামুক খাও!"

চন্দ্রদাদার নাসারন্ধ্রে, তখন বোধ হয় ভর্জ্জিত লুচির সুগন্ধ প্রবেশ করিয়াছিল। কারণ তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে অন্দরের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

বড়বাবু উত্তর দিলেন, "অতি সামান্য! তুমি কিছুতেই আমাদের নিমন্ত্রণ করলে না দেখে, আমরা নিজেরাই এসে হাজির হয়েছি।"

"টাকা কে দিলে ?"

"তুমি!"

আকাশ হইতে সদ্যঃপতিতের মত চন্দ্রদাদা বলিলেন, "আমি! কখন দিলাম টাকা ?"

"আহা, তুমি আর তোমার স্ত্রী—ও এক কথা।"

"আমার স্ত্রী! তোমাদের খাবার জন্যে টাকা দিয়েছে !!"

"এই রকম ত জানা আছে।"

চন্দ্রদাদা আর দাঁড়াইলেন না। ঝড়ের মত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রদাদা চঞ্চল চক্ষুতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ভিতরে গেলেন বটে, কিন্তু রান্নাঘরে যেখানে তাঁহার ষোড়শী অপরার্দ্ধার সহিত নগেন্দ্রবাবুর গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, সেইদিকে চাহিবামাত্র তাঁহার চঞ্চল চক্ষু একেবারে আশ্চর্য্যরকম স্থির হইয়া গেল।

আমরা দরজার আড়াল হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতে লাগিলাম! চন্দ্রদাদার মুখ বর্ষণোদ্যত মেঘের মত ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রদাদার স্ত্রী রত্নটী, তখন ব্রাহ্মণবেশী নগেন্দ্র ঘটকের কাছে আপনার দুঃখ জানাইয়া বলিতেছিলেন, "আর ঠাকুর! এমন লোকের হাতে পড়েছি যে বাড়ীতে একটা লোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখবার যো' নেই!" এমন সময়ে চন্দ্রদাদা বর্ষণের আগে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে বেটা ঘটকা, তোর এই কাজ!"

নগেন্দ্রবাবু আরো অধিক মনযোগের সহিত, কড়া হইতে ভাজা 'লুচি তুলিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রদাদার গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ছি, বামুনকে গালাগালি দিতে আছে কি ? উনি যে আমাদের দেশের লোক!"

চন্দ্রদাদা রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন "তুমিও তা হোলে এই ষড়যন্ত্রের

ভেতরে আছ? আমার হাতে পোড়েছ ব'লে বাড়ীতে একটা লোকের মুখ দেখ্‌বার যো নেই, না? একলা আমার মুখ দেখে তোমার মন ওঠে না বুঝি? তাই এই বাবুদের মুখ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছ? তা দেখ। খুব ভাল ক'রে দেখ!"

গৃহিণী বলিলেন "ছি! পাগলের মত মাথামুণ্ড কি যে বলো তার ঠিক নেই!"

বাহির হইতে, আমাদের আপীসের নব-বিবাহিত নূতন প্রেমিক ভবানীবাবু বলিয়া উঠিলেন, ' চন্দর দা,—বৌদিদিকে অত জোরে বোকো না,—রাত্রিতে তাহ'লে অশ্রু-বন্যায় বিছানা থেকে একদম ভেসে যাবে!"

চন্দ্রদাদার গৃহিণীর মনে বোধ হয় তখন কিছু সন্দেহ হইল। তিনি আর দ্বিতীয় কথাটী না কহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। চন্দ্রদাদাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ঝনাং করিয়া, উপরের ঘরের কবাট বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হইল না। কারণ, এদিককার কাজ তখন প্রায় ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে। ঝী মাগীর খোঁজ লইয়া দেখিলাম, সে দেশছাড়া হইয়া পলাইয়াছে। কাজেই নিজেরাই পাতা পাতিয়া বসিয়া গেলাম। আহার করিতে বসিয়া সকলেই বলিল, "রন্ধন অতি চমৎকার হইয়াছে।"

গোপালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এত চমৎকার হোতো না, কারণ, ঘৃত সংযোগে যেমন ব্যঞ্জন, তেমনি চন্দরদার গৃহিণীর সংযোগে আমাদের রন্ধন, এমন মধুর হয়েছে।" আমরা সকলে সে কথা স্বীকার করিলাম।

আসিবার সময়ে, একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চন্দরদা, শীগ্‌গীর নেমে এস,—আমরা বিদায় হচ্ছি,—তোমাদের জন্যেও লুচি মাংস রইল,—দেরী হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!"

সোমবারে, আপীসে আসিয়া দেখিলাম, চন্দ্রদা আসেন নাই। শুনিলাম. তিনি সেই রাত্রেই স্ত্রীকে লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর হইতে, তিনি নিয়মিতরূপে আপীসে আসিতেছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকে আর কখনও কলিকাতায় লইয়া আসেন নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কবিতা-কুঞ্জ।

যশোলিপ্সা।

(১)

অধিরথ-সূতপুত্র দাতাকর্ণ নামে
পরিচিত সর্ব্ব ঠাঁই সারা ধরাধামে!
দানে তাঁর মুগ্ধ বিশ্ব। ফিরে না কখন
ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে কভু কোন জন।
একদিন কোথা হ'তে অনেক ব্রাহ্মণ
অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় আসিল যখন
দুয়ারে তাঁহার; প্রণমিয়া ভক্তিভরে
শুধালেন বীরবর "কি অভাব তরে
আজি হেথা হে ব্রাহ্মণ! পুরাইব আমি—
পুরাইব মনস্কাম—সাক্ষী অন্তর্যামী।"
শুনি' সে কঠিন বাণী, হাসিল ব্রাহ্মণ—
সে হাসি বৃশ্চিক প্রায় করিল দংশন
বীর প্রাণে—স্তব্ধ রাজা বিদ্রূপের বাণে!
হাসিয়া কহিল বিপ্র, "এ মহান্ দানে
হবে তব স্বর্গলাভ। বাড়িবে সম্মান!
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারে কর পুত্রদান!
পুত্রে দাও বলিদান। মাংসেতে তাহার
ক্ষুধা মোর তৃপ্ত হবে! গাইবে সংসার
যশোগান তব—আশীর্ব্বাদ ব্রাহ্মণের!"
স্বর্গ আশা পরাজিল স্নেহ সন্তানের!

(২)

স্বর্গ-আশে সূতপুত্র সন্তানের প্রাণ
হেলায় উৎকোচরূপে করিলেন দান!
অজ্ঞাত তখনো কর্ণ ব্রাহ্মণ-বিধাতা—
জ্ঞাত শুধু আপনারে বিশ্বমাঝে দাতা!
সেই আত্মশ্লাঘাভরে, যশ-আশে আর
বধিল নির্ম্মম প্রাণে পুত্রে আপনার!
বধিল অপত্য-স্নেহ! দলিল চরণে
মানব-মহান্-ধর্ম্ম আশ্রিত রক্ষণে!
দাতা তুমি, রাজা তুমি—ন্যায়-দণ্ড লয়ে
অধিষ্ঠিত সিংহাসনে! আজি কোন ন্যায়ে
হে রাজা হে দানবীর! নির্ম্মম অন্তরে
বধিলে আপন পুত্রে আপনার করে!
কোন্ অধিকার বলে দলিলে চরণে
ন্যায়ের উন্নতশির বসি' সিংহাসনে!
সে কি শুধু হে রাজন্ অতিথির তরে?
সে কি শুধু ব্রাহ্মণের স্বর্গ-অঙ্গীকারে?
শুধু মোক্ষ, শুধু স্বর্গ, শুধু ধর্ম্ম বোলে
ন্যায়দণ্ড পদাঘাতে চূর্ণ করে দিলে!
থাক স্বর্গ স্বর্গে থাক্—থাক ভগবান—
সারা বিশ্ব চাহে যে গো ন্যায়ের বিধান!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

বিপদ।

তখন নিশীথ বিনিদ্র রমেশ
পার্শ্বে জায়া নিদ্রামগ্ন;
সহসা রমেশ উঠিল চমকি'
পদে কি হইল লগ্ন।
"কমল কমল" করিল চীৎকার
রমেশ বিশুষ্ক তালু;
উঠে ব্যস্ত হ'য়ে অর্দ্ধ ঘুমঘোরে
কমলিনী আলু-থালু।
"কি হ'ল তোমার" সুধা'ল কমল
রমেশ কহিল পরে—

ঠেকিল যে বিছে ঝাঁটা এনে তুমি
মার ওই বিছানায়।
শীঘ্র মার ঝাঁটা যেন না পালায়
পালঙ্কের পায়ের দিকে
খুঁজে দেশালাই জ্বালিতেছি আমি
হিচ্‌কক্‌ ল্যাম্পটিকে।"
কমলের ঝাঁটা উঠিছে পড়িছে
অন্ধকারে বিছানায়;
হেন কালে উহা চড়াৎ করিয়া
মেজেতে পড়িয়া যায়।
"বুঝিরে পালাল" কহিল রমেশ
আলোক জ্বালিয়া ঘরে,
"কমল তোমার লক্ষ্য কিছু নাই"
হতাশ বিহ্বল স্বরে!
ভ্রূভঙ্গী করিয়া উত্তরিলা নারী
দূরে ফেলে দিয়ে ঝাঁটা।
"লক্ষ্য নাই মোর! অকর্ম্মার ধাড়ী"
রমেশ ভয়েতে কাঁটা!
"দেখিছ না চেয়ে চেন ছড়াটাকে
বিছে ভেবে করে ভুল—
এ দুপুর রাতে ঘটালে প্রমাদ
বাধাইলে হুলুস্থূল।"
শ্রীরসময় লাহা।

প্রার্থনা।

ভবের কাণ্ডারী কোথায় শ্রীহরি
আকুল পরাণ ডাকে!
তৃষিত তাপিত পিপাসিত চিত
তোমারি করুণা মাগে।
এস গো আমার সাধনার ধন
এস গো আমার বাঞ্ছিত রতন
তব তরে হিয়া, উঠে ব্যাকুলিয়া
কত প্রেম অনুরাগে!

প্রভু কি খেলায় রেখেছ আমায়
এ ভব সংসার মাঝে,
জাগায়ে কামনা দিবস যাপনা
মজিয়া অসার কাজে।
ওহে লীলাময় একি তব লীলা!
পরাণ লইয়া একি তব খেলা!
ভেঙ্গে দাও খেলা বাসনার জ্বালা
অবশ পরাণ যাচে—
কত দিন হরি গোলক বিহারী
বাঁধা রব মোহ ডোরে!
দিন বহে যায়, কি হবে উপায়
রেখোনা বাঁধিয়া মোরে।
কোন্ কাজে নাথ হেথায় পাঠালে!
এ ভবে আসিয়ে গেছি সব ভুলে—
নিজ 'কর্ম্ম' ফলে তোমা' আছি ভুলে
মজিয়া মোহের ঘোরে।
হে মধুসূদন রিপু কয় জন
বন্ধু ভাবে আসি' কাছে,
করি কত ছল বাসনা অনল
জ্বেলে দেয় হৃদি-মাঝে।
হে ব্রহ্মাণ্ডপতি এ ভবের হাটে,
ছ'জনারে লয়ে দিনগুলি কাটে,
যদিবা নির্জ্জনে থাকি তব ধ্যানে
তা'রা আসে পাছে পাছে?
পরাণের কথা হৃদয়ের ব্যথা
জানত হে বনমালী,
তবে কেন হায় ঘুরাও আমায়
রিপুর কবলে ফেলি?
তুচ্ছ সুখ আশে ঘুরি' দিবানিশি
হতাশ অন্তরে আঁখি জলে ভাসি,
তোমা ছাড়া হয়ে বাসনারে লয়ে
যাতনায় সদা জ্বলি।
কোথা হৃদয়েশ, দাবদগ্ধ ক্লেশ
সহিতে পারি না আর,

কামনা অনলে দাও দাও ঢেলে
শান্তি বারি অনিবার।
আশীষের ধারা বহে যাক হৃদে
বিষণ্ণ পরাণ ভাসুক আমোদে
তোমারি করুণা আজিগো প্রার্থনা
ঘুচাতে বেদনা ভার।

শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়।

মায়া।

অমিয় মাখান নাম অতীব মধুর,
ভাবার্থ ভাবুক যেই বিদিত তাহার।
তুমি সর্ব্বপ্রকৃতির প্রধানা প্রভুর,
সৃজন, পালন, লয় প্রভাবে তোমার।

সর্ব্বগুণময়ী, সর্ব্ব অন্তরবাসিনী,
দুর্ব্বিজ্ঞেয়া, দূরত্যয়া, ত্রিগুণপালিকা;
সুরাসুর সবাকার কর্ম্মানুবন্ধিনী,
বিশ্ববিমোহিনী বহুভাব প্রকাশিকা।

ত্রিগুণ-অতীত তব স্রষ্টা নিরাকার,
তোমারি প্রভাবে ভবে সম্ভবে সাকারে।
ত্রিগুণবিকারময়ি! বিকারে তোমার
শুভাশুভ সর্ব্বকার্য্য ঘটিছে সংসারে।

তোমারি প্রভাবে মায়া! হইয়ে মোহিত
বিরিঞ্চির এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তোমারি যোগের বলে বিকার-রহিত
বিশ্বেশের বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন।

কোন যোগবলে মায়া! করে দিবাকর
প্রচণ্ড প্রখর করে পৃথ্বী উদ্ভাসিত?
স্নিগ্ধভাবে সেই কর ল'য়ে সুধাকর
কেমনে ধরায় করে ওষধি বর্দ্ধিত?

কোন যোগবলে মায়া! গ্রহগণ সবে
পরস্পরে আকর্ষিয়া ভ্রমিছে সতত?
অবিরাম গতি! শিক্ষা দিতেছে মানবে
আলস্যে সময় যেন নাহি হয় গত।

কোন বলে প্রদক্ষিণ করিয়া তপনে
সরিৎ, সাগর, শৈল, সকল সহিত,
অবিরত এ মেদিনী নিরত ঘূর্ণনে
দিবস, রজনী, ঋতু যাহে প্রকাশিত?

কেমনে হইল মায়া! বীজের সৃজন?
কি বলে বপিত বীজ উদ্ভবে অঙ্কুর?
নানারূপে সুপ্রকাশ—রস আকর্ষণ
কোনরূপে তিক্ত কোনরূপে বা মধুর।

কি ভাবে থাকে বা ফুল তরুর ভিতরে?
কেমনে বা নানারঙ্গে হয় প্রকাশিত?
কেহ গন্ধহীন কেহ সৌরভ বিতরে,
কেমনে বা হয় ফুল বীজে প'রণত?

একরূপে সর্ব্বজীব সৃজিত হইয়ে
নানারূপে বল মায়া! সম্ভবে কেমনে?
কেহ নিঃস্ব নিজধন পরে বিতরিয়ে,
কেহ করে কৃপণতা উদর পোষণে।

কোন বলে বিষতুল্য ভাবিয়ে অন্তরে
কেহ নারীজাতি হ'তে রহেবা অন্তরে?
কেহ বা জীবন-তরী, সুধাজ্ঞান ক'রে
ভাসাইয়া দেয় বামা-প্রেমের সাগরে?

কোন বলে বল মায়া! আমরা এ সব—
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশমণ্ডল,
বৃষভ-বাহন বিষ্ণু, বিরিঞ্চি, বাসব,
শশী, সূর্য্য, গ্রহ, সুর, অসুর সকল;

অসীম সুখের স্থান ত্রিদশ-আলয়,
মানবের কর্ম্মক্ষেত্র ভরত-ভুবন,
ভূচর, সলিলচর, খেচরনিচয়,
মর্ত্তবাসী নানাজাতি নর অগণন;

রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য, আশ্রিত,আশ্রয়,
পিতা, পুত্র, পতি, পত্নী, তনয়া, জননী,

তস্কর, পাপিষ্ঠ, শঠ, সাধু সদাশয়,
অন্ধ, বিকলাঙ্গ কিংবা রূপসী রমণী,

নয়নরঞ্জন ফুল, মধুর সুবাস,
মিষ্ট মকরন্দপায়ী লোলুপ মধুপ,
রমণী-লতিকা জাত কুসুমের হাস,
আরো বা অদৃশ্য কত গুণে কত রূপ,—

তুমি সর্ব্বমূলা মায়া! পেরেছি বুঝিতে,
তুমিই রেখেছ জ্ঞান করি আচ্ছাদন।
সৃজিত হ'য়েছি মোরা ব্রহ্ম-বারি হ'তে,
মায়া-বায়ু উপাদানে বুদ্বুদ মতন।

যাবৎ অন্তরে বায়ু, আর সর্ব্বধারে
প্রিয়াপ্রিয়-জ্ঞান-ঘৃণা বহি-সমীরণ
স্থির ভাবে রাখে ধ'রে সম চাপভারে
তাবৎ অস্তিত্ব-"তুমি"-"আমি" দরশন।

বাহিরের যত ঘৃণা মমতা বাতাস
"কি আছে ভিতরে হেরি" বাসনা-হিল্লোলে
বহিল, বুদ্বুদ "তুমি" 'আমি'র বিনাশ,
বায়ু-নিষ্ক্রমণে বিশ্ব মিশে ব্রহ্মজলে।

যেজন তোমারে মায়া! করে নিবেসিত
হৃদয়কন্দরে নিজ আপনা হেরিতে,
বেদবিধি বেড়াজাল করিয়ে ছেদিত
ব্রহ্ম-জল-রস পিয়ে হরষিত চিতে।

বিশাল বসুধা যাবা খেলিবার ঘর,
মায়া-যন্ত্রে নিজ অংশে রাজা মন্ত্রী, করি,
বিবিধ মুরতি গঠি যন্ত্রী যে ঈশ্বর
খেলিছেন মায়াসহ খেলা বলিহারি।

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত।*

রজনীকান্ত কবি। রজনীকান্ত ভারতীর ভক্ত সেবক। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

শ্যামা বঙ্গভূমির স্নেহ-সরস ক্রোড় হইতে, পূর্ব্ব-নেপথ্যের অন্তরালে, একদিন

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!—"

বলিয়া যে উদাত্ত সঙ্গীত তাঁহার ভক্তিসিক্ত হৃদয়-কন্দরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সহিত, গণ-সাধারণের পরিচয়-সাধন হইয়া গিয়াছিল।

---

* সুকবি রজনীকান্ত সেন, গত ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে, ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার পারিবারিক জীবন-যাত্রা-সম্বন্ধে, আমরা বড় অধিক কিছু জানি না। কিন্তু সেজন্য আমাদের খেদ নাই। কারণ, সাহিত্যের সার্ব্বত্রিক যোগ-সূত্রই আমাদিগকে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধে মিলিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যের আলেখ্যে, আমরা তাঁহার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখি, তাহা ভক্তি-পুলকিত, প্রেম-পেলব, সাধনা-সমাহিত, রহস্য-তরল। আধুনিক সাহিত্যের যথেচ্ছাচার তাঁহাতে ছিল না। বিদ্যমানকালের সাহিত্যিকগণের বিদ্বেষদ্বন্দ্ব এবং পরিবাদ তাঁহাতে দেখিতে পাই নাই। সসীমতায়, তাঁহার মনোভবা বদ্ধচরণ হয় নাই; পরন্তু সান্তের নাগপাশ টুটিয়া, অনন্তের দিকে, অসীমের দিকে তাহা অনায়াসগতি সমীরের মত ছুটিয়া গিয়াছিল। তিনি গাইয়াছেন—

"আমি চাহিনা ওরূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মূরতি নয়;
কোন্ কুম্ভকারে, গড়ে দিবে তারে ?
ইঙ্গিত মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়!"

তিনি মৃণ্ময়ীর ধ্যান-ধারণায় চিত্ত অর্পণ করেন নাই, কারণ নিখিল জগৎ যাঁহার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল,—মাটী দিয়া কুম্ভকারে তাঁহার রূপ কি গড়িতে পারে? যাঁহার "সংখ্যাতীত পদ", যাঁহার "সংখ্যাতীত কর,"—তাঁহার রূপ কি পঞ্চভূতে বাঁধা পড়ে? কবি বলিতেছেন,—

"শ্রীপদনখরে, এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয়;
প্রতি রোমকূপে, কোটি জগৎ-রূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়!"

এমনি আনন্দ-সুন্দর ভক্তির ভাব—তাঁহার সকল কবিতায়। তিনি চাহেন,

সকল হরষ আশা,
সকল ভাবনা ভাষা,
সফল হইবে হরি! করুণাবলে।

তিনি প্রার্থনা করিতেছেন:—

"(কবে) চিরমধুমাধুরীমণ্ডিত মুখ তব
রাজিবে মলিন মরমতলে।"

তাঁহার কবিতাগুলি, প্রায়ই গীতিকাকারে গ্রথিত। এই নিমিত্ত, তাঁহার

অধিকাংশ কবিতা, সুরতাললয়ে সুকণ্ঠ গায়ক-কর্ত্তৃক গীত হইলে, যেন মুগ্ধকর ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে।

অনেকে বলেন, তিনি "পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজেন্দ্রলাল।" বাস্তবিক, দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গশক্তি এবং হাস্য-প্রিয়তা তাঁহাতে ছিল। কিন্তু তিনি, কদাপি কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারেন না। কারণ, তিনি অনুকারী ছিলেন না। বিদ্যমান বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ তথাকথিত কবিতার মত, তাঁহার রচনা অনুকরণদুষ্ট নয়। এই জন্যই আজ তাঁহার এত আদর।

তাঁহার একটী হাসির কবিতা হইতে এখানে স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি। "পতিত ব্রাহ্মণে"র মুখে, তিনি এই আত্মস্বীকার বসাইয়া দিয়াছেন।

"(বাবা,) এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে
অমন ধোলাই পৈতে;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে—
সে কথা আবার কইতে ?
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে
বাজাই এমনি আখড়াই,
(যে) যজমান আর শিষ্যবর্গে
বেমালুম ভাবে পাকড়াই।
মদ্‌টা আস্‌টা খাই, মাসে মাসে
পড়েও থাকিগো খানাতে;
(আর) ব্রাহ্মণ বলে' চিনিতে না পেরে'
ধরেও নেযায় থানাতে!"

আজ কয়েকমাস হইতে তিনি মেডিকেল কালেজে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। দারুণ গলক্ষত রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সঙ্গীতে তিনি সিদ্ধব্রত ছিলেন। কিন্তু সে কিন্নরকণ্ঠ রোগরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি কথা কহিতে পারিতেন না। দিবারাত্র রোগযন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াও, একদিনের তরেও তিনি বাগ্বাদিনীর চরণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই রোগশয্যাতেও তিনি "বাণী", "কল্যাণী", "অমৃত" "আনন্দময়ী" প্রভৃতি ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এমন একনিষ্ঠ সাধনা, এমন অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং সাহিত্যের প্রতি এমন ঐকান্তিক প্রীতি, শুধু বাংলাসাহিত্যে কেন, জাগতিক সাহিত্যে দুর্লভ। তিনি যে, এখনকার "সখের কবি" ছিলেন না,—তাঁহার ব্যথা-ভীষণ মৃত্যুশয্যায় অনুষ্ঠিত অলোকসাধারণ কার্য্যাবলীই তাহার জলন্ত নিদর্শন।

আজ তাঁহার সমাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার আত্মা এখন সকল যন্ত্রণার অতীত হইয়া, আনন্দধামে নীত হইয়াছে। কিন্তু দীনতম সাহিত্যসেবী আমরা,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, রজনীকান্তের পুণ্যস্মৃতি যেন আমাদের মানসপট হইতে কদাপি বিলুপ্ত না হয় এবং তাঁহার সেই 'সার্ব্বলৌকিক সাধনা,—যাহা নিষ্কামতায় একাগ্র, ধ্যানে শাশ্বত এবং ভূমানন্দে পরিপ্লুত—তাহা যেন সুদূর ভবিষ্যতের কণ্টকাকীর্ণ অন্ধতমসমলিন পন্থায়, আমাদের কাছে দীপ্তদীপপ্রতিম হইয়া থাকে।

তাঁহার শোকহারী "বাণী" বঙ্গীয় সমাজে সদাই নব-প্রেরণা বহন করুক। তাঁহার "কল্যাণী" সর্ব্বহৃদয় কল্যাণসুধাসিঞ্চিত করুক এবং নীলকণ্ঠের মত, তিনি নিজে পুড়িয়াও যে "অমৃত" ঘরে ঘরে বিলাইয়া গিয়াছেন, ভগবান করুন,—আমরা যেন কখনও তাহার অনাদর না করি!

পৌরাণিক তত্ত্ব।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বেদই তাহাদের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদের পূর্ব্বে আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হয় নাই। বেদের ভাষা ও তাহার রচনার মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সংস্কৃতসাহিত্যবারিধি আলোড়ন করিয়া আমরা যে সকল রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে, বেদই সংস্কৃত সকল গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন। সে যাহাই হউক, বেদের ধর্ম্মশিক্ষা ও দেব-তত্ত্ব কিরূপ ছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য। এ বিষয়টী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, বেদে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাঁহাকে লইয়াই জগৎ এবং তিনিই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা। তবে বেদে যে বহুল দেবতার বন্দনা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, সে সকল কিছুই নয়। সে গুলি দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ভূত, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহগণকে দেবতা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঈশ্বরের তিনটি মাত্র প্রধান লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে তাহার গুণ ও শক্তির বিষয় বেদে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার আভাষ আছে। কিন্তু ঐশী শক্তি বিশিষ্ট বীরের বা ঈশ্বরের অবতার

বিষয়ক কোন অনুভাব বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদোক্ত ক্রিয়ার একমাত্র দৃশ্যমান প্রকৃতি জীবন্ত আকারে ভূতসমষ্টির পূজা। যেমন অগ্নি অর্থাৎ তেজ, ইন্দ্র অর্থাৎ আকাশ, পবন অর্থাৎ বায়ু, বরুণ অর্থাৎ জল ইত্যাদি। আরাধনার পদ্ধতি বেদে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বুঝা যায় যে গৃহী গৃহে বসিয়া স্বয়ং ঈশ্বরের স্তব বন্দনা করিতেন এবং তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিতেন। কোন মন্দির বা সাধারণ দেবালয়ে গিয়া গৃহী পূজা করিতেন না। আর তাহার সেই পূজা অজ্ঞাত ও অদৃশ্য ঈশ্বরকে প্রদত্ত হইত অর্থাৎ যাঁহাকে সেই পূজা প্রদত্ত হইত, তিনি গৃহীর দৃষ্টির গোচরীভূত নয়। স্থূল কথা এই যে বেদের মধ্যে মূর্ত্তি পূজার কিঞ্চিন্মাত্রও নিদর্শন নাই।

কিন্তু কোন সময়ে বেদোল্লিখিত অদৃশ্য ঈশ্বরের পূজা পরিবর্ত্তিত হইয়া মূর্ত্ত্যাকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য কাল্পনিক দেবতার আরাধনা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব এবং কোন সময়ে ঐতিহাসিক বীর রাম এবং কৃষ্ণ দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও বড়ই কঠিন। মনুসংহিতায় কোন কোন স্থলে * মূর্ত্তি পূজার আভাষ আছে, কিন্তু তাহাতে লিখিত আছে যে নিকৃষ্ট ও জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণগণ সাধারণ দেবালয়স্থিত দেবতার পূজা করিয়া আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। রামায়ণ ও মহাভারতের ভিত্তি সম্পূর্ণ অবয়বে অবতারের উপর সংস্থাপিত। উক্ত কাব্যদ্বয়ের অভিনেতা-গণ দেবতার অবতার এবং দেবযোনি। স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, ইহাদের সম্বন্ধে উক্ত কাব্যদ্বয় লিখিত প্রক্রিয়া সমূহ বেদপ্রসূত, কিন্তু বেদে মূর্ত্তি পূজার আভাষ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু উক্ত কাব্যদ্বয়ের সকল স্থলেই তপস্যা ও প্রশস্তি দ্বারা আরাধনার পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। এবং বিষ্ণু ও শিবকে সম্বোধন করিয়া স্তব, স্তুতি ও বন্দনা করাই ঐ কাব্যদ্বয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, এই কাব্যদ্বয়েই বেদের ভূত সমষ্টির পূজা রহিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদিগের দেব দেবী বিষয়ক আরাধনার মূল ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের দেবতত্ত্ব যে প্রণালী অবলম্বনে লিখিত, পুরাণ নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগুলি নিশ্চয়ই সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত কাব্যদ্বয়ের সহিত পুরাণগুলির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয় এবং সেই বিভিন্নতায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তাহারা ঐ পুস্তকদ্বয় অপেক্ষা আধুনিক।

---

* ৩য় অধ্যায় ১৫২ ও ১৪৬ শ্লোক এবং ৪র্থ অধ্যায় ২১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

রামায়ণ ও মহাভারতে সৃষ্টি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, পুরাণেও ঠিক সেই ভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কাল সম্বন্ধে কাব্যদ্বয়ে যাহা আছে, পুরাণেও তাহাই আছে। কিন্তু দেবদেবী সম্বন্ধীয় গল্প ও ঐতিহাসিক উপন্যাস উক্ত কাব্যদ্বয় অপেক্ষা পুরাণে অধিকতর পরিস্ফুট ও সংহত আকারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ ও অন্যান্য লক্ষণ ব্যতীত অধিকতর আধুনিক বর্ণনার বিশেষত্ব পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি দেবতার সত্বার বিশেষ আবশ্যকতা, দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও ধর্ম্ম, দেবতাদের শক্তি ও অনুগ্রহ পরিচায়ক নূতন উপন্যাসের সৃষ্টি এবং তাহাদের প্রতি কায়মনে ভক্তি সংস্থাপনের ফল পুরাণে দৃষ্ট হয়। যে আকারবিশিষ্ট হউক না কেন, শিব ও বিষ্ণুর আরাধনাই পুরাণের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাদ্বারা বুঝা গেল যে, বেদের গার্হস্থ ও ভৌতিক পূজা রহিত হইয়া পুরাণ শাস্ত্রে উপাসক সম্প্রদায়িকগণের নিরপেক্ষ ও বিশেষ পূজার আস্থা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ব্যাপার রামায়ণে দৃষ্ট হয় না এবং মহাভারতে তাহা পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য এই পুস্তকদ্বয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহারা কেবল শিব বা বিষ্ণুর আরাধনার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

পুরাণগুলির এইরূপ প্রকৃতি বলিয়া তাহাদের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সংশয় উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ পুরাকালে কতকগুলি পুরাণ ছিল, বর্ত্তমান পুরাণগুলি তাহাদের আংশিক বা বিমিশ্র অনুকরণ বা প্রতিরূপ। বর্ত্তমান অধিকাংশ পুরাণের মধ্যে বর্ণিত উপন্যাস সমান এবং বাক্য বিন্যাসও সমান এবং কতকগুলির ভাষাও সমান। ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে বর্ত্তমান পুরাণগুলি এইরূপ কোন গ্রন্থের অনুকরণ কিম্বা পূর্ব্ব প্রচলিত কোন আদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের এ অনুমান অপ্রামাণিক নহে। ইহা একটী প্রচলিত শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে। সেই শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সকল পুরাণে লিখিত বিষয়গুলির মূল পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ছিল। পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বতন উপন্যাসের সংরক্ষণই বর্ত্তমানে পুরাণ সকল সঙ্কলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে অভিপ্রায় তাহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। সে যাহাই হউক পুরাণে কি কি বিষয় থাকে তাহাই আমাদের এক্ষণে আলোচ্য। তাহা জানিতে হইলে আমাদের অমরকোষের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। অমরসিংহ লিখিয়াছেন পুরাণ পঞ্চ লক্ষণবিশিষ্ট। এই পঞ্চ লক্ষণ কি কি?

প্রথম আদি সৃষ্টি। দ্বিতীয় প্রলয় এবং পুনরায় জগতের সৃষ্টি। তৃতীয় দেবতা ও প্রজাপতিদের বংশাবলী কীর্ত্তন। চতুর্থ মনুদিগের অধিকার এবং পঞ্চম ইতিহাস অর্থাৎ আদিমকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের ও তাহাদের বংশধরগণের বৃত্তান্ত। খৃষ্টাব্দের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে অমরসিংহের সময়ে পুরাণ এইরূপ উপাদান ও লক্ষণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহা বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু ও অন্যান্য পুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে, যথা—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

সে যাহাই হোক যদি অমরসিংহের সময় হইতে পুরাণের উপাদান সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে পুরাণে সেই উপাদান সকল বর্ত্তমান থাকা উচিত। ইহা প্রকৃত কি না তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। কতকগুলি পুরাণ সম্বন্ধে সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই, আর অপর কতকগুলি সম্বন্ধে তাহা কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে সেই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ রূপে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বিষ্ণুপুরাণ খানি সকল পুরাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে মন্বন্তরের বর্ণনা ও চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাজবংশ কীর্ত্তনের মধ্যে সমাজ সংস্থান ও মৃতোদ্দেশে প্রেতক্রিয়া, পঞ্চম অংশে কৃষ্ণ চরিত এবং ষষ্ঠ অংশে মহাপ্রলয় বর্ণনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত নানাবিধ আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত ভাবে উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল আখ্যায়িকা উপাসক সাম্প্রদায়িকগণের প্রকৃতি ধারী। স্থূল কথা এই যে, পুরাণ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে উহা ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ। পৃথিবী সম্বন্ধীয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির বর্ণনা এবং রাজবংশ কীর্ত্তন যাহা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ তাহারা পুরাণের সহজাত নয়। কারণ সে সকল বিষয় কতকগুলি পুরাণে নাই এবং যাহাতে আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অধিকন্তু সকল পুরাণেই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রচলিত নিয়ম, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রত উপবাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি হয়ত কার্য্যোপযোগী আখ্যায়িকা দ্বারা দৃষ্টান্তরিত হইয়াছে কিম্বা ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার বিধি ও নিয়ম সকল দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনার জন্য স্তব বন্দনাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সে যাহাই হোক, পুরাণে লিখিত বিবরণ

প্রকৃত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, পুরাণ সকল যে তদবস্থায় পঞ্চ লক্ষণ বিশিষ্ট আখ্যার সার্থকতা সম্পাদন করে নাই, তাহা বিশদরূপে উপলব্ধি হইবে। এমন কি সেই পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে একটিও মূলগ্রন্থে ধর্ম্ম শিক্ষাপ্রদ বলিয়া কথিত হয় নাই। অমর সিংহ রাজবংশাবলী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কোন আভাষ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তিনি তাহা না করিলেও বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, যে তাঁহার অভ্যুদয়ের পর পুরাণগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পুরাণ প্রচলিত, সেগুলি পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট নয়। তদ্দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, তাহা পুরাতন পুরাণ নয়। বিশেষরূপে এ বিষয়ের অনুশীলন করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইবে। বর্ত্তমান পুরাণগুলি কোন সময়ে প্রকটিত তাহার কোন রূপ নিদর্শন না থাকিলেও তন্মধ্যে ঘটনা বিশেষের বর্ণনা বা তাহাদের আভাষ কিম্বা তন্মধ্যে বর্ণিত আখ্যায়িকা সকল কিম্বা ঘটনার ক্ষেত্রসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে সেগুলি অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন সময়ে রচিত হইয়াছে, এবং তাহারা যে পুরাতন কোন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উপাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত গ্রহণ ব্যতীত বর্ত্তমান পুরাণ সমূহ পুরাতন গ্রন্থ হইতে অন্য কোন সাহায্য গ্রহণ করে নাই। অচিরস্থায়ী অভিপ্রায়ের অনুরোধেই এইরূপ সঙ্কলন সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সেই আদান ধর্ম্ম সংসৃষ্ট বলিয়া দোষাবহ নহে। অনেকগুলির নির্ঘণ্টের অধিকাংশ এবং সমস্ত পুরাণের কতক অংশ অমিশ্র ও পুরাতন। পুরাণগুলি আসক্ত অন্তরে অনুশীলন করিলে উপাসক সম্প্রদায়-গণের প্রক্ষিপ্তাংশ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে অংশগুলি পরিত্যক্ত হইলে প্রকৃত ও আদীম বিষয় গুলির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এবং কোন একটি দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদুপরি ভক্তি সংস্থাপন বিষয়ক ব্যাপার পুরাণে লক্ষিত হইলেও বেদের ঠিক পরবর্ত্তী কালে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মনোভাব গঠনের পুরাণই একটি অমূল্য ইতিহাস। বেদের অবিমিশ্র ক্রিয়াদির উপরেই পুরাণের বীর পূজার ভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে। গ্রীস দেশের নরপতি আলেক্‌জণ্ডার যৎকালে ভারতে

আগমন করেন সে সময়ে এবম্প্রকার বীরপূজা প্রচারিত আকারে এবং সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে ভারতে সংস্থাপিত ছিল। গ্রীক জাতিদের হারকিউলিসের চরিত্র ঠিক বলরামের চরিত্রের অনুরূপে গঠিত। যমুনা তীরস্থিত মথুরা ও শূরসেনী রাজ্যের বর্ণনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারত যে সকল আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ সে সকল পূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ যদুবংশ, পাণ্ডুবংশ, কৃষ্ণ ও তৎসাময়িক বীর পুরুষগণ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের আখ্যায়িকা পুরাতন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

সাময়িক সাহিত্য।

হতভাগ্য। *

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

(১)

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জয়ভেরী যতই উচ্চরবে নিনাদিত হউক না কেন, পৃথিবীতে ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার নয়; ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ ও সুরূপ-কুরূপের মধ্যে জাতি-ভেদ চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে। তা' না হইলে রাধাচরণকে এমন হাহাকারের জীবন অতিবাহন করিতে হইবে কেন?

কি যে পোড়া অদৃষ্ট লইয়া সে জন্মিয়াছিল,—ঘরে-পরে কেহই তাহাকে সুনজরে দেখিত না। তাহার অপরাধ—সে কুৎসিতের শিরোমণি,—বিধাতা তাহাকে একটুও সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই। কুরূপ-কদাকারত অনেকেই হইয়া থাকে; কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য-সম্পর্ক-শূন্য কদাকার চেহারা কেহ কখনও দেখে নাই। কাফ্রীও ত দেখিতে কুৎসিৎ; কিন্তু সে কুৎসিতেও একটা সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু রাধাচরণকে যে একবার দেখিত, সে সাধ্য-পক্ষে দ্বিতীয়বার আর তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইত না। বেচারা যে কাণা, খোঁড়া, কিম্বা কুঁজো ছিল, তাহা নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত ও পদ প্রভৃতি কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই ভগবান তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। তাহার ছিল সমস্তই,—কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ কিছুই মানানসহি ছিল না।

মুখখানা তাহার অতিরিক্ত রকমের ছুঁচলো—তাহাতে তাহার নাকটা টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত বাঁকান। চক্ষু দুইটী কোটরাগত, কিন্তু ঠোঁট দুইখানি নিঃশেষ পাতলা ছিল। শরীরের রং যে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তাহা নয়। রং তাঁবাটে, চুলগুলা একেবারে কটা। বয়স হইয়াছে, অথচ মুখে দাড়ী গোঁফের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। আর গড়ন পিটন বড়ই পাকাটে গোছের ছিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত রাজ্যের অসঙ্গিলনগুলি যেন জড়াইয়া তাহার দেহে আশ্রয় লইয়াছে!

---

* বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক Guy de Maupassant এর Ugly নামক গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত।

শুধু কি এই অপরাধের জন্যই রাধাচরণ সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল? ইহাই মুখ্য অপরাধ বটে; কিন্তু আর এক অপরাধও তাহার ছিল। সে অপরাধ—তাহার স্বভাবটাও তাহার চেহারারই অনুরূপ! সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে,তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি অসামঞ্জস্যের লীলাভূমি! সে যে গেঁয়ার, কি নির্ব্বুদ্ধি ছিল, এমন নয়। তাহার স্বভাবের দোষ এই যে,সে কাহারও মনের মত হইয়া চলিতে পারিত না। তাহার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে সকলেই বিরক্তি বোধ করিত। সে যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান বিরক্তি!

এইজন্য পথে ঘাটে বাহির হওয়া রাধাচরণের পক্ষে বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিতে পাইলে কি ছেলের দল, কি বুড়ার দল চিলের মত ছোঁ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িত।

ছেলেরা হতভাগ্যের মাথায় 'চাঁটা' মারিয়া তাহার রূপ-গুণের ব্যাখ্যা করিত। আর বুড়ার দল নিজেদের রসিকতা চরিতার্থের জন্য কেহ তাহাকে 'বুঝন-মোড়ল', কেহ 'কার্ত্তিক', কেহ বা 'বোকাপাঁঠা' প্রভৃতি নামে ডাকিয়া 'ফোক্‌লা দাঁতের' হাসি হাসিত। রাধাচরণ দুর্ব্বল—এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহার কিছুই করিবার শক্তি ছিল না। কেবল মাত্র আকাশের পানে চাহিয়া এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত। হৃদয়ের দুঃসহ যাতনা এই দীর্ঘনিশ্বাসে অভিব্যক্ত হইত।

(২)

এই হৃদয়-দৈন্যের মধ্য দিয়া বেদনাতুর হৃদয়ে সে যখন ঘরে ফিরিয়া আসিত, সেখানেও হায় তাহার জন্য কাহারও স্নেহ-ব্যাকুল চক্ষু অপেক্ষা করিত না। তাহার তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে বারি সিঞ্চন করে, এমন লোক কেহই ছিল না।

রাধাচরণ পিতৃমাতৃ হীন। ভায়েদের কাছেই সে থাকিত। তাহারা কিন্তু এই সর্ব্বকনিষ্ঠ বেকার ভাইটাকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। রাধাচরণ সংসারের পক্ষে নিজেকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার আশায় সহোদরদের আশে-পাশে আগ্রহচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইত। দাদাদের আজ্ঞার অপেক্ষায় সর্ব্বাঙ্গে যেন কান পাতিয়া ভ্রাতৃগণের মুখপানে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু হায় সবই বৃথা! স্নেহ ও প্রীতির পরিবর্ত্তে,—প্রতিদানে অবজ্ঞা ও উপহাসের বোঝা লইয়া ব্যথিত চিত্তে নির্জ্জনে গিয়া তাহাকে আশ্রয় লইতে হইত। এ পাষাণ সংসারে নির্জ্জন স্থানই তাহার একমাত্র আশ্রয় দাতা, একমাত্র বন্ধু!

আজ রাধাচরণের মনে হইল,—বেকার বসিয়া আছে বলিয়াই হয়ত দাদারা তাহার উপর চটিয়া থাকিবে! তাহাতে আবার সে একা নহে—তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের ভারও তাহার দাদাদের বহন করিতে হয়। এমন অবস্থায় বিরক্ত হইবারইত কথা!'—এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধাচরণ স্থির করিল, "সে চাকরী করিবে" এই কথা তাহার দাদাদের আজ সে জানাইবে। এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই ভায়েরা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইবে। দুইটা মিষ্ট কথার সে কাঙ্গাল! আর তাহা সে নিশ্চয়ই দাদাদের নিকট হইতে শুনিবে। এই ভাবিয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

রাত্রে আহারাদির পর রাধাচরণ ভায়েদের কাছে গিয়া নিজ সংকল্প জানাইল। কিন্তু একি! একি উত্তর!! রাধাচরণের হৃদপিণ্ডটা যেন কে মোচড়াইয়া ধরিল! উত্তরে সে শুনিল —"তোকে চাকরী দেবে কে? ও চেহারা দেখলেই সাহেব যে ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে!"—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানি সহোদরদিগের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাশের ঘর হইতে ভ্রাতৃজায়াদেরও চাপাহাসি সেই সঙ্গে রাধাচরণের মর্ম্মে আসিয়া বিদ্ধ করিল। ক্ষণকালের জন্য সে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চোখের জল সামলাইতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরে বসিয়া রাধাচরণ ভাবিতেছে—"হায়! দু'টা মিষ্ট কথা সংসারে এতই কি দুর্লভ!

এতই কি দুরাশার সামগ্রী! কত লোকে নিত্যই রাশি রাশি আদর ও স্নেহ দুই পায়ে দলিয়া উপেক্ষাভরে চলিয়া যাইতেছে, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে তাহার কণামাত্র সমস্ত প্রাণমন দিয়াও ভিক্ষা করিয়া পাই না! ইহাতে ত কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই তথাপি এটুকু দিতে লোকে এত কাতর কেন?"—এমনি সময়ে ঘরের মধ্যে পত্নী মনোরমা দেখা দিল। রাধাচরণ পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, পত্নীর মুখে শ্রাবণের মেঘ যেমন রাতদিন নামিয়া থাকে, তখনও ঠিক সেইরূপ আছে—কোনও ভাবান্তর ঘটে নাই। রাধাচরণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুই হাতে পত্নীর হাত দুইখানি দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বলো, বলো, আমার কি অপরাধ? বলো, কেন তোমরা আমায় এত ঘেন্না কর?" মুখরা পত্নী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিল—"ঘেন্না করি কি সাধে! যার রূপ-গুণ নাই, তার আবার বিয়ে করা কেন!" রাধাচরণ অমনি মনোরমার হাত দুইখানা সজোরে ছুড়িয়া ফেলিল! ইচ্ছা হইল, দেহ হইতে তাহার পাষাণ হৃদয়টা টানিয়া বাহির করিয়া আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া লইল। রাধাচরণ মনে মনে ভাবিল—"আবর্জ্জনার মত এ হতভাগ্য জীবন আর রাখিয়া লাভ কি? মানুষ হইতে যে অধিকতর স্নেহময়, অধিকতর কৃপাময়,—যাহাকে আত্মসমর্পণ করিলে, নিরাশার দাবাগ্নি হৃদয়ে লইয়া ফিরিতে হয় না—আজ তাহারই কাছে যাইব। জলে ডুবিয়া মরিব।" জামা জুতা পরিয়া সে নিঃশব্দ পদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৩)

অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রজনী আকাশে তারার ঝাঁক লইয়া বসিয়া আছে। রাধাচরণ রজনীর নিস্তব্ধ পথ বাহিয়া অন্যমনস্কভাবে চলিতেছে। সহসা তাহার গতি রোধ হইল। পশ্চাৎ হইতে কে রাধাচরণের হাত ধরিয়া স্নেহভরে টানিতেছে আর বলিতেছে,—"এস ভাই, এস, আমার ঘরে এস। এত রাত্রে আর কোথায় যাবে! এসো, তোমার পায়ে পড়ি, এস।" এই কথায় রাধাচরণের বুকের মধ্য হইতে সমস্ত প্রাণটা সাড়া দিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল—এক গণিকা তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে। হউক গণিকা! এমন স্নেহস্বর সে কখনও কাহারও নিকট শুনে নাই। সে বিহ্বলভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গণিকার অনুসরণ করিল।

গণিকা রাধাচরণকে নিজের ঘরে বসাইয়া তাহার দুই পকেট হাতড়াইয়া যা' দুই পয়সা ছিল, প্রথমে তাহা বাহির করিয়া লইল। পরে দীপ জ্বালিল। আলোতে রাধাচরণের মুখ দেখিবামাত্র গণিকা ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওরে এযে সেই 'বুবন্ মোড়ল' দেখছি। তুই আবার এখানে কেন? বেরো, বেরো! চিড়িয়াখানায় যা!"

রাধাচরণের হৃদয়ের সমস্ত রক্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তাহার পাঁজর যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল। দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

শোক-সংবাদ।
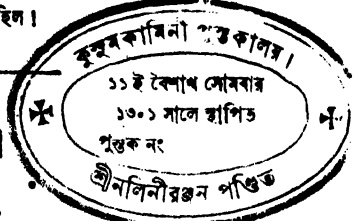
অর্চ্চনা-সাহিত্য-সম্মিলনীর অন্যতম সভ্য আমাদিগের সোদরপ্রতিম বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বিগত ২৬শে ভাদ্র রবিবার জলমগ্ন হইয়া পূত জাহ্নবী-ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন। অর্চ্চনা-সাহিত্য-সম্মিলনীর সকল সভ্যের সকল মধুর স্মৃতির সহিতই প্রায় যোগীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত। আমরা

এই পল্লীস্থ অধিবাসীর হিতের জন্য যাহা কিছু সদনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটির প্রাণ ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ ; আমাদের সামাজিক আমোদপ্রমোদ, প্রীতি সম্বর্দ্ধনের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের মধুর প্রকৃতি কিরূপভাবে সকলকে উৎফুল্ল করিত, তাহা বর্ণনাতীত। পল্লীমধ্যস্থ বা যোগীন্দ্রের পরিচিত কোন লোক তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুষ্কচক্ষে শুনে নাই। তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার উদারতা, সৌজন্য, বিনয় ও দানশীলতা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে অতি বিরল। তাই যোগীন্দ্রনাথকে ছোট বড়, ধনী নির্ধন যে কেহ দেখিয়াছে সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। সেইজন্য আজ জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলেই তাঁহার শোকে ম্রিয়মাণ। সেই জন্যই আজ এই বিশ্বব্যাপী হাহাকার!

যোগীন্দ্রনাথ এক প্রকার চিররুগ্ন ছিলেন। কিন্তু রোগে তাঁহার প্রকৃতি কঠোর না হইয়া মধুরত্ব লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং শারীরিক কষ্টভোগ করিতেন বলিয়া অপরের কষ্ট বুঝিবার শক্তি তাঁহার অত অধিক ছিল।

যোগীন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ বৃত্তিতেও তিনি বিপদগ্রস্ত পরিবারের উপকার করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরোপকার সাধন করিতেন। বলা বাহুল্য, তিনি যে সকল স্বার্থোন্নতির প্রলোভন ত্যাগ করিতেন, তাহা অতি অল্প লোকেই করিতে পারে।

যোগীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে। সকলেই শোকমগ্ন, সান্ত্বনা দিবার লোকের অভাব। আমরা তাঁহার অগ্রজ, তাঁহার দেবীস্বরূপিনী জননী বা তাঁহার অভাগিনী বিধবাকে প্রবোধ দিব কি বলিয়া সে ভাষা তো খুঁজিয়া পাই না। তবে যিনি সকল মঙ্গলের আধার, যিনি যোগীন্দ্রনাথকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন—যাঁহার স্মৃতি শান্তিময়, যিনি শান্তির পূর্ণতা, আমরা তাঁহার চরণে সমস্বরে প্রার্থনা করি যেন তিনি যোগীন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত শোকবিহ্বল পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে নব শক্তিতে অনুপ্রাণিত করেন, তাঁহাদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। জীব মরে না; দেহান্তর পরিগ্রহ করে; মানুষ দেহত্যাগ করিলে শোক করা বৃথা, এ শিক্ষা তিনি এ সময় যোগীন্দ্রনাথের দারুণ শোকমগ্ন পরিবারবর্গকে দিবেন ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সৃষ্টি-প্রকরণ ও স্বর্গে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সংস্থাপন, যাহা পুরাণে উল্লিখিত আছে, সে সমুদয় বেদ হইতে নীত হইয়াছে। বেদে তাহাদের বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত না থাকিলেও, প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের আভাষ তাহাতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদের সত্ত্বা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না এবং বোধ হয় তাহাতেই পুরাণে উল্লিখিত ঐ সকল বিষয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। আদীম বা ভূতনিচয়ের সৃষ্টি বিষয়ক কল্পনা সাঙ্খ্য দর্শন হইতে পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। আর সাঙ্খ্যদর্শনই নিশ্চয় মনুষ্য ও প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তার আদীম বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিপাদক। সেই জন্য পুরাণের যে অংশ আধুনিক বলিয়া মনে সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, দেবতত্ত্ব প্রবর্ত্তক প্রভৃত প্রতিভাশালী হিন্দুমনীষিগণ, তাহাতে বর্ণিত আপনাদের স্বাভিলষিত ও মনোমত দেবতার আরাধনার পদ্ধতির সহিত, স্বাবলম্বনীয় ও স্বতোদ্ভব জড় পদার্থের স্রষ্টাকে কিয়ৎ পরিমাণে বিপরীত ভাবে এবং অবোধ্য ও অস্পষ্ট আকারে সংযুক্ত করিয়াছেন। আর ইহাও বিশদরূপে উপলব্ধি হইবে, যে তাঁহাদের পুনঃ সৃষ্টি বর্ণনা অর্থাৎ জড়পদার্থের বর্ত্তমান আকারের বিকাশ ও উপচয় এবং জগতের সংস্থাপন অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপ করিতে গিয়া তাঁহারা আখ্যায়িকার সহিত কতকগুলি অসঙ্গত ও বিসদৃশ ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা রূপক ও অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন তাহাকে সমীচীন ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

পুরাণের একটী অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ এই যে, তাঁহাতে অসংখ্য দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণীত আছে, যাহা হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে যাহাতে সকল পদার্থই লীন হইবে তত্রাচ প্রত্যেক উপাসক-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছানুসারে সে ভাব ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় এই রূপ সংস্কারের

মূল বেদেই রোপিত হইয়াছিল। কিন্তু জীবাত্মাধারী গুণ বা ভূতনিচয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর একটী মহাপুরুষের অস্তিত্ব বেদে কল্পিত হইয়াছে এবং সেই কল্পনা অসম্পূর্ণ হইলেও বা সেই মহাপুরুষের অস্তিত্বের বর্ণনা বিসদৃশ হইলেও, তিনিই জগতের একাধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পুরাণের ব্যাপার তাহা নহে। পুরাণে শিব বা বিষ্ণু এক অদ্বিতীয় সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি যে এক বা সমান, এ সংস্কার অভিনব নহে। পুরাকাল হইতে এ সংস্কার লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এ ভাবটী খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থায় অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং প্লেটো প্রবর্ত্তিত খৃষ্টীয়ানদের সহিত শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণ সমতুল্য রূপে ইহার আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দুদের সহিত সে সময়ে গ্রীক-দিগের সংস্রব থাকা বিচিত্র নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের সহিত লোহিত সাগরের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল এবং ভারত-জাত পণ্যদ্রব্য যে রূপে আলেকজেন্দ্রিয়ায় নীত হইত, ভারতের দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার সেই ভাবে তথায় নীত হইয়াছিল। সিথিয়ানস * খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দিতে ভারতবর্ষ হইতে ভোজবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, উহা আপনার দেশে প্রচার করাতে এফিফেনিয়স † ও ইউসিবিয়স ‡ সিথিয়ানসের বহু নিন্দাবাদ করিয়াছিল। এবং সেই সময়েই এমোনিয়স সাকস ¶ ও এলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরে প্লেটোনিষ্টসদের নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোক প্রাচ্যদেশীয় জাতিদের নিকট হইতে তথায় আনীত হইয়াছিল, সাকস এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জগতের সত্ত্বা বেদ ও পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং যোগ নামে যে অনুষ্ঠান কতক গুলি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ঠিক অনুরূপ ক্রিয়া সাধন করিবার জন্য তিনি বিশিষ্ট রূপ ব্যবস্থা করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তপস্যা ও চিন্তা দ্বারা অবিনশ্বর আত্মার উপর দৈহিক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিল। তদ্দারা তাহারা এই জীবনেই সর্ব্বময় ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিবে।

---

* Schythianus.
† Ephiphanius.
‡ Eusebius.
¶ Ammonius Saccas.

বিষ্ণু পুরাণের ষষ্ঠ অংশের সপ্তম অধ্যায় পাঠে পরিলক্ষিত হইবে যে, হিন্দুজাতিই ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ও ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিষয়ক এইরূপ সংস্কারের প্রথম ও আদি প্রবর্ত্তক এবং এইরূপ সংস্কার যাহা বিদুষিগণ এলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরে প্রচার করেন, তাহা তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময়ে সেই সংস্কার সংগৃহীত হয়, তাহার মর্ম্ম তখন ঠিক সমানভাবে ও তদবস্থাপন্নই ছিল এবং এমোনিয়সের শিষ্যগণ সম্ভবতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মসূত্র সকলকে নূতন জীবন ও আকার প্রদান করিয়াছিল এবং পরলোক-তত্ত্ববাদীগণ কর্ত্তৃক পুরাণে লিখিত বাক্যাবলী যথাযথরূপে বর্ণে বর্ণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এন্‌কুইটিল ডিউপিরণ * নামক ৫০০ খৃষ্টাব্দের এক খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপ-দেশক উপনিখাট † অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, সিনেসিয়সের ‡ কতকগুলি ঈশ্বরস্তোত্র বিষ্ণুপুরাণে লিখিত বিষ্ণুর বন্দনা ও স্তোত্রের সহিত ঠিক সমান।

কিন্তু এক সর্ব্বশক্তিমান্‌ অদ্বিতীয় কর্ত্তার গুণসমূহ আপনার অভিলষিত ও আবশ্যকীয় কতকগুলি দেবতার প্রতি অর্পণ করিবার ব্যাপার বেদে দৃষ্ট হয় না। তাহা যে বেদ প্রবর্ত্তিত কালের বহুদিন পরে লিখিত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ রাম বিষ্ণু অবতার হইলেও তাঁহার চরিত্র ঠিক মানব চরিত্রের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভগবৎগীতা নামক দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক প্রক্ষিপ্তাংশে তাহা সমধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যস্থলে কৃষ্ণের দৈব প্রকৃতি ও শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনস্থানে তাঁহার দৈবশক্তি অস্বীকৃত হইয়াছে এবং কোন স্থানে তাহা বাদানুবাদে পরিপূরিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের সকল স্থানেই কৃষ্ণ রাজকুমার বা যোদ্ধার পরিচায়ক। তাহার কোন স্থলেই তিনি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন নাই। তিনি আপনাকে বা আপনার বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবার আশয়ে কিম্বা শত্রুগণকে পরাভব বা তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিবার আশয়ে, কোন প্রকার অসাধারণ শক্তি ধারণ করেন নাই। নিশ্চয়ই সমগ্র মহাভারত এক সময়ে রচিত হয় নাই। উহার অনেক অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। উহার সমগ্র

---

* Anquetil du Perron.

† Oupnekhat.

‡ Synesius.

বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা আবশ্যক। তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যাপারের যাথার্থ্য নিরূপিত হইতে পারে।

পুরাণগুলিও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সকল অবস্থার প্রকৃত প্রকৃতি আমরা সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারি না। তবে পুরাণ সকলের আভ্যন্তরিক মর্ম্ম এবং পুরাণ রচনার সময়ে ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম, আমরা সামান্যরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হই। বর্ত্তমান কালে হিন্দুগণ যে ধর্ম্ম অনুসরণ করে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে এখন যে ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহার সেইরূপ প্রকৃত অবস্থা শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পরিস্ফুটতা লাভ করে নাই। শঙ্করাচার্য্য শৈব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অভ্যুদয় সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের ৮০০ বা ৯০০ বৎসরে হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রামানুজের খৃষ্টাব্দের ১২০০ বৎসরে, মাধবাচার্য্যের ১৩০০ বৎসরে এবং বল্লভাচার্য্যের ১৬০০ বৎসরে অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং বোধ হয় পুরাণ সকল বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতাদের মত অনুসরণ করিয়াছিল অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই সমর্থন করাই পুরাণ সমূহের উদ্দেশ্য।

পুরাণ সকল যে আধুনিক অর্থাৎ ইদানীন্তন কালে রচিত, তৎসম্বন্ধে অপর একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণের কতকগুলি অধ্যায়ে ভবিষ্যৎবাণী আছে। কলিযুগে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিবে প্রভৃতি যে সকল অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে পুরাণের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেবলমাত্র চারিখানি পুরাণের অধ্যায়ে এইরূপ বিষয় লিখিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ পুরাণ সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের বহুকাল পরে যে রচিত হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণিত হইবে। কিন্তু এখানে একথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবৎ এবং মৎস্য পুরাণে এই ভবিষ্যৎবাণী বিবৃত থাকিলেও, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে এই চারিখানি পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

পুরাণের অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ এই যে, ইহাতে সকল বিষয় দুই ব্যক্তির কথোপকথনছলে বিবৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ একজন প্রশ্নকর্ত্তা, অপর ব্যক্তি উত্তরদাতা। উত্তরদাতার মুখ হইতেই বিষয় গুলি নিঃসৃত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথনের সহিত অপর ব্যক্তিগণের কথোপকথন

সন্নিবেশিত থাকে এবং তাহাদের মধ্যেও প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা আছে। ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণকেই প্রায় সকল পুরাণে উত্তরদাতা রূপে দৃষ্ট হয়। লোমহর্ষণের গুরু ব্যাস যাহা অন্যান্য ঋষি প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিবার আশায় তিনি লোমহর্ষণকে আদেশ করেন, সচরাচর এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাস ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়। ইহা একটি পদবী মাত্র। ইহার অর্থ সংগ্রহকারক। বর্ত্তমান মন্বন্তরে ২৮ জন ব্যাস ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে 'ব্যাস' দ্বারা পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বুঝাইতেছে। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যকে বেদ ও পুরাণ শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু বোধ হয় তিনি কোন চতুষ্পাঠী বা বিদ্যামন্দিরের গুরু বা শিক্ষক ছিলেন এবং অনেকানেক বিদূষী তাঁহারই যত্নে হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রকটন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহারা ব্যাসের শিষ্যস্থলাভিষিক্ত না হইয়া তাঁহারা তাঁহার সহপাঠী ও সহযোগী ছিলেন, কারণ তাঁহাদিগকে যাহা শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের উপর রাজবংশাবলী বর্ণনার ভার অর্পিত হইয়াছিল লোমহর্ষণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। লোমহর্ষণ সূত বলিয়া আখ্যায়িত হইত। কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। সূত একটী পদবী। এবং লোমহর্ষণ একটী সূত বলিলে বুঝিতে হইবে যে, স্তুতিকারক এবং নৃপতিবর্গের বীরত্ব ও কার্য্যকলাপ বর্ণনার জন্য তাহার জন্ম* এবং বায়ু ও পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে তাহাই সূতের জাতীয় জীবিকা এবং তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ব্রাহ্মণগণের সে কার্য্যে আদৌ অধিকার নাই। সুতরাং আমাদের এই উপলব্ধি হইল যে, ব্যাসের শিষ্য বলিয়া সূত সম্ভবতঃ তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে তৎকালিক ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গল্প-গুলি ও জনশ্রুতি সমূহ সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই পুরাণ সমূহে রাজবংশাবলী ও জগতের বর্ণনা সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক, সূত অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিয়াছিল, কারণ অন্যান্য অনেক গুলি পুরাণের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণেও ভিন্ন কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কথিত আছে লোমহর্ষণের ছয়টী শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে তিনজন তিন

---

* বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

খানি সংহিতা রচনা করেন এবং তিনি নিজে চতুর্থ খানি সংগ্রহ করেন। সংহিতা অর্থে সংগ্রহ বা সঙ্কলন। বেদ-সংহিতা অর্থে বেদে লিখিত স্তব, বন্দনা প্রভৃতির সংগ্রহ। এই সংগ্রহ কোন মনীষিবিশেষের স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি প্রত্যেক সংহিতার আদি প্রবর্ত্তক ও উপদেশক রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পুরাণের সংহিতা সমূহও ঠিক সেই ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং মিত্রয়ু, সাংশপায়ন, অকৃতব্রণ এবং রোমহর্ষণই তাহাদের সংগ্রহকারক। কিন্তু সেই সকল সংহিতার সামান্য চিহ্নও এক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় না। কথিত আছে যে, এই ব্যক্তিচতুষ্টয়ের সংগৃহীত বিষয় বিষ্ণুপুরাণে আছে। কিন্তু বিশেষ গবেষণা করিয়াও সে সংগ্রহ গুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় সেই সংগৃহীত বিষয় সমন্বিত পুরাণ অন্য কোন আকারে ছিল। বর্ত্তমান পুরাণ সমূহ তাহারই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বের আকার বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না।

মৎস্য পুরাণে পুরাণ সমূহ শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিবার এক প্রণালীর অভাব লক্ষিত হয়। পদ্মপুরাণে সেই প্রণালী সম্পূর্ণাবয়বে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে বোধ হয় ইহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয় যে পুরাণের মর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু লেখকগণের অভিমত পুরাণে স্ফুটতমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উপাসক সম্প্রদায়গণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিমত এই সকল পুরাণে যে প্রণালীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা লেখকগণ প্রকটভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডে কথিত আছে* গুণের প্রাধান্য অনুসারে পুরাণগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবৎ, গরুড়, পদ্ম এবং বরাহ, সাত্ত্বিক পুরাণ। কারণ সেগুলিতে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়

---

* পদ্মপুরাণ ৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং স্কন্দং তথৈবচ।
আগ্নেয়ং চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ং চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে ॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈবচ ॥
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সততা ও সরলতা বর্ত্তমান। সুতরাং তাহারা বৈষ্ণব পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি, তামস পুরাণ। কারণ সেগুলিতে তম ভাবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞতা ও অন্ধকারবৎ কাপট্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাহারা শৈব পুরাণ। তৃতীয় শ্রেণীস্থ পুরাণ গুলি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন এবং ব্রহ্ম, রাজস পুরাণ। কারণ সেগুলিতে রজোগুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে লোভ এবং ক্লেশ সমূহের আকার বর্ত্তমান।

মৎস্যপুরাণে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু কোন্ পুরাণ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভূত তাহা লিখিত হয় নাই। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় + যে পুরাণে হরি বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত, হইয়াছে তাহা সাত্বিক। যাহাতে অগ্নি বা শিবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহা তামস এবং যাহাতে ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় বর্ণনার সমাবেশ আছে, তাহা রাজসপুরাণ। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, রাজস পুরাণগুলি শক্তি উপাসকগণের গ্রন্থ। কারণ তাহাদের কতকগুলির মধ্যে দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রধান প্রক্ষিপ্তাংশে দুর্গা বা কালীর আরাধনার প্রখ্যাত উপাখ্যান আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কতকগুলি অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণ প্রণয়িনী রাধা ও অন্যান্য দেবীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ তৃতীয় বিভাগীয় পুরাণগুলিকে শাক্ত পুরাণ নয় বলিয়া আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন তন্ত্র নামক অন্য এক ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থের উদ্দেশ্যই শক্তিপূজা এবং সে প্রণালী অনুসারে পূজা ব্রহ্ম পুরাণে দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের মত আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারি না। কতকগুলি তাহাদের মতানুযায়িক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পুরাণ সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য হইতে পারে না। ইহা উপপুরাণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। আবার পদ্মপুরাণের মতে তৃতীয় বিভাগীয় পুরাণ সকল কৃষ্ণ আরাধনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেস্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণুরূপী

+ মৎস্যপুরাণ ৫২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সংপূর্ণেষু স্বরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে॥

অনুমান না করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাল গোপাল, (যিনি বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন, যিনি রাখাল বালকগণের এবং গোপিনীগণের সঙ্গী, এবং যিনি রাধার প্রণয়ী ছিলেন) কিম্বা জগন্নাথ বলিয়া অনুমান করা কর্ত্তব্য। রজোগুণের দ্বারা ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তিকারক আনন্দ উপভোগের সজীবতা সংরক্ষণ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা তাঁহার ঐশিক শক্তিসম্পন্ন যৌবনাবস্থার চরিতের প্রতি যে প্রযুজ্য তাহা নহে। যাঁহারা এইরূপ আকারে তাঁহার আরাধনা প্রণালী সৃজন করিয়াছেন অর্থাৎ গোকুল ও বঙ্গদেশীয় গোস্বামীগণ, বল্লভাচার্য্য ও চৈতন্যের ভক্তগণ ও তাঁহাদের বংশীয়গণ এবং জগন্নাথ ও শ্রীনাথদ্বারের পুরোহিত ও অধ্যক্ষগণের প্রতি তাহা প্রযুজ্য হইতে পারে। তাঁহারা সম্পন্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং উপদেশ ও অভ্যাস দ্বারা রজোগুণের সত্বার উপযোগীতা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ক্ষণস্থায়ী সুখভোগ করিবার সম্যক একতা দেখাইয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

সহধর্ম্মিণী।

নবম পরিচ্ছেদ।

আট দশ দিনে খোকা অনেক ভাল হইয়া আসিল, তবে এখনও সম্পূর্ণ জ্বর যায় নাই। অন্য কোন ভাল ডাক্তার না থাকায় সতীশচন্দ্র রমেন্দ্রনাথকেই পুনঃ পুনঃ ডাকিতে বাধ্য হইলেন—নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও পুনঃ পুনঃ তাঁহার বাড়ী আসা সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক দিতে পারিলেন না। দিনে রমেন্দ্র দুই তিন বার আসিয়া খোকাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই কয় দিনে অনেকে সতীশচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে ও তাঁহার সম্বাদ লইতে আসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রফুল্লবাবু ও তাঁহার স্ত্রী পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, সেইজন্য খোকা সেদিন বেশ ভাল আছে দেখিয়া সতীশচন্দ্র ও হেমাঙ্গিনী দাসদাসীকে খোকাকে খুব সাবধানে রাখিতে বলিয়া প্রফুল্ল বাবুর বাড়ীতে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রফুল্লকুমার ও সতীশচন্দ্র নার্শারি দেখিতে বাহির হইলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া যাইবার একটু পরেই তথায় ডাক্তার রমেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রফুল্লকুমার কোথায় গিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই সময়ে একজন চাকর হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন।"

হেমাঙ্গিনী ভিতর হইতে নিজের চাকরের গলা শুনিয়া সত্বর বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই খোকার অসুখ বেড়েছে।"

চাকর বলিল, "খোকাবাবু কেমন কর্‌ছে, তাই ঝি আমাকে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে পাঠিয়েছিল; সেখানে ডাক্তার বাবুর চাকর বল্‌লে, তিনি এখানে এসেছেন, সেই জন্য এখানে ছুটে এসেছি।"

মায়ের প্রাণ! সতীশচন্দ্র কোন্ দিকে বেড়াইতে গিয়াছে তাহা কেহ জানে না, হেমাঙ্গিনী আর এক পল দেরি করিতে পারিল না, সে রমেন্দ্রনাথের সহিত বাড়ীর দিকে ছুটিল।

তখন সন্ধ্যা। নির্ম্মল আকাশে চমৎকার চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নাচর্চ্চিত। এই সময়ে হেমাঙ্গিনী ও রমেন্দ্র একত্র—একসঙ্গে দ্রুতপদে পানিয়াখোলার দিকে যাইতেছিলেন। চাকরের এত তাড়া নাই, সে তাঁহাদের অনেক পিছনে পড়িয়াছিল।

দূর প্রান্তরমধ্যস্থ পথে প্রফুল্লকুমার ও সতীশচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা ইহাদের দেখিলেন। প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "ডাক্তার বলিয়া বোধ হয়; হাঁ—নিশ্চয়, সে ঐ রকম হাঁটে—সঙ্গে আবার স্ত্রীলোক! বাহবা বেশ!"

সতীশচন্দ্র হাসিলেন। তিনি দূর হইতে তাঁহার স্ত্রীকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে প্রফুল্লকুমারের বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

তথায় এই সময়ে আরও দুই একটী ভদ্রলোক সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাদের ডাক্তার ডুবে ডুবে জল খায়, এখানে না এসে, এক সুন্দরী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে!"

একজন হাসিয়া বলিলেন, "সতীশ বাবুর স্ত্রী।" তিনি কোন কু-উদ্দেশ্যে একথা বলেন নাই। তিনি আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, ছেলের পীড়ার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ীতে গিয়াছে। সতীশের হৃদয়ে তাঁহার কথাটা শেলবৎ বিদ্ধ হইল।

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "তিনি ডাক্তারের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন কেন?"

যাহা ঘটিয়াছিল একজন তাহা বলিলেন; কিন্তু ইহাতেও সতীশচন্দ্র কোন কথা বলিলেন না, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে চাহিয়াছিলেন।

সহসা—তিনি বসিয়াছিলেন—চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, দেখি কি হয়েছে!"

তিনি চলিয়া গেলে একজন বলিলেন, "সতীশ বাবু ছেলেকে বড় ভাল বাসেন, ছেলের কথা শুনিয়া কি রকম হইলেন—দেখিলেন!"

ছেলের জন্য সতীশচন্দ্র কি রকম হন নাই। তখন শক্তিশালিনী ঈর্ষা সতীশচন্দ্রের সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া নিজের অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তিনি একটু পূর্ব্বে ছেলেকে সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহার অসুখ বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তাই ভাবিলেন উভয়ে একত্র নির্জ্জন পথে বেড়াইবার জন্যই হেমাঙ্গিনী ও রমেন্দ্র গোপনে পরামর্শ করিয়া এই অজুহতে চলিয়া গিয়াছে। ছেলের অসুখের কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। ঈর্ষায় দেবতাও দানব হয়—সতীশ দুর্ব্বলহৃদয় মানবমাত্র।

তিনি বাড়ীর নিকট আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন না, কিয়ৎক্ষণ বাড়ীর চারিদিকে চোরের ন্যায় ঘুরিলেন, তাহার পর তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা এসেছেন?"

সে বলিল, "হাঁ—ডাক্তার বাবুর সঙ্গে এসেছেন। ডাক্তার বাবু খোকা বাবুকে দেখ্‌ছেন।"

তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, রমেন্দ্র হেঁট হইয়া খোকার নাড়ী দেখিতেছেন।

খোকা সতীশচন্দ্রকে প্রথম দেখিল, দেখিয়াই "বাবা বাবা" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা পাইল।

স্বামীকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "খোকা এখন বেশ আছে—ঝি কেন এত ব্যস্ত হইয়াছিল বলা যায় না।"

সতীশচন্দ্র রাগতভাবে দাসীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই কেন মিছামিছি ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিলি?"

দাসী বলিল, "পাঠাব না, জ্বর বেড়েছে, খোকা ভুল বকছিল, আমার ভয় হল—তোমরা কোথায় বেড়াতে গেছ বলে যাও নি, তাই ভয় পেয়ে ডাক্তার বাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম।"

রমেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এরূপ জ্বরে কখনও কখনও এরূপ হয়, ইহাতে ভয় পাইবার কথা বটে!"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া রমেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। হেমাঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ ছেলের নিকট আসিয়া নিজ শয়ন গৃহে আসিল, তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহে সতীশচন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র গৃহমধ্যে আসিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "দরজা বন্ধ করিলে কেন?"

সতীশচন্দ্র বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সখ—আমার কথা শেষ হইবার আগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আছে। বলি, আজ এই জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রণয়ীর সঙ্গে ভ্রমণ বৃত্তান্তটা কিরূপ—আমি শুনিতে চাহি।"

হেমাঙ্গিনী দরজার দিকে চাহিল। স্বামীর এ ভাব দেখিলে সে কোন কথা না বলিয়া অন্যান্যবার তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইত। আজ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আর তাহার সহ্য হইল না—সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "কেন তুমি এ রকম করিতেছ, আমি কি কখনও তোমার কাছে কোন দোষ করিয়াছি? বিনা কারণে কেন তুমি এই সব কথা বল? কখনও কি আমার কোন দোষ পাইয়াছ?"

সতীশচন্দ্র অত্যন্ত কঠিনকণ্ঠে বলিলেন, "না, এ পর্য্যন্ত পাই নাই, তাহা স্বীকার করি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি কখনও তোমাকে সন্দেহ করি নাই। কিন্তু তুমি এখানে আসিয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছ না, দেখিতেছি। এ সব কি ব্যাপার!"

"তুমি অন্যায় বলিতেছ, আমি অন্য কাহাকেও ভালবাসি না।"

"যদি সেই প্রেমের বিদায়-দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিতাম।"

"কি বিদায়?"

"কি বিদায়!—বর্ণন করিব কি? তুমি কি তাহা জান না? চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে যখন বলিয়াছিলে যে, তুমি আমায় ভালবাস না, তাহাকেই ভালবাস, যখন সে তোমার হাত বুকে তুলে লইয়াছিল, আমি কি তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই?"

হেমাঙ্গিনীর নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার মনে সমস্ত জীবনটা নিদারুণ রহস্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব স্বচক্ষে দেখিয়াও আমি তোমায় কখনও কিছু বলি নাই, কারণ আমি তোমায় নিজের প্রাণ অপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি, আমি সমস্তই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আর—তুমি, হেমাঙ্গিনী—হা হতভাগিনী তুমি—"

হেমাঙ্গিনী কাতরে বলিল, "ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি—আমি এখন আমার ছেলেমেয়ে ও তোমায় ভিন্ন কাহাকে জানি না, কেন এই সকল কথা তুলিয়া আমাকে কষ্ট দাও, তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া নাই?"

"যে দিন আমরা এখানে এসেছি, সেই দিন হতেই সে তোমার কাছে এসেছে, দিনের মধ্যে একবার নয়—সাতবার।"

"তোমার ছেলেকে দেখিতে, তুমি কি বিনা চিকিৎসায় বাছাকে মারিয়া ফেলিতে চাও—তিনি এখানে সর্ব্বদাই ডাক্তারের মত আসেন, অন্য কোন ভাবে কখনও আসেন নাই, তুমি কি নিজে তাহা দেখ নাই?"

"আর আজ! তোমরা দুজনে আধ ক্রোশ রাস্তা নির্জ্জনে এক সঙ্গে আসিয়াছ! তোমাদের এ ভাব দেখিয়া আমি যে পাগলের মত হইয়াছিলাম, তাহা কি তুমি বুঝ না? তাহার পরম সৌভাগ্য যে, তখন আমার সঙ্গে এই রমেন্দ্রের দেখা হয় নাই, নতুবা কি যে ঘটিত বলিতে পারি না।"

"তুমি জ্ঞানী, বিবেচক, ছিঃ, তোমার কি এরূপ কথা ভাল? তিনি এখানে কখনও কোন অসম্মানের কথা বলেন নাই, তিনিও শিক্ষিত, তিনি কি জানেন না যে, আমি এখন অপরের স্ত্রী, ছেলেমেয়ের মা।"

সতীশচন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছেন? সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতকটা উন্মত্তই বটে, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, একবারে বালকের মত হেমাঙ্গিনীকে উভয় বাহুবেষ্টনে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী তাঁহার ভাব দেখিয়া ভীতা হইল। সে তাহার স্বামীর এ ভাব

আর কখনও দেখে নাই। সে প্রথমতঃ এতই রাগত হইয়াছিল যে, স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার এ ভাব দেখিয়া সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। সান্ত্বনা করিবে কি, হেমাঙ্গিনীও যে নিজে কাঁদিয়া ফেলিল!

তখন সতীশচন্দ্র স্ত্রীর প্রতি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল—তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

* * * *

পরদিবস রমেন্দ্রনাথ খোকাকে দেখিতে আসিলে সতীশচন্দ্র তাঁহার হস্ত বিলোড়ন করিলেন, তাঁহাকে সমাদরে বসিতে বলিলেন। তিনি এ কাজ আদৌ করেন নাই।

কিন্তু ঈর্ষা-সর্পী একবার হৃদয়-গহ্বরে স্থান পাইলে, কে তাহাকে দমন করিতে সক্ষম হয়? সুবিধা পাইলেই সে মাথা তুলিয়া দংশন করিতে চেষ্টা করে। সতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইল, তিনি ঈর্ষাকে হৃদয়ে দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুবিধা পাইবামাত্র ইহা আবার তাঁহার হৃদয়ে কালসর্পীর ন্যায় মস্তক উত্তোলিত করিল।

রমেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীর সকল কার্য্যেই তিনি বিনা কারণে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে আর কোন কথাই বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন কি রমেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার ছেলের কথা কহিলেও তিনি মনে মনে ঈর্ষায় উন্মত্ত প্রায় হইতেন। ক্রমেই তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া রমেন্দ্রের সহিত মিশিতেছে। যে কখনও ঈর্ষার জ্বালা সহ্য করিয়াছে, সে কোনক্রমে সতীশচন্দ্রের হৃদয়ের এই নরক-যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিবে না; প্রকৃতই সতীশচন্দ্র কেমন এক রকম হইয়া গেলেন—না উন্মাদ, না প্রকৃতিস্থ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন খোকা দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল, কাজেই রমেন্দ্রও খুব কদাচিৎ সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিতেন, এখন ছেলে প্রায় ভাল হইয়াছে, এখন আর তাঁহার তাহাকে প্রত্যহ দেখিবার আবশ্যকতা ছিল না।

অবশেষে খোকা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে রমেন্দ্রনাথ একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখন আর আমার এখানে কোন কাজ নাই, এখন আমি বিদায় হইতে পারি।"

তিনি চলিয়া গেলে সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তবে বিদায় হইয়াছে!"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "হাঁ—বিল পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি।"

সে দিন সোমবার। মঙ্গলবার সতীশচন্দ্র আহারাদির পর বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত ছেলের অসুখের জন্য এখানকার কিছুই দেখি নাই, আজ একবার দেখিয়া আসি।"

ছেলের জন্য যত না হউক, তিনি নিজের জন্য বটে, বাটীর বাহিরে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেন না, কারণ স্ত্রীর উপর সন্দেহ। আজ রমেন্দ্র বিদায় হইয়া গিয়াছে জানিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সেই সাহসে আহারাদির পরেই বেড়াইতে বাহির হইলেন।

তিনি কেন অধিকক্ষণ বাড়ী ছাড়িয়া থাকেন না, তাহা হেমাঙ্গিনী বেশ বুঝিতে পারিত, কিন্তু সে তাহার মনের কথা মনেই রাখিত, কখনও প্রকাশ করিত না।

পরদিনও সতীশচন্দ্র আহারাদির পরেই বাহির হইয়া গেলেন।

আজ বৈকালের গাড়ীতে সতীশচন্দ্রের পিসিমাতা তাঁহার পুত্র সুধাংশুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে আসিবেন, তাহা পূর্ব্বে পত্র লিখেন নাই, কাজেই সতীশচন্দ্র তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতেন না।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও সতীশচন্দ্র ফিরিলেন না। এই সময়ে হেমাঙ্গিনী বাহিরে কাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিল, বলিল, "এসেছেন! পিসিমা এসেছেন শুনে ভারি আশ্চর্য্য হইবেন নিশ্চয়।"

কিন্তু সতীশচন্দ্র আসিলেন না, আসিলেন রমেন্দ্র।

আবার রমেন্দ্র! হেমাঙ্গিনীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সতীশচন্দ্রের অনুপস্থিতে রমেন্দ্র! রমেন্দ্র আর আসিবেন না—আবার আসিয়াছেন, এখন সতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে রমেন্দ্রের সঙ্গে দেখিলে, তিনি কি মনে করিবেন! হেমাঙ্গিনীর চোখে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হইল; তাহার বক্ষঃস্থল অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল, সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া রহিল।

রমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কেমন আছে ?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "বেশ আছে, আপনি সেদিন বলিয়াছিলেন, আপনার আর আসিবার আবশ্যক হইবে না।"

রমেন্দ্র কহিল, "হাঁ—আর তাহাকে দেখিবার আবশ্যক নাই। এই পথে যাইতেছিলাম, তাহাই একবার মনে করিলাম, তাহার খবরটা লইয়া যাই। আজ কি কুয়াসাই হইয়াছে। এখানে মধ্যে মধ্যে শীতকালে এমনই কুয়াসা হয়, রাত্রে এখন একহাত দূরের লোক দেখিবার উপায় নাই!"

তিনি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনীর নিকট বসিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্বের কোন ভাবই আর ছিল না, তিনি সতীশচন্দ্রের মনের ভাবও জানিতেন না, কাজেই তাঁহার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না, যেমন দশ জনের সহিত ব্যবহার করিতেন, রমেন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনীর সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, তিনি এখনও তাহাকে পূর্ব্বপরিচিতা বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইলে হেমাঙ্গিনীর বক্ষঃ আরও কাঁপিতে লাগিল, যদি এই সময়ে সতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি কি বলিবেন—তিনি কি ভাবিবেন!

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "খোকাকে একবার দেখিবেন না ?"

হেমাঙ্গিনীর ইচ্ছা রমেন্দ্রনাথ যত শীঘ্র হয় বিদায় হয়েন, কিন্তু রমেন্দ্র আজ এত শীঘ্র বিদায় হইবার ইচ্ছা করেন নাই। তিনি বলিলেন, "পরে দেখিব।"

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রমেন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "বসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

হেমাঙ্গিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না, সে নীরবে তাহার সম্মুখে বসিল। এক নিমেষে তাহার আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইয়া গেল।

রমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি কোন বিষয়ে কাহারও পরামর্শ লইতে চাহি, আমি জানি আপনি অতি বুদ্ধিমতী. আপনার পরামর্শ আমি অন্য সকলের পরামর্শ হইতে অধিক মনে করি, তাহাই কোন গুরুতর বিষয়ে আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

মুক্ত আত্মা।

আজি, মহা শূন্যে কত দূরে,
পদতলে পৃথ্বী ঘুরে,
ব্যাপ্ত এই চরাচরে, ঘোরতর মায়াজাল!
জড়ত্বে আবদ্ধ আত্মা,
ইন্দ্রিয়ের কি মত্ততা,
মায়া-মদে' ভোর হ'য়ে, কত কষ্টে যাপে কাল!
ছাড়িয়া ধরার মাটী,
সোণার শিকল কাটি',
ছেদি' মায়া-মোহপাশ, আসিয়াছি পলাইয়া—
লৌহ-খাঁচা ভেঙ্গে চুরে
বনপাখী এল উড়ে,
কি মোহেতে ছিল মুগ্ধ, ভাবিলে শিহরে হিয়া!
শুধু স্বার্থ, সুখ-আশ,
ফেলিতে দিত না শ্বাস,
ছয় রিপু-নাগপাশে, দেহ-মন-প্রাণ বাঁধা;
কত তবু যত্ন করি'
বেহেছিনু দেহ-তরী
সত্য-পথে দিশাহারা—নয়নে লাগিয়া ধাঁধা!
জীবনের পরপারে,
ছাড়ি কায়া-কারাগারে—
কি আনন্দে—মহানন্দে, যাপি কাল পেয়ে ছাড়া!
বিভ্রান্ত যতেক নর
গর্ব্বে শুধু আত্মপর!
প্রহেলিকাময় দেশে, স্বর্গবোধ করে কারা!
ফুরায়েছে মোর সব,
দেহটা অস্পৃশ্য শব,

ভেসে গেছে সুখ-সাধ, ধন-জন-গৃহ-ভূমি;
টুটিল ভঙ্গুর বাসা
বুক-ভরা শত আশা
সকলি নিঃশেষ করি, মৃত্তিকা রয়েছে চুমি'!
হাহাকার-কোলাহল
আত্মীয় নয়নে জল—
মায়া-মোহে মুগ্ধ সবে, অজ্ঞানতা কি মূঢ়তা!
ঊর্দ্ধলোকে যেতে চাই,
তবুত বিরাম নাই!
বারে বারে ডাকা পিছে, নির্ম্মমতা নিষ্ঠুরতা!

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

রমণী ও রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্যমান বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা বড় আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে না। সাহিত্যের পুজানিকেতন এখন সম্প্রদায় বিশেষের পরিবাদে এবং দলাদলির 'আখড়া'য় পরিণত হইয়াছে। একদল দোষ দেখাইতেছেন, আর একদল তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। মিঃ বেসান্ত বিগত যুগের ইংলণ্ডীয় সমালোচকগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"Some fault finding, some ridicule, a good deal of slashing personality, and the expression of individual prejudice, and like or dislike, which characterised so much of the British review criticism of the beginning of this century, much of it utterly conventional and blind judgment * * *." আমাদের আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতির সহিত, মিঃ বেসান্তের কথা ঠিক মিলিয়া যায়।

এরূপ ক্ষেত্রে, আমি সসঙ্কোচে কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য সম-দর্শন। তিনি দোষ দেখিবেন। তিনি গুণ দেখিবেন। আবশ্যক হইলে, নিন্দা করিবেন। আবশ্যক হইলে, প্রশংসা করিবেন। একথা

যিনি ভুলিয়া যাইবেন, তিনি তারা-গ্রামে কণ্ঠ তুলিয়া আখ্‌ড়াই বাজাইলেও, আমরা তাঁহাকে সমালোচক বলিব না। জনৈক লেখক বলেন,—"Unhappy those, who hunt and purvey for a party, and scrape together out of every author all those things, and those only, which favour their own tenets, while they despise and neglect all the rest !" (*The Improvement of the Mind. P. P. 51.*) অর্থাৎ "যাহারা পুস্তক হইতে আপনার মনের মত কথাগুলি বাছিয়া লইয়া, অন্যান্য মত একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া দলাদলিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা দুর্ভাগ্য !"

বাস্তবিক, এরূপ আচরণে, কখনো ধ্রুবের পথ মুক্ত হয় না। অথচ আমাদের সাহিত্যে, এইরূপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা, নৈশ আকাশের তারামালার মত অগণ্য দেখিতেছি।

কাব্য,—প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। (১) ধর্ম্মসঙ্গীত। (২) মানব-সঙ্গীত। (৩) প্রকৃতি সঙ্গীত। (৪) প্রেম-সঙ্গীত। উপস্থিত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার আগে, এ গুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, আমার বক্তব্য বিষয় সহজে বুঝাইতে পারিব। কাব্যের স্তর, প্রধানতঃ চারিটী বটে,—কিন্তু সূক্ষ্মানু-ভূতিতে, কাব্যের আরও কয়েকটী বিভিন্নপথানুসারিণী গতি অনুভব করা যাইতে পারে। তবে, তাহা প্রশাখা মাত্র,—কাণ্ড নয়।

(১) ধর্ম্মসঙ্গীত। এদিকে,—অর্থাৎ ধর্ম্মমূল কাব্যরাজ্যে আমরা তত বেশী কবির সাক্ষাৎ পাই না,—অন্যান্য দিকে যত দেখি। সত্য বটে, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, নবীনচন্দ্র, হোমার এবং ভার্জ্জিল প্রভৃতি কবিগণ, প্রধানতঃ ধর্ম্ম সঙ্গীতেই কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়াছেন,—কিন্তু সার্ব্বত্রিক কবি-সমাজের ভিতরে, তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনীয়। এক হিসাবে, অধিকাংশ কবিতাই ধর্ম্মমূলক ; কিন্তু অন্যদিক দিয়া দেখিলে, বলা যায়,—নিছক ধর্ম্ম, মহাকাব্যের উপাদান। রামায়ণ বা মহাভারত, ইলিয়াড বা প্যারাডাইস লষ্টের মত কাব্যেই তাহার যথাপ্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু মহাকাব্যের কাল গত। আর তাহা প্রণীত হইবে না। দান্তের সেই সুদীর্ঘ এবং রোমহর্ষণ নরক বর্ণনা,—আধুনিক যুগের অবসররঞ্জনপ্রয়াসী, পাঠকগণের পক্ষে একান্ত গুরুপাক। এখনকার পাঠকও ভাব-গম্ভীর সুন্দর রচনা চায় বটে,—কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়।

(২) মানব সঙ্গীত। এদিকে কোন এক বিশেষ কবির নাম করা যায় না।

ইংলণ্ডীয় কবিতায়, এক সময়ে ইহার অতুল প্রভাব দেখা যাইত। আলেক-জাণ্ডার পোপের পরে, আর এদিকে ততটা উৎসাহ, কাহারও রহিল না। কাউপারের কবিতায়, মানব এবং প্রকৃতির মিলন সাধন হইল। তাহার পর, ইংলণ্ডীয় কবিগণ. আবার নূতন গানে মাতিয়া উঠিলেন। আমাদের দেশেও, নবীনচন্দ্রই এদিকের প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি। এখনকার কবিরা, নূতন সুরে বীণা বাঁধিয়াছেন।

(৩) প্রকৃতি-সঙ্গীত। এদিকে প্রতীচ্য কবিগণের ভিতরে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের যতটা উৎসাহ দেখি, তেমন আর কাহারো নয়। আবাল্য তিনি প্রকৃতির একজন ভক্ত অনুনেতা ছিলেন। এতটুকু একটী ছোট ফুল,—তাহার দিকেও তাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়া থাকিত। একটী ছোট গিরিভূমির নিকটে বিদায় লইবার সময়েও তিনি বলিয়া উঠিতেন, "Farewell! We leave thee to Heaven's peaceful care—"
আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন,

"Like a roe
I bounded over the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever Nature led."—*Tintern Abbey.*

প্রকৃতির গান আরও অনেক কবি গাহিয়াছেন, কিন্তু কয়জন কবির সঙ্গীতে এমন প্রাণের সাড়া পাই? তাই মিঃ ষ্টেড বলেন, "Wordsworth is emphatically the poet to read in the lake country, but he is a delightful companion whenever you have time to escape from the turmoil of paved streets into the diviner calm of the fields and the woods."

আমাদের এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির গানে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিয়াছেন। প্রকৃতির ছবি, এদেশে আরও অনেক কবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখিত আলেখ্যের কাছে আর সকলের ছবি ম্লান। এই প্রকৃতির গানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশেষত্ব। এবং এই বিশেষত্ব ধরিয়া বিচার করিলে, তাঁহার কবি-প্রকৃতি যেমন সহজে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এমন আর কিছুতে নয়।

(৪) প্রেম-সঙ্গীত। আগেই বলিয়াছি, এদিকে কবির সংখ্যা সামান্য

নয়। আমাদের এদেশে চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিয়াছেন। কারণ, মানব প্রকৃতি ভালবাসা ভিন্ন থাকিতে পারে না। আবার, প্রেমের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে, রমণীর কথা আসিবে-ই। কারণ, রমণী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। ম্যাথু-আর্ণল্ড বলেন, "মানব-জীবনের গূঢ়-সমস্যা যাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হয়, এবং সৌন্দর্য্যের সহিত সেই গূঢ়-সমস্যার সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক যিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই কবি।"

জগতে, সৌন্দর্য্য বলিয়া যে বৃত্তি আছে, তাহার অনুশীলন সকলেই করে। কেহ দৃশ্যমানা প্রকৃতিতে,—গাছের সবুজ মাধুরিমায়, ফুলের শোণিমায়, আকাশের নিলীমায়, তটিনীর তটতালতমালতলবাহিনী বঙ্কিমা গতিতে, মাধবীকুঞ্জে গন্ধবহের মন্দগনর্ত্তনে, তৃণবসনা সান্দ্রশ্যামা মেদিনীর বুকে আলোকছায়ার লীলায়িত আবর্ত্তনে, তরলমেঘরম্য গিরিশৃঙ্গরেখায় এবং ফুটন্ত কুসুমলোহিত উপত্যকায় সৌন্দর্য্যের সার্ব্বভৌমিক লিপি পাঠ করেন আবার কেহবা অন্তর্গামিনী দৃষ্টিতে মানবহৃদয়গুপ্ত ভাবসৌন্দর্য্য খোলা কেতাবের মত অনায়াসে পাঠ করিয়া ফেলেন। অর্থাৎ কেহ ঐন্দ্রিয়ক শক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য দেখেন এবং কেহবা মানসিক বৃত্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য দেখেন। বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতি, ইহার মধ্যে কোন্‌টী দর্শনযোগ্য, এখানে তাহার বিচার অনাবশ্যক।

সৌন্দর্য্যের আভাসে প্রকৃতি প্রোজ্জ্বলা—তাই প্রকৃতি বরণীয়া। এবং রমণী সেই সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিক তুলিকাসম্পাতে পরিপূতা,—সেই সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিমা। কবিরা সৌন্দর্য্য-পাগল। তাই, তাঁহারা রমণীকে দেখিলে, যেমন চন্দ্রের বিশ্রব্ধ জ্যোৎস্নায় ফেণাধবলিত মহাসাগরের অনন্ত তরঙ্গরাশি উছলিয়া উঠে,—তেমনি আত্মহারা হইয়া মনোতুরঙ্গের রাশ ছাড়িয়া দেন।

রমণীর মর্ম্মবেত্তা হইতে চান সকলেই,—কিন্তু রমণীর রূপ বা সৌন্দর্য্য, সকলকে সমভাবে আকর্ষণ করে না। কেহ তাঁহাকে জগদ্ধাত্রীরূপে দেখেন :—

"When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou !"

কেহ তাঁহাকে শুদ্ধান্তশোভিনী গৃহলক্ষ্মীরূপে দেখেন। এবং কেহ বা তাঁহাকে মদনোৎসবের পূজাপুষ্পপ্রতিম দেখেন।

কবিদের ভিতরে; শেষোক্ত শ্রেণীর লোক-ই অধিক। ইহাদের কবিতায় যে মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হাস্যে রঙ্গিণী, লাস্যে ভঙ্গিনী।

সেক্‌সপীয়ারের 'ভেনাস এবং আডোনিস'' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশেও, রমণীর এই মূর্ত্তির অভাব নাই। যেমন প্রাচীন সাহিত্যে। তাঁহাদের, 'কামিনী হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ।'' একমাত্র চণ্ডীদাস রমণীর মহিমময়ী মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন। আর সকলেরই কবিতায় কেবল সম্ভোগ আর সম্ভোগ, আর সম্ভোগ! পারস্য ভাষাতেও এমন কবির অভাব নাই। সুরা এবং রমণী সম্ভোগ,—ইহাই অনেক পারস্য কবির স্বপ্নকাম্য। উদাহরণ,

বনশোভা পাই যদি নদী তটোপরি—
পাশে যদি পাই মোর সুধী—সুরা নরী—
তা'হলে চাহিনা আমি বাসনা-নিরয়,
যদি থাকে,—কোথা স্বর্গ ইহা ছাড়ি মরি।
ওমর খাইয়াম।

বাস্তবিক,

"The light that lies
In woman's eyes"

তাহা চিরকালই তরলপ্রকৃতির কবিগণের মনোহরণ করিয়া আসিতেছে।

বিদ্যমান যুগে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথও রমণীকে এবং রমণীর প্রেম লইয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এবং তৎরচিত কবিতাগুলিতে তিনটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

ক। কামজ প্রেম। খ। রূপজ প্রেম। গ। পবিত্র প্রেম।

প্রথমে, রবীন্দ্রনাথের কামজ প্রেমের কথা ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই অংশের আধুনিক নাম হইয়াছে, "যৌবন-স্বপ্ন"। এগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সনেট' বিশেষ। তাহার ভাষা যেমন মধুর, তেমনি লীলাময়ী, তেমনি প্রয়োগপটুতার পরিচায়ক। এগুলির ভিতরে ধরি ধরি করিতেছি, অথচ ধরিতে পারিতেছি না, এমন ভাবের কোন কবিতা নাই। তাহা ফল্গু-প্রবাহের মত বালুগুপ্ত নয়, পরন্তু চন্দ্রালোকপ্রতিম স্বপ্রকাশ। এবং সেই জন্যই ইহার এক একটী কবিতা পাঠ করিলে পর, সুরের অনুরণনটুকু প্রাণের ভিতরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকে।

গৌরচন্দ্রিকায়, কবি মীনকেতনের জয়-গাথা গাহিয়াছেন। তাহাতে তিনি অতীত যুগের একটী সুন্দর স্বপ্নসম্ভব চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন। তাহার পর, কবি বলিতেছেন:—

"নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!

"লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা, লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।"

এই কয়েক ছত্রে, কেবল কাম-প্লুত হৃদয়ের লালসা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"লও লজ্জা, লও বস্ত্র লও আবরণ।"

এ পংক্তিতে আমরা কামজ বাসনার চরমসীমায় গিয়া উপস্থিত হই। প্রথমে আমাদের মনে হয়, ইহা রমণীর উক্তি। কিন্তু সমস্ত কবিতাটী পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, কোনও পুরুষ তাহার 'সখি'কে, তাহার প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিতেছে। কিন্তু

"লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র লও আবরণ।"

প্রভৃতি উক্তি পুরুষের মুখে একান্ত অশোভন। পুরুষ, যতই প্রেমপাগল হউক না কেন, তাহার পৌরুষ গর্ব্ব এবং পুরুষোচিত স্বাতন্ত্র্য কখনো যায় না। রমণীর বেশধারী পুরুষ এবং তাহার মুখে রমণীজনসুলভ উক্তি সখের থিয়েটারেই শোভা পায়,—কবিতায় নয়।

তাহার পর অন্য কবিতায় ;—

"কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি,
তাহার সৌন্দর্য্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহ খানি
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমলপরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া!"

অপর কবিতায় ;

"পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
সুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ।"

ভিন্ন কবিতায় ;

"কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকসিত স্তন দুটী আগুলিয়া রয়,

*   *   *

দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়

*   *   *

আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!"

ভরসা করি, এই পংক্তিগুলিকে সমর্থন করিতে না পারিলে, কাহারো অপ্রিয়-ভাজন হইতে হইবে না। এই সকল কবিতায় এমন একটী স্থান নাই, যেখানে পূতভাবের শাশ্বতবিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং কবিই এগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া দিতেছেন ;

"এসগো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।"

কবি উর্ব্বশীর মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। এ কবিতায় তিনি তাঁহার ভাষার যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে শব্দের সম্রাট বলিতে হয়। কবি

গোড়াতেই উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ।" এখানে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু তাহার পর তিনি উর্ব্বশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি", "মুক্তবেণী বিবসনে।" এবং তাহা দেখিয়া কবির চিত্ত "লুব্ধ" ও "মুগ্ধ" "মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম।" তাঁহার আর একটী কবিতায় পড়িয়াছিলাম ;

"আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে।"

"লাজহীনা পবিত্রতা" তেমন অসহ্য নয়,—কিন্তু যখন একজন বেশ্যার—একজন বারবিলাসিনীর "কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি" দেখিয়া, কবি "মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম মুগ্ধ" হন এবং তাহাকে তাঁহার গণ-সাধারণের সম্মুখে—যথায় পিতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগ্নী বিচরণ করিতেছেন, তথায় আনিয়া উপস্থিত করেন, তখন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এরূপ চিত্র বাস্তব হৌক আর অবাস্তব হৌক,—আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে চাই না। এমন কবিতা রচয়িতব্য কি না, তাহা বিবেচ্য। যখন সমালোচকের আসন লইয়াছি, তখন আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এ ছবি আঁকিয়া রবি বাবু তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং অপার আনন্দের বিষয়, যে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের হাতে কেবল "লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল" দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

কেবল স্মরলীলায় যখন চিত্ত বৈচিত্র্যকামী হইয়া উঠিল, কেবল "দরশ' আর 'পরশের মেলা'য় মন যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখনকার হৃদয়ের অবস্থা কবি অতি সুন্দরভাবে কয়েক স্থানে দেখাইয়াছেন। উদাহরণ ;

"দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়োনা পান!
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।"

আর একস্থানে কবি নিজেই দেখাইয়া দিতেছেন, যে প্রেম কামজ, তাহা ধ্রুব নয়। উদাহরণ,

"এ নহে খেলার ধন যৌবনের আশি,
বোলোনা ইহার কাণে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিওনা টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।"

ক্রমশঃ।

সাময়িক সাহিত্য।

কুমারী ঔপন্যাসিক।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

সম্প্রতি ডাক্তার এমিল্ রিচ্ (Dr. Emil Rech) কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

উপন্যাস মানবের অতীত ও বর্ত্তমান সমাজের ইতিহাস। উপন্যাসে মানব-চরিত্র চিত্রিত হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের সংখ্যা কম নহে এবং তাহাদের মধ্যে কুমারী-ঔপন্যাসিকেরই সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কুমারীদের উপন্যাস লেখার সামর্থ্য কতটুকু আছে। উপন্যাসের যাহা প্রধান অঙ্গ—মানব-জীবন, চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রভৃতির ক্ষমতা এই কুমারীদের আছে কিনা। মানবের সহিত মানবের প্রতিনিয়ত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষণে মানব-জীবন গঠিত। যে কুমারী সাধারণ্যে বিশেষভাবে মিশিতে পায় নাই—যে নরনারীর সংস্পর্শ বিরহিত, সে কল্পনায় কিরূপে মানব-চরিত্র সজীব করিয়া তুলিবে ? আমি একথা অস্বীকার করি না যে কতকগুলি কুমারী মনোমুগ্ধকর উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলির নায়িকার মধ্যে অধিকাংশই কুমারী। কুমারী-নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণে তাহাদের অক্ষমতার কোন কারণ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র কুমারীদের লইয়াই উপন্যাস নহে ; উপন্যাসে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী-চরিত্রও চিত্রিত হওয়া আবশ্যক। পাশব প্রকৃতি নর বা কামুকা নারীচরিত্র বিশ্লেষণ কি তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য ? যে কুমারী-জীবন জীবন-নাটকে একটী অতি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক মাত্র—যে জীবনের এক অংশ হইতে অন্য অংশে কখনও যায় নাই—যে দুই চারিখানি মানব-চরিত্র সম্বন্ধীয় উপন্যাস, নাটক বা অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে মাত্র—যাহার বিদ্যা পুঁথিগত—সে কি নর-নারীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রের সঠিক নিখুঁত ছবি আঁকিতে সমর্থ ? অথবা লেখিকা কুমারী না হইয়াও যদি বিবাহিতা হইয়া সাধারণ মানবের ন্যায় জীবন অতিবাহন করে—(যে দ্বন্দ্বহীন জীবন 'জীবন' নামেরই অনুপযুক্ত) কতকগুলি গ্রন্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে—সেও কি পাশব-প্রকৃতি নরনারীর হৃদয়-তন্ত্রী তাহার দুর্ব্বল করাঘাতে ধ্বনিত করিয়া সাধারণ-পাঠকের মনোমুগ্ধকর সুরের সৃষ্টি করিতে পারে ? এই সব লেখিকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে সাধারণে ভালমন্দ গ্রন্থ বিচার করিতে পারেন না। ইহারা অধিকাংশ সময়ে জটিল সমস্যাপূর্ণ ও দুরূহ গূঢ়তত্ত্ব—যথা ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা করে। বলা বাহুল্য, প্রায় সকল মীমাংসাতেই তাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এই সকল লিখিতে বা বুঝিতে হইলে সাধারণের মধ্যে মেশা—বহু গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা আবশ্যক, কিন্তু তাহার কোনটীই ইহাদের নাই। কোন এক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন 'He who has seen one monument has seen none ; he who has seen thousands of them has seen one.' মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য।

উপন্যাস লিখিতে বসিয়া কুমারীরা সাধারণতঃ অত্যন্ত বিরক্তিজনক ঘটনার সমাবেশ করে। সে যেটীকে খুব হৃদয়গ্রাহী ও অভিনব ঘটনা বলিয়া বোধ করে সেইটীই হয়ত মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। Homer যেখানে Odysseusকে শূকর-পালের মধ্যে আনয়ন

করিয়াছেন,—একজন কুমারী কবি হয়ত তাহাকে *Ithaca*র রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবে। একটী ভিক্ষুক বালক আপেল ভক্ষণ করিতেছে Murillo ইহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিতে পারেন। ইহাদের নিম্নস্তরের চিত্রকর Angels, Nymphs, Demons প্রভৃতি চিত্রিত করে; সে সাধারণ মানবের চিত্র স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করিতে অক্ষম। সেইরূপ কুমারী ঔপন্যাসিকও উক্ত নিম্নস্তরের চিত্রকরের ন্যায় দেবতা দানব প্রভৃতি চিত্রিত করে। কিন্তু মানব কেবলমাত্র দেবতা বা দানব নয়; উহাদের একত্র সমাবেশ, এই জ্ঞান তাহাদের আদৌ নাই। ইংরাজী সাহিত্যের শত শত উদাহরণ দূরে থাউক জার্ম্মানী সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে Miss Marlilttএর লেখাও উক্ত দোষে দুষ্ট। নায়িকা বালিকা, নায়ক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। নায়ক বালিকার প্রেমে উন্মত্ত, কিন্তু মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করে। এরূপ উন্মাদ প্রকৃতি মানব থাকিতে পারে, কিন্তু কোথায়? সমাজে নহে; পাগলাগারদে। প্রকৃতপক্ষে যে মানব ভালবাসিতে পারে, সে সেই এক সময়ে, তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে না। তত্রাচ Mariltt এর উপন্যাস যথেষ্ট বিক্রয় হয় এবং সাধারণে তাহার বিশেষ প্রশংসাও করে।

সময়ে সময়ে কুমারীরা অসম্ভব উত্তেজনা-পূর্ণ ঘটনাবলীর সৃজন করে। তাহাদের শূন্য হৃদয় হইতে কল্পনা-ধূলিকণা বাহির হইয়া মেঘ সৃষ্টি এবং তাহার অন্তরাল হইতে গম্ভীর গর্জ্জনে হিষ্টীরিয়া-দামিনীর সহিত অশনি নিক্ষেপ হয়। ইহাদের নায়কনায়িকার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক মাতাল হইয়া নিজে নিজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে।

আর একখানি উপন্যাসে, লেখিকা কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অধঃপতনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় তাহার মতের কোনও মূল্য নাই। যেগুলি অধর্ম্ম, যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ পাপ বলি তাহা লেখিকার চক্ষুতে তত দূষণীয় নহে। কিন্তু মানবের নাস্তিকতা স্পষ্টবাদিতা ও নিজ নিজ সরল বিশ্বাস ও জ্ঞান লেখিকার চক্ষে মহা-পাপ। আসল দোষগুলি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। মানব দেখিলেই হয় তাহাকে দেবতা না হয় দানব এই দুই রকমের একটা বর্ণন করিবে। কিন্তু এই দেবতা ও দানব কল্পনারাজ্যে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের অস্তিত্ব কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? এইরূপ অসম্ভব আদর্শ চরিত্র মানব ও তাহাদের কার্য্যাবলী শতশত বালিকা-পাঠিকার হৃদয়ে পূর্ণ। তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত। কুমারী ঔপন্যাসিকের দুর্ব্বল কল্পনায় তাহাদের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইতেছে।

পাঠিকাদের মধ্যে যাহাদের সন্তানাদি হয় নাই, তাহাদের হৃদয়ে অধিকাংশ সময়ে কুমারী-ঔপন্যাসিকের প্রভাব চির-জাগরিত থাকে। কোন যোদ্ধার অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অদ্ভুত দৃশ্য ও ঘটনাবলী সম্বন্ধীয় গল্পপাঠে স্পেনদেশীয় এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। এমন কি এই লেখিকাদের অসঙ্গত বর্ণনায় অনেকের হৃদয়ে চিরকালের জন্য একটা অভাব অনুভূত হইয়া থাকে।

যদি এই কুমারী লেখিকাদের হৃদয়ে ভাবের বন্যা এতই প্রবল, তাহা হইলে কুমারীরা উপন্যাস ছাড়িয়া পদ্য লিখে না কেন? প্রকৃত ঔপন্যাসিক পুরুষের মধ্যেও অল্প। তাহারা নিজের প্রভূত অক্ষমতা সত্বেও সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ—উপন্যাস লিখিতে ছেলেখেলা করিয়া বসেন।

এই কুমারী-ঔপন্যাসিকদিগের লেখনী কাড়িয়া লইবার জন্য একটী সভা আহুত হওয়া আবশ্যক।

কণ্ঠহার।

(ক)

নবীন চিত্রকর অসিতেন্দু একখানি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে পাঠ করিলেন:—

"৫০৲ টাকা পুরস্কার!

একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটীয়া গাড়ীতে, গত শনিবার একছড়া সোণার কণ্ঠহার হারাইয়া গিয়াছে। হারের তলায়, একটী পদক আছে। পদকের উপরে একজন পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক ফেরৎ পাঠাইলে. উপর উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।" অসিতেন্দু বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং নিকটস্থ টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর হইতে, একছড়া সোণার কণ্ঠহার বাহির করিলেন। বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে হারটী ঠিক মিলিয়া গেল। তিনি তখনি হারটী পকেটে ফেলিয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

(খ)

বিজ্ঞাপন-লিখিত ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া, অসিতেন্দু বাহির হইতে ডাকিলেন,—"বাড়ীতে কেহ আছেন?"

উপর হইতে কে বলিল,—"কাকে খুঁজিতেছেন মহাশয়?"

অসিতেন্দু বলিলেন, "আপনাদের কাহারও হার চুরি গিয়াছে কি?"

অল্পক্ষণ পরেই একটী যুবক শশব্যস্তে বাড়ীর বাহিরে আসিলেন এবং অসিতেন্দুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিই কি ডাকিতেছিলেন?"

"আজ্ঞে হাঁ। আমি আপনাদের হার, একখানা ভাড়াটে গাড়ীর ভিতর হইতে পাইয়াছি।"

"আসুন,—ভিতরে আসিয়া বসুন।" বলিয়া যুবক অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং অসিতেন্দু তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। উভয়ে বাহিরের একখানা ঘরে গিয়া বসিলেন এবং যুবক জিজ্ঞাসমাননেত্রে অসিতেন্দুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি কি হার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন?"

"আনিয়াছি। এই হার ত?" বলিয়া অসিতেন্দু হারছড়া পকেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া, টেবিলের উপরে রাখিলেন।

যুবক হারছড়া তুলিয়া লইয়া হর্ষ-দীপ্তনেত্রে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ—হাঁ—এই হার-ই বটে।"

অসিতেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! হারের উপরে ও ছবিটা কার?"

"হারটী আমার বিধবা ভগ্নীর। এই হারটী উপহার দিয়াই তাঁ'র স্বামী পরলোকে চলিয়া যান। হারের উপরে তাঁরই মূর্ত্তি। এইজন্য আমার ভগ্নী হারটী বড় মূল্যবান জ্ঞান করেন। হারটী আজ দুদিন হারাইয়া গিয়াছে। সেই হইতে আমার ভগ্নী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। আপনি একটু বসুন,—আমি হারটা আগে তাঁকে দিয়া আসি।" বলিয়া যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হঠাৎ অসিতেন্দুর দৃষ্টি উঠানের বারান্দার দিকে গেল,তিনি দেখিলেন, বারান্দায় একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে ধবল বস্ত্র। তাঁহার অঙ্গ অনাহার-ক্ষীণ। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ক্রন্দননিষণ্ণ। অসিতেন্দু অনুভবে বুঝিলেন,—ইনিই যুবকের ভগ্নী। অল্পক্ষণমধ্যেই অসিতেন্দুর পরিচিত যুবকটী, রমণীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবং রমণীর হাতে কণ্ঠহারটী দিলেন। অসিতেন্দু দেখিলেন, রমণীর বিষাদ-কাতর চক্ষুতে আনন্দের বিভা ফুটিয়া উঠিল —সমস্ত শরীরে যেন পুলকের একটা হিল্লোল খেলিয়া গেল,—তিনি তাড়াতাড়ি হারছড়া ভ্রাতার হাত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং আবেগের সহিত তাহা বুকের উপরে চাপিয়া ধরিলেন।

এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া অসিতেন্দুর চোখের পাতা অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিল.—হিন্দুবিধবার এমন মহিমময়ী মূর্ত্তি তিনি ইহার আগে আর কখনো দেখেন নাই। অনতিবিলম্বে যুবক ফিরিয়া আসিলেন, এবং বলিলেন, "আপনি আজ আমাদের যে উপকার করিলেন,—তাহার প্রতিদান নাই। তথাপি যৎকিঞ্চিৎ দিলাম,—গ্রহণ করুন।"

অসিতেন্দু আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অর্থের প্রতি লোভ থাকিলে, আমি হার ফিরাইয়া দিতাম না। ঐ টাকা, আপনি আপনা রভগ্নীর নামে কোন অনাথের উপকারে ব্যয় করিবেন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

(গ)

রাস্তায় আসিয়া, অসিতেন্দু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। তাঁহার শিল্পীর প্রাণ, আজ এতদিন ধরিয়া একটা মহান্ অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছে। তিনি এতদিন ধরিয়া চঞ্চল কল্পনার একটা ধ্রুব আদর্শের সন্ধান করিতেছিলেন। কতদিন ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বিনিদ্র রজনী পোহাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশের অরুণিমায় এবং বিহগের বৈতালিক বিরাবে তাঁহার একাগ্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু তথাপি কল্পনার সে শাশ্বত গরিমা, তাঁহার চিন্তার বাঁধনে মূর্ত্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। আজ তাঁহার চোখের সামনে আশার আলো ফুটিয়া উঠিল, আজ তাঁহার কল্পনা রক্তরাঙা শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন, "আমি রমণীর এক আদর্শ মূর্ত্তি অঙ্কন করিব। সে মূর্ত্তি প্রেমের আভাসে উদ্ভাসিতা। জগতের পূজা তাহার পায়ে পড়িবে।"

(ঘ)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অসিতেন্দু, বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার এক পুরাতন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অসিতেন্দু ইজি চেয়ারের উপরে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বলিলেন, "আরে কেও? যোগেন নাকি? এতদিন পরে কোথা থেকে হে?"

"আর কোথা থেকে!" বলিয়া হতাশভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্র একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে বসিয়া পড়িলেন।

অসিতেন্দু বলিলেন, "তোমার মুখের ভাবখানাত তেমন আরামজনক বলিয়া মনে হইতেছে না। এতদিন কোথায় ছিলে ?"

"পশ্চিমে।"

"সেত খুব ভালো। কিন্তু তোমার মুখাকৃতিটা তেমন ভাল নয় কেন হে ?"

"সে কথা আর তুমি বুঝিবে কি করিয়া ? আমার অবস্থায় পড়িলে আপনিই বুঝিতে—আমাকে আর বাক্যব্যয় করিয়া বুঝাইতে হইত না।"

"যে অবস্থায় তোমার মত মুখের আকার হয়, সে অবস্থার সুখ উপভোগ করিবার জন্ত আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই কিন্তু! যাক সে কথা—ব্যাপারখানা খুলিয়া বল।"

"আর খুলিয়া বলিব আমার মাথা আর মুণ্ড।"

"তোমার মাথা-মুণ্ডের প্রতি আমার লোভ নাই। যাহা ব্যাপার কি বল।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "আজ কয়েক বৎসর হইল, আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়, সে কথা তুমি জান। সম্প্রতি আমি পশ্চিমে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া হঠাৎ একদিন মদনের বাণে আহত হই।"

"বাণটা আসিল কোথা হইতে ?"

"সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি শোন। এলাহাবাদে আমাদের এক স্বজাতীয়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করি। তাঁহাদের সঙ্গে আগে আমার কোন জানাশুনা ছিল না। তাঁহার বাড়ীতে দিন দুই তিন থাকিবার পরে, হঠাৎ একদিন গৃহকর্ত্তার এক কন্যাকে দেখিলাম। ভারি সুন্দরী! একেবারে ডানা-কাটা পরী! তাহার উপরে অবিবাহিতা। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ!"

"অর্থাৎ তুমি গৃহকর্ত্তার নিকটে সপ্রতিভ ভাবে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলে ?"

"ঠিক বলিয়াছ, বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাটী বয়স্থা হইয়াছিল। সুতরাং গৃহকর্ত্তা, প্রস্তাবমাত্র 'সম্মতি লক্ষণ' প্রকাশ করিলেন। ফুলশয্যার রাত্রিটা বেশ কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া দেখি, প্রিয়া লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন। লেপের ভিতর হইতে তাঁহার শ্রীপদযুগল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতে আল্‌তা-মাখানো প্রকাণ্ড দুটী 'গোদ্‌'!"

"গোদ!" অসিতেন্দু চোক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন, সে হাসি আর থামে না। বহুকষ্টে হাস্যবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "অতঃপর ?"

"অতঃপর, আমার চীৎকার,—ডাকাত পড়িলে লোকে যেমন ভাবে চেঁচাইতে ত্রুটি করে না—তেমনি জোরে। ফলে, প্রথমতঃ গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ। বেচারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, আগে কাপড় দিয়া গোদ্‌ ঢাকিয়া ফেলিল, তারপর মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই ব্যাপার কি জানিবার জন্ত ছুটিয়া আসিল। আমি রাগিয়া কাঁই হইয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে জুয়াচুরি ? গোদওয়ালী মেয়েকে আমি কখনো লইব না।"

আমার শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কেন বাবাজী! তুমিত নিজেই দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়াছ।"

আমি মুখের মত কোন উত্তর না খুঁজিয়া পাইয়া ক্রোধভরে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলাম্। তারপর, ট্রেণযোগে একদম্ কলিকাতায়।

অসিতেন্দু বলিলেন, "এখন কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

"পুনর্ম্মুষিক ভব। আবার তাকেই গ্রহণ করিতে হইবে—আর কি! কিন্তু জীবনটা একেবারেই সাহারা-মরুভূমি হইয়া গেল দেখিতেছি। অদৃষ্ট!"

"তা'ত বটেই! এখন ঐ স্ত্রীটিই যাতে সেই সাহারার মাঝে ওয়েশীষ হইয়া উঠে, তার চেষ্টা দেখ!"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "হাঁহে, এবারের একজিবিসানে তুমি কি একখানা পেণ্টিং পাঠাইয়াছিলে,—কাগজে তার খুব প্রশংসা দেখিলাম্।"

অসিতেন্দু বলিলেন, 'হাঁ সেখানা আমার কাছেই আছে। এখনো তাতে ফিনিশিং টাচ্ পড়ে নাই। দেখিবে?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র সোৎসাহে কহিলেন "আরো সেই জন্যইত আমি এসেছি।"

"তবে এস" বলিয়া অসিতেন্দু গাত্রোত্থান করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানি ছোটখাটোর উপরে বেশ সাজানো গুছানো,—একজন চিত্রকরেরই উপযুক্ত। তাহার একদিকের দেওয়ালে র‍্যাফেল, টিশিয়ান, ম্যুরিলো, রেমব্রাণ্ড ও এঞ্জিলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্র এবং বাষ্ট রক্ষিত। আর তিন দিকে দেওয়াল ঢাকিয়া নানারূপ দৃশ্যের নানাবিধ ছবি। কোনখানা ল্যাণ্ডস্কেপ,—তাহাতে ক্রমাতিসূক্ষ্ম বনান্ত-রেখার শ্যামিমার সহিত আকাশের নিলীমা মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও তৃণহরিৎ দুকূলমধ্যগতা তটিনী,—তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে অরুণ কিরণ রজত দ্রববৎ জ্বলিতেছে। তীরে তীরে দুগ্ধধবলদেহ গাভিগণ রোমন্থনপরায়ণ। বহুদূরে তটতালতমালবীথিকার পাশে এক বলাকাগৌর মেঘজড়িতশৃঙ্গ পর্ব্বত। তাহার উপত্যকা পুষ্পপরাগপুঞ্জপাতে রক্তিম। কোনখানায় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ দৃশ্য এবং কোনখানায় বা এক বিভুধ্যাননিরত বক্ষবদ্ধহস্ত ধ্যানস্তিমিতনেত্র যোগী। এমনি নানাভাবের নানা চিত্র।

সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেখিলেন, ঘরের মধ্যে একটা ইসিল্। তাহার উপরে একখানা স্বদ্যবর্ণনির্লিপ্ত বৃহৎ আলেখ্য। ছবিখানার ব্যাকগ্রাউণ্ডে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে চিত্রকর্ম্মীর নিপুণ তুলিকাসম্পাতে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী অচিরোদ্ভিন্ন-যৌবনা প্রেমবিকসিতলোচনা ষোড়শী যুক্তকরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার অল্প-অরুণমধ্য নয়নে যেন এক স্বর্গীয় হর্ষ-বিষাদ যুগপৎ সপ্রকাশ। তাঁহার অঙ্গ অলঙ্কারমাত্রশূন্য—তাহাতেই যেন তাঁহার রূপ বাড়িয়াছে। তাঁহার সিক্ততনু তুষারশুভ্র বস্ত্র পরিধৃত হওয়াতে,—যেন একটা জ্বলন্ত পবিত্রতার

মত দেখাইতেছিল। সেই তরঙ্গায়িততিমিরবৎ কেশরাশি এলায়িত হইয়া তাঁহার চোখে মুখে বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। ছবিখানির তলায় লেখা "বিধরা।"

অনেকক্ষণ মুগ্ধভাবে ছবিখানা দেখিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "এমন ছবি আঁকিয়া তুমি অমর হইবে। কিন্তু বিষয়টা কি ভালো বুঝিলাম না।"

অসিতেন্দু কহিলেন, "মৃত স্বামীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে করিতে বিধবা যেন চোখের সম্মুখে স্বামীকে দেখিতে পাইয়াছেন। দর্শনজনিত আনন্দ মূর্ত্তির চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর দেখিয়াও স্বামীর কাছে যাইতে পারিতেছেন না বলিয়া বিধবার আনন্দদীপ্ত চক্ষু বিষাদস্পর্শমুক্ত নয়। ভাই! মূর্ত্তির মুখ কল্পনায় আঁকি নাই—একটী বিধবার মুখকে আদর্শ রাখিয়াই আমি Memory painting করিয়াছি।"

ছবিখানা অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন চমৎকার মুখ কার হে?"

অসিতেন্দু সেই কণ্ঠহারের কথা বিস্তারিত ভাবে বলিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র শুনিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অসিতেন্দু বলিলেন, "ভাই! সেই বিধবা দেবীর কথা মনে হইলেই, এখনো আমার সমস্ত মন সম্ভ্রম আর ভক্তিতে ভরিয়া যায়। রমণী যে ভগবানের কি অতুল সৃষ্টি তা' সেইদিনই আমি প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন "আবার এই রমণীই সময়বিশেষে পিশাচী হইয়া উঠে।"

অসিতেন্দু আবেগভরে বলিলেন, "তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও—আমার মানসীর পায়ের ধূলা লাগিলে তারা পবিত্র হইয়া যাইবে।" একটু থামিয়া তাহার পর অসিতেন্দু বলিলেন, "কিন্তু ভাই, এখন বড় এক গোলমালে পড়িয়া গিয়াছি।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসমাননেত্রে বলিলেন "কি?"

অসিতেন্দু বলিলেন, "জানত ভাই, আমার সংসারে পরিবারের ভিতরে আমি, স্ত্রী আর এক শিশু পুত্র। বাড়ীতে একটা কিছু হইলেই আমাকে ব্যস্ত হইতে হয়। বিশেষ, চিত্রকরের প্রধান শত্রু ব্যস্ততা। ঝী মাগী আজ ক'দিন হইল ছাড়িয়া গিয়াছে, বাজার হাট আমাকেই সব করিতে হইতেছে। এদিকে আর দু'চারদিনের পরিশ্রমেই আমার ছবিখানা শেষ হইয়া যায়—কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। সুবিধামত লোকও খুঁজিয়া পাইতেছি না যে রাখি। একবার তুমি চেষ্টা করিয়া দেখিও, যদি পাও।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি, আমাদের ঝী'কে বলিয়া দেখিব যদি তার সন্ধানে লোক থাকে। আজ তবে আসি।"

"এস। কিন্তু লোকের কথা ভুলিও না।"

"না—তা' আর বলিতে হইবে না।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

(৬)

পরদিন সকালে অসিতেন্দুর চিত্রশালায় ভোরের আলো আসিয়া

পড়িয়াছে। অসিতেন্দু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া,—যেমন করিয়া ভক্ত, দেবীপ্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে,—তেমনি করিয়া স্বহস্ত অঙ্কিত বিধবা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ দ্বারে করাঘাত হইল। অসিতেন্দু সচকিত হইয়া রুদ্ধদ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে ?"

"আমি—যোগেন, দোর খুলিয়া দাও।"

অসিতেন্দু দ্বারের অর্গলমোচন করিলেন। মুক্তদ্বারপথে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার লোক আনিয়াছি ভাই!"

অসিতেন্দু উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "কৈ ?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওগো ঠাকরুণ! ভিতরে এস—তোমার মনিবের কাছে কাজ বুঝিয়া লও।"

অসিতেন্দু দেখিলেন, একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোক সলজ্জভাবে ঘরের ভিতরে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

অসিতেন্দু বলিলেন, "তুমি পারিবে বাছা ?"

স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর দিল না,—কেবল, সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিল।

অসিতেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিলেন,—আদ্-ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখখানা বেশ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিবা-মাত্র অসিতেন্দুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল,—তাঁহার সর্ব্বশরীর পবনতাড়িত বেত্র-বৃক্ষের মত কাঁপিতে লাগিল—তিনি প্রেতভয়গ্রস্তের মত সবেগে পিছনে হটিয়া আসিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বিস্ময়াগ্রহাতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ? তোমার আবার হঠাৎ একি হইল ?"

অসিতেন্দু জড়িত স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! এ তুমি কাকে আনিয়াছ ?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বেগম টেগম কিছু ধরিয়া আনি নাই—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

অসিতেন্দু কহিলেন, "ইহাকে তুমি কোথায় পাইলে ?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "আমার ঝী ইহাকে আনিয়া দিয়াছে—এ স্ত্রীলোকটী তার বাড়ীতেই থাকিত।"

"সত্য ?"

"সত্য!"

"সত্য ?"—

"মিথ্যা বলিয়া লাভ ?"

অসিতেন্দু একান্ত অবসন্নের মত চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—তিনি সন্দেহাকুলনেত্রে একবার রমণীর দিকে আরবার অসিতেন্দুর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন।

অসিতেন্দুর দিকে চাহিলেই বুঝা যাইতেছিল, তিনি হৃদয়ের ভিতরে তখন যেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া

অসিতেন্দু বলিলেন, "যোগেন! তুমি আমার ছবিতে আঁকা রমণীর মুখের সঙ্গে এই স্ত্রীলোকটীর মুখটা একবার মিলাইয়া দেখ।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈষৎ অবনত হইয়া স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিলেন—সেও তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মুখ ভয়ে যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাহার পর ছবির দিকে চাহিলেন এবং তদ্দণ্ডে বজ্র স্পর্শিতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

অসিতেন্দু বলিলেন "কি দেখিছে?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য! দুজনের মুখ এক!"

"হাঁ এক। যোগেন! আমি আকাশে বাগান রচনা করিতেছিলাম। আমার মানসী আর নাই! সে আর দেবী নাই বন্ধু! সে এখন পতিতা—কলঙ্কিনী—দানবী"! অসিতেন্দু টেবিলের উপরে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষ যেন বিপুল যন্ত্রণায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "যখন আদর্শ কলঙ্কিত,—তখন এ ছবিতে আর কাজ কি!" অসিতেন্দু ক্ষিপ্তের মত ছবির উপরে গিয়া পড়িলেন এবং পলকের ভিতরে টেবিলের উপর হইতে একখানা ধারালো ছুরি তুলিয়া লইয়া সেই অতি যত্নে-আঁকা আলেখ্য একেবারে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর চকিতের মধ্যে সেই নবাগতা রমণীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যাও!"

রমণী কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের দিকে গেল তাহার মুখ তখন বরফের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। চলিতে তাহার পা বাঁধিয়া যাইতেছিল—তাহার দেহ টলিয়া টলিয়া পড়িতেছিল—এবং তাহার দিকে চাহিবামাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বুঝিলেন, রমণীর হৃদয়েও ঝড় উঠিয়াছে—সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে!

(চ)

একদিন পরে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, "আজ প্রভাতে গঙ্গাতীরে একটী অজ্ঞাত-পরিচয় স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ, এই ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যক্তির যোগ নাই—এই মৃত্যু ইচ্ছাকৃত।

স্ত্রীলোকটীর পরিধানে থান কাপড়। তাহার হাতদুটি বুকের উপরে স্থাপিত ছিল। সন্ধান করাতে তাহার উভয় হস্তের যুক্তমুষ্টিতে একছড়া কণ্ঠহার পাওয়া গিয়াছে। সে হারছড়া সহজে খুলিয়া লওয়া যায় নাই—দুইহাত দিয়া সে এমনি জোরে তাহা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুরাণ সমূহের সংখ্যা অষ্টাদশ। এ বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কথিত আছে এই অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত উপপুরাণ নামক আর অষ্টাদশ পুরাণ আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নামমাত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেরই কোন নিদর্শন নাই। প্রকারভেদে অষ্টাদশ পুরাণের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। কতকগুলির মূল প্রকৃতির প্রতিপাদনই এই বিশেষত্বের কারণ। কারণ সেই পুরাণগুলিতে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে। ইহাতে এই উপলব্ধি হইল যে, যে পুরাণে পুরাণ সমূহের তালিকা আছে, তাহা সম্পূর্ণ না হইলে তালিকা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং তালিকার জন্য একখানি মাত্র পুরাণে অর্থাৎ শেষখানিতে আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত পুরাণ সম্পূর্ণ হইলে একখানি ব্যতীত অন্য সকলগুলিতে তাহাদের নাম অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্‌খানি যে সর্ব্বশেষে লিখিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সকলগুলিতে প্রকারভেদ না হইলেও অনেকগুলিতে তাহা প্রক্ষিপ্ত ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

যে সকল পুরাণের প্রকারভেদ করা হইয়াছে, তাহারা প্রায় সমান। সেই অনুসারে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম	ব্রহ্মপুরাণ।	দশম	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
দ্বিতীয়	পদ্মপুরাণ।	একাদশ	লিঙ্গপুরাণ।
তৃতীয়	বিষ্ণুপুরাণ।	দ্বাদশ	বরাহপুরাণ।
চতুর্থ	শিবপুরাণ।	ত্রয়োদশ	স্কন্দপুরাণ।
পঞ্চম	ভাগবৎপুরাণ।	চতুর্দ্দশ	বামনপুরাণ।
ষষ্ঠ	নারদপুরাণ।	পঞ্চদশ	কূর্ম্মপুরাণ।
সপ্তম	মার্কণ্ডপুরাণ।	ষোড়শ	মৎস্যপুরাণ।
অষ্টম	অগ্নিপুরাণ।	সপ্তদশ	গরুড়পুরাণ।
নবম	ভবিষ্যপুরাণ।	অষ্টাদশ	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

উপরিউক্ত তালিকা ভাগবতপুরাণের দ্বাদশস্কন্ধে আছে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়েও ঠিক এইরূপ আছে। কিন্তু অন্যান্য পুরাণে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণের তালিকায় অগ্নিপুরাণের পরিবর্ত্তে বায়ুপুরাণ আছে *। অগ্নিপুরাণের তালিকায় শিবপুরাণের পরিবর্ত্তে বায়ুপুরাণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বরাহপুরাণের তালিকায় গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নাই। তাহাদের পরিবর্ত্তে বায়ু ও নৃসিংহপুরাণ আছে। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের ন্যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের তালিকায় বায়ুপুরাণের উল্লেখ নাই এবং অগ্নিপুরাণের ন্যায় মৎস্যপুরাণের তালিকায় শিবপুরাণ উল্লিখিত হয় নাই। কোন্ কোন্ পুরাণে কতগুলি শ্লোক আছে, তাহাদের সংখ্যা, অগ্নি, মৎস্য, ভাগবত এবং পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। সেই সকল শ্লোকের সংখ্যা এই চারিখানি পুরাণের দুই বা এক স্থান ব্যতীত প্রায় সমান। সেই শ্লোকের মোট সংখ্যা ৪০০০০০ অর্থাৎ ১৬০০০০০ পংক্তি। কথিত আছে ইহা সংক্ষিপ্ত সংখ্যা। প্রকৃত পক্ষে ইহার সংখ্যা একশত কোটী †। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এখনও পুরাণের যে সকল অংশ বিদ্যমান আছে, তাহা সংগ্রহ করিলে শ্লোকের সংখ্যা ৪০০০০০ এর অধিক হয় বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাদের সংখ্যা শতকোটী হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চারিলক্ষ শ্লোক সমগ্র তন্ন তন্ন রূপে ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে বহুকালের আবশ্যক। বহুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলেও পুরাণোল্লিখিত দেবদেবী সম্বন্ধে সুসংস্কৃত ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পাঠান্তর আছে এবং অনেক অংশ ভ্রম ও অসম্পূর্ণ অবস্থাবিশিষ্ট।

পুরাণের সংখ্যাগণনার বিষয় স্থূলরূপে অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উহা সারাংশ নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে কোন কোন স্থলে ঐ

---

* কূর্ম্মপুরাণে লিখিত পুরাণের তালিকায় ১৮ খানি পুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা হইতে অগ্নিপুরাণ পরিত্যাগ করিলে পুরাণের সংখ্যা ১৭ খানি হয়।

† মৎস্যপুরাণ ৫২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ।
পুরাণমেকমেবাসীত্তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গ সাধনং পুণ্যং শতকোটী প্রবিস্তরং।

সংখ্যার সহিত শ্লোকের সংখ্যার যোগ আছে। এই শ্লোক-সংখ্যার সহিত মৎস্যপুরাণে দুই একটী ঘটনা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহা অসার নহে। কারণ তদ্দ্বারা মৎস্য পুরাণে লিখিত আভাষের সহিত বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণগুলি মিলাইবার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় কিম্বা তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ও অতীত কালের পুরাণের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সেইজন্য আমি প্রত্যেক পুরাণের বর্ণনা যাহা মৎস্যপুরাণে আছে তাহা তাহাদের বিবরণের সহিত সংযোজিত করিলাম এবং তাহার প্রামাণ্যের জন্য মৎস্যপুরাণ হইতে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ। যাহা পূর্ব্বাবয়বে ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে মরীচিকে বিবৃত করেন, তাহাকেই ব্রহ্মপুরাণ কহে। ইহাতে দশ সহস্র শ্লোক আছে। * পুরাণের সকল তালিকায় এই পুরাণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; তজ্জন্য ইহাকে আদি বা প্রথম পুরাণ কহে। ইহার অপর নাম সৌর পুরাণ। কারণ ইহার অনেক স্থলে সূর্য্যের আরাধনা দৃষ্ট হয়। সৌরপুরাণ নামধেয় একখানি উপপুরাণ আছে। তাহার সহিত ব্রহ্মপুরাণের কোন সংস্রব নাই। সচরাচর এইরূপ কথিত হয় যে, ব্রহ্মপুরাণে ১০০০০ শ্লোক আছে; কিন্তু বাস্তবিক ইহার শ্লোক সংখ্যা সপ্তসহস্রের কম নয় এবং অষ্টসহস্রের অধিক নয়। ইহার একটী পরিশিষ্ট আছে। তাহা ব্রহ্মোত্তর পুরাণ নামে আখ্যাত। ইহা স্কন্দপুরাণে লিখিত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথক। তাহাতে ইহা অপেক্ষা আরও তিন সহস্র শ্লোক অধিক আছে। তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে ইহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

ব্রহ্মপুরাণের বক্তা লোমহর্ষণ। তিনি নৈমিষারণ্য তীর্থে সমবেত ঋষিগণের নিকট ইহা বর্ণনা করেন। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষপ্রজাপতির নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, লোমহর্ষণ তাহাই ঋষিগণের নিকট বিবৃত করেন। সেইজন্য এই পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ আখ্যায় আখ্যাত। এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। মৎস্যপুরাণে দক্ষ প্রজাপতির পরিবর্ত্তে মরীচির নাম দৃষ্ট হয়।

এই পুরাণের প্রথম কতিপয় অধ্যায়ে সৃষ্টি বর্ণনা, মনুদিগের অধিকার, কৃষ্ণের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল ব্যাপার অন্যান্য কতিপয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

* ব্রহ্মণাভিহিত পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে।
ব্রাহ্মংতু দশসাহস্রং পুরাণং পরিকীর্ত্তিতং॥

উপরিউক্ত কতিপয় অধ্যায়ের পর জগতের বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৎপরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের জগন্নাথ ও শিবের মন্দিরাদির বর্ণনায় কয়েক অধ্যায় পরিপূর্ণ। এই পুরাণের এই সকল অধ্যায়ের এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, যে জগন্নাথরূপী কৃষ্ণের আরাধনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল বর্ণনার সহিত কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে এবং সেই বর্ণনাসমূহ বিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের আখ্যায়িকার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। এই সংকলনের পর যোগ অভ্যাস ও তাহা সাধন করিয়া কি প্রকারে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু এ পুরাণে একটী লক্ষণও দৃষ্ট হয় না। আর যখন উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, এই পুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কখনই সংগৃহীত হয় নাই।

ব্রহ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন মাহাত্ম্যপূর্ণ। পুণ্যতোয়া বল্‌গা নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই ইহার উদ্দেশ্য। উত্তরখণ্ড কোন্ সময়ে লিখিত তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে ইহা যে আধুনিক তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ। যে সময়ে পৃথিবী সুবর্ণময় পদ্মের ন্যায় আকারবিশিষ্টা ছিল, সেই সময়ের ঘটনা সকল যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে পণ্ডিতবর্গ তাহাকেই পদ্মপুরাণ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাতে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোক আছে *। পুরাণের তালিকায় ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে ইহার শ্লোক সংখ্যা পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র। ইহা সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হয়, কারণ অন্যান্য পুরাণ ইহা সমর্থন করে। এই পুরাণ খানি খণ্ড নামে পাঁচটী অংশে বিভক্ত; যথা প্রথম সৃষ্টি খণ্ড; অর্থাৎ সৃষ্টির বিবরণ; দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড অর্থাৎ পৃথিবীর বর্ণনা; তৃতীয় স্বর্গ খণ্ড অর্থাৎ স্বর্গের বিবরণ; চতুর্থ পাতাল খণ্ড অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশের বিবরণ এবং পঞ্চম উত্তর খণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট। ইহার আর একটী অংশ আছে তাহাকে ষষ্ঠ অংশ বলা যাইতে পারে। তাঁহা ক্রিয়া যোগসার নামে অভিহিত অর্থাৎ জীবাত্মা কি প্রকারে পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, ইহাতে তাহারই প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

---

* এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ধৈরন্ময়ং জগৎ।
তদ্‌বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎপদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
পাদ্মং তৎ পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্রাণীহকথ্যতে।

পদ্মপুরাণের এই সকল বিভাগের সংজ্ঞা দ্বারা তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয় সন্নিবেশিত আছে, তাহার কেবল অসম্পূর্ণ ও আংশিক মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। প্রথম বিভাগে অর্থাৎ যাহাতে সৃষ্টির বিবরণ আছে, তাহাতে লোমহর্ষণের পুত্র সূত উগ্রশ্রবা বক্তা। উগ্রশ্রবাকে তাহার পিতা নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের নিকট পদ্মপুরাণ বর্ণনা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টির সময়ে যে পদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ এই পুরাণে লিখিত আছে। ব্রহ্মা প্রথমে পুলস্ত্যের নিকট যাহা বর্ণনা করেন এবং পুলস্ত্য যাহা ভীষ্মের নিকট বিবৃত করেন, তাহাই সূত উগ্রশ্রবা কর্ত্তৃক অবিকল বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডের প্রথম কতিপয় অধ্যায়ে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির বর্ণনা এবং প্রজাপতিগণের বংশাবলী কীর্ত্তন। সে সকল-গুলি বিষ্ণুপুরাণে লিখিত সেইরূপ বিষয়ের ঠিক অনুরূপ, এমন কি বিষ্ণুপুরাণের ভাষা পর্য্যন্ত অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। তৎপরে মনুগণের অধিকার ও রাজবংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলি পৌরাণিক বিষয়। কিন্তু এ সকল বিষয়ের পর অভিনব ভিত্তিহীন ও অপ্রকৃত বিষয় সকল উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন আজমীর প্রদেশস্থিত পুষ্কর নামক হ্রদকে তীর্থস্থান বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভূমিখণ্ড অর্থাৎ পৃথিবীর বিবরণ। পৃথিবীর বিবরণ এই বিভাগের শেষাংশেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে ১২৭ অধ্যায় আছে। সেই সকল অধ্যায়ে পুরাতন আখ্যায়িকা আছে এবং কতকগুলি অন্যান্য পুরাণে যেরূপ আখ্যায়িকা আছে তৎসদৃশ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। সেই আখ্যায়িকাগুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত। কিন্তু সেই সকল অধ্যায়ের অধিকাংশস্থলে তীর্থের বিবরণ আছে। সেই সকল বিবরণ স্থানে স্থানে রূপক অলঙ্কারে গ্রথিত। তাহাতে স্ত্রী, মাতা, পিতা বা গুরু সম্মানার্হ বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তীর্থস্থানের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

স্বর্গ খণ্ড অর্থাৎ স্বর্গের বিবরণ। ইহার কতিপয় অধ্যায়ে পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যলোক, ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতির সংস্থানের বর্ণনা আছে এবং সকল লোকের উপর বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ বিষ্ণুলোকের সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে কতকগুলি প্রখ্যাত নৃপতির বৃত্তান্ত আছে এবং তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিয়মাবলী লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ নানাবিধ বর্ণনাবিশিষ্ট গল্পে পরিপূর্ণ, কিন্তু সে গল্পসমূহ

কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে সুগ্রথিত নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি মাত্র পুরাতন; যেমন দক্ষযজ্ঞ। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আধুনিক এবং পূর্ব্ব-কালের লিখিত নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

সহধর্ম্মিণী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গিনী কথা কহিবার চেষ্টা পাইয়াও কোন কথা কহিতে পারিল না; তাহার হৃদয় এতই কম্পিত হইতেছিল যে, তাহার বোধ হইল, যেন তাহার বুক ফাটিয়া যায়। রমেন্দ্রনাথ কি বলিতে চাহেন—তাহার সহিত কি পরামর্শ? আর—আর এই সময়ে যদি স্বামী আসিয়া পড়েন?

সে কোন কথা কহিল না দেখিয়া রমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি তো প্রফুল্ল বাবুর মেয়েকে দেখিয়াছেন?"

"হাঁ, দেখিয়াছি—বেশ মেয়ে।"

"বেশ ভাল মেয়ে?"

"হাঁ, খুব ঠাণ্ডা, বেশ দেখিতে, লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে। কেন তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"তাহার বিবাহের জন্য।"

"কেন আপনি কি তাহার সম্বন্ধ করিতেছেন?"

"সম্বন্ধ করিতেছি ঠিক নহে—নিজেই তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিতেছি।"

হেমাঙ্গিনী বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণপরে বলিল, "সুশীলা বেশ ভাল মেয়ে।"

রমেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে কহিল, "তবে তাহাকে বিবাহ করা যায়। প্রফুল্ল বাবু এ প্রস্তাব করিয়াছেন।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "আমি শুনিয়া যথার্থই খুব খুসী হইলাম।"

এ কথা হেমাঙ্গিনী মিথ্যা বলে নাই—রমেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া সুখী হইলে, হেমাঙ্গিনী প্রকৃতই অতিশয় সুখী হয়।

এই সময়ে জানালায় অন্ধকারে কাহার মুখ বাহির হইল। সে মুখের ভাব ভয়াবহ—তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে—মাথার চুলগুলাও অত্যন্ত অপরিষ্কার—ওষ্ঠাধর অত্যন্ত বক্র হইয়া ভীষণ হইয়াছে। এ কে—একি মানুষের মুখ না কোন প্রেত?

হেমাঙ্গিনী বা রমেন্দ্রনাথ এ বিভীষিকা দেখিতে পাইলেন না, তবে এই মূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে তখন যে এক অর্দ্ধস্ফুট শব্দ নির্গত হইল, তাহারা উভয়ে তাহা শুনিয়া চমকিত হইয়া জানালার দিকে চাহিলেন। কেহ কিছু তথায় দেখিতে পাইলেন না।

হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসিল, "এ কিসের শব্দ?"

রমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে কুয়াসা আর অন্ধকার—কেহ বোধ হয় পথে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। চলুন, খোকাকে একবার দেখিয়া যাই।"

উভয়ে খোকাকে গিয়া দেখিলেন।

রমেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও কুয়াসা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আশা করি বিপদ আপদ ঘটিবে না,—বাড়ী পৌঁছিতে পারিব।"

রমেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তখনও সতীশচন্দ্র ফিরিলেন না। এই ঘোরতর অন্ধকারে পথে তাহার কোন বিপদ আপদ ঘটিল না তো? যতই সতীশচন্দ্রের ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল, ততই হেমাঙ্গিনী উৎকণ্ঠিত ও আরও অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিল, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, চাকরদিগকে লণ্ঠন লইয়া বাবুর সন্ধানে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিল। কিন্তু এই সময়ে দ্রুতপদে বাটীর পশ্চাৎ দিক্‌কার দরজা দিয়া সতীশচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া অন্ধকারে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহার এই কার্য্যে হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইল; তিনি তো কখনও এরূপ করেন না? সমস্ত দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া একেবারে ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন কেন? হয় ত আবার তাঁহার মনে সেই ভাব আসিয়াছে! সৌভাগ্যের বিষয় তিনি রমেন্দ্রকে এখানে দেখেন নাই। নতুবা হয় ত একটা অনর্থ ঘটিত।

হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে একটা নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিল, সে হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়া অন্য গৃহে বসিল। তাহার মুখখানি কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় একান্ত ম্লান ও বিষণ্ণ হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। হেমাঙ্গিনী দেখিল, তিনি কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিয়াছেন। ঘর হইতে বাহির হইয়াও তিনি কোন কথা কহিলেন না। রাত্রি হইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী আহারের কথা কহিল, তাহাতেও তিনি কথা কহিলেন না। তাঁহার ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর ভয় হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?"

এবার জড়িতকণ্ঠে সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "অন্ধকারে পথ ভুলিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম।"

"খাইবে না ?"

"না—খাইয়াছি।"

"কোথায়—কোথায় খাইলে ?"

"প্রফুল্ল বাবুর বাড়ীতে।"

এই সময়ে সতীশচন্দ্র বাড়ীতে ফিরিয়াছেন শুনিয়া পিসীমা ছুটিয়া আসিলেন। বাধ্য হইয়া সতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত নানা বাজে কথা কহিতে লাগিলেন ; আবার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া খোকা তথায় ছুটিয়া আসিল—এই সময়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

পিসীমা বলিলেন, "এ জায়গা খুব ভাল, অন্য জায়গায় খোকার এত বড় ব্যারামটা হলে না জানি কত রোগা হয়ে যেতো।"

খোকা বলিয়া উঠিল, "আমি রোগা হব কেন ? ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, আমি যে ভাল ছেলের মত তার ওষুধ খেয়েছি, একবারও কাঁদিনি।"

সতীশচন্দ্র ক্ষিপ্রবেগে মস্তক তুলিলেন, বলিলেন, "কখন ডাক্তার বাবু এ কথা বল্‌লেন ?"

খোকা বলিল, "এই যে আজ সন্ধ্যার সময়। মা তাঁকে সঙ্গে করে আমায় দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন।"

ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সতীশচন্দ্র নিজ স্ত্রীর দিকে ফিরিলেন—তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা যেন হেমাঙ্গিনীকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ রমেন্দ্র আবার আসিয়াছিল ?"

হেমাঙ্গিনীর সহস্র চেষ্টারও স্বর সংযত করিতে পারিল না, তাহার স্বর কম্পিত হইল ; সে বলিল, "হাঁ—আজ সন্ধ্যার পর আসিয়াছিল।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র আরাম কেদারায় গিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিলেন না, ক্ষণপরে হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে, সে আর আসিবে না।"

হেমাঙ্গিনী ব্যথিত হৃদয়ে বলিল, "তিনি তাহাই বলিয়াছিলেন, তিনি আসিলে আমিও সে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'এই পথে যাইতে-ছিলাম, তাই খোকার খবর লইয়া যাইব ভাবিলাম,'—তাহার পর একটা খবর দেওয়াও ছিল, শুনিবে কি?"

এই সময়ে সতীশচন্দ্রের খানসামা সেই গৃহমধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। সতীশচন্দ্র বিরক্তভাবে বলিলেন, "বেটা, কাঁপিতেছিস কেন? কোথা যাওয়া হয়েছিল, দূর করে দেব জাননা?"

ভৃত্য ব্যাকুল হইয়া বলিল, "বাবু—বাবু—ভয়ানক—ভয়ানক——"

সতীশচন্দ্র উঠিয়া বসিয়া ধম্‌কাইয়া বলিলেন, "বেটা পাজী, ভয়ানক কি?"

"খুন—হুজুর—খুন।"

পিসীমা, হেমাঙ্গিনী এই কথায় ভীত হইয়া উঠিলেন। দাসদাসীরাও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সতীশচন্দ্র বড় বিচলিত হইলেন না—তিনি আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়া গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় খুন হয়েছে?"

"হুজুর—রেলের মাঠে।"

"কি রকম?"

"এক জন মাড়োয়ারি দোকানদার অনেক টাকা নিয়ে গরুর গাড়ী করে আস্‌ছিল—কে তাকে খুন করে সব টাকা কড়ী নিয়ে পালিয়েছে। সমস্ত মধুপুরে হৈ চৈ পড়ে গেছে।"

"দূর হ বেটা—গাঁজাখোর কোথাকার!"

খানসামা প্রভুর ধমক খাইয়া পালাইল। সতীশচন্দ্র অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদিত করিয়া বলিলেন, "লোকে একটা বিষয় কি রকম দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়াইয়া ফেলে দেখ। এই খুনের ব্যাপারে মাড়োয়ারী নেই—গরুর গাড়ী নেই—টাকা চুরি নেই—অথচ ইহার মধ্যে লোকে এই সব রটাইয়া তুলিয়াছে।"

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে তুমি এ কথা আগেই শুনেছিলে?"

"হাঁ, বাড়ীতে ফিরিবার আগেই শুনিয়াছিলাম।"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "কই, তুমি তো এতক্ষণ কিছু বল নাই ?"

সতীশ কহিল, "খুনের কথা আর কি বলিব !"

হেমাঙ্গিনী সভয়ে জিজ্ঞাসিল, "কে খুন হইয়াছে, শুনিয়াছ কি ?"

"হাঁ, শুনিয়াছি।"

"আমাদের চেনা কেউ ?"

"হাঁ, ডাক্তার রমেন্দ্র। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে দরজার পাশেই কে তাঁহাকে খুন করিয়া গিয়াছে।"

এই ভয়াবহ সংবাদে হেমাঙ্গিনীর মনের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত—তাহার মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হইয়া আসিল—কি ভয়ানক—এই সন্ধ্যার সময়ে রমেন্দ্র তাহার নিকটে বসিয়াছিলেন, এই একটু আগে তিনি তাঁহার বিবাহের কথা বলিতেছিলেন, আর সেই রমেন্দ্র আর নাই—এ জগতে নাই—খুন হইয়াছেন !

এক পলকে হেমাঙ্গিনীর মস্তিষ্কের মধ্যে শত চিন্তা, শত বিভীষিকা, ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তাহার স্থির চিন্তা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, "এই ডাক্তার কে ?"

হেমাঙ্গিনীর কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "এখানকার ডাক্তার, খোকাকে তিনিই দেখিয়াছিলেন। আমি জানিতাম, তিনি আর আমার বাড়ীতে আসেন না ; বোধ হয়, এখান থেকে বাড়ীতে ফিরিবার সময়ে কেহ তাঁহাকে খুন করিয়াছে—বেশ লোক ছিলেন।"

পিসীমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এমন লোককে এমন করে কে খুন কর্‌লে !"

সংক্ষেপে সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "কেমন করে বলিব, পিসীমা ?"

পিসীমা জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি কার কাছে শুন্‌লে ?"

সতীশচন্দ্র কহিল, "এ সব খবর শীঘ্র চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। যখন বাড়ীতে আসিতেছিলাম, সেই সময় দেখি পথে দুটো লোক ভারি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কি বলাবলি করিতে করিতে ছুটিতেছিল, তাই তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারাই ডাক্তারের কথা বলিল।"

পিসীমা কহিলেন, "কিন্তু আমাদের খানসামা শুনেছে যে, একজন মাড়োয়ারী খুন হয়েছে,—হয় ত ডাক্তারের কথা মিথ্যা।"

সতীশচন্দ্র সংক্ষেপে "তাই হবে," বলিয়া সেই আরাম কেদারায়ই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পিসীমার সঙ্গে কেহ যে আসিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন।

ক্রমে দাসদাসীগণ সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। সতীশচন্দ্র চেয়ারেই ঘুমাইতেছেন দেখিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়া শয়ন করিতে যাইতে পারিল না—সেই ঘরে বসিয়া পিস্তামার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় কে সবলে সম্মুখ দরজায় ঘা দিল। উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন—এত রাত্রে কে? বিশেষতঃ তাহারা আজ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়াছিলেন, সামান্য কারণেই অতিশয় ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সুধাংশু পিসীমাকে সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে রাখিয়া তখনই কাকার সহিত দেখা করিবার জন্য গিরিধী চলিয়া গিয়াছিল; কাকার নিকটে তাহার দুই-একদিন থাকিবার কথা—সে ফিরিবে না, তবে এ রাত্রে দরজায় এত জোরে ধাক্কা মারিতেছে কে! শব্দে সতীশচন্দ্র নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বহির্দ্বারে বারংবার আঘাতের ভয়ানক শব্দ উত্থিত হওয়ায় এমন কি ভৃত্যদিগেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তখন একজন গিয়া দরজা খুলিয়া দিল; তৎক্ষণাৎ সুধাংশু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার জননী বলিয়া উঠিলেন, "তুই! এর মধ্যে ফিরিলি যে?"

সুধাংশু বলিল, "কাকা বাবু গিরিধীতে নাই, মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন, সাত-আট দিন ফিরিবেন না, তাই আমি পরের গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলাম—সেখানে কাহার কাছে থাকিব?"

সতীশচন্দ্র এখন বুঝিলেন যে, পিসীমা একা আসেন নাই—আসাও অসম্ভব, নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে সুধাংশু আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার মন অন্য বিষয়ে এতই অভিভূত ছিল যে, তিনি এ সকল কথা ভাবিবার বিন্দুমাত্র সময় পান নাই। এক্ষণে কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "তুই এই অন্ধকারে কেমন করে পথ দেখিয়া আসিলি?"

সুধাংশু বলিল, "গিরিধী হইতে যখন বাহির হই, তখন এখানে যে এমন কুয়াসা অন্ধকার হইবে, তাহা কেমন করিয়া জানিব? তবে এখানে ষ্টেশনে নেমে বড় কষ্ট পাইতে হয়নি।"

সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "কেন, কি হইয়াছিল ?"

"অনেক লোক লণ্ঠন হাতে পথে ছুটাছুটি কর্‌ছে, তাহাদের লণ্ঠনের আলোয় আমার বেশ সুবিধা হয়ে গেল।"

পিসীমা বলিলেন, "তুই এত রাত্রে দরজা এমন করে ঠেল্‌ছিলি যে, আমরা ভয়ে মরি!"

"কেন, এত ভয় কিসের ?"

"খুন!"

"কোথায় ?"

"এই মধুপুরের কোথায়।"

"ওঃ—তাই বুঝি লোকগুল লণ্ঠন নিয়ে চারিদিকে ছুটিতেছিল! বটে—তা ভাবি নি। সতীশ দাদা, কে খুন হয়েছে ?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "একজন ডাক্তার!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধাংশু বলিল, "কি ভয়ানক!"

পিসীমা বলিলেন, "তিনি খোকাকে দেখ্‌ছিলেন,—আজ সন্ধ্যার সময়ও এখানে এসেছিলেন।"

সুধাংশু। তিনিই খুন হয়েছেন ?

পিসী। হাঁ, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি এখানে এসেছিলেন। হেম, রমেন্দ্র বাবু এখান থেকে কটার সময় গিয়েছিলেন ?

সু। রমেন্দ্র বাবু—ডাক্তার রমেন্দ্র বাবু—আমাদের রমেন্দ্র বাবু নয় তো ?

সুধাংশু হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিল। পিসীমা বলিলেন, "আমাদের রমেন্দ্র বাবু, সে কি!"

সু। বউ দিদি তা জানে। কলিকাতায় বউ দিদির সঙ্গে তার আলাপ ছিল—আমাকে তিনি ভারি যত্ন করিতেন—তিনিই কি ?

সতীশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, সেই রমেন্দ্র বাবু!"

সু। সেই রমেন্দ্র বাবু! যিনি কলিকাতায় আমায় এত যত্ন করিতেন! কি ভয়ানক!

স। হাঁ, তিনিই। তিনি এখানে ডাক্তারি করিতেন।

সুধাংশুর মুখ নিতান্ত বিষণ্ণ হইল, সে যথার্থই এক সময়ে রমেন্দ্রনাথকে বড়ই ভাল বাসিত। সে বলিল, "বউ দিদি, রমেন্দ্র বাবু এখানে আছেন, তুমি আমাকে লেখ নাই কেন ? তাহা হইলে তিনি খুন হইবার আগেই আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিতাম।"

পিসীমা বলিলেন, "তিনি খুন হবেন, তা কে আগে জান্‌তো!"

সু। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, আমায় ভারি যত্ন করিতেন।

পি। খুব ভাল লোক ছিলেন?

সু। বউ দিদিকে জিজ্ঞাসা কর। দাদার সঙ্গে বউ দিদির বে হলো, না হলে রমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে হতো; আমি তখন ছেলে মানুষ ছিলাম—কিন্তু সব বুঝিতাম, বউ দিদি, রাগ কর না।

পিসীমা পুত্রের মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে পূর্ব্বকথা উদিত হইল। তিনি রমেন্দ্র ও হেমাঙ্গিনীর ভালবাসার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রমেন্দ্র হেমাঙ্গিনীকে ভালবাসিতেন। আর হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে ভালবাসিত; কেবল রমেন্দ্র গরীব বলিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে বিবাহ করে নাই। তবে সেই রমেন্দ্র আর এখনকার এই রমেন্দ্র দুই এক লোক! পিসীমার মনে যে কথা উদিত হইল, তাহা তিনি ভাবিতেও ভীতা হইলেন। অনেক রাত্রি হইয়াছিল, তাঁহারা সে দিনের মত সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুধাংশু শয়ন মাত্রেই নিদ্রিত হইল; কিন্তু পিসীমা তখনও ঘুমাইলেন না; পুরান ঝি বসিয়া পান সাজিতেছিল, সে পিসীমাকে দেখিয়া বলিল, "এই কথা শুনে ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে—ঘুমুতে পাচ্ছি না।"

পিসীমা বলিলেন, "অন্য কেউ হলে এত ভয় হতো না—তিনি এখান থেকে চলে যাবার পরেই এই কাণ্ডটা হয়েছে কিনা!"

"কে চলে যাবার পর?"

"ডাক্তার বাবু।"

"ডাক্তার বাবু! সে কি?"

"হাঁ—তাইতো—তুমি তা শোননি, তুমি খানসামার কাছে কেবল মাড়োয়ারীর কথাই শুনেছিলে; তা নয়, ডাক্তার রমেন্দ্রনাথ খুন হয়েছেন।"

"ডাক্তার বাবু—সে কি! কে বলিল?"

"সতীশ বলিল। সে বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে কাহার কাছে এ কথা শুনে এসেছিল।"

"বাবু, কার কাছে এ কথা শুন্‌লেন? খানসামা ঠিক শুনে এসেছে—

একজন মাড়োয়ারী খুন হয়েছে—মিছামিছি লোকে মাড়োয়ারীর কথা বলিবে কেন?"

"খানসামা ভুল শুনিয়াছিল—তোমাদের বাবু ঠিক শুনিয়াছে।"

"না—তিনিই ভুল শুনেছেন। যে মাড়োয়ারীটাকে মরে প'ড়ে থাক্‌তে দেখেছিল, খানসামা তার নিজের মুখ থেকে একথা শুনে এসেছে। সে তোমাদের কাছে সাহস করে সব কথা বল্‌তে পারেনি, আমাদের কাছে সব বলেছে। ডাক্তার বাবু মারা যাবেন কেন? আহা তিনি দেবতা লোক!"

"সুধাংশুও তাই বল্‌ছিল?"

"হাঁ, সকলেই রমেন্দ্র বাবুকে ভালবাসিত—কেবল—" (নীরব)।

"কেবল—কেবল কে?"

"কেবল আমাদের বাবু তাকে দেখ্‌তে পারতেন না—দিদির জন্যেই তাঁদের আগে ভারি ঝগড়া ছিল, আমি হেমের পুরান ঝি—আমি সবই জানি। তারপর এতদিন আর কিছু দেখিনি, কিন্তু এখানে এসে বাবুর মেজাজ যেন খারাপ হয়ে গেছে—তাই মনে কচ্চি বাবু সেই পুরান কথা ভেবে এই রকম হয়েছেন।"

"হেম সে রকম মেয়ে নয়।"

"না—না—তা নয়—আগে যাই-হোক, এখন হেম বাবুকে বড় ভালবাসে।"

"এখানে দেখা হবার আগে আর কখনও হেমের সঙ্গে এই রমেন্দ্রের দেখা হয়েছে?"

"না, আর কখনও দেখা হয়নি—যা হোক্‌গে—আমার এ জায়গাটা ভাল লাগচে না—এখান থেকে যেতে পার্‌লে বাঁচি।"

* * *

সেই রাত্রে হেমাঙ্গিনী শয়নকালে স্বামীকে বলিল, "এখন আর সে কথা বলে ফল নেই—কোথায় বে হবে—না—কি ভয়ানক!"

সতীশচন্দ্র কেবলমাত্র বলিলেন, "ভয়ানক—নিশ্চয়ই ভয়ানক!"

"তাঁহার বিবাহ হইত—প্রফুল্ল বাবুর মেয়ের সঙ্গে বের কথা হইতেছিল—"

"তোমায় ছেড়ে - তোমায় ভুলে?"

এ কথা বলিবার সতীশচন্দ্রের কোন আবশ্যকতা ছিল না; অন্য সময় সতীশচন্দ্র এ কথা বলিলে, হেমাঙ্গিনী কি করিত বলা যায় না; কিন্তু অদ্যকার লোমহর্ষণ ব্যাপারে হেমাঙ্গিনীর মন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সে কাতরে বলিল,

"কেন তুমি এ সকল কথা বল? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এ সব ভুলে যাও— আমি ভগবানের নাম করে বল্‌ছি তোমার সঙ্গে আমার বে হবার পর আমি অন্য কাহাকেও কখনও এক নিমেষের জন্যও মনে স্থান দিই নাই। কেন এ সব কথা বলিয়া আমাকে কষ্ট দাও?"

সতীশচন্দ্র কোন কথা বলিলেন না। হেম বলিল, "আজ তাহার বিবাহের কথা বলিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন।"

এবারও সতীশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না, নীরবে শয়ন করিলেন; কিন্তু সে রাত্রে নিদ্রিত হইতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহ জানে না।

* * *

প্রাতে সতীশচন্দ্র সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া বাজারের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার একটু পরেই প্রফুল্ল বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহার উপর সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে সেরূপ জেনানার বন্দোবস্ত ছিল না, বিশেষতঃ মধুপুরে জেনানা বন্দোবস্ত কম, এই সকল কারণে প্রফুল্ল বাবু হেমাঙ্গিনীর সহিত অবাধে কথাবার্ত্তা কহিতেন; এখানে আসিয়া পিসীমাও অনেকটা স্বাধীন।

প্রফুল্লবাবু আসিয়াই বলিলেন, "কি ভয়ানক! শুনিয়াছেন?"

হেমাঙ্গিনী অতি দুঃখিতস্বরে বলিল, "হাঁ, তিনি কি একেবারে মারা গিয়াছেন?"

প্রফুল্লকুমার অতি বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "তাহারা তাহা কি আর বাকী রাখিয়া গিয়াছে।"

পিসীমা নিকটে বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "তাহা হইলে রমেন্দ্র বাবুই ঠিক,— আমাদের সতীশ তাহাই বলিতেছিল; কিন্তু খানসামা বলে একজন কে মাড়োয়ারী খুন হয়েছে।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "তাহার কথাও ঠিক—একজন মাড়োয়ারীও কাল রাত্রে খুন হইয়াছে। এক রাত্রে দুই-দুইটা খুন! মধুপুরে এ রকম ভয়ানক কাণ্ড আর কখনও হয় নাই। মাড়োয়ারী অনেক টাকা লইয়া মধুপুরে আসিতেছিল, কে তাহাকে খুন করিয়া টাকা লইয়া পালাইয়াছে। ডাক্তারের বিষয় সতন্ত্র। কে ডাক্তারকে তাহার নিজের দরজার পাশে লাঠী মারিয়া খুন করিয়াছে।"

পিসীমা বলিলেন, "সতীশ তাহাই বলিয়াছিল।"

হেমাঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিল, "তিনি এখান হইতে যাইবার পরেই বোধ হয় এ কাণ্ড হইয়াছিল।"

প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে কাল রাত্রে ডাক্তার এসেছিল?"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "হাঁ, খোকাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার সময় এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহার অনেক পরে তিনি খুন হইয়াছিলেন; কখন এ কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায়। ডাক্তার বাড়ীতে না ফেরায় তাহার চাকর তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হয়, তাঁহাকে কোথায়ও না পাইয়া যখন বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল, সেই সময়ে দরজার একটু দূরে মৃতদেহ দেখিতে পায়।"

পিসীমা বলিলেন, "সতীশ কিন্তু আগে এ খবর পাইয়াছিল।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "ডাক্তার খুন না হইবার আগে তিনি কিরূপে তাহার খুনের কথা জানিবেন?"

পিসীমা বলিলেন, "খানসামা আসিয়া মাড়োয়ারীর খুনের কথা বলিলে সে বলিয়াছিল যে, মাড়োয়ারী খুন হয়নি—ডাক্তার খুন হয়েছে। হয় ত তখন আর কেউ শুনে থাকবে, তার কাছে শুনে এসেছিল।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "রাত্রি একটার আগে তাহার চাকরও জানিত না যে, ডাক্তার খুন হয়েছে—কেহই তখন মনে করিতে পারে নাই যে ডাক্তার খুন হইয়াছে।"

পিসীমা বলিলেন, "সতীশ নিশ্চয়ই কারও কাছে শুনেছিল, না হলে সে আমাদের এ কথা কেমন করে বল্‌লে। কোথায় কি রকমে ডাক্তার বাবু খুন হয়েছেন, তা পর্য্যন্ত বলেছিল।"

প্রফুল্লকুমার চিন্তিতভাবে বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। বলিতে পারি না—সতীশ বাবু কার কাছে এ কথা শুনেছিলেন।"

পিসীমা বলিলেন, "রাস্তায় কারা ছুটে যাচ্ছিল, তাদের কাছে শুনেছিল। তখন কত রাত্রি হবে—সতীশ রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী এসেছিল।"

প্রফুল্লকুমার বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক! হয় ত তাহারাই ডাক্তারকে খুন করিয়া পালাইতেছিল ডাক্তার যে খুন হইয়াছিল, তাহা সে সময়ে আর কাহারই জানিবার উপায় ছিল না। এই লোককে আমাদের খুঁজিয়া

বাহির করিতেই হইবে—রমেন্দ্রের খুনী যতদিন সাজা না পায় ততদিন আমরা কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। এখন সতীশ বাবু এই লোকদের চিনিতে পারিলে হয়।"

"তারা কোঁন বাগানের মালী।"

এই সময়ে সতীশচন্দ্র ও সুধাংশু বাড়ীতে ফিরিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্রকে দেখিয়াই প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারের খুনের কথা তুমি কাল রাত্রেই শুনিয়াছিলে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ,—শেঠের বাগানের মালী মনিয়ার কাছে শুনেছিলাম।"

"মনিয়ার কাছে? এই খুনী ধরিতেই হইবে।"

সতীশচন্দ্র কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রফুল্লকুমার ছুটিলেন।

শেঠের বাগান সেখান হইতে বেশি দূর ছিল না—অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তারাতো এ কথা অস্বীকার করে। তারা বলে যে, তারা ডাক্তারের খুনের কথা তোমায় বলেনি। ডাক্তার যে খুন হয়েছে, তারা রাত্রে আদৌ তা জানিত না।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "কি জন্য মিথ্যাকথা বলিতেছে জানি না, আমি রাত্রে বাড়ীর দিকে আসিতেছি, দেখি দুইটা লোক ছুটিয়া যাইতেছে. উহারা মধুপুরের দিক্ হইতে আসিতেছিল। হাতে একটা মশাল—তাহারই আলোয় তাহাদের চিনিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে—ডাক্তার বাবু খুন হয়েছে।' তাহারা না বলিলে আমি এ কথা শুনিব আর কাহার কাছে?—তখন আমার আর কাহারও সঙ্গেই দেখা হয় নাই।"

প্রফুল্লকুমার সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন, "তবে তাহারা এখন একথা অস্বীকার করিতেছে কেন? মনিয়া অনেক কাল শেঠের বাগানে কাজ করিতেছে, তাহাকে সকলেই ভাললোক বলে জানে, সে না হইলে আমি মনে করিতাম যে, তাহারা এই খুনের মধ্যে আছে। আমি তাহাকে তোমার সম্মুখে আনিতে চাই—দেখি তখন সে কিরূপে মিথ্যা বল্‌তে সাহস করে।"

"অনায়াসে।"

প্রফুল্লকুমার আবার ছুটিলেন। তিনি রমেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভালবাসিতেন; তাঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন; তবে তিনি দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক নহেন—মনের ভাব প্রকাশ হইতে দেন নাই। এ অবস্থায় তিনি যে রমেন্দ্রের হত্যাকারীকে ধৃত করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি বৃদ্ধ মনিয়া মালীকে ধরিয়া সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আনিলেন। মালী বলিল, "বাবু—আপনি হুজুর—কি বলিয়াছেন, তাই ইনি বাবু আমায় ধরে আন্‌লেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "কাল রাত্রে তুমি আর একটা লোক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটছিলে—সেই যে সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়—"

মালী বলিল, "হাঁ—হুজুর—আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমি বল্‌লেম একজন খুন হয়েছে।"

সতীশচন্দ্র প্রফুল্লকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনিলে? যে কথা আমায় বলেছিলে এখন প্রফুল্ল বাবুকে বল।"

মালী বলিল, "হুজুর, বলেছিলাম যে একজন লোক খুন হয়েছে।"

"হাঁ—ঠিক তাই।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "তুমি কি বলেছিলে যে, ডাক্তার রমেন্দ্র বাবু খুন হয়েছে?"

মালী অত্যন্ত ভয় পাইয়া কহিল, "হুজুর—এ কথা আমি কেমন করে বল্‌ব—আমি আপনাকে ত বলিলাম—"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বলেছিলে যে. ডাক্তার বাবু খুন হয়েছে।"

মালী বলিল, "না—হুজুর, আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে, একজন মাড়োয়ারী খুন হয়েছে, কিন্তু হুজুর সে কথা না শুনেই চলে গিয়েছিলেন—রাত্রে আমরা ডাক্তার বাবুর কথা শুনিনি, আজ সকালে শুনেছি। আজ জান্‌লেম যে দুটো খুন হয়েছে।"

সতীশচন্দ্র বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দুটো খুন—সে কি?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "একজন মাড়োয়ারী দোকানদারও কাল রাত্রে খুন হইয়াছে, মালী সেই খুনের কথাই বোধ হয় তোমায় বলিতে যাইতেছিল; কারণ ডাক্তার যে খুন হইয়াছে, তখন কেহ তাহা জানিত না।

রাত্রি একটার সময় তাহার চাকর এ কথা জানিতে পারে। তাই ভাবিতেছি, তুমি তখন কাহার কাছে শুনিলে যে ডাক্তার খুন হইয়াছে ?"

সতীশচন্দ্র কোন কথা বলিলেন না—কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না; ক্ষণকাল তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন—সে নীরবতা ভয়াবহ—ঘোর সন্দেহজনক। প্রফুল্লকুমার এবার গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতীশ, তুমি এ কথা কাল রাত্রে কাহার কাছে শুনিয়াছিলে ?"

তবুও সতীশচন্দ্র নীরব। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। সুধাংশু পিসীমা সকলেই বিস্ফারিতনয়নে সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, পূর্ব্বে যাহা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন, এখন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন একান্ত দুরূহ। অবশেষে সতীশচন্দ্র কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমি এই মালীর কাছে শুনিয়াছিলাম, এখন কেন অস্বীকার করিতেছে জানি না।"

মনিয়া বলিল, "হুজুর, অন্যায় বলিতেছেন। আমি ডাক্তার বাবুর কথা রাত্রে শুনি নাই, হুজুরকে কেমন করে বল্‌ব, হুজুর. রাত্রে কেবল খুনের কথা শুনেই চলে গিয়েছিলেন, আমি এখন যাচ্ছি হুজুর. হুকুম কর্‌লেই হুজুরে হাজির হব।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

রমণী ও রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২) রূপজ প্রেম।

রূপজ প্রেম কি? কামুকেরও রূপজ মোহ আছে,—কিন্তু প্রেম নাই। সে চায় সম্ভোগ ও তৃপ্তি। আশা পূর্ণ হইলেই তাহার প্রস্থান। কিন্তু রূপজ প্রেমের এ রীতি নয়। রূপজ প্রেম হইতেই পবিত্র প্রেমের উদ্ভব। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি,স্বামীর অনুরাগের আরম্ভ রূপজ মোহে। তারপর যতই দিন যায়,

রূপের মোহ কাটিয়া যাইতে থাকে। তখন স্বামীর সম্মুখে, স্ত্রী কেবল আর "প্রাণেশ্বরী" নন,—তখন তিনি সহধর্ম্মিণী,—তখন তিনি রমণীর রমণীত্বে অধিষ্ঠিতা। তখন তাহার ভিতরে কেবল মধুকরের মত মধুপান—পিয়াসা নাই; পরন্তু তদপেক্ষা মঙ্গলকর কিছু আছে।

এ বিভাগে রবিবাবুর কাব্যে যাহা আছে, তাহা সুন্দর, তাহা উপভোগ্য এবং "কামগন্ধ নাহি তায়।" ইহাতে বিরহ আছে, মিলন আছে, মান অভিমান আছে, হতাশা আছে, আনন্দ আছে। প্রেমের নানা অবস্থায় মানব হৃদয়ে যে সকল বিভিন্ন ভাবের লহরী বহিতে থাকে, কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় তুলনারহিত কৌশলে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। কোথাও তাহা মিলনে আবেগ-কম্পিত, কোথাও তাহা বিরহে ক্রন্দন-নিষণ্ণ, কোথাও তাহা অভিমানে আপনাতে আপনিই নিমগ্ন এবং কোথাও তাহা আহ্বানে ও আনন্দে, প্রীতিকায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গভঙ্গময়।

উদাহরণ,—মিলনে।

"তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার!
যৌবন সমুদ্র মাঝে কোন পূর্ণিমার আজি
এসেছে জোয়ার!

* * *

জাগরণ সম তুমি আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে!
সুষুপ্তির প্রান্ত তীরে দেখা দাও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে।

* * *

কুসুমের মত খসি' পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষপরে।
গোপনে শিশির ছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।"

আমাদের স্থানাভাব, তাই প্রলোভনসত্ত্বেও এই সুন্দর কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তারপর,—বিরহে।

"'তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।

শুকপথে দগ্ধমাঠে
রৌদ্র খরতর
নিবিড় ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই প্রহর।"

এখানে প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিরহীর হৃদয় যাতনা স্বপ্রকাশ। এইরূপে,—প্রকৃতির ভিতর দিয়া পাঠকের মনের সঙ্গে কবিতালিখিত বিষয়ের একটী অখণ্ড পরিচয়সাধন করিয়া দিতে, কবি রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। আমরা নানাভাবে, নানা শ্রেণীর কবিতায়, তাঁহার এই অসাধারণসুলভ শক্তির অভিব্যক্তি বহুবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষতঃ, প্রকৃতির সহিত কবির সহমর্ম্মিতা প্রেমবন্ধন-যুক্ত হইয়া, যেখানে মানবের হৃদয় বৃত্তির ভিতরে প্রাণস্পন্দনমধুর নানাবিচিত্র ভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়, সেখানে সে কবিতার উদ্দেশ্য কদাপি ব্যর্থ হয় না। এ শক্তি দুর্লভ। ইহার যথানিবেশ রবীন্দ্রনাথে যেমন দেখি, এমন আর কোথাও নয়। উদাহরণ—

"আমায় অমনি খুসি করে রাখ
কিছুই না দিয়ে
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এম্‌নি ধূসর মাঠের পারে,
এম্‌নি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অম্‌নি রাখ বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।"

এই কয়েক ছত্রে, ছন্দের সহজপ্রবাহে, অনায়াস-গতিতে এবং সরল ঝঙ্কারে আমাদের হৃদয়ে একটি প্রণয়মধুর উজ্জ্বল কল্পনা জাগিয়া উঠে। সাধারণ রূপজ প্রেম সম্বন্ধে রবিবাবুর অসংখ্য কবিতা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র পরিচয়, বোধ হয় আবশ্যক হইবে না।

(৩) পবিত্র প্রেম।

রমণীহৃদয় প্রণয়ের মর্ম্ম-নিকেতন বটে, রমণীর আনন সৌন্দর্য্য-জ্যোৎস্নার

অনুলেপনে রূপ রম্য বটে,—কিন্তু তাহাতেই রমণীর গৌরব নয়। রমণী স্নেহে জননী, ভালবাসায় ভগিনী, দুঃখে যাতনানাশিনী, শোকে অশোকরূপিনী, চিন্তায় তাপহারিণী, দীনে করুণাদায়িনী—রমণী কেবলমাত্র প্রিয়তমা নয়। রমণীর অমর প্রেম সর্ব্বজনের কাম্য। কিন্তু সে কি প্রেম? কেবলমাত্র চুম্বনে তাহা নাই—কেবলমাত্র আলিঙ্গনে তাহা নাই—তাহা আছে কেবল সন্তানের প্রতি মাতার স্বর্গীয় দৃষ্টিপাতে—তাহা আছে কেবল কৃষ্ণোদ্দেশে যশোদার স্তন্যধারায়। যে রমণী আমার জন্মদাত্রী—সেই রমণীকে কেবল আমরা কামনা-কলুষিত মূর্ত্ত কামের মত গড়িয়া তুলিব? তাহা নয়।

তাই অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন—

"নারি

তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি

শুষ্ক জড় জগতের নিত্য নব ছলা—

* * *

তুমি স্বস্তি শান্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,

সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী "ভব দুখহরা।"

বহুযুগ পূর্ব্বে চণ্ডীদাসও তাই গাইয়াছিলেন—

"তুমি বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,

তুমি সে নয়নের তারা।"

তাই বিহারীলাল গাহিয়াছিলেন—

"তোমার মূরতি ধোরে
কে এসেছে মোর ঘরে?
কে তুমি সেজেছ নারী?
চিনেও চিনিতে নারি;
উদার লাবণ্যে তব
ভরিয়া রয়েছে ভব;

তুমিই শিবের জ্যোতি;
হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী;
প্রেম স্নেহ ভক্তিভাবে দেখি অনিবার!
প্রেয়সী আমার!
নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!

আর বিদ্যমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ, রমণীকে এতদূর উচ্চাসন দেন নাই বটে, কিন্তু রমণীর মহিমা তাঁহারো প্রাণের উপরে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছে। তাঁহার প্রাণের উপরে যে রেখাপাত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের স্তরে স্তরে পূর্ণতালাভ পূর্ব্বক ভাষার প্রবাহে, উপমার যথাপ্রয়োগে এবং ছন্দের স-লীল ঝঙ্কারে একটা ভাস্বর যজ্ঞাগ্নির সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ রমণীর মাতৃত্ব দেখেন নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত।

রমণীর স্তনের উদ্দেশে জাগতিক কবি, মুগ্ধভাবে কামপ্লুত হৃদয়ে গান গাহিয়াছেন। এদিকে সকল দেশের এবং সর্ব্বকালিক কবিতার ভিতরেই একটী অনুধাবন-যোগ্য সারূপ্য দেখা যায়। স্তনের নাম উঠিলে, পারস্য কবি ফার্দুসীর মনে দাড়িম্বফলের কথা মনে পড়িয়া যায়। বৈষ্ণব কবি বলেন, "কুচ কাঞ্চন শ্রীফল"। আর জনৈক ইতালীয় কবি লিখিয়াছেন—

"Where fresh and firm, two ivory
apples grow."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, "কানু ছাড়া গীত নাই" বলেন নাই। স্তনের উদ্দেশে তিনি গাহিয়াছেন—

"নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
* * *
হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন—

"ভালবাস ; প্রেমে হও বলী,
চেওনা তাহারে।
আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের।"

টীকা অনাবশ্যক।

"তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
* * *
জীবনের কাজ আছে প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।"

প্রেমের পন্থা যে কুসুম-বিস্তৃত নয়, পরন্তু কর্ত্তব্য-নিয়মিত, কবি দু'কথায় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এইরূপ নানা কবিতার ভিতর দিয়া, প্রেমের যথার্থ স্বরূপ,—রমণীর প্রতি কবির ভক্তি,—নিশান্ত আকাশের কোলে তিমির-তুলিকালিপ্ত শ্যামদ্রুমমুকুটের উপরে উষা রাজ্ঞীর ধবলস্মিতের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানেই কবি ক্ষান্ত নন। তারপর, রমণীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।"

প্রেমের মহান পরিণতিতে, মানব-হৃদয়ের ইহাই শেষ অবস্থা। এইখানে রবীন্দ্রনাথ রমণীকে গৌরবের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তারপর, "রাত্রে ও প্রভাতে।" এমন সুন্দর এবং পবিত্রভাব পূর্ণ কবিতা, বাংলা সাহিত্যে আমি খুব অল্পই পাঠ করিয়াছি। স্বামী, স্ত্রীকে বলিতেছেন, কাল রাত জোছনা-মাখা ছিল। আমি তোমাকে চুম্বন করিয়াছিলাম,—তোমার ঘোমটা খুলিয়া দিয়াছিলাম,—তোমার বেণীর বাঁধন আলগা করিয়া দিয়াছিলাম,—তোমার কেশ রাশি এলাইয়া দিয়াছিলাম,—তোমার "আনমিত মুখখানি" বুকে রাখিয়াছিলাম, তোমার মুখে তখন কথা ছিল না,—সখি! তখন তুমি "হাসি-মুকুলিতমুখে" আমার "সকল সোহাগ সয়েছিলে।"

ইহা কিছু নূতন কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই বলিবার থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহার পরই বলিতেছেন—

"আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

* * *

দেবি, তব সীঁথি মূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।

একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে।"

আপনার অর্দ্ধাঙ্গীর উপরে, এমন দেবীত্বের আরোপ করিতে গেলে অনেকেই যে বক্র-নাসিকায় দূর-প্রস্থিত হন, তাহা অস্বীকার্য্য নয়।

"নারী" নামধেয় কবিতায়, কবি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর বিন্দু
মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ।

জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এস, এস নারি,
আন তর্পণ বারি।
* * *

এস কল্যাণী নারি
বহিয়া তীর্থ বারি।
* * *
আঁধার নিশীথ রাতি।
গৃহ নির্জ্জন, শূন্য শয়ন,
এলোকেশ পাশে শুভ্র বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এস তাপসিনী নারি,
আন তর্পণ বারি।"

কবি রমণীর আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেছেন—

বিরলে তোমার ভবন খানি
পুষ্প কানন মাঝে,
হে কল্যাণি নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্র শাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষ ভরে।
* * *
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে
কাঁকণ দুটির মঙ্গল গীত
উঠে মধুর স্বরে।
* * *
ভালে তোমার আছে লেখা,
পুণ্য ধামের রশ্মি রেখা
* * *
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
পুণ্য ধামের গভীর রেখা,
দীপ্তশিরে পুণ্য শীতল
তীর্থ সলিল ঝরে।"

"পতিতা" নামক কবিতায়, পতিতা রমণীর মুখে কবি একটি অমৃত-মধুর বাণী বসাইয়া দিয়াছেন :—

"আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃত সরস আমার পরশ
আমার নয়নে দিব্য বিভা!
* * *
দেবতারে মোর কেহত চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।"

আমরা ইহার উপরে আমাদের কর্কশ ভাষার প্রলেপ দিতে চাহি না;—যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি উপভোগ করুন। আমরা এখানে আর পুঁথি বাড়াইব না—কারণ আমাদের স্থান অল্প এবং রবি কবির ভাণ্ডার কুবেরের মত অফুরন্ত। যাহা দেখাইয়াছি,—তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট; এখন, "বুঝ জন, যে জানো সন্ধান!"

সর্ব্বশেষে, আর একটী উপস্থিত প্রসঙ্গ-জড়িত কথা বলিয়া বিদায় লইব। আমরা, আগেই বলিয়াছি, কবি অক্ষয়কুমার প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথের তুলিকায়, রমণীর "জগদ্ধাত্রী" মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে নাই এবং সুলেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ, 'অর্চ্চনা'র পৃষ্ঠায় আগেই তাহা নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। এখানে একটী কথা আছে।

টমাস গ্রে এবং গোল্ডস্মিথের কবিতা সংগ্রহ কালে মিঃ ষ্টেড বলিয়াছিলেন, "Gray laboured his verse as the Jeweller polished the diamond. Goldsmith wrote with the * * * simplicity of nature." আমাদের অক্ষয়কুমারও, তেমনি রত্নবণিকের মার্জ্জিত হীরক প্রতিম ভাষায়, রমণীর যে বিরাট আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তিনি প্রকৃতির simplicity দেখাইয়াছেন। আমরা পৃথিবীর মানুষ। অসাধারণে যাহার পরিণতি, মানবের জীবনসংগ্রামের তুমুলবিরোধাবশিষ্টা কল্পনা, কদাচ তাহার ধারণা করিতে পারে। চোখটুকু, দৃষ্টিটুকু, মূর্ত্তিটুকুর ভিতর দিয়া যাহা সহজে নজরে পড়িয়া যায়, আমরা প্রথমেই আপাতদৃষ্টিতে তাহাই দেখিতে পাই। তাহার নেপথ্যে যে রহস্য, যে মহিমা বিরাজ করিতেছে, তাহাকে দর্শনপথানুগামী করিতে হইলে, অধিকতর চিৎ শক্তির আবশ্যক। সাধারণ মানবের তাহা কোথায়? অক্ষয়কুমার সাধারণ কল্পনাতীত স্বর্গের ছবি অঙ্কন করিয়াছেন। তাহাতে রমণীকে ধারণ সীমার বাহিরে মুক্ত অসীমে একটা মেঘের মত ভাসিয়া যাইতে দেখি। আপনার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভিতরে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সকলেই যদি সেই এক কাজে ব্রতী হন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের, আমাদের শুদ্ধান্তের, আমাদের গৃহলক্ষ্মীর,—উপবেশনে যাঁহার স্নিগ্ধচ্ছায়াসুন্দর কোমল করপল্লব আমাদের ললাটের উপরে প্রসারিত রহিয়াছে, শয়নে যাঁহার সাহচর্য্য আমাদের অবসরকে মধুরতর করিয়া তুলিতেছে, গমনে যাঁহার মঙ্গল কামনা আমাদের পন্থাকে কুসুমাস্তৃত ও নিরাপদ করিয়া তুলিতেছে, বিপদে যাঁহার আশ্বাসবাণী আমাদের মানসকে অমল করিয়া তুলিতেছে এবং যাতনায় যাঁহার স্নেহস্নিগ্ধবাণী আমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছে, তাঁহার ছবি কে আঁকিবে? এদিকে আমরা রবীন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, প্রকৃতির simplicity অপেক্ষাও simplicity যদি কিছু থাকে,—তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই simplicityর ভিতর দিয়া রমণীকে যতদূর উচ্চ, যতদূর পবিত্র, যতদূর মহিমময়ী করিতে পারা যায়, ততদূর করিয়াছেন। করিয়া, ভালো করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা জানি না, কিন্তু তাঁহার শক্তি প্রসাদাৎ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা ঋষির সামগানের মত মহান্, তাহা যজ্ঞপীঠের মত পবিত্র, তাহা হোমধূমের মত মনোহারী।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সোরাব ও রস্তম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেথায়, রস্তম্ আসি শিবিরের দ্বারে
সবেগে, ডাকিলা স্বীয় অনুচরগণে,
কহিলা আনিতে শীঘ্র সমরের সাজ!
আপনি পরিল বর্ম্ম ; অস্ত্রে শস্ত্রে সাজে
সামান্য বীরের মত ; চর্ম্ম শিল্পহীন
করে ; শিরস্ত্রাণ শিরে মহার্ঘ সুন্দর,
অশ্বপুচ্ছ-গুচ্ছ সুলোহিত, মধ্যে তা'র
সঞ্চরে সমীরে ; তাহার চৌদিকে শোভে
শিল্পরূপ ধরি জাতরূপ সুচিকণ !—
সাজি বীরসাজে, বীর বাহিরিল বেগে!
পশ্চাতে চলিল রুক্ষ তুরঙ্গমবর,
(খ্যাত গুণপনা যা'র মেদিনীমণ্ডলে)
প্রভুর পশ্চাতে যথা যায় সারমেয়
প্রভুভক্ত! হয়বরে আনিলা রস্তম্
শিশুকালে, বোখরার নদীতীরে হেরি,
পালিলা যতনে। কপিশ সে অশ্ববর!
কেশর সুন্দর দীর্ঘ শোভে গ্রীবাদেশে,
বসন আসন পৃষ্ঠে, পর্যন্তে হরিত,
খচিত কাঞ্চনশিল্পে, মধ্যস্থলে তা'র
মৃগয়ার পশুচিত্র শোভে চিত্রাকারে!
আরোহিলা অশ্ববীর ; ত্যজি স্বশিবির,
পারস্যশিবির ভেদি, বাহিরিল শূর ;
হেরিল পারস্যসৈন্য, চিনিল পলকে,
অভ্যর্থিল কোলাহলে পূরিয়া গগন!
নারিল চিনিতে মাত্র তাতার বাহিনী!
পারস্যসাগরে যবে শুক্তিসঞ্চয়নে
নিমগন নীরধির নীলিমা গম্ভীরে
শুক্তিধর, গৃহী তা'র তীরের কুটীরে
যাপে প্রতিক্ষণ যথা উৎসুক মলিন
মহাভয়ে, কিন্তু যবে দিবা-অবসানে
মুক্তাশুক্তি সহ পতি ফিরে নিরাপদ,
মিলে পত্নীসনে আসি পর্ণের কুটীরে,
ভুলে দুখকথা যথা বিধুরা পলকে,
মুখ ছাড়ি মলিনিমা অদৃশ্যে পলায়,
সেরূপ রস্তমে হেরি পারসীকগণ
ভুলিল দুঃখের কথা, স্বপ্নকথা মত ;
নিমেষে হরষভাতি ভাতিল আনন!
পারস্যসৈন্যের অগ্রে আসিলা রস্তম্।
হামানশিবিরে সাজি সোরাব তাতার
বাহিরিল ; চারিদিকে তাতারবাহিনী
দীর্ঘ শক্তি অস্ত্র করে, কণ্টকিত করি
সমরপ্রাঙ্গণ, সম চতুরস্রাকারে
দণ্ডাইল সবে ; সৈকত চত্বর, মধ্যে
শূন্য, সুবিস্তৃত ; সোরাব তাহার মাঝে!
ধান্যক্ষেত্র যেন শোভা পায়, লয় যবে
ক্ষেত্রস্বামী কাটি শস্যচয় মধ্যজাত,
সমকোণ সমবাহু চতুর্ভুজরূপে!
রস্তম্ আসিল হেথা সৈকতপ্রাঙ্গণে,
চাহিল শিবির তাতারের, নিরখিলা
সোরাব সৈন্যের মাঝে আসিছে বাহিরে।
অনিমেষ যুবকেরে নিরখে রস্তম্!
শীতের প্রভাতে যথা নারী ধনবতী
ত্রিতলপ্রাসাদে, চাহে গবাক্ষের পথে
কৌষেয়বসন-জাত যবনিকা তুলি
ধীরে ধীরে, দীনহীনা রমণীর পানে
নিয়োজিতা গৃহকর্ম্মে কঠোর, অঙ্গুলি

মলিন নিস্পন্দ তীক্ষ্ণ শীতের দংশনে,
ভাবে ভাগ্যবতী সবিস্ময়, অভাগিনী
বাঁচে কি প্রকারে, কত দুখকথা আর
জাগে তার মনে, সেরূপ রস্তম্ হেরে
ডুবিয়া বিস্ময়ে, অজ্ঞাত যুবক বীরে!
"কোথায় রস্তম্ ?কোথা পারসীকবীর!"
বলিতে বলিতে যুবা উপনীত আসি
রস্তমের পুরোভাগে! বৃদ্ধ নির্নিমেষ
নিরখে যুবকমূর্ত্তি, তেজঃপুঞ্জময়!
ভাবিল বিস্মিত মনে, "কেবা এ যুবক!
অত্যল্প বয়স, পালিত কোমল স্নেহে!"
রাজার উদ্যানে যথা দেবদারু শিশু
সরল, সুদীর্ঘ, সুশ্যামল ঢালে ছায়া
কৌমুদীনিশীথে মুখর নির্ঝর দেহে,
সেরূপ সোরাব প্রাংশু, সস্নেহে পালিত!
গলিল গভীর স্নেহে বীরের হৃদয়
পলকে যুবকে হেরি! দণ্ডাইল বীর,
কহিলেক সম্বোধিয়া করাগ্রসঙ্কেতে:—
"যুবক, স্বর্গের চিত্র বড় সুমধুর,
সুখময়, শান্তিকর; সমাধি, ভীষণ!—
ভীষণ মৃত্যুর শয্যা সমাধি হইতে
স্বর্গের মূরতি, বৎস, সুখকরতর!
হের মোরে; মহাকায়, বর্ম্মে সুসজ্জিত,
রণে পরীক্ষিত আমি; ভীষণ সংগ্রামে
যুঝিয়াছি শত, শত অরাতির সনে;
হারি নাই কভু,কিংবা বাঁচে নাই রিপু!
অবিবেকী কেন দিবে আহুতি জীবন,
সোরাব, সমরানলে! শান্ত কর মন!
তাতারবাহিনী ছাড়ি, নিবস ইরাণে
আমার তনয়রূপে! মোর সৈন্যদলে
সেনানী হইয়া যুঝ, বাঁচি যতদিন!
যু[illegible] তোমার সম নাহিক ইরাণে!"
সস্নেহে সোরাবে হেন কহিলা রস্তম্।
সোরাব শুনিল বাক্য—বাক্য সুগম্ভীর
রস্তমের! নিরখিল শরীর বিশাল
অচঞ্চল সে সৈকতে!—যেন দুর্গ দৃঢ়
রচিল সে মরুস্থলে কোন বীরবর
পুরাকালে, নিবারিতে দস্যু-আক্রমণ!
প্রথম বার্দ্ধক্য শিরে আঁকিয়াছে রেখা
ধূসর, কেশের রূপে! দেখিয়া রস্তমে
আশার প্রবাহ শত, শত পথে আসি,
পূরিল যুবার হৃদি; দৌড়িল সোরাব
পুরোভাগে, পড়ে আসি বৃদ্ধের চরণে,
জড়াইল নিজ করে রস্তমের কর!
কহিল; "পিতার দিব্য, দিব্য লাগে তব,
তুমি না রস্তম্? কহ,তুমি না সে বীর?"
চাহিলা কটাক্ষে বীর যুবকের পানে,
ফিরাইলা মুখ, কত চিন্তিলা অন্তরে;—
"হা ভাগ্য! কি মনোগত চতুর যুবার?
গর্বিত কপট ধূর্ত্ত তাতারবালক;
যদ্যপি তাহার প্রশ্নে প্রকাশি সম্মতি,
মানিবে না পরাজয় নিশ্চয় যুবক;
অথবা, হবেনা মিত্র ছাড়ি শত্রুদল,
মিটাইবে সুকৌশলে সমরের সাধ;
গাইবে আমার যশ; দিবে সবিনয়
উপহার—কোটিবন্ধ অথবা কৃপাণ;
ফিরিবে স্বদেশে নিরাপদ; মহোৎসবে
প্রাসাদে সমরকন্দে, স্পর্দ্ধিবে সগর্বে,
বলিবে,—আমুর তীরে শিবিরনিবেশে
পারশ্যতাতার-সৈন্য আছিল যখন,

একদিন আহ্বানিনু পারসীক বীরে,
যুঝিবারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ; বিমুখ সকলে,
কেবল রস্তম রণে আইল সাহসে ;
উপহার দানাদান করি ফিরিলাম
নিরাপদ গৃহে দুইজন।" এইরূপ,
মনে লয়, বলিবে যুবক ; প্রশংসিবে
সোরাবেরে সভাজন ; মোর তরে তবে
পড়িবে লজ্জার ফাঁশ ইরাণের গলে !"
ভাবি হেন, চাহে বীর সোরাবের পানে,
কহিলা কর্কশ উচ্চে ঃ—"উঁহু, যুবক !
কেন বৃথা জিজ্ঞাসিছ রস্তমের কথা ?
চাহিলে যুঝিতে স্পর্দ্ধা করি মোর সনে,
আছি আমি হেথা ! কার্য্যে পরিণত কর
দর্প তব, কিংবা ভঙ্গ দেহ দ্বন্দ্বরণে ?
অথবা যুঝিবে মাত্র রস্তমের সনে ?
অবিবেক শিশু, রস্তমে হেরিলে, ভয়ে
পলায় সকলে ! জানি আমি সুনিশ্চয়,
যদ্যপি রস্তম্ বীর আসিতেন হেথা
প্রকাশিত, না পারিতে যুদ্ধকথা আর
কহিতে তাঁহার সনে ! তাই বলি তোমা,
যে হই সে হই আমি, জ্বলন্ত অক্ষরে
অন্তরের অন্তস্তলে রাখহ লিখিয়া ;—
"যদি পরিহর গর্ব্ব, ভঙ্গ দেহ রণে,
তবেই নিস্তার ! নতুবা, বালুকাভূমি
রহিবে সজ্জিত কঙ্কালভূষণে তব,
যতদিন বায়ু না করে মলিন অস্থি,
অথবা নিদাঘে, না করে যাবৎ আমু
বিধৌত পুলিন, নিদাঘ-প্লাবন করে !"

নীরব রস্তম্ ! তবে দাণ্ডায় সোরাব,
উত্তরিল ;—নিদারুণ এতই কি তুমি !
হেন বাক্যে নাহি ভয় সোরাবহৃদয়ে !
সোরাব বালিকা নহে ; নহিবে শঙ্কিত
বাক্যের তাড়নে মাত্র ! তবু সত্য ইহা,
রস্তম্ আপনি যদি আসিতেন হেথা,
সকল সমরকথা হইত নিঃশেষ !
আর বলি, সুবিশাল ভয়ঙ্করতর
দেহ তব আমা হ'তে ; যুঝিয়াছ জয়ী
শত রণে ;—রণবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ, প্রাচীন ;
আমি অনভিজ্ঞ যুবা এ প্রথম রণে ;—
তবু জয় পরাজয় ভাগ্যের অধীন !"
যদিও ভাবিছ, তব বিজয় নিশ্চয়,
তথাপি নিশ্চয় সার নাহি সে নিশ্চয়ে ?
যথা সাগরের বক্ষে ভাসে দুইজন
উদাসীন, জানেনাকো তরঙ্গ তুফান
ভাসাইয়া ল'য়ে যাবে সাগর গভীরে,
উত্তুঙ্গ তরঙ্গমাঝে, শমনসদনে,
অথবা তুলিবে তীরে উচ্চে নিরাপদে,
ভাগ্যের তরঙ্গে তথা আমরা দু'জন
উদাসীন, নাহি জানি তরঙ্গ প্রবল
ছুটিবেক অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে,—
সাগরের উপকূলে, অকূল পাথারে !
ভাবিলেও তবু নাহি শক্তি জানিবারে ;
পরিণতিকালে কার্য্য দেখাইবে ফল !"
এতেক কহিলা যুবা। না দিলা উত্তর
রস্তম্, সোরাবে লক্ষি নিক্ষেপিল শূল !
যথা গগনের উচ্চ-উচ্চতর হ'তে,
ধায় পক্ষিরাজবাজ লক্ষি পরাবতে
ধান্যক্ষেত্রে বেগে, যেন সীসকগোলক,

রস্তমের স্কন্ধ ছাড়ি নিম্ন নিম্নতর
সেরূপ ছুটিল অস্ত্র, সোরাবে নাশিতে?
হেরিল যুবক অস্ত্র, বিদ্যুতের বেগে
ছাড়ি দিল অস্ত্রপথ; সন্ সন্-স্বনে
বিলোড়িয়া বায়ুস্তর ভেদিল সৈকত
নিম্ন নিম্নতর; উড়িল বালুকা-রাশি
ঢাকি কতদূর? সোরাব তৎপর তবে
অব্যর্থ সন্ধানে ছাড়িল আপন শক্তি
মহাশক্তিমান্ রস্তম্-উদ্দেশে। অস্ত্র
বাজিল নির্ভর রস্তমের লৌহবর্ম্মে,
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ধ্বনিল আয়সখণ্ডে;
বধির শ্রবণ; পড়িল সৈকত ভূমে!
রস্তম্ কুপিত তবে লইল মুদ্গর—
বৃক্ষের প্রকাণ্ড কাণ্ড, কর্কশ এখনো
শাখামূলে—অপরের দুর্ব্বহ সেভার!
নিদাঘের কাল যথা ঝটিকা প্রবল
প্রবেশিয়া হিমালয়বনে বনস্পতি
ভাঙ্গে মড়মড়ে, তা'র কাণ্ড শাখাহীন
ভাসি আসে রাবিনীরে বৃক্ষহীন বেশে,
কূলে অধিবাসী কূলে করিবারে ভরি,
সেরূপ বিশাল বীর তুলিল মুদ্গর,
হানিলা সোরাবে লক্ষি। যুবক সত্বর
ছাড়িয়া মুদ্গর প্রাপ্ত গেল কতদূর?
পড়িল মুদ্গর ভূমে, ভীম বজ্রনাদে
রস্তমের মুষ্টিচ্যুত; পড়িলা রস্তম্
জানু পাতি ভূমিতলে; পশিলা অঙ্গুলি
বালুকায় কতদূর; ঘুরিল মস্তক;
আঁধারিল চক্ষু উড়ি বালুকার কণা!
সত্বর তখন কুদ্ধা নিষ্কোসিয়া অসি,
পারিত চূর্ণিতে বীর দর্প রস্তমের!
কিন্তু অহো! রস্তমের পরাজয় হেরি,
হাসিল ঈষৎ বীর, না তুলিল অসি,
সরিল পশ্চাতে, নম্র! কহিলা রস্তমে;
"সুনির্ঘাত বীরবর হানিল মুদ্গর!
ভাসিল না অস্থি মম, মুদ্গর কেবল
ভাসিল, আমুনীরে, নিদাঘপ্লাবনে!

ক্রমশঃ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক সাহিত্য।

ফরাসী উপন্যাসের শোচনীয় অবস্থা।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

অনেক দিন হইতেই ফরাসী উপন্যাসের অধঃপতনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে—বর্ত্তমান সময়ে উহা শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। প্রকাশক ও গ্রন্থ-বিক্রেতারা আদৌ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না এবং গ্রন্থকারগণ ক্রমশঃ সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছেন। প্যারিসের একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"উপন্যাসের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী টেনীস্, গল্ফ (golf) এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ aeroplane বা ব্যোমযান প্যারিসবাসীরা এখন এই লইয়াই মাতিয়াছে। ব্যোমযানে গমন করিবার সময় উপন্যাস পাঠের

বিশেষ অসুবিধা। দৈবাৎ হস্তস্খলন হইলেই নিম্নের লোকের মাথা কাটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু উপন্যাসের অধঃপতনের আসল কারণ উপন্যাস প্রণয়নের আধিক্য। অধিক উপন্যাসের আর আবশ্যকতা নাই। পাঠেচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট পুস্তকই বিদ্যমান আছে। সুন্দররূপে বাঁধান ভাল উপন্যাস সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু অর্দ্ধপেনি মূল্যে এক-দিনের পাঠোপযোগী গল্প-পুস্তকের অভাব দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ পাঠকই উপন্যাস ভালবাসে কারণ ইহার ঘটনা-বৈচিত্র্য হাঁফ্ ছাড়িতে দেয় না। মারামারি, কাটাকাটি, লড়াই, রক্ত-প্রস্রবণ সবই ইহার অন্তর্গত। কিন্তু এখন ঔপন্যাসিকের বড়ই দুর্দ্দিন। প্যারিসবাসীদের উপন্যাসপাঠতৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং আর উপন্যাসপণ্য বিক্রয় হয় না। শিক্ষিত পাঠক ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনচরিত, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে জ্ঞানের উন্নতিসাধন করেন। তাঁহাদের ধারণা পূর্ব্বতন ঔপন্যাসিকবৃন্দ মানব-চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান উপন্যাসে সেই চরিত্র গুলিরই পুনঃসংযোজন হইয়াছে মাত্র। সুতরাং উহা পাঠে অনর্থক অর্থব্যয় ও সময় ক্ষেপণ অনাবশ্যক। সেইজন্য উপন্যাস ক্রয়ে যে অর্থব্যয় করিত সে তৎপরিবর্ত্তে তাহার তিন বা চতুর্গুণ অর্থব্যয়ে সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাদি ক্রয় করে।

উপস্থিত প্যারিসে পাঠকের দৃষ্টি জীবনচরিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। Jules Verne এর চমকপ্রদ সুন্দর গল্পগুলি এক্ষণে অতি পুরাতন হইয়াছে— সেগুলির মোহিনী শক্তি এখন বিলুপ্ত; তাহার ভবিষ্যদ্বাণী এক্ষণে সত্যে এবং দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ একদিন আসিবে যে দিন দর্শন ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিও পাঠক আয়ত্ত করিয়া লইয়া সাহিত্যের অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইবে। উপন্যাসগুলির দুরবস্থার অন্য এক কারণ এই যে পাঠক যাহা চায় উহাতে তাহা পায় না। বিজ্ঞানের কোন তথ্যই উপন্যাসে সন্নিবেশিত হয় না। সুতরাং ঔপন্যাসিককে এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য অভিনব শক্তি এবং ইঞ্জিনিয়রের নব উদ্ভাবনগুলি উপন্যাস মধ্যে সন্নিবেশ করা আবশ্যক।

Eugene Sue র নাম পাঠকের নিকট এখন একরূপ অজ্ঞাত। George Sand এর গ্রন্থ ক্বচিৎ কেহ পাঠ করে; Victor Hugo র গ্রন্থ অতি অল্পই বিক্রয় হয়; এবং Moliere প্রভৃতির গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পঠিত হয় মাত্র। কতকগুলি অজ্ঞাতনামা নূতন লেখক কতকগুলি অনন্যসাধারণ উপায় অবলম্বনে সাধারণকে তাহাদের রচিত উপন্যাস পরীক্ষার্থ ক্রয় করিতে অনুরোধ করে। ফলে তাহাদের উপন্যাস কিছু কিছু বিক্রয় হয় এবং ভাল উপন্যাসগুলি পুস্তকালয়ে আবদ্ধ রহে। কেহ উপন্যাস লিখিতে ইচ্ছা করিলে এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সহায়তায় অনেকটা সফলকাম হইতে পারেন।

ইংরাজী সংবাদপত্র অপেক্ষা ফরাসী সংবাদপত্রে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ বেশী আলোচিত হয় কিন্তু ইহাতে কখনও কোনও সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। ইহাই উপন্যাস সমূহের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণামের অন্যতম কারণ। নবীন লেখকের পক্ষে ইহাও একটী অন্তরায় কারণ প্রকাশকের সেই একঘেয়ে প্রশংসাবাদসূচক বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ব্যতীত তাহাকে সাধারণে পরিচিত করিবার অন্য কোনও উপায় থাকে না। এইরূপ অযথা প্রশংসাবাদে পাঠক অনেক-বার প্রতারিত হইয়াছে। পুনরায় প্রতারিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় সে আর প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে ভুলে না। ফরাসী প্রকাশকের ব্যবসাবুদ্ধিহীনতাও এই অধঃপতনের একটী কারণ। ইংরাজ প্রকাশক একখানি ফরাসী গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া যে মূল্যে বিক্রয় করে ফরাসী প্রকাশক সেই স্থলে তাহার দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্য গ্রহণ করে অথচ মুদ্রণের পারিপাট্য পুস্তকের কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই ফরাসী প্রকাশক অপেক্ষা ইংরাজ প্রকাশকের পুস্তক প্রশংসার্হ। ফরাসী প্রকাশকের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। অন্যথা যুবকের আশা সুদূরপরাহত।

অরণ্য উচ্ছেদ ও সংবাদপত্র।

এমেরিকান্ রিভিউ অব্ রিভিউস্ পত্রে (American Review of Reviews) এমেরিকান সংবাদপত্রসমূহ কর্ত্তৃক অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন—"প্রতিবৎসর যে সংখ্যা বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আমেরিকাবাসীরা তাহার তিনগুণ বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, ফলে এই হিসাবে আগামী তেত্রিস বৎসরের মধ্যে আমেরিকা বৃক্ষ শূন্য হইবে। কিন্তু এই সমগ্র উচ্ছেদ সাধনের জন্য সংবাদপত্র শতকরা এক ভাগের অধিক দায়ী নহে। Hemlock, poplar এবং balsam প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীর বৃক্ষ হইতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষ সমূহ নিউ ইংলণ্ড (New England) নিউ ইয়র্ক (New york) পেনসিলভ্যানিয়া (Pennsylvania); এই সমস্ত স্থানেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আজকাল উইস্‌কনসিন (Wisconsin), মিনেসোটা (Minnesota), মিচিগান (Michigan), অরিগন্ (Oregon) এবং ওয়াসিংটন (Washington) প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তপ্রদেশে ১৮৮০ সালে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯০৫ সালে তাহার দশগুণ কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।

এই পঁচিশ বৎসরে সাধারণ সংবাদপত্রের আকৃতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং যে পরিমাণ কাগজ উপস্থিত সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির জন্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রতিবৎসর ৫০,০০০ একার (অর্থাৎ প্রায় ৮০ বর্গ মাইল) ভূমির যাবতীয় কাগজ প্রস্তুতোপযোগী বৃক্ষের উচ্ছেদ সংসাধিত হইতেছে। মিঃ রোসিটার (Mr. Rossiter) আমেরিকার অত্যধিক সংবাদ ও সাময়িক পত্রের প্রচার সম্বন্ধে বেশ এক টা হিসাব দিয়াছেন। ১৮৮০ সালে যে সংখ্যক পত্রাদি প্রকাশিত হইত তাহা গড়ে প্রতি লোকের প্রতি ৪১ খানি হিসাবে পড়িত। কিন্তু ১৯০৫ সালের প্রকাশিত সংখ্যক পত্রাদি প্রতি-লোকের প্রতি ১২৫ খানি হিসাবে পড়িতে দেখা গিয়াছে, উপরন্তু ইহার প্রত্যেক খানির ওজন পূর্ব্ব প্রকাশিত সংবাদ পত্রাদির দ্বিগুণ। তিনি বলেন, কাগজের সুলভ মূল্য—লিনোটাইপ্ ছাপিবার কলের ব্যবহার এবং বিজ্ঞাপনবৃদ্ধির হেতুই কাগজ ব্যবহারের এত বৃদ্ধি। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে কম্পোজ করিবার সুলভ মূল্য, সুলভ কাগজ এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিজ নিজ বিজ্ঞাপন মানানসই ও নয়নাকর্ষক করিবার জন্য অজস্র অর্থ-ব্যয় হেতুই আমেরিকার পত্রাদির এত উন্নতি ও অরণ্যের উচ্ছেদ।

ছয়খানি প্রধান আমেরিকার সংবাদ পত্রের রবিবার-সংখ্যায় (Sunday edition) গড়ে ৬০খানি পৃষ্ঠা থাকে অর্থাৎ তাহাতে ৪৮০ পৃষ্ঠার একখানি আট-পেজী পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে। যুক্তপ্রদেশে ৪৫৬ খানি রবিবারসংখ্যক (Sunday edition) পত্রাদি প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে কাগজ ব্যয়িত হয় তাহাতে ৫০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ৬০ লক্ষখানি পুস্তকের একটী পুস্তকাগার হইতে পারে। নিউইয়র্কের রবিবার-সংখ্যা পত্রের শতকরা ৩৮½ পৃষ্ঠা পাঠ্য বিষয়াদি, ৩৮½ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনীতে এবং অবশিষ্ট চিত্র ও ব্যাখ্যায় পূর্ণ। ১৯০৫ সালে প্রতি পৌণ্ড কাগজের মূল্য ১½ সেণ্ট (cent) হইতে ২ সেণ্টে (cent) দাঁড়াইয়াছে। কাগজের এই মূল্য বৃদ্ধিতে সংবাদ পত্রাদির লভ্যাংশের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে।

এখন সকলের মুখে এক কথা, উপায় কি? কেহ কেহ ক্যানেডা (Canada) কাঠের উপর করের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার জল্পনা করিতেছে। অন্য কোন দ্রব্য হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা ও আয়োজন চলিতেছে কিন্তু অদ্যাবধি ইহাতে কোন সুফল ফলে নাই। কেহ কেহ পত্রাদির মূল্য ও বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিতেছে।

প্রভাতে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইবার জন্য যে অসংখ্য সংবাদ পত্রের সৃষ্টি, সেই পত্র সমূহের কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের উচ্ছেদসাধন করিতে হয়; ইহা বাস্তবিক ভাবিবার কথা। বৃক্ষের পত্রের অপেক্ষাও সংবাদপত্র অল্পক্ষণ স্থায়ী। সংবাদপত্র প্রায় ভূমিষ্ট হইবামাত্রই নষ্ট হয়, বৃক্ষের পত্র তবু কিছু কাল জীবিত থাকে।"

সহধর্ম্মিণী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মধুপুর বড় সহর নহে, এখানে এইরূপ এক রাত্রে দুইটী খুন হইলে সমস্ত মধুপুর যে চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যাঁহারা খুন হইয়াছেন, তাঁহারা দুইজনেই অতি সম্ভ্রান্ত লোক—মধুপুরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাদিগকে চিনিত; মাড়োয়ারী একজন বড় দোকানদার—আর রমেন্দ্রনাথ সকলেরই প্রিয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইল; এবং একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। গত রাত্রি হইতে এই খুনের কথা ব্যতীত আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল যে, আততায়িগণ মাড়োয়ারীকে খুন করিয়াছে, তাহারা ডাক্তার বাবুকেও খুন করিয়াছে; কিন্তু মাড়োয়ারীর টাকা-কড়ি সমস্তই চুরি গিয়াছিল; তাহারা যদি রমেন্দ্র বাবুকে খুন করিত, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহা কখনই ছাড়িয়া যাইত না। কিন্তু রমেন্দ্র বাবুর সোনার ঘড়ি চেন, তাঁহার হাতের আংটী, তাঁহার পকেটের টাকা কিছুই অপহৃত হয় নাই; সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, টাকার জন্য কেহ তাঁহাকে হত্যা করে নাই। তাহা হইলে তাহারা কখনই তাঁহার আংটী, ঘড়ী প্রভৃতি ছাড়িয়া যাইত না। এইজন্য সকলে মনে করিল যে, যাহারা মাড়োয়ারীকে খুন করিয়াছিল, অহারা রমেন্দ্রনাথকে খুন করে নাই। রমেন্দ্রনাথের হত্যা-কারী অন্য কেহ। এখন জিজ্ঞাস্য—সে কে? কেন রমেন্দ্রনাথকে খুন করিল? মধুপুরে তাঁহার কোন শত্রু ছিল না, তবে কি অন্য কোন স্থান হইতে কেহ আসিয়া তাঁহাকে খুন করিয়া পলাইল? মধুপুরবাসিমাত্রেই এই সকল কথা লইয়া পথে ঘাটে মাঠে বাড়ীতে আলোচনা করিতেছিল।

রমেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দেখিয়া জানা গেল যে, কেহ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছিল; সেই আঘাতেই তিনি ঘুরিয়া পথি-

পার্শ্বস্থ থানার ভিতরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। খুব সম্ভব তাঁহার মস্তকে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি মরিয়াছেন কি জীবিত আছেন, তাহা তাঁহার হত্যাকারী আর ফিরিয়া দেখে নাই, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলাইয়াছিল।

সেখানকার মাটি পাথরের ন্যায় কঠিন, কাজেই নিকটে কাহারই পায়ের দাগ পড়ে নাই। কয় জন লোক সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

রমেন্দ্রনাথের ভৃত্য বলিল, সে বাবুর জন্য জাগিয়া বসিয়া ছিল, রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে বাহিরে একটা শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু পথে অন্ধকারে কেহ পড়িয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে তাহা আর তত লক্ষ্য করে নাই। তাহার পর অনেক লোক বাবুকে মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখিবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিল, তখনও বাবু ফিরেন নাই। রাত্রি বারটা বাজিল তবুও বাবু ফিরিলেন না দেখিয়া তখন সে লণ্ঠন লইয়া বাবুকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। বাবুকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, বাড়ীর কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোকে সে দেখিল যে, কে যেন থানার ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে। আলো ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া সে তখন জানিল, তাহার প্রভু; তখন সে ভয় পাইয়া সকলকে খবর দিয়াছিল।

বলা বাহুল্য প্রফুল্ল কুমার, মনিয়া মালী ও সতীশচন্দ্র যাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সকলকেই বলিলেন। মনিয়াকে সকলেই চিনিত,তাহার উপর সন্দেহ করিবার কোনই কারণ ছিল না, তাহার কথা সহজে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিল না; আবার সতীশচন্দ্র বড় লোক—যদিও তিনি অল্প দিন মধুপুরে আসিয়াছেন, তথাচ সকলেই তাঁহাকে অতি ভদ্রলোক বলিয়া জানিয়াছিল, সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তবে এই দুই জনের দুই রকম কথায় সকলেই কিছু-না-কিছু বিস্মিত হইল মাত্র, কেহই কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না।

যাহাই হউক, পুলিশ নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা এই দুই খুনের অনুসন্ধান বিশেষ রূপে করিতেছিল; তিন দিনের দিন পুলিশের দ্বারা মাড়োয়ারীর দুই খুনী ধৃত হইল; ইহারা দুই জন মহা বলবান্ দোসাদ, ইহাদের কার্য্যই চুরি ডাকাতি। পুলিশ বিনা কারণে ইহাদিগকে ধৃত করে নাই; মাড়োয়ারীর নিকট হইতে ইহারা যাহা কিছু লইয়াছিল, পুলিশ তাহা সমস্তই ইহাদের

নিকটে পাইল। পুলিশ ইহাদের বিরুদ্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাইয়াছিল, সে সকলের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, কয় দিন হইতে এই দুই জন মধুপুরে ঘুরিতেছিল, ইহাদের সঙ্গে দামন নামে আর একটা লোকও ছিল; কিন্তু পুলিশ তাহার কোন সন্ধান পাইল না। যে দুই জন ধরা পড়িয়াছিল, তাহারা বলিল, দামন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা জানে না।

মাড়োয়ারী ও ডাক্তার যে প্রায় একই সময়ে খুন হইয়াছিলেন, তাহাও একরূপ সপ্রমাণ হইল; সুতরাং সকলেই বুঝিল, এই দোসাদগণ কখনই রমেন্দ্রনাথকে খুন করে নাই। তিনি অন্য কোন লোক কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন।

পুলিশ মাড়োয়ারীর হত্যাকারিদ্বয়কে ধরিয়া রমেন্দ্র বাবুর খুনীকে ধরিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইল। ইন্‌স্পেক্টর আগামী রবিবারে এ সম্বন্ধে সকলের এজেহার লইবেন, তাহা প্রচার করিলেন। এই সময়ে রমেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা জননী দেশ হইতে মধুপুরে উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্লকুমার প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, তিনি তাঁহার মৃত পুত্রের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সতীশচন্দ্রের উপরেই ডাক্তারের খুনের সন্দেহ বিশেষ রূপে পড়িল, তবে মধুপুরের কেহ সহজে তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে পারিল না; তাহারা জানিত, রমেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার স্ত্রীর পরিচয় ছিল না, তাহারা সতীশচন্দ্রের মনের ভাবও জানিত না, কাজেই তাঁহার উপরে তাহাদের সন্দেহ তেমন বদ্ধমূল হইতে পারিল না। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কথা স্বতন্ত্র; তাহার স্বামীর মনের ভাব—ভয়াবহ ঈর্ষা—রমেন্দ্রের উপরে স্বামীর আক্রোষ ক্রোধ—হেমাঙ্গিনী এ সকল জানিত; এমন কি একদিন সতীশচন্দ্র তাহার কাছে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, তিনি রমেন্দ্রকে বিধিমতে শিক্ষা দিবেন। তাহার উপর সেদিন সতীশচন্দ্র অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন চোরের ন্যায়—কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া একেবারে শয়নগৃহে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কাপড় জামা ছাড়িয়া অন্য কাপড় জামা পরিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন—তা হৌক, এ সকলেও তাঁহার উপর

সন্দেহ হইবার কারণ ছিল না, তবে তিনি সেই সময়েই রমেন্দ্রের হত্যার কথা বলিয়াছিলেন, তখন এই হত্যাসম্বন্ধে মধুপুরে কেহ কিছু জানিত না—জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না ; তবে কিরূপে তিনি জানিলেন ? হেমাঙ্গিনী আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, তাহার দৃষ্টিপথে পৃথিবী যেন হেলিয়া পড়িতে লাগিল এবং অতি নিদারুণ বেগে বক্ষোবেপন আরম্ভ হইল।

ইহা ভিন্ন সতীশচন্দ্র সর্ব্বদাই বাহির হইবার সময়ে একটা বড় লাঠি লইয়া বাহির হইতেন। তিনি সেই রাত্রে সেই লাঠী লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন কি না,তাহা হেমাঙ্গিনী দেখে নাই ; তবে সেই দিন হইতে এ পর্য্যন্ত সে আর সে লাঠী দেখিতে পায় নাই। সে লাঠী কোথায় গেল ? তিনি সে লাঠীটা কি করিলেন ? হেমাঙ্গিনী শুনিয়াছিল যে, কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে রমেন্দ্রনাথের মস্তকে লাঠী মারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে—স্বামীর উপর এই ভীষণ সন্দেহে হেমাঙ্গিনীর মস্তিষ্কে যেন কে প্রচণ্ড অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল ; কিন্তু তাহার স্বামী যে এরূপ ভয়াবহ কাজ করিবেন, কিছুতেই একথা তাহার মন মানিতে চাহিল না ; হেমাঙ্গিনীর সন্দেহ হয়—বিশ্বাস হয় না।

পর দিন সতীশচন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইলে হেমাঙ্গিনী আসিয়া শয়নগৃহের দরজা বন্ধ করিল। সে দিন তাহার স্বামী যে কাপড় জামা পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই যে লাঠী ব্যবহার করিতেন,তাহা কোথায় গেল,তাহা জানিবার জন্য হেমাঙ্গিনী উন্মাদিনীর মত হইল। তাহার বিশ্বাস, তাহার স্বামী সে সকল এই ঘরে কোন খানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন ; খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার নিজ বাক্স মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যতক্ষণ এই সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা জানিতে না পারিবে, ততক্ষণ হেমাঙ্গিনী কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না, আর এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে সে একেবারে সত্য সত্যই উন্মত্তা হইয়া উঠিবে !

হেমাঙ্গিনী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু সে যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথায়ও পাইল না। তবে কি সে যাহা ভাবিয়াছে, তাহাই সত্য ? প্রকৃতই কি তাঁহার স্বামী তাঁহার সে দিনের জামা কাপড় লাঠী তাঁহার নিজের বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছেন ?

সতীশচন্দ্রের তিন-চারিটা বড় বাক্স ছিল। এই সকল বাক্সের চাবী তিনি নিজের নিকটে রাখিতেন। হেমাঙ্গিনী নিজের চাবীগুলি লইয়া সেই কয়েকটা বাক্স খুলিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, অনেক কষ্টে সে একটা বাক্স খুলিল—

তাহাতে সে কাপড় জামা নাই। আর একটা খুলিল—তাহাতে নাই। তাহার পরে আর একটা খুলিল—কে যেন তাহার বুকে সহসা প্রবলবেগে একটা ধাক্কা দিল—সে উন্মীলিত নেত্রে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল!

সেই বাক্সের মধ্যে সেই লাঠী—ভাঙ্গা—দুই খণ্ডে বিভক্ত—কি একটা কালো দাগ লাঠীর মাথায় রহিয়াছে। লাঠীর নীচেই সেই কাপড় ও জামা, এখন যদিও শুষ্ক, কিন্তু দেখিলেই বোধ হয় কোন দিন এ জামা ও কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছিল!

হেমাঙ্গিনী ক্ষিতিতলন্যস্তজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, এবং এক নিমেষে তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশ্বাসে, তাহার শিরায় শিরায়, তাহার অস্থিগুলির মধ্যে একটা অতি তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তবে—তবে—যথার্থই তাহার স্বামী নরহন্তা—তাহার স্বামী নিরীহ রমেন্দ্রকে সত্যসত্যই হত্যা করিয়াছে?

হেমাঙ্গিনীর চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল—সে স্তম্ভিত হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। সে কি করিয়াছে, তাহার স্বামী তাহা জানিতে পারিবেন—এখন জানিলেই বা কি—তাহার আর সংসারের কোন কিছুতেই আস্থা নাই,—মায়া মমতা নাই,—তাহার হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার পুত্র কন্যা না থাকিলে সে যে এতক্ষণ কি করিত, তাহা বলা যায় না।

এই সময়ে কে দরজায় আঘাত করিল। হেমাঙ্গিনী শরাহত হরিণীর ন্যায় লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে পুরাণ ঝি বলিল, "দিদি, একজন কে এসেছে।"

হেমাঙ্গিনী কি উত্তর দিল, তাহা সে নিজে জানে না, তাহার কোন জ্ঞান ছিল না। ঝি আবার বলিল, "একজন কে এসেছে!"

কম্পিত হস্তে হেমাঙ্গিনী সত্বর বাক্স বন্ধ করিল, তৎপরে ধীরে ধীরে গিয়া দরজা খুলিল। ঝি বলিল, "একজন মেয়ে মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাকে আগে আর কখনও দেখি নি—একি দিদি, তোমার কি অসুখ করেছে? তোমার মুখ চোখ এ রকম হয়ে গেছে কেন?"

হেমাঙ্গিনী অস্পষ্ট স্বরে বলিল "না—মাথাটা ধরেছে। কে এসেছে? বল গিয়ে, আমার অসুখ ভারি অসুখ করেছে।"

ঝির পশ্চাদ্দিক্ হইতে একজন বলিল, "দুই-একটা কথা কহিব, বেশি বিরক্ত করিব না।"

স্ত্রীলোকটী নিঃশব্দে ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল, তাহার হৃদয় আরও দমিয়া গেল, সে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। হেমাঙ্গিনী দেখিবামাত্র এই স্ত্রীলোককে চিনিতে পারিয়াছিল—ইনি রমেন্দ্রের মা।

কলিকাতায় একবার রমেন্দ্রের জননীর সহিত হেমাঙ্গিনীর দেখা হইয়াছিল। সংসারে এই দরিদ্রা জননী ব্যতীত রমেন্দ্রের আর কেহই ছিল না, রমেন্দ্রনাথ মাতার নিকটে নিজের কোন কথাই গোপন করিতেন না। হেমাঙ্গিনীর বিষয় তিনি জননীকে সকলই বলিয়াছিলেন; জননী তাই কলিকাতায় আসিয়া হেমাঙ্গিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। সেই দিন হইতে হেমাঙ্গিনী তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত, অথচ কেন ভয় করিত, তাহা সে জানিত না।

হেমাঙ্গিনী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আসুন—বসুন।"

রমেন্দ্রের জননী আসিয়া গৃহমধ্যস্থ শয্যায় বসিলেন। যতক্ষণ ঝি না চলিয়া গেল, তিনি ততক্ষণ কোন কথায়ই কহিলেন না; আর হেমাঙ্গিনীর কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

ঝি চলিয়া গেলে রমেন্দ্রনাথের জননী অতি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কে আমার ছেলেকে খুন করিয়াছে, তাহা শুনিতে আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।"

হেমাঙ্গিনীর বোধ হইল, তাহার পদতল হইতে পৃথিবী ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে! হেমাঙ্গিনীর গলা কে যেন দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিল! রমেন্দ্রের জননীর সম্মুখে সেই বাক্সমধ্যে তাহার পুত্রের হত্যার ঘোরতর প্রমাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে! তাহা কত ভয়ানক—কত ভীষণ—তাহা হেমাঙ্গিনীর ভাবিবারও ক্ষমতা নাই, হেমাঙ্গিনী কথা কহিতে পারিল না।

রমেন্দ্রের জননী বলিলেন, "তুমি তাহাকে খুন করিয়াছ?"

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল, দ্বিগুণোদ্বিগ্নচিত্তে অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে বলিল, "আমি তাঁহাকে খুন করিয়াছি? কি ভয়ানক! আপনি এই ভয়ানক কথা বলিতে আমার কাছে আসিয়াছেন?"

রমেন্দ্রের জননী বলিলেন, "আমার ছেলে কিরূপে মরিয়াছে, তাহা আমি সব শুনিয়াছি। কে আমার বাছাকে খুন করিল, আমি রাত দিন তাহাই ভাবিতেছিলাম; সকলেই এখানে বলিতেছে, আমার ছেলেকে সকলেই ভাল বাসিত; আজ এই মাত্র শুনিলাম, তুমি এইখানে আছ, এই কথা শুনিবা-

মাত্রই আমার মনে হইল—ওঃ এখন বুঝিতেছি, আমার ছেলে—আমার সোণার চাঁদ বাছা কেন মারা গিয়াছে। আমি জানি, তুমি নিজের হাতে তাহাকে খুন কর নাই—করিতে পার না—তবে অন্য লোক দিয়া তাহাকে খুন করিতে পার! তাহাই কি করিয়াছ?"

হেমাঙ্গিনী নীরবে সর্ব্বাঙ্গে প্রস্তরবর্ষণবৎ এই সকল ভয়ানক কথা শুনিতে লাগিল; তাহার রাগ হইল না, সে বিনীত ভাবে বেদনাপ্লুত হৃদয়ে বলিল, "আপনি এমন ভয়ানক কথা বলিবেন না, আমার প্রাণ দিলে যদি তিনি প্রাণ পাইতেন, আমি তাহাও করিতাম।"

রমেন্দ্রের জননী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, "তুমি আমার ছেলের সুখ শান্তি এক সময়ে নষ্ট করিয়াছিলে—তুমি তাহার জীবনের শনি, কাজেই তাহার এই রকম মৃত্যুতে আমার সন্দেহ স্বভাবতই তোমার উপর হইয়াছে।"

তথাপি হেমাঙ্গিনী রাগ করিল না—যেন লজ্জায় ঘৃণায় মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া গেল; সেই রকম ভাবেই কহিল, "যাহা বহুদিন হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা তুলিয়া আমাকে আর কষ্ট দিবেন না; আপনার ছেলে আমার ছেলের এইখানে রোগে প্রাণরক্ষা করিয়াছেন—আপনার ছেলের অনিষ্ট হয়, এমন কাজ আমি করিব?"

এইবার রমেন্দ্রের মা সুর ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে? এ ত শরীরের অসুখ বলিয়া বোধ হয় না—মনের অসুখ—কিসের জন্য?"

হেমাঙ্গিনী সম্পীড়িত হৃদয়ে বলিল, "আপনার কাছে গোপন করিব না—আপনার ছেলের এই রকম মৃত্যুতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; আমি তাঁহার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানি না।"

"আর তোমার স্বামী?"

"আমার স্বামী! তিনি কেন তাঁহার অনিষ্ট করিবেন?"

হেমাঙ্গিনীর সে সময়ের মনের অবস্থা কি বর্ণন করা যায়? হেমাঙ্গিনীর প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল, সে মনে মনে দৃঢ়রূপে জানে কে রমেন্দ্রকে খুন করিয়াছে। খুনী তাহার স্বামী—তাহার পুত্র কন্যার পিতা! তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা নিহত রমেন্দ্রের জননী! যে কখনও তাহার মত অবস্থায় না পড়িয়াছে, সে কখনও কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে! হেমাঙ্গিনীর যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

হেমাঙ্গিনী বলিল, "আপনি কখনও এ কথা মনে স্থান দিবেন না, আমরা আপনার ছেলের অনিষ্ট করিব, ইহা অসম্ভব।"

রমেন্দ্রের জননী উঠিলেন, উঠিয়া বলিলেন, "হেমাঙ্গিনী, অনেক দিন আগে এক সময়ে তুমি আমার সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছিলে, তোমার জন্য সে আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, সেই সময় যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, তখন বলিয়াছিলাম, যদি তোমার জীবন কখনও দুঃখের—যাতনার—কষ্টের শ্মশানক্ষেত্র হয়, তখন মনে করিও যে, তুমি তোমার নিজের পাপের দণ্ড পাইতেছ। এখনও সেই কথা বলিতেছি—আমার কথা যেন বেশ মনে থাকে!"

হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠরোধ হইল। যথার্থই কি তাহার পাপের দণ্ড ভোগ আরম্ভ হইতেছে। উঃ! আরম্ভ কি ভীষণ!

রমেন্দ্রের মা দ্বারের নিকটে গিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা জান না, কে আমার ছেলেকে খুন করিয়াছে?"

হেমাঙ্গিনী ক্লিষ্টনিশ্বাস সহকারে বলিল, "আমরা কেমন করিয়া জানিব?"

রমেন্দ্রের মা প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে যে একটু অগ্রসর করিয়া দেওয়া উচিত, তাহাতে হেমাঙ্গিনীর সাহস হইল না। সে সেই-খানে বসিয়া পড়িল—সমগ্র পৃথিবী তাহার নেত্রপথে ঘুরিতে লাগিল, এবং তাহার সম্মুখে যেন একটা মহা কোলাহলময় স্বপ্ন-বিভীষিকা জমাট বাঁধিয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে হেমাঙ্গিনী গৃহের বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিল; সেই শব্দে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—আবার কি রমেন্দ্রের মা ফিরিয়া আসিতেছেন!

না—এবার তিনি নহেন। হেমাঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলিল, তখনই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—পিসী মা।

পিসী মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেও হেমাঙ্গিনী কোন কথা কহিতে পারিল না। পিসী মা হেমাঙ্গিনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমার এ কি চেহারা হইয়াছে, তাহা কি দেখিতেছ না?"

তবুও হেমাঙ্গিনী কথা কহিতে পারিল না। তখন তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

পিসী মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখানকার সকল লোকেই নানা কথা বলিতেছে ; হেম, আমি তোমায় দুই-একটা কথা বলিতে চাই।"

তথাপি হেমাঙ্গিনী নীরব। এবং তাহার দৃষ্টি পিসীমার চোখের উপরে নিস্পন্দ!

পিসী মা বলিলেন, "দেখ হেম, কে এই ভয়ানক কাজ করিয়াছে, কি কে করে নাই, তাহা আমি বলিতেছি না ; সতীশ সে দিন যাহা বলিয়াছিল, তাহা এখন এখানকার সকলেই শুনিয়াছে ; এই জন্য নানা লোকে এখন নানা কথা বলিতেছে। যখন রমেন্দ্র খুন হইয়াছে কি না, তাহা কেহ জানিত না, তখন কেমন করিয়া আমাদের সতীশ জানিল, রমেন্দ্র খুন হইয়াছে ? কেবল কি খুন হইয়াছে ? তাহা নহে—কেমন করিয়া কি ভাবে সে খুন হইয়াছে,তাহা পর্য্যন্ত সে বলিয়াছিল : এ কথা তাহার না বলাই ভাল ছিল ; আমিও তখন না বুঝিতে পারিয়া এ কথা প্রফুল্ল বাবুর সম্মুখে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম ; এখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই ; যাহাতে ইহার জন্য অনিষ্ট হইতে না পারে, তাহাই করিতে হইবে।"

হতভাগিনী হেমাঙ্গিনী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হা ভগবান!"

"উপায় আছে—হেম।"

"কি উপায় ?"

"উপায়—আমি আর সুধাংশু দুইজনেই মিথ্যাকথা বলিব। যখন পুলিশ আমাদিগের জিজ্ঞাসা করিবে, নিশ্চয়ই তাহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িবে না—তখন আমরা উল্টা কথা বলিব ; সতীশ যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিব না—সতীশকেও সেই মত কথা বলিতে হইবে।"

"কি বলিবেন ?"

"সুধাংশু বলিবে সে গিরিধি হইতে সে রাত্রে ফিরিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছিল, সেইখানে জন কত লোক দেখিয়া সে-ও দাঁড়ায়—তখন রমেন্দ্রের মৃতদেহ ইহারা দেখিতে পাইয়াছিল ; কি হইয়াছিল, সে সেই সব লোকের নিকটে শুনিতে পায়, তাহার পর, সেই রাত্রে সে আমাদের কাছে আসিয়াই সে কথা বলে।"

"কিন্তু এ কথা ত ঠিক নয়।"

"তাহা আমি জানি, ঠিক না হলেও এখন সতীশকে বলিতে হইবে—এখন আর অন্য উপায় নাই, মিথ্যা হইলেও তাহাকে এই কথা বলিতে হইবে।

আমিও বলিব আমি ভুল করিয়া সতীশের নাম করিয়াছিলাম—খুনের কথা শুনিয়া মাথা ঠিক ছিল না, তাই সুধাংশুর নাম না করিয়া ভুলিয়া সতীশের নাম করিয়াছিলাম ; সতীশও ভুলক্রমে মালীর কথার সহিত সুধাংশুর গোল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে তখন জানিত না যে, দুইটা খুন হইয়াছে, তাই মালী যে খুনের কথা বলিয়াছিল, সতীশ সে খুন ডাক্তার সম্বন্ধেই ভাবিয়াছিল ; এরূপ ভুল হওয়া সম্ভব, আমাদের সকলেরই ভুল হইয়াছিল—এ কেবল ভুল—আর কিছু নয়—হেম, ঠিক মনে থাকিবে ত। পুলিশ আসিবার আগেই আমাদের সকলেরই সব কথা ঠিক করিয়া রাখা উচিত।"

হেমাঙ্গিনী অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "হাঁ. পিসী মা তাই—ভগবান আমার অদৃষ্টে ইহা লিখিয়াছিলেন—এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন !"

পিসী মা বলিলেন,"এখন এ সব কথা যাক্,অন্য কথায় আর এখন কাজ নাই, এখন যাহাতে সতীশ রক্ষা পায়, যাহাতে সকলে আমরা রক্ষা পাই, এখন তাহাই করিতে হইবে, এখন আর কিছু ভাবিবার আবশ্যক নাই।"

"আর—আর—সুধাংশু—সে কি—"

"তাহার বিষয় নিশ্চিন্ত থাক ; সুধাংশু মূর্খ ছেলে নয়, আমি তাহার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি, সে ঠিক বলিবে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, সতীশ সে রাত্রে এ কথা চাকর-বাকরদের সম্মুখে বলে নাই।"

হেমাঙ্গিনী কথা কহিল না, নীরবে বসিয়া রহিল। পিসী মা বলিলেন, "সতীশকে এ কথা বলিও, সে-ও যেন ঠিক এই কথা বলে, তাহা হইলে তাহার কথায় লোকে যে, তাহার উপর সন্দেহ করিতেছে, সে সন্দেহ আর থাকিবে না, সমস্ত গোলই মিটিয়া যাইবে।"

পিসী মা চলিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী সেইখানে করতললগ্নশীর্ষ বিষণ্ণ পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া রহিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সে উঠিয়া তাহার খোকার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পিসী মা, হেমাঙ্গিনী স্বামীকে যে কথা বলিতে বলিয়াছেন, সে কথা এখন হেমাঙ্গিনী কিরূপে তাহার স্বামীকে বলিবে ? ইহা কি বলা সম্ভব ? হেমাঙ্গিনী সমস্ত দিন ইহাই ভাবিল। সতীশচন্দ্র বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সে একাকী বিছানায় পড়িয়া ইহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া, সমস্ত দিন ভাবিয়াও সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বৈকালে সতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। তিনি হেমাঙ্গিনীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি—ভারি অসুখ করেছে না কি ?"

হেমাঙ্গিনী কাতরে বলিল, "হাঁ, একটু অসুখ করেছে।"

"নিজের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমাও গে যাও—তাহা হইলে অসুখ সারিবে।"

"এইখানে বেশ আছি।"

সতীশচন্দ্র মুখ অবনত করিয়া সস্নেহ মৃদুহাস্যে হেমাঙ্গিনীর ললাটে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন, হেম কাতরে অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইল। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, ঘরের ভিতরে অল্প অন্ধকার সঞ্চিত হইয়াছিল, সতীশচন্দ্র সেই অন্ধকারে হেমাঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ দেখিতে পাইলেন কি?

সতীশচন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। মৃদু স্বরে অতি দৃঢ় ভাবে বলিলেন, "কি ভুল বিশ্বাস মাথার ভিতর আনিয়াছ—আমি বলিতেছি—সম্পূর্ণ ভুল—সম্পূর্ণ ভুল।"

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অন্ধকার এক-পা এক-পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিল। সন্ধ্যার পর সুবিধা পাইয়া পিসী মা আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সতীশকে সে কথা বলিয়াছিলে?"

হেমাঙ্গিনী কম্পিত স্বরে বলিল, "পিসী মা, তুমি বলিও—আমি পারিব না।"

পিসী মা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাজেই—দেখিতেছি, আমায় বলিতে হইল। সতীশের সব কথা জানা উচিত।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সোরাব ও রস্তম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উঠ,ত্যজ ক্রোধ; নাহি ক্রোধলেশ মম !
দেখিলে তোমারে কোপ করে অন্তর্দ্ধান !
কহিলে, রস্তম্ নহ তুমি, বীর ! ভাল,
কেবা তুমি তবে,হেরিলে তোমারে.কেন
অন্তরের তলে জাগে ব্যথা ! দেখিয়াছি.
বালক যখন আমি, যুদ্ধ শত শত ;
দলিয়াছি সমরের শোণিততরঙ্গ
মহারঙ্গে ; শুনিয়াছি কাতর বিলাপ
মুমূর্ষুর শুষ্ককণ্ঠে ! কিন্তু কাঁদে নাই
এমন অন্তর কভু ; কঠোর হৃদয়ে
স্বর্গ হ'তে আসিল কি কোমল বেদনা !
সাহারার তপ্তবক্ষে সুশীতল ধারা
তটিনীর ; বীরবর, দু'জনে, ঈশ্বরসাক্ষী,
পরিহরি রণ ; আইস পুঁতিয়া রাখি
শক্তি বিভীষিকা হেথায় ধরার বক্ষে ;
সন্ধি করি দোহে ; সৈকত আসনে বসি,
করি সুরাপান মিত্রভাবে, দুইজন
উচ্চারি মঙ্গল ! শুনিব তোমার মুখে
রস্তমের কথা কীর্ত্তিগাথা বীরত্বের !
আছে শত্রু শত শত পারসীক দলে,
সে সবারে আক্রমিতে পারি অনায়াসে ;
লাগেনা অন্তরে ব্যথা ! শূর অসংখ্যক
বিরাজে তাতারসৈন্যে, যোগ্য তব রণে ;
যুঝহ তা'দের সনে, স্পর্দ্ধা করে যা'রা,
তোমার শক্তির আগে !. কিন্তু,
তোমা আমা !—
অহো, ভুঞ্জি সুখ দোহে সুখশান্তি-
ক্রোড়ে !"

নীরব সোরাব ! রস্তম্ দণ্ডায়মান
সরল, সরল যেন, কম্পমান কোপে ;
ত্যজিল মুদ্গর, শক্তি নিল ডান করে
বর্ম্মাবৃত ! তীক্ষ্ণ তার জ্বলিছে দশন
শিখাময় প্রাণঘাতী, ধূমকেতু যেন
গগনের ভালে জ্বলে অমঙ্গলময় !
সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধূসর ধূলায় ;
প্রভাহীন অস্ত্র শস্ত্র ; কাঁপে বক্ষঃস্থল,
মহাকোপে ; ফেনরাশি নিঃসরে বদনে ;
বদ্ধকণ্ঠে দুইবার না সরিল ভাষা !

কতক্ষণে কহে বীর স্খলিত অক্ষরে ;
ভীরু ! পলায়নপটু ! অকুশল রণে !
বিলাসনাটক ! খল ! চাটুবাদ-পটু !
যুঝ, আনিও না মুখে ঘৃণার ও কথা !
এ নহে রাজার তব প্রমোদকানন !
নহ তুমি এবে সেই বিহারবিপিনে
তাতারবালিকা সহ নৃত্যসহচরী !
হের, দাঁড়াইয়া আছ, সৈকত পুলিনে
আতুর, করিতে নৃত্য রণরঙ্গমঞ্চে
মোর সঙ্গে ; যুদ্ধ মোর নহে বিলাসের
অভিনয় ! দুইজনে যুঝিব নিশ্চয়,
জয় কিংবা পরাজয় নহে যতক্ষণ !
আনিওনা মুখে আর সন্ধির প্রস্তাব !
সুরাপান কথা কিংবা মঙ্গল-আচার !

করহ স্মরণ গীর বীরত্বের কথা;
ছল চাতুরীর তব করহ পরীক্ষা!
লঘুগতি উল্লম্ফনে—ভীরুর কৌশলে,
ব্যর্থ করি দুইবার সন্ধান আমার,
করিলে লজ্জিত, তাই নাহি আর দয়া!'
কহিলা রস্তম হেন! তীব্র উপহাসে
কোপেতে জ্বলিল যুবা, নিষ্কোষিলা অসি
যেমন যুগল শ্যেন, লক্ষি এক বুলি,
পূর্ব্বাপর গগনের দুইপ্রান্ত হ'তে
ধায় তীরপাত-বেগে, ধাইল সেরূপ
দোহে দোঁহাকারে লক্ষি; চর্ম্মে চর্ম্মে বাজি;
উঠিল ঝঞ্ঝনা ঘোর, ধ্বনিল গগন!
যেমন প্রভাতকালে, বিজন বিপিনে,
উঠে কুঠারের ধ্বনি, বৃক্ষ মড়মড়ি,
কাটি কাঠুরিয়া যবে পাড়ে বনস্পতি!
দু'জন দু'জনে হেন হানিল নির্ঘাত!
নিরখি অদ্ভুত যুদ্ধ, ব্যথিত তপন
ঢাকিল জলদে মুখ; হইল আঁধার
রণস্থল! সমীরণ বহিল প্রবল
গাইয়া বিলাপগান, সমরপ্রাঙ্গণ,
সমবেদনায়! ঢাকিল যুগল বীরে
বায়ুর আবর্ত্ত, উড়ায়ে বালুকারাশি!
দুই বীর রহে মাত্র অন্ধকারে ডুবি;
দু'পাশে দাঁড়া'য়ে সৈন্য দীপ্ত দিনমানে
নির্ম্মল গগনতল; স্বচ্ছ আমুহ্রদে
ভানুকরমালা খেলে, চঞ্চল, উজল!
সোরাব রস্তম্ কিন্তু যুঝে অন্ধকারে!
শোণিতে লোহিত চক্ষু, হর্য্যক্ষ যেমন
কোপান্বিত! বহে শ্বাস মহারণ-ক্লেশে!
যেন দুই অজগর গরজে ভীষণ
প্রলয়পবন তুলি, নিশ্বাসে নিশ্বাসে!
রস্তম্ হানিলা শূল চর্ম্মে সোরাবের!
নিবারিল শূল যুবা, লৌহসার-ফল
ভেদিল সে চর্ম্ম, কিন্তু নারিল স্পর্শিতে
গাত্রচর্ম্ম! মহাকোপে গরজি রস্তম্,
উপাড়িল শূলবর! সোরাব তখন
হানিল সবেগে অসি, লক্ষি শিরস্ত্রাণ
রস্তমের, লৌহশর নারিল ভেদিতে
একবারে! লোমপুচ্ছ শিরস্ত্রাণ-চূড়া,
দর্পের উদ্ধত কেতু,—নারিল ধর্ষিতে
যাহা কোনো বীরবর—বিচ্ছিন্ন পাড়িল
কিন্তু সে সৈকতভূমে, ধূলায় ধূসর!
করিলা মস্তক নত রস্তম্ অমনি!
ঘোর অন্ধকার ক্রমে হৈল ঘনতর
সেই কালে! কড় কড় গর্জ্জিল ভীষণ
শতহ্রদা বায়ুপথে, গগনগবাক্ষে
চাহিয়া লোহিত চক্ষে, তুলি যবনিকা
জলদের! সন্নিহিত রুক্ষ হয়বর,
নাদিল ভীষণ রুক্ষ! গরজিল যেন
শ্রবণভৈরব, মৃগেন্দ্র সঙ্গিনীহীন
কাতর জর্জ্জর সারাদিন ব্যাধবাণে
সমাগত তথা নিশাকালে মরিবারে!
শুনিলা সভয়ে শব্দ বাহিনীযুগল!
চঞ্চল আমুর স্রোত দাঁড়ায়, অচল!
সোরাব শুনিল, কিন্তু নির্ভীকহৃদয়
ধাইল হানিতে পুন অসি শিরস্ত্রাণে!
রস্তম্ নোয়ায় মাথা; চর্ম্মে বাজি অসি,
কাচ যেন, খণ্ডে খণ্ডে পড়ে শিরস্ত্রাণে!

রহিল কেবল অসিমুষ্টি মুষ্টিতলে!
মস্তক রস্তম্ বীর তুলিল তখন!
ঘোর নেত্রে অনিমেষ চাহিল সোরাবে!
ঘুরা'য়ে ভীষণ শক্তি গগনের পথে,
উচ্চারে "রস্তম্" নাম! সোরাবের
কানে
পশিল সে ধ্বনি, বীর শঙ্কিত, স্তম্ভিত,
সরিল পশ্চাতে পদমাত্র! সবিস্ময়
সবিশেষ নিরখে মূরতি, ধাবমান
পুরোভাগে! হতবুদ্ধি দণ্ডাইল বীর;
ফেলিল শরীরত্রাণ চর্ম্ম; পৃষ্ঠদেশ
অমনি বিদ্ধিল বেগে, তীক্ষ্ণহুল শূল!
অবসন্ন দেহ বীর টলিতে টলিতে
পড়িল ধরণীতলে! তিমির নিবিড়
পলাইল অদৃশ্যেতে; স্তিমিত পবন;
বাষ্পে উড়াইয়া মেঘ, উজ্জল তপন
বাহিরিল শূন্যপথে! পারস্য তাতার
হেরিল উভয়ে!—রস্তম্, দণ্ডায়মান
অক্ষতশরীর! সোরাব, বিক্ষতদেহ
শয়িত সৈকতে, রুধিররঞ্জিত তলে!
হাসি অবজ্ঞায়, তবে কহিলা রস্তম্;
সোরাব, ভাবিয়াছিলে, বিনাশিবে আজ
পারসীকবীরে, খণ্ডে খণ্ডে মৃতদেহ
ছিঁড়িবে তাহার; উড়াইয়া জয়কেতু
পশিবে শিবিরে? অথবা, যদ্যপি রণে
রস্তম্ আপনি আসিতেন যুঝিবারে,
তোমার চাতুরীমুগ্ধ লইতেন যদি
উপহার, স্বশিবিরে ফিরিতে অক্ষত;
সফল হইত আশা! তাতারবাহিনী
গাইত তোমার খ্যাতি, বাখানি পৌরুষ,
অথবা, চাতুরী তব; প্রচার করিত
যশ, দেশে দেশে! প্রাচীন জনক তব
ভাসিতেন সুখে! হইলে নিহত, অজ্ঞ!
অজ্ঞাতের হাতে ফুরাইল জীবলীলা!
ফিরিলে শিবিরে জয়ী অক্ষতশরীরে,
হইতে পিতার প্রিয়, প্রিয় তাতারের?
প্রিয়তর কিন্তু এবে হইবে শিবার!"
রস্তমের বাক্য শুনি, সোরাব নির্ভীক
কহিলা;—"নিশ্চয় তুমি অজ্ঞাত!
তথাপি
শূন্যগর্ভ গর্ব্ব তব! করিও না মনে,
গর্ব্বিত! সোরাব হত তোমার প্রহারে!
কখনও নয়! রস্তম্ মারিল মোরে,—
পিতৃভক্ত সুতে! থাকিতাম যদি আমি
অক্ষতশরীর, আসিত যুঝিতে যদি
প্রতিযোধরূপে দশবীর, তুল্যবলী,
থাকিত হেথায় পড়ি, থাকিতাম আমি
অক্ষত দণ্ডায়মান, তোমার সমান!
কিন্তু রস্তমের নাম—প্রিয়নাম মম
পশিল শ্রবণে, কর করিল শিথিল!
সেই নাম, কহিনু নিশ্চয়, সেই নাম,
আর তব মুখচ্ছবি স্নেহ সুধামাখা
(এখনো বিঁধিছে তাহা অন্তর আমার!)
করিল দুর্ব্বল হস্ত, খসিল ফলক,
বিঁধিল তোমার শূল, শক্র অসজ্জিত!
করিছ গরব বৃথা, নিন্দিছ নিয়তি
মম, বীর! কিন্তু, কহি শুন, দুরাচার!
(শুনিলে কাঁপিবে প্রাণ!) এ মৃত্যুর মম
লইবেন প্রতিহিংসা মহাপরাক্রম
রস্তম্! জনক মম, অন্বেষিণু যাঁ'রে

সর্ব্বস্থানে, করিবেন বৈরনির্যাতন
সুনিশ্চয়! সমুচিত দিবেন নিগ্রহ!"
যেমন বসন্তকালে, হেরিলে কিরাত
ঈগলী রক্ষিছে শিশু আপন কুলায়ে
পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদতটে গিরিচূড়ে,
বিন্ধে তা'রে শরাঘাতে ব্যাধ নিরদয়,
পরিহরি নীড় যবে উড়ে বিহঙ্গিনী,
ধায় পাছে পাছে, লক্ষি বিদ্ধ লক্ষ্য তা'র;
হেনকালে, খাদ্যসহ ফিরিয়া ঈগল
দেখি দূরে থাকি তা'র শাবক সকল
অরক্ষিত, (কোথা গেছে ছাড়িয়া সঙ্গিনী,)
দ্রুতপক্ষে আসি, উড়ে নীড়ের উপর
চক্রাকারে, তারস্বরে চীৎকারে কর্কশ,
(যেন ক্রুদ্ধ ডাকে নীড়ে সঙ্গিনীরে তা'র)
কিন্তু হায়, জানেনা সে বিদ্ধ বিহঙ্গিনী
ম্রিয়মাণ, পড়ি আছে যেন পক্ষস্তূপ,
যন্ত্রণায় কম্পমান, দূর গিরিপথে
দৃষ্টির অতীত,—হায়, উড়িবেনা আর
বিহঙ্গিনী হ্রদবক্ষে, ফুটিবেনা তা'র
বিম্বরূপে মূর্ত্তি আর হ্রদের দর্পণে,
গাহিবেনা শৃঙ্গে শৃঙ্গে আর প্রতিধ্বনি
তাহার ভৈরব রব!—পশে নিজ নীড়ে
বিহঙ্গম, জানেনা যে সর্ব্বনাশ তা'র,
সেরূপ রস্তম্ আপনার বংশনাশ
কিছু না বুঝিল! মুমূর্ষু পুত্রের পার্শ্বে
রহিল দাঁড়া'য়ে; চিনিলনা কে সোরাব!
অবিশ্বাস করি, কহিল বিরক্ত স্বরে;—

"পিতা! প্রতিহিংসা? একি প্রলাপের কথা!
ছিলনা তনয় কভু বীর রস্তমের!"
সোরাব স্খলিত স্বরে উত্তরিল তবে;
"নিশ্চয়, নিশ্চয় ছিল পুত্র রস্তমের!
আমি(ই) সে অজ্ঞাত পুত্র! নিশ্চয় এ কথা
একদিন, একদিন শুনিবেন পিতা!
এত দীর্ঘ কাল বীর নিবসেন যথা,
(জানিনা কোথা সে স্থান; কিন্তু কোনো স্থান
বহুদূর) একদিন রটিবে তথায়
এ বারতা; শুনিবেন রস্তম্ নিশ্চয়!
বিঁধিবে শ্রবণ তাঁর শূলাঘাত-প্রায়,
রোষানলে প্রজ্বলিত, ক্ষোভিত, সজ্জিত,
বৈরনির্যাতনে রণে আহ্বানিবে তোমা!
দুরাচার, ভাবি দেখ, একমাত্র পুত্র
আমি; বীর রস্তমের! জ্বলিবে কিরূপ
শোক; প্রতিহিংসা তার কিরূপ ভীষণ!
থাকিত যদ্যপি, হায়, তাবৎ জীবন
দেখিবারে পুত্রশোক! কিন্তু,তাঁর তরে
মোর নাহি তত শোক? কাঁদে প্রাণ মম
বড় জননীর তরে! আজারবেজানে
নিবসেন মাতা মোর, বৃদ্ধ রাজা সনে,
পিতা তা'র,—কূর্দ্দপতি! পলিত মস্তক
তাঁর জরার তাড়নে! বড় শোক স্মরি মায়ে!
না দেখিবে মাতা মোর সোরাবে কখন
তাতারশিবির হ'তে আর প্রত্যাগত
রণশেষে, রণলব্ধ সামগ্রীসম্ভারে

সম্মানিত ! দেশে দেশে হইবে প্রচার
মৃত্যুর বারতা মম ; শুনিবেন তিনি
অবশেষে ; জানিবেন মাতা অসহায়,
সোরাব, তনয় তাঁ'র নয়নানন্দন,
আনন্দসাগরে আর ভাসিবেনা, হেরি
জননীর মুখ ! হইল নিহত পুত্র
আমুর পুলিনে, দূরে—অতি বহুদূরে,
যুঝি দ্বন্দ্বরণে অজ্ঞাত শত্রুর করে !"
রস্তমে এতেক বলি, নীরব সোরাব !
অসহায় জননীর বিষণ্ণ বদন,
মানস চক্ষুর পথে ধীরে দেখা দিল,
ভাবিল আপন মৃত্যু, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে !
রস্তম্ একান্ত মনে শুনি এ কাহিনী
চিন্তার সাগরে মগ্ন ! ভাবে নাই মনে
তখনো,সোরাব তা'র অজ্ঞাত নন্দন !—
শুনিয়া সে সব নাম. পূর্ব্বপরিচিত,
উপজিল মনে বটে সকল ঘটনা !
অভাগিনী মাতা. (রস্তম্ আসিয়া. পাছে
ল'য়ে যায় সুতে, শিখাইতে ধমুর্ব্বেদ)
জানাইলা বীরে, সোরাবের জন্মকালে,
জনকভবনে, "জন্মিল দুহিতা এক,
নহে সে তনয় !" ভাবিল রস্তম্ তাই,
"সোরাব নিশ্চয় অহঙ্কারে আপনার
দিল পরিচয় 'রস্তমের পুত্র' বলি ;
অথবা তাতারবাসী দিয়াছে যুবকে
হেন আখ্যা,ছড়াইতে যশের সৌরভ !"
এতেক ভাবিয়া বীর, শুনিলা কাহিনী
সোরাবের, নিমগন গভীর চিন্তায় !
শোকেতে পূরিল মন ! পূর্ণিমায় যথা
সাগরের মহাস্রোত উছলিয়া উঠি,
ভাসাইয়া দেয় বেলা ! নয়নের প্রান্তে
অশ্রু দেখা দিল আসি ! স্মরণ হইল
নব যৌবনের কথা একে একে ;
যৌবনের
উদ্দাম প্রমোদ ! যেমন প্রভাতকালে,
রাখাল বালক, থাকি উচ্চ গিরিগৃহে,
দেখে কতদূরে, চঞ্চল মেঘের মাঝে,
সুন্দর নগর সৌরকরে সমুজ্জ্বল,
রস্তম্ সেরূপ অস্পষ্ট স্মৃতির মাঝে,
হেরিলা যৌবন কতদূরে আলোকিত !
নিরখিল যৌবনের উদ্ভিন্ন বিকাশে
সোরাবের মাতা ; বৃদ্ধ রাজা,পিতা তাঁর,
ভাল বাসিতেন যিনি প্রাণের সমান
রস্তমেরে, সমাদরে দিলেন দুহিতা
রূপবতী, আনন্দিত, দেখিলেন তাঁ'রে !
তিনের, উজ্জ্বল সুখে জীবনের দিন
সুদূর, সুদূর সেই নিদাঘের মাঝে,
সেই দুর্গ, সেই বন শিশিরে সিঞ্চিত,
সে মৃগয়া, মৃগয়ার সেই সারমেয়,
সুখের সে গিরিমাঝে বিমল প্রভাত,—
একে একে রস্তমের হইল স্মরণ ;
চাহিলা যুবকপানে, সুন্দর দর্শন ;
যৌবনের মুখে পুত্রের প্রতিমা যেন
পাইল দেখিতে ; করুণা জাগিল মনে,
হেরিয়া সোরাবে শয়িত সৈকত তটে !
প্রস্ফুটিত করবীরে, যৌবনের কালে,
কাটিয়া ফেলিলে যেন উদ্যানপালক
অকুশল, ঘুচাইতে তৃণের জঞ্জাল
তা'র মূলে, পড়ি থাকে হাস্যময় ফুলে
সুদর্শন, শুষ্কপ্রায় তৃণস্তূপোপরি,

সেরূপ পতিত হায়, আমুর পুলিনে
সোরাব, সামান্য সেই সৈকতশয্যায়,
মৃত্যুগ্রাসে। তবু কত কান্তি সে শরীরে।
ভানুকর ফুটে না কি মেঘের কবলে?
দীপশিখা সমুজ্জ্বল নির্বাণের কালে।
একদৃষ্টে শোকাকুল চাহিল রস্তম্
যুবার সে মুখ পানে, কহিলা সোরাবে;
সত্য বটে সেইরূপ (ই) পুত্র-রত্ন তুমি।
যদ্যপি হইতে তুমি রস্তমের সুত,
ভাল বাসিতেন তিনি প্রাণের সমান!
কিন্তু এ কি ভ্রান্তি তব! অথবা সকলে
শিখাইল মিথ্যা কথা তোমারে, সোরাব!
নহ কখনই তুমি রস্তমের সুত।
পুত্র নাহি রস্তমের; এক, আর নহে—
একমাত্র আছে তাঁ'র দুহিতা, সোরাব!
আছে সে মায়ের সঙ্গে; জীবিকা তাহার
নারীর সহজ সাধ্য কার্য্য লঘুতর।—
ভাবে না, স্বপ্নেও কভু ভাবে না,
পিতারে!
ভাবেনা যুদ্ধের কিংবা বিপদের কথা!"

ক্রমশঃ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাতাল খণ্ড। ইহাতে সর্প-দেবতার বাসস্থান পাতাল-বিবরণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে। ইহাতে রামের বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু যেস্থলে রামের বৃত্তান্ত আরম্ভ হইল, সেস্থলে পুলস্ত্যের পরিবর্ত্তে শেষদেব বক্তা হইয়া রাম ও তাহার সন্তানসন্ততিগণের ইতিহাস বিবৃত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় ইহার সংগ্রহকর্ত্তা কালিদাসের রঘুবংশকে আদর্শ করিয়া তাহা হইতে এ বৃত্তান্তের আভাষ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময়ে ইহাতে নূতন ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ব্যাপারের দ্বারা অনেকগুলি অধ্যায় পরিপূর্ণ। অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ঞীয় অশ্বকে উৎসর্গ করিবার উদ্যোগের সময়ে অশ্বটী একটী ব্রাহ্মণের আকার ধারণ করিল। এই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে অশ্বযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু রাম সেই অশ্বকে ছেদন করিবার উদ্যোগ করাতে তাহার দেহ সুস্থ হইল এবং সে ঘোটক দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আলোকের জ্যোতির ন্যায় স্বর্গে

গমন করিল। তাহার পর শ্রীভাগবতের প্রশস্তি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং বিষ্ণুআরাধনার ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল ব্যাপার তন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে সদাশিব বক্তা এবং পার্ব্বতী শ্রোতা।

উত্তর খণ্ড অত্যন্ত অসমজাতীয় পদার্থের বৃহৎ সমষ্টি। কিন্তু ইহা যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃতিবিশিষ্ট সে বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিবাদ হইতে পারে না। অন্য কোন উপাসকসম্প্রদায়ের ধর্ম্মের ভাব ইহাতে আদৌ নাই। ইহার প্রধান সন্দর্ভগুলি প্রথমে দিলীপ ও বশিষ্ঠমুনির বাদানুবাদে কীর্ত্তিত। যেমন মাঘমাসের স্নানের ফল কি? লক্ষ্মী নারায়ণকে স্তব বন্দনার শক্তি কত প্রবল? কিন্তু ভক্তির প্রকৃতি, বিষ্ণুর প্রতি বিশ্বাস, বিষ্ণুর নাম দ্বারা দেহ চিহ্নিত করা, বিষ্ণুর অবতারসম্বন্ধীয় গল্প, বিশেষতঃ রাম অবতারে তাহার কার্য্য-কলাপ, বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি মানবের বিবেকশক্তির উপর নিহিত। এই সমস্ত বিষয় শিব, পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে বর্ণনা করেন। তৎপরে দিলীপ ও বশিষ্ঠের কথোপকথন পুনরারম্ভ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের মধ্যে কেবল বিষ্ণু কেন সম্মানার্হ তাহা বশিষ্ঠ রাজা দিলীপকে বুঝাইয়া দেন। শিব কামুক এবং ব্রহ্মা অহঙ্কারী, বিষ্ণুই কেবল নির্ম্মল চরিত্র। শিবের বাক্য অবসানে বশিষ্ঠমুনি ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। যে সকল মানব ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাদিগের মন জ্ঞানালোকসম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক খণ্ডের গুণ নীতিপ্রদ উপন্যাস দ্বারা দৃষ্টান্তরিত হইয়াছে। এই খণ্ডের অধিকাংশে অন্যান্য বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটীতে কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সহিত কতকগুলি গল্প সংযুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশই নূতন।

ক্রিয়াযোগসারে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সূত কর্ত্তৃক ঋষিগণের নিকট কথিত হইয়াছিল। কলিযুগে মনুষ্যগণের কি প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে, কারণ তাহারা পূর্ব্বকালের ন্যায় তপোনুষ্ঠান ও ত্যাগস্বীকার করিতে অসমর্থ সুতরাং কলিযুগে কি প্রকারে তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিত হইবে? জৈমিনি ব্যাসকে এই প্রশ্ন করাতে ব্যাস তদুত্তরে যাহা বলেন, তাহাই ক্রিয়াযোগসারে বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের শেষ অধ্যায়ে বিষ্ণুর উপাসনা করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে এই উত্তরই ব্যাস জৈমিনিকে প্রদান করেন। বিষ্ণুর বিষয়ে চিন্তা, তাঁহার নাম জপ, তাঁহার নাম দ্বারা দেহ চিহ্নিত করণ, তাঁহার মন্দিরে

তাঁহার উপাসনা, এ সমস্তই নৈতিক বা উপাসনা বা চিন্তাবিষয়ক গুণের মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র।

পদ্মপুরাণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র। কিন্তু তাহাদের কোনটী পুরাণের আদি লক্ষণাক্রান্ত নহে। কালসম্বন্ধে প্রথম তিনটী অংশের কোনপ্রকার সংস্রব থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা অধিক পুরাতন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তন্মধ্যে জৈনদের নাম ও তাহাদের ধর্ম্মের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ম্লেচ্ছদিগের বৃত্তান্ত আছে এবং বৈষ্ণবদের চিহ্নধারণের প্রশংসা আছে। এরূপ ব্যাপার কখনই পুরাকালে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। পাতাল-খণ্ডে ভাগবতের সমস্ত ব্যাপার বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা ভাগবতের পরবর্ত্তী কালে লিখিত। ইহাতে শালগ্রাম শিলা ও তুলসীবৃক্ষের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং তপ্ত মুদ্রার ব্যবহার অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহদ্বারা বিষ্ণুর নাম গাত্রচর্ম্মে ছাপ প্রদান করিবার এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যবহার ও ক্রিয়া ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই আধুনিক। ইহাতে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গ প্রভৃতির আধুনিক মন্দিরের বিষয় এবং তুঙ্গভদ্রাতীরস্থিত হরিপুরের বিষয় উল্লিখিত হই-য়াছে। এই হরিপুরের স্থলে খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়নগর সংস্থাপিত হয়। ইহাদ্বারা ইহাদের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। ক্রিয়াযোগ-সারও আধুনিক, বোধ হয় ইহা বঙ্গদেশীয় কোন লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত। পদ্মপুরাণের কোন অংশই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষা পুরাতন নহে। আর ইহার শেষ অংশ পঞ্চদশ বা ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ। যাহাতে পরাশর বরাহকল্পের ঘটনাপরম্পরা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্যবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাকেই বিষ্ণুপুরাণ কহে এবং পণ্ডিতগণ জানেন যে ইহাতে ত্রয়োবিংশতি সহস্র শ্লোক আছে।* এস্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত বিষয়গুলি অন্যান্য পুরাণের বিষয়ের সহিত তুলনা করিলে অনুভূত হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণখানি পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্ট। ইহাতে পাঁচটী লক্ষণই বর্ত্তমান আছে এবং যদিও পরকীয় ও উপাসক-

---

* বরাহ কল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাশরঃ।
যৎ প্রাহ ধর্ম্মানখিলাংস্তদুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ॥
* * *
ত্রয়োবিংশতি সাহস্রং তৎপ্রমাণং বিদুর্বুধাঃ।

সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাভিমতের আভাষ ইহাতে লক্ষিত হয়, তাহাতে কিন্তু বিশেষ বিবেকশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুভূত হইবে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাবের ঐকান্তিকতা প্রচলিত প্রশান্ত পথ পরিভ্রষ্ট হয় নাই। আর জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকাসম্ভূত যাহা ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সংখ্যায় তাহারা নিতান্ত কম এবং সেগুলির সন্নিবেশ সুপ্রণালী-অনুসারে করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ অংশ নামে ছয় ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে স্বর্গ ও প্রতিস্বর্গের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে জগৎ কিরূপে উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই প্রথম বিভাগে লিখিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় বিভাগে লিখিত আছে কিরূপে আদিম অবিভাজ্য পদার্থ হইতে বস্তুর আকারের বিকাশ হইয়াছে। এতদুভয় সৃষ্টি সাময়িক। কিন্তু ব্রহ্মার তিরোভাবের সহিত প্রথম সৃষ্টির অবসান হয়। সে সময়ে যে দেবতাগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ বিধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তাঁহাদের সঙ্গে ভৌতিক পদার্থসমূহ আপনাদের মৌলিক সমষ্টির সহিত মিলিত হয়। একজন সর্ব্বময় কর্ত্তামাত্র অবশেষে থাকেন। প্রত্যেক কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার জীবনের এক দিনে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শ্বাপদাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জগতের অপর সমস্ত পদার্থ সম্পূর্ণাবয়বে ঋষিগণ এবং দেবতাগণের অবস্থান সম্বন্ধে কোন ব্যত্যয় হয় না।

বিষ্ণু এবং অন্যান্য পুরাণে লিখিত ভূতসমষ্টির সৃষ্টির বিবরণের মর্ম্ম সাঙ্খ্যদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পরাবলম্বী ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব মিশ্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তাহাদের মধ্যে বেদান্তদর্শনের মনমোহকর সূত্র কতক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে এবং বহু দেবদেবী আরাধনা-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের পৌরাণিক শিক্ষানীতির প্রাধান্য তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রধানের নিরপেক্ষ সত্ত্বা বিসদৃশ হইলেও এবং পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের অনৈক্য থাকিলেও ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, বিষ্ণু কেবল পুরুষ নয় তিনি প্রধানও বটে এবং কেবল প্রধান নয় তিনি সমস্ত চাক্ষুষ পদার্থ এবং কালরূপী। তিনি পুরুষ, প্রধান, ব্যক্ত এবং কাল। এরূপ সংস্কার হিন্দুদের আদিম ধর্ম্মসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই এবং তাহা হইতে পৃথক নহে। এই ধর্ম্মসূত্রে ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং তদিচ্ছায় পৃথিবীর সৃষ্টি তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টির প্রতিরোধ হওয়াতে সৃষ্টি সম্পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, এইরূপ অসঙ্গত ভাবে তাহা বিবেচিত হইলেও তাহাতে যখন তাহার গুণসমূহ আকার-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হয়, তখন তাহা কার্য্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই

গুণসমূহের আকারগুলি হইত পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় শরীরী ভাবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ তখন তদ্দ্বারা জড়প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই তিন দেবতাকেই বিষ্ণু বা বিষ্ণুর প্রতিকৃতি বলিয়া বৈষ্ণব পুরাণে বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার শৈব পুরাণে ইহাদিগকে শিব বলিয়া গৃহীত হয়। পুরাণসমূহ অনুমেয় বিসদৃশ ভাবের সত্ত্বা এইরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। অন্যান্য দেবতত্ত্বে এবম্ভূত ব্যাপারের ছায়াও লক্ষিত হয় না। সে যাহাই হউক একটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতার তিনটী পৃথক পাদার্থিকতা সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত ও বিসদৃশ ভাবের সত্ত্বা পুরাণেই দেখা যায়।

জীবজন্তুর অবস্থানের জন্য পৃথিবী সম্যক উপযোগী হইবার পর, ব্রহ্মার মানসপুত্র অর্থাৎ প্রজাপতিগণ ও তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের তথায় বসতি হইল। এতদ্দ্বারা এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, সর্ব্বপ্রথমে সাতটী ধর্ম্মাত্মা হইতে উদ্ভব মনুষ্যের বংশাবলীর আদিম আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, কিন্তু কাল-সহকারে সেই গল্পসমূহ অসঙ্গতভাবে বিস্তৃত আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পত্নী না থাকিলে সপ্তর্ষিগণের সন্তান-উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের পত্নীর সত্ত্বার জন্য স্বায়ম্ভুব মনু ও তাহার স্ত্রী শতরূপাকে এই আখ্যায়িকার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইল; অর্থাৎ ব্রহ্মা পুরুষ ও স্ত্রী এতদুভয়ের কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং তাহাদের সংযোগে কন্যার জন্ম হইল। প্রজাপতিগণের সহিত সেই কন্যাদের বিবাহ হইল। ব্রহ্মার এইরূপ দুই প্রকার প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বহুবিধ উপন্যাস এই ভিত্তিতেই সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এক মানব-দম্পতির উৎপত্তির সমীচীন ইতিহাস হইতে এই উপন্যাসগুলির সৃষ্টি হইলেও তাহাদের ঘটনাসমূহ অধিকতর মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া উহাদিগকে রূপকালঙ্কারে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে যখন তাহারা স্থূলাকারে বর্ণিত হইয়াছে তখন তাহাদের মধ্যে আদিম উপন্যাসের ভাষা, বর্ণ বা মর্ম্মে চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না। স্বায়ম্ভুব ও তাহার পত্নী শতরূপা রূপকাকারে বর্ণিত এবং তাহাদের কন্যাসন্ততিগণ যাহারা ঋষিগণের পত্নী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহারা ভক্তি, উপাসনা, সন্তোষ, জ্ঞান এবং জনশ্রুতি বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে এবং অবরোহ-প্রণালী-ক্রমে তাহাদের বংশীয়গণকে চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এবং যজ্ঞীয় অগ্নিতে দৃষ্ট হয়। অপর সৃষ্টি-প্রকরণে দক্ষ প্রজাপতি সকল জীবের মূল বা আদি এবং তাহার কন্যাগণ সমস্ত জীবের প্রসূতি। রূপক অবলম্বনে গুণ, ক্রোধ বা জ্যোতিষ্কসমূহকে কন্যা বলিয়া

গ্রথিত হইয়াছে; ইহাদের সম্বন্ধে এই গল্পসমূহের মর্ম্ম বোধগম্য নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার বিশদরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যদ্যপি আমরা প্রজাপতি ও ঋষিগণকে বাস্তবিক দেব বলিয়া অনুভব করি এবং যাঁহারা হিন্দুদিগের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসূত্রের প্রবর্ত্তক এবং স্বর্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদি পর্য্যবেক্ষক বলিয়া তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিলে ইহার অর্থবোধ হইতে পারে।

স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অতি অল্পসংখ্যক নরপতির বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে তাঁহারা পৃথিবী শাসন করেন এবং কৃষিকার্য্য প্রচলন করেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই সভ্যতার জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে এই সকল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে কাল্পনিক ব্যাপারের আধিক্য নাই এরূপ বিবেচনা করিলেও সেই নৃপতিবর্গের কার্য্যকলাপ জনশ্রুতিরূপ ভিত্তির উপর কতদূর সংস্থাপিত তাহা আলোচনা করিয়া আমাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিবার আবশ্যকতা নাই। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের উপাখ্যান এইরূপ ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও তাহা নিশ্চয়ই পুরাতন। কিন্তু ধর্ম্মনীতি ও স্তব দ্বারা বিষ্ণুকে একমাত্র স্রষ্টা স্থির করিয়া এই সকল গল্প এই পুরাণের বৈষ্ণবদিগের মর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিস্তৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, বিষ্ণু পুরাণে এই গল্পের মূল প্রোথিত হয় নাই। প্রহ্লাদের গল্পে নির্ব্বিবাদে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহার লেখক ইহার বর্ণনায় অন্য কোন পূর্ব্বতন রচনার নিকট ঋণী।

ক্রমশঃ

শ্রীবিহারিলাল আঢ্য।

আশ্বাস।

কেন সত্য ধ্রুব ভুলি
কেন মূঢ় মোহে ঢলি
আকুল ক্রন্দন!
শত পাপ বুকে লয়ে
শান্তির আলয়ে শুয়ে
এ কি বিলাপন!

অবিশ্বাস এত সন্দ
মনে প্রাণে কত দ্বন্দ্ব
নিরয় সৃজন
রে মূঢ় মূর্খতা তোর—
কত পাপ মোহ ঘোর
বিনষ্ট চেতন!

বাঁশরী বাজিছে দূরে—
প্রাণ বিমোহন সুরে
অমিয়া ছড়াই!
ফল ফুল গন্ধ মধু
দেবতা তথায় সুধু
তোর হৃদে নাই?

ওই শশী রশ্মি দিয়া
কুঞ্জবন আলোকিয়া
খেলে লতিকায়

শত বৃক্ষ আলোড়িয়া
বায়ু যে তাহারে নিয়া—
আদরে দোলায়!

বিশাল সৃজন বনে
কত পত্র কত বর্ণে
কিবা আভা তায়—
রূপ গন্ধ বিমুখিয়া
কেন দেব আদেশিয়া—
বিল্ব পত্র চায়!

সারাটা জীবন ধরি
সাধ্যমত কারিগরি
কর প্রাণপণ—
হ'ক তুচ্ছ দীনতায়—
দেব কি উদাস তায়
ওরে হীন মন!

সে নহে দেবতা রীতি
তবু কেন এ বিস্মৃতি
বিষাদে মগন—
দীনতা হীনতা ভুলি
কর ভূমানন্দে গলি
প্রিয় দরশন!

শ্রীউমাচরণ ধর।

পদ্মা-বক্ষে।

ক

আমাদের দেশ হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে, মাঝে পদ্মা পার হইতে হয়। কিন্তু কপাল এমনি মন্দ, যে যেমন নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম, আর অমনি ষ্টীমারখানি যেন আমাকে উপহাস করিয়া ডাঙা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি অবাক হইয়া ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু ষ্টীমারের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিলেই যদি নদী পার হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। কাজেই খেয়া নৌকার চেষ্টায় রহিলাম।

খেয়া নৌকা পাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। আমি জিনিষ পত্র লইয়া নৌকার উপরে উঠিলাম। জলের উপরে নাচিতে নাচিতে নৌকাখানি ভাসিয়া চলিল। এবং ক্রমে তীর ছাড়িয়া দূরে গিয়া পড়িল।

একটু ভাল হইয়া বসিয়া, মাঝীর দিকে চাহিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। তাহার কপালের উপরে কি ভয়ানক একটা কাটা দাগ! লোকটা বুড়া হইয়াছে—কিন্তু এমন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া সে যে প্রাণে মরে নাই, তাহাই ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম।

কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি মাঝি?"

"রামচরণ গো!" বলিয়া সে আবার আপন মনে হালে ঝিঁকে মারিতে লাগিল।

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁহে রামচরণ! তোমার কপালে অমন কাটা দাগ কি ক'রে হল?"

একটু হাসিয়া, সে মাথা নীচু করিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার সেই অনাবৃত সুগঠিত দেহের মাংসপেশী গুলা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

আমি আবার সেই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে, বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়াছিল, বোধ হয় কিছু ভাবিতেছিল। কারণ, আমার কণ্ঠস্বরে সে অতিরিক্তরূপে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "বড় নোংরা কথা বাবু! ছোট লোকের কথা আপনাদের ভাল লাগ্‌বে কি?"

আমি তাহার কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিলাম, "তা' হোক্—তুমি বলো।"

রামচরণ একান্ত অনিচ্ছার সহিত আরম্ভ করিল :—

খ

"পদ্মার ধারেই,—ঐ যেখানে ছুটা তাল গাছ একটা মন্দিরের উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে,—ঐ খানে আমাদের গাঁ। আমাদের গাঁ'এ সকলেই জেলের কাজ করিয়া দিন গুজরাণ করে। আমিও জেলে। এতটুকু বয়স হইতেই আমি পদ্মার বুকে, পদ্মার হাওয়ায়, জাল বুনিয়া, মাছ ধরিয়া আর ডিঙি বাহিয়া ক্রমে একজন জোয়ান মরদ্ হইয়াছিলাম।

সংসারে আমার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। বাপ, মা, ভাই বোন—যাদের লইয়া সংসার,—তারা সকলেই আমাকে একে একে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ছুঃখিরাম জেলের মেয়ে গঙ্গামণি, বিধবা হইয়া বাপের কাছেই ছিল। তার বয়স যখন সতেরো কি আঠারো,—তখন তার বাপও মারা গেল। গঙ্গার মা আগেই মরিয়াছিল।

বাবু! সকলেই ব্যথার ব্যথীকে ভালবাসে। আমি যেমন একা—গঙ্গাও তখন তেমনি। আমার তাকে বড় ভাল লাগিত। আর দেখিতেও সে বেশ ছিল। টানা টানা চোখ, হাসিমাখা ঠোঁট,—নিটোল গড়ন, যা' রংটা একটু কালো। তা' কালো রংএই তাকে মানা'ত ভালো।

সারাদিনমান খাটিয়া খুটিয়া, আমি যখন রোজ সাঁঝের আগে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, তামুক খাইতাম,—ঠিক সেই সময়টতে গঙ্গা, কাঁখে পিতলের কলসী লইয়া, পদ্মা হইতে জল আনিতে যাইত। আমি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, সেও আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া যাইত। তাহার হাসি দেখিলে, আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না।

গঙ্গা জল লইয়া যখন ভিজা কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ঘরে ফিরিয়া যাইত,—তখন আমি তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে—যতক্ষণ দেখা যায়—চাহিয়া থাকিতাম। তারপর দিনের আলো নিবিয়া যাইত। আর আমি,—অন্ধকারে দাওয়ায় বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতাম। ঘরের ভিতরে আরো অন্ধকার,—সে দিকে চাহিতেও ভরসা হইত না।

একদিন আমার ঘাড়ে ভূত চাপিল। আমি গঙ্গার ঘরের দিকে চলিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, গঙ্গা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে? কাহার কথা?

আমাকে দেখিয়া, গঙ্গা বসিতে বলিল। আমি বসিলাম।

গঙ্গা বলিল, "রামচরণ! আমার বাপ মরে গেছে।" আমি কোন উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিতে পারিলাম না। মাটীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "হুঁ।"

গঙ্গা নোক্ দিয়া মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমাকে দেখ্‌বার কেউ নেই।"

"হুঁ।"

গঙ্গা আঙুলে আঁচলের কোণ জড়াইতে জড়াইতে বলিল: "আমি একলা।"

এইবারে আমি কথা কহিলাম। আস্তে আস্তে বলিলাম—"আমিও একলা। আমাকেও দেখ্‌বার কেউ নেই।"

"কেন, তুমি পুরুষ মানুষ,—বিয়ে কর্ত্তে পারো।"

"আর তুমি?"

গঙ্গা আমার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি! আমি যে বিধবা!"

তাহার হাসি দেখিয়া আমি সাহস করিয়া বলিলাম, "বেশ ত গঙ্গা! তোমার যখন কেউ নেই,—তখন আমার কাছে গিয়ে থাকতে পার ত?"

গঙ্গা মুখ রাঙা করিয়া বলিল—"মিন্সের কথার ছিরি দেখ! তোমার কাছে গিয়ে থাকলে লোকে বল্‌বে কি?"

"তা' তাদের যা' খুসি বল্‌বে! শোনো গঙ্গা! তুমি আমার ঘরে চলো!"

"এই কথা বল্‌তে তুমি বুঝি এখানে এসেছ? এখনি বিদেয় হও—নৈলে—"

"নৈলে কি গঙ্গা?"

"ঝাঁটার বাড়ি!"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "গঙ্গা! তোমার গালাগালি তামুকের চেয়েও মিষ্ট! আমি আবার আস্‌ব,—তুমি আবার গালাগালি দিও।"

গঙ্গা হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

গ

তার দু' একদিন পর হইতে,—কি মনে করিয়া জানি না,—গঙ্গা মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসিত। আমি হয়ত উনান ধরাইতে পারিতেছি না,—সে আমাকে সরাইয়া দিয়া নিজেই উনান ধরাইতে বসিয়া যাইত। উনানে ফুঁ দিতে দিতে তার গাল দুখানি ফুলিয়া উঠিত, আগুণের লাল আভা তার মুখের উপরে পড়িত, আর আমি হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতাম।

গঙ্গা হাসিয়া বলিত, "রামচরণ! তুমি ক্যাংলা ছেলের মত যে রকমভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছ, তাতে বোধ হয় আমার মুখখানা যদি সত্যি সত্যি রসগোল্লা হত, তা' হলে তুমি টপ্ করে গালে ফেলে দিয়ে বসে থাক্‌তে,—না?"

গঙ্গার সঙ্গে কথায় আমি পারিয়া উঠিতাম না—কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

গঙ্গা আগে মাঝে মাঝে আসিত -তারপর প্রায় আসিত—তারপর রোজ আসিতে আরম্ভ করিল। শেষটা, এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, কেউ কারুকে না দেখিলে, তিলেক থাকিতে পারিতাম না।

গাঁয়ের নানা লোকে নানা কথা বলিত, কিন্তু আমরা সে সব কথা কাণে তুলিতাম না। আমাদের ছোট লোকের জাতে বাবু ধর্ম্মজ্ঞান কম,—দুদিন পরেই আমাদের কথা সকলের সহিয়া গেল।

ঘ

রামচরণ তাহার কাহিনী বন্ধ রাখিয়া, একবার তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল—আমরা কতদূর আসিয়াছি।

তখন বর্ষণ-তৃপ্তা মেদিনীর মুখ হইতে মেঘচ্ছায়াবগুণ্ঠন সবে মাত্র অপসারিত হইয়াছে। তটলীন শ্যাম-সুন্দর দ্রুমদলের উপরে তখনো প্রকৃতির রৌদ্রদগ্ধ বিবর্ণতা অর্পিত হয় নাই এবং তাহার অবকাশপথে দূর দৃশ্যমান ক্ষেতের বুকে তখনো জল টলমল করিতেছে;—ঝাউ বাগানের পাশ দিয়া, বেণার ঝোঁপ ডুবাইয়া, কাশের চামর লুটাইয়া সেই পঙ্কিল জল-প্রবাহ হু হু করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া প্রবহমানা পদ্মার বেগ-ভীষণ তরঙ্গের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। পদ্মার বুকে একটা বালুচর জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহার একদিকে একটা বক এক পা তুলিয়া ঝিমাইতেছে এবং আর একদিকে একজন জেলে, জলে খেপ্‌লা জাল ফেলিতে ফেলিতে মেঠোসুরে গান ধরিয়াছে;—

ও! একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার ঘরের কাছে আর্‌সি নগর—
তাতে এক পড়্‌শী বসত্ করে।

চারিদিকটা একবার দেখিয়া রামচরণকে বলিলাম,—"তার পর?"

রামচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার আরম্ভ করিল;—

"এইবারে আমার বিপদের কথা শুনুন। গঙ্গা আমার কাছে রোজ আসিত, সে কথা আমি আগেই আপনাকে বলিয়াছি এমনি কয়েক বছর জলের মত কাটিয়া গেল। তারপর, গঙ্গা হঠাৎ আমার কাছে আসা বন্ধ করিল। একদিন—দুদিন—তিনদিন গেল,—গঙ্গার দেখা নাই। বলিয়াছি, তাকে না দেখিলে, আমি থাকিতে পারিতাম না। সে হাতে করিয়া আমাকে দা-কাটা তামুক সাজিয়া না দিলে আমার তৃপ্তি হইত না। তাহার হাতের রান্না না হইলে, আমার খাইতে সাধ যাইত না। সে আমার ঘরে না থাকিলে, আমার ঘর যেন পোড়োবাড়ীর মত বোধ হইত—সেই গঙ্গার আজ তিনদিন দেখা নাই। তার ঘরে ছুটিয়া যাই—দেখি বাহির হইতে দরজায় তাঁলাবন্ধ। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম—আমাকে ফেলিয়া গঙ্গা গেল কোথায়?

একদিন, সন্ধ্যার একটু আগে আমি জাল ঘাড়ে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি—এমন সময়ে কিছু তফাতে, একটা খালের ধারে, বাঁশঝাড়ের তলায় হঠাৎ দু'জন মানুষকে দেখিতে পাইলাম। আমার কেমন সন্দেহ হইল। এমন সময়ে, এখানে এরা কে? আমি দু'পা আগাইয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল আমার শরীরের ভিতরে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল।

দেখিলাম, আমার এত আদরের গঙ্গা—শুঁইরাম জেলের ছেলে হরিদাসের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, তাহার গায়ের উপরে ঢলিয়া পড়িতেছে। এ'দৃশ্য কি প্রাণ ধরিয়া দেখা যায় বাবু? আমি গম্ভীর ভাবে ডাকিলাম—"গঙ্গা!" তাহারা দু'জনেই চমকিয়া উঠিয়া আমার পানে চাহিল; তাহার পর ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আর আমি সেই ভরা সাঁঝের আঁধারে দুই হাতে মাথা চাপিয়া মাটীর উপরে বসিয়া পড়িলাম।

৩

বাবু! বনের পাখীও আদর পাইলে উড়িয়া পলায় না—কিন্তু এ'দুনিয়ায় স্ত্রীলোককে বুঝি কেহ স্নেহের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

তাহার পর হইতে আমি গঙ্গার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু সে বোধ হয়, আগে হইতেই সাবধান হইয়াছিল,—আমি তাহাকে কোথাও পাইলাম না।

একদিন আমি পদ্মার ধার দিয়া আসিতেছি। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ গাছের পাশ হইতে উঁকি মারিতেছিল। হঠাৎ দেখি, মাটীর ভাঙন ধরা কূলের উপরে গঙ্গা আর হরিদাস!

আমাকে দেখিয়া, প্রথমটা তাহারা থতমত খাইয়া গেল,—তাহার পর পলাইবার চেষ্টা করিল। আমি সেদিন খুব সতর্ক ছিলাম—তাহারা সরিয়া পড়িবার আগেই আমি একলাফে তাহাদের সম্মুখে গিয়া পড়িলাম এবং গঙ্গার একখানা হাত, আমার দু'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলাম।

হরিদাস তখন আমার হাত হইতে গঙ্গাকে ছাড়াইয়া লইতে আসিল। আমি তখনি গঙ্গাকে ছাড়িয়া বাঘের মত তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম—আমার গায়ে তখন অসুরের মত জোর ছিল, আমি অনায়াসে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলাম। সে সাঁতার জানিত,—ডুবিয়া মরিল না। ভাসিয়া উঠিয়া, সাঁতরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

আমি তখন গঙ্গার দিকে ফিরিলাম। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। আমি আবার তাহার হাত ধরিলাম। ডাকিলাম, "গঙ্গা!"

"কি?"

"আমাকে তুমি কি দোষে ছেড়ে গেলে?"

"পোড়াকপাল আর কি! আমি তোমাকে ছাড়তে যাব কেন?"

"গঙ্গা! এখনো আমাকে ভুলাবার চেষ্টা? আমি কি অন্ধ? যাক্ সে কথা—এস আমরা ডিঙি ক'রে পদ্মায় বেড়াতে যাই।"

"আজ আমাকে ছেড়ে দাও রামচরণ! আমি কোথাও যেতে পার্ব্ব না।"

"চুপ! আর এক কথা না। এস আমার সঙ্গে—ডিঙিতে ওঠ!"

চ

কাছেই ডিঙি বাঁধা ছিল। আমি গঙ্গাকে তাহার উপরে জোর করিয়া উঠাইলাম।

ডিঙি ভাসিয়া অগাধ জলে গিয়া পড়িল। চারিদিকে চাঁদের আলোতে জলের খেলা—জলের গান! আমি দাঁড় ছাড়িয়া দিলাম। স্রোতের মুখে নাচিতে নাচিতে ডিঙি আপনিই ভাসিয়া চলিল।

আমি চুপ করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। চাঁদের আলোতে গঙ্গার মুখ বেশ দেখা যাইতেছিল। সেদিন তাকে যেন আরো সুন্দর বোধ হইতেছিল।

হঠাৎ গঙ্গা বলিল "রামচরণ! আর কেন—এইবার ফেরো!"

"ফেরবার জন্যে আসিনি গঙ্গা!" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম।

আমার হাসিতে শিহরিয়া উঠিয়া গঙ্গা বলিল, "তবে তুমি কি কর্ত্তে চাও ?"

গঙ্গার কাছে সরিয়া গিয়া আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, "তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কর্ত্তে চাই। শোনো গঙ্গা! আজ তুমি ভগবানের নাম নিয়ে ঠিক করে বল দেখি, তুমি কার ?"

"আমি তোমার!" বলিয়া গঙ্গা আমার কোলে মুখ লুকাইল।

আমার বুকে কে যেন আগুনের শলা বিঁধিয়া দিল—আমি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "হতভাগি! এখনো মিছে কথা!"

গঙ্গা তাড়াতাড়ি আমার কাছ হইতে সরিয়া গিয়া বলিল "রামচরণ! পায়ে পড়ি তোমার—আমাকে ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেবার জন্যেই কি তোকে এখানে এনেছি? ওঠ্—ওঠ্!" আমি একটানে গঙ্গাকে দাঁড় করাইয়া দিলাম। নৌকা টলমল করিতে লাগিল।

গঙ্গা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি কেন এমন কোরছো রামচরণ! আমি—আমি—তোমাকে বড় ভালবা——!"

"চুপ! ভালবাসার কথা ও' পাপমুখে আনিস্ না! আমি তোকে ভালবাসি,—আগে যেমন—এখনো তেমন! আর তার ফলে তুই কি করেছিস্?"

আমি চোখের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—আমি তখন পাগল হইয়া গিয়াছিলাম—আমার সকল জ্ঞান চলিয়া গিয়াছিল—আমি গঙ্গাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিলাম।

গঙ্গা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "রামচরণ! আমাকে মেরোনা—আমাকে মেরোনা!"

"চুপ কর্ চুপ কর্! তোর কান্না আমি শুন্‌তে পারি না—আমার মায়া হয়! তোর যদি ভগবান থাকেন—তবে তাঁর নাম কর্—আমি তোকে জলে ফেলে দেব।"

গঙ্গা আবার কাঁদিয়া উঠিল। তখন হু হু করিয়া আমার কাণের পাশ দিয়া ঝোড়ো হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল—সেই বাতাসের সঙ্গে গঙ্গার কান্না যেন আমার কাণের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া ছুরির মত বুকে বিঁধিতে লাগিল!

আমি তাহাকে শূন্যে তুলিলাম—সে আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল—পদ্মার তীরে তীরে সেই কান্না যেন বাজিয়া উঠিল—তার চুল খুলিয়া এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে উড়িতে লাগিল।

গঙ্গা চীৎকার করিয়া বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও রামচরণ! আমাকে ছেড়ে দাও—আর আমি এমন কাজ কর্ব্বনা—আমাকে মেরোনা—তুটী পায়ে পড়ি তোমার!"

যে স্বরে আমি পৃথিবীর সব ভুলিয়া যাইতাম,—এ' সেই স্বর! আমি একবার তার মুখের দিকে চাহিলাম। চাঁদের সমস্ত আলো যেন একেবারে গঙ্গার মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

আহা হা হা! আমার গঙ্গা! আমার গঙ্গা!

আমার সমস্ত দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িল। আমি আর সহিতে পারিলাম না—চোকের জলে আমার বুক ভাসিয়া গেল,—আমি গঙ্গাকে আবার নৌকার উপরে বসাইয়া দিলাম।

তুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া আমি বলিলাম, "গঙ্গা! গঙ্গা! আমি তোকে মার্ত্তে পার্ব্বনা।"

আমি নৌকা লইয়া তীরের দিকে ফিরিলাম। নৌকা ডাঙায় লাগিল। গঙ্গা আগে নামিল। আমি তার পরে নামিলাম।

ডিঙিখানা বাঁধিয়া রাখিতেছি—এমন সময়ে পিছনে কাহার পায়ের শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখি হরিদাস! আমি সরিয়া যাইবার আগেই সে বিত্যুতের মত আমার উপরে আসিয়া পড়িল। তার ডানহাতে একখানা দা'—তাই দিয়া সে আমার কপালের উপরে সজোরে আঘাত করিল।

দপ্ করিয়া আমার চোখের সাম্‌নে যেন সকল আলো নিবিয়া গেল—পায়ের তলায় পৃথিবী যেন সরিয়া গেল—আমি ঘুরিয়া মাটীর উপরে পড়িয়া গেলাম। তাহার পরই শুনিলাম গঙ্গা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বজ্রাঘাতের মত সে হাসি, আমাকে অজ্ঞান করিয়া দিল!

ছ

জ্ঞান হইলে দেখিলাম, চাঁদ পশ্চিমের আকাশে। আমি একলা পদ্মাতীরে পড়িয়া রহিয়াছি—রক্তে আমার দেহ ভাসিয়া যাইতেছে।

অমন আঘাতেও আমি মরিলাম না—ভগবান আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখনো আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এই আমার কথা বাবু!"

...পনাদের শুনিবার মত? গঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ...ন হইতে তা'রা দেশত্যাগী ... গঙ্গার সেই শেষ হা...

এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। সে হাসি মনে হইলে, এখনো আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। মানুষে কি অমন করিয়া হাসিতে পারে?"

রামচরণ স্তব্ধ হইল। নৌকা তখন তীরের কাছে আসিয়াছে। তখন দিনের আলো নির্ব্বাপিত প্রায়—তটতরুর শ্যামায়মান শোভার উপরে সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসর ছায়া প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং দূর-নেপথ্য হইতে কেবল দু' একটা পাখী শান্তসন্ধ্যার সেই মৌন ধ্যান-যোগ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বন্ধুর বিবাহে।

জীবনের প্রতিকর্ম্মে,
সুখৈশ্বর্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্মে,
পাপ-পুণ্যে, দুঃখ-দৈন্যে, বাসনা ও সান্ত্বনায়—
আত্মসুখ তুচ্ছ করি—
তব সুখে প্রাণ ভরি'—
ফিরিবে যে পাশে পাশে, ছায়া সম ধরি কায়—
হের তা'রে প্রীতি-চক্ষে,
নববধূ ধর বক্ষে,
হো'ক্ পূর্ণ প্রতি মর্ম্ম, হো'ক্ ধন্য মনপ্রাণ,—
ঘুচে যাক পাপতাপ,
বাধা-বিঘ্ন-অভিশাপ,
হে বিভো মঙ্গলময়, মঙ্গল করহে দান।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

সহধর্ম্মিণী।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস ইন্‌স্পেক্টর রমেন্দ্র বাবুর খুন সম্বন্ধে যে যাহা জানিত, তাহার এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন।

রমেন্দ্র বাবুর খানসামা কিরূপে তাহার প্রভুর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা বলিল।

রেলের ডাক্তার বাবু মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে রমেন্দ্রের মাথায় মোটা শক্ত লাঠী মারিয়াছিল, সেই এক আঘাতেই তিনি ঘুরিয়া খানার ভিতর পড়িয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

রমেন্দ্রনাথ যে সেদিন রাত্রি আটটার সময় সতীশচন্দ্রের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সতীশচন্দ্রের দাসদাসীরা বলিল, হেমাঙ্গিনীও একথা বলিল।

তাহার পর সুধাংশু এজাহার দিল। সে বলিল, "আমি রাত্রে গিরিডি হইতে ফিরিয়া সতীশ বাবুর বাড়ীতে যাইতেছিলাম, তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল, বোধ হয় প্রায় একটা—ডাক্তার রমেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আমি কতকগুলি লোককে দেখিতে পাই; কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ডাক্তারের কথা বলিল। আমি সতীশ দাদার বাড়ী পৌঁছিয়াই এ কথা তাহাদের বলিয়াছিলাম।"

ছেলে যাহা বলিল, পিসীমা তাহার কথার সমর্থন করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন "আপনি এ কথা প্রফুল্ল বাবুকে বলেন নাই, আপনি বলিয়াছিলেন, ডাক্তার বাবুর খুনের কথা সতীশ বাবু আপনাদের প্রথম বলেন।"

পিসীমা বলিলেন, "দুইটা খুন হইয়াছিল, তাঁহা তিনি জানিতেন না। তাহার পর এই খুনের কথা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাহাই তাঁহার এ ভুল হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র সুধাংশু তাঁহার ভুল মনে করিয়া দিলে, তখন তাহার মনে হইল, খুনের কথা প্রথম সুধাংশু আসিয়াই তাহাদিগকে বলে।"

তাহার পর সতীশচন্দ্র এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি বাড়ীতে ফিরিবার সময় মালীর কাছে শুনিয়াছিলাম, কে একজন খুন হইয়াছে, তাহার পর সুধাংশু আসিয়া ডাক্তারের খুনের কথা বলিল, তাহাই আমার এ ভুল হইয়াছিল। দুইটা খুন যে এক রাত্রে হইয়াছে, তাহা সহজে মনে হয় না, কাজেই এই ভুল করিয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া গেলে প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "তুমি এক কথা, মালি আর এক কথা বলায় সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের সকলেরই মন বড় বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল—এখন বুঝিলাম আপনার এ ভুল কেন হইয়াছিল।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "মালীর কাছে শুনিলাম, একটা খুন হইয়াছে, তাহার পর সুধাংশু আসিয়া বলিল, ডাক্তার খুন হইয়াছে, তাহাতেই আমার মনে হইয়াছিল, মালীও ডাক্তারের নাম করিয়াছে, আর একটা খুন যে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা একবারও আমার মনে হয় নাই।"

"যাহাই হ'ক—এ কথাটা যে মিলিল, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

"পুলিশ কি বলে যে, দোসাদের দলের কেহ ডাক্তারকে খুন করে নাই।"

"হাঁ, তাহাদের খুন করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাহারা খুন করিলে টাকা-কড়ি ঘড়ির চেন কিছুই ফেলিয়া রাখিয়া যাইত না।"

"তাহা ত নিশ্চয়।"

"সতীশ বাবু আমরা এখানে সকলে চাঁদা করিয়া কিছু টাকা তুলিতেছি। যে রমেন্দ্রের খুনীর সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে সেই পুরস্কার দিব।"

"আমিও চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছি। রমেন্দ্র বাবুর খুনী যাহাতে ধৃত হয়, তাহার জন্য আপনারা আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। বিশেষতঃ এই এক রাত্রে দুই-দুইটা খুন হওয়াতে সকলেই ভীত হইয়া উঠিয়াছে, আমার স্ত্রী এত ভীত হইয়াছে যে, আর এখানে থাকিতে চাহিতেছে না। আচ্ছা, কে কি চাঁদা দিতেছেন?"

"সকলে দশ টাকা করিয়া দিয়া আমরা পাঁচ শত টাকা তুলিব মনে করিতেছি।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "পাঁচশ টাকা বেশি নয়, তাহাতে যে বেশি কাজ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।"

"এখানে আর অধিক উঠিবার সম্ভাবনা নাই, তোমার নামে কত ফেলিব?"

"পাঁচ হাজার টাকা।"

প্রফুল্লকুমার এবং তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব টাকার কথা শুনিয়া অতি বিস্মিত ভাবে সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। পাঁচ হাজার টাকা! রমেন্দ্র, সতীশ বাবুর কে যে, তিনি তাহার জন্য এত টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত!

সতীশচন্দ্র তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "পাঁচ হাজার টাকা বেশি নয়, ডাক্তার বাবুর খুনী যদি ইহাতে ধরা পড়ে, তাহা হইলে আমি অতি আনন্দের সঙ্গে এ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

প্রফুল্লকুমার ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে সতীশচন্দ্র চিন্তিত মনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র গৃহ প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, হেমাঙ্গিনী নিজ ঘরে শুইয়া আছে, সে উঠে নাই, তাহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ। তিনি স্ত্রীকে দেখিতে গেলেন, হেমাঙ্গিনী তাহার বিশুষ্ক পাংশুবর্ণ মুখে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন তুমি কি করিবে স্থির করিতেছ ?"

সতীশচন্দ্র সহজকণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব, স্থির করিতেছি ?"

"হাঁ, বেশি কথা কহিয়া কাজ নাই; আমি জানি, রমেন্দ্রকে কে খুন করিয়াছে।"

"তুমি কিছুই জান না।"

"তর্ক করিতে চাহি না—ক্ষমতাও নাই। পিসীমা ও সুধাংশুও জানে কে খুনী। আর তাহার প্রমাণ এই ঘরেই আছে।"

"প্রমাণ! সে কি ?"

"সেই লাঠী—ভাঙ্গা লাঠী—আর তোমার রক্তমাখা কাপড় জামা।"

ক্রোধে সতীশচন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "কে চুরি করিয়া আমার বাক্স খুলিয়াছিল ?"

হেমাঙ্গিনী ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি—আমি খুলিয়াছিলাম। যাক্ সে সব কথা—তুমি খুনী, আমি তোমার সঙ্গে একত্রে থাকিতে পারি না, আমার ছেলেমেয়ে না থাকিলে আমি অনেক আগেই তোমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতাম। এখন আশা করি, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইবে।"

"তোমার হুকুমে নয়।"

"যাহা বলিতেছি শোন, যাও—দেশে গিয়া থাক, আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার বাপের বাড়ীতে থাকিব।"

"হেম, বড়ই দূরে যাইতেছ।"

"আমি মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছি, আমি—আমি—"

হেম্ কাঁদিতে কাঁদিতে বালিশে মুখ লুকাইল, কাতরে বলিল, "এখন আজ হইতে আমার জীবনে সুখ শান্তি রহিল না। কখন তুমি ধরা পড়, কখন তোমার—উঃ কি সর্ব্বনাশ!"

"চুপ্—যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে, আমি খুন করি নাই।"

"আমি—আমি—"

"যাক্—তোমার কথাই এখন হউক, আজই এখান থেকে যাইতে চাও, না যতদিনের জন্য এ বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে, ততদিন থাকিবে?"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; এত শীঘ্র যে স্বামী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, তাহা সে ভাবে নাই; সে তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "যাও—আর যেন—আর যেন—" কি বলিতে যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী তাহা ভুলিয়া গিয়া সহসা চুপ করিল।

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না—সুধাংশু থাকিল, পিসীমা এখানে থাকিল, লোকজন সব থাকিল, তুমি এইখানেই থাক; আমি কলিকাতায় যাইতেছি। তাড়াতাড়ি এখান হইতে সকলে চলিয়া গেলে কেবল সন্দেহ বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র।"

কথাগুলি অনলাক্ত লৌহশলাকাবৎ হেমাঙ্গিনীর কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিল। হেমাঙ্গিনী কোন কথা কহিতে পারিল না, বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র এত সহজে এত শীঘ্র স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন কেন? তবে কি তিনি বুঝিয়াছেন যে ফাঁসী কাষ্ঠ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় পলায়ন! সে দিন সে রাত্রে কুক্ষণে সর্ব্বাগ্রে রমেন্দ্রের খুনের কথা তিনি না বলিলে কেহ কখনও তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। কেন উন্মত্ততা বশতঃ তিনি এই ঘোর মূর্খের কাজ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "রমেন্দ্রের খুনীকে যে ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিব বলিয়াছি।"

তিনি কি এখন এই কথা বলিয়া হেমাঙ্গিনীকে উপহাস করিতেছেন! হেমাঙ্গিনীর বোধ হইল, তাহার বুক যেন ফাটিয়া যায়।

সহসা সতীশচন্দ্র মুহূর্ত্তমধ্যে স্ত্রীর গণ্ডে ওষ্ঠে শত চুম্বন করিয়া দ্রুতবেগে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর জড়ীভূত হৃদয় অবসন্ন হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে চারিদিকে কেবল ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পিসীমা তাহার মনের অবস্থা জানিতেন, তিনি তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, তখন হেমাঙ্গিনীর সংজ্ঞা আছে—অথচ নাই, সে জাগ্রত অথচ নিদ্রিত। এ সংসারে তাহার ন্যায় অবস্থা বোধ হয় আর কাহারও হয় নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিনই সতীশচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন, হেমাঙ্গিনীরও ইচ্ছা ছিল, যত শীঘ্র পারে, সে মধুপুর হইতে চলিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা ঘটিল না, পরদিনই তাহার জ্বর হইল, বিকালে সে নানা ভুল বকিতে লাগিল, পিসীমা ও সুধাংশু না থাকিলে যে কি হইত, তাহা বলা যায় না।

আর রমেন্দ্র বাবু নাই যে, তিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন; রেলের ডাক্তার বাবু তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

বিকারের মুখে পাছে হেমাঙ্গিনী খুনের কোন কথা বলিয়া ফেলে, পাছে তাহা কেহ শুনিতে পায়, এইজন্য পিসীমা কাহাকেও সহজে হেমাঙ্গিনীর নিকটে যাইতে দিতেন না। সর্ব্বদা হয় তিনি না হয় সুধাংশু হেমাঙ্গিনীর নিকটে থাকিতেন।

একদিন সুধাংশুকে হেমাঙ্গিনীর কাছে রাখিয়া পিসীমা বাহিরে আসিয়া বসিলেন। পুরাণ ঝি তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, "দিদিমণি জ্বরের ঝোঁকে কেবলই ডাক্তার বাবুর নাম করেন। যেন বাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাবুর ভারি ঝগড়া হচ্চে. কেন দিদিমণি এসব কথা বলে তা জানি না।"

পিসীমা বলিলেন, "ডাক্তার বাবু এখান থেকে গিয়াই খুন হয়েছিলেন, তাহাতে জ্বরের ঝোঁকে হেম যে, তাঁহার কথা বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! সতীশ পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছে, হয়তো তাতে খুনী ধরা পড়্‌বে।"

"সকলেই তাই বল্‌চে, নিশ্চয়ই সেই দোসাদের দলের কারও এই কাজ—পিসীমা, তোমার কি মনে হয়?"

"আমারও তাই মনে হয়। এরা পারে না, এমন কাজ নেই।"

"আশ্চর্য্যের কথা—দিদির এত ব্যারাম আর বাবু কলকাতায় রইলেন, আস্‌বেন না।"

"তিনি খবর পান নি!"

"খবর পান নি—সে কি!"

"এখন খবর দিয়ে তাকে অনর্থক ভাবনায় ফেলা, তাই আমি সুধাংশুকে ডেকে এ কথা লিখ্‌তে বারণ করে দিয়েছি। হেম একটু ভাল হলেই খবর দেব।"

* * *

প্রকৃতই এক সময়ে হেমাঙ্গিনীর জীবনের আশা ছিল না, কিন্তু সে রক্ষা পাইল। ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একটু ভাল হইবামাত্র পিসীমাকে কাঁদিয়া কহিল, "আমায়—আমায়—এখান থেকে নিয়ে চল, এখানে থাক্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব। সেই—সেই খুন যেন দিবা রাত আমার চোখের উপরে দেখিতেছি।"

পিসীমা বলিলেন, "তুমি আর একটু ভাল হলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।"

আরও কয়েক দিনে হেমাঙ্গিনী সুস্থ হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের মধুপুর হইতে যাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী পিসীমাকে বলিল, "কালই চল।"

পিসীমা বলিলেন, "ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন, তোমার এখনও রেলে যাইবার অবস্থা হয় নাই। আর তিন চার দিন দেরি কর।"

অগত্যা আরও কয়েক দিন হেমাঙ্গিনী মধুপুরে থাকিতে বাধ্য হইল। সে এখান হইতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখানে থাকিলে বারংবার রমেন্দ্রের খুনের কথা তাহার মনে হয়, আর সে উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠে।

হেমাঙ্গিনী জানিত, সে এখান হইতে গিয়াও শান্তি পাইবে না, কোথায়ও গিয়াই সে জীবনে আর শান্তি পাইবে না, দারুণ ভীতি বিভীষিকার মধ্যে তাহাকে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। কোন্ দিন সতীশ বাবু ধরা পড়েন—কোন্ দিন তাঁহার বিচার হয়—কোন্ দিন তাঁহার ফাঁসী হয়। কতকাল সে এই ভয়ে

এই আতঙ্কে জীবন কাটাইবে! তাহার পর সকলেই তাহাকে দেখাইয়া বলিবে, ঐ দেখ, ইহারই স্বামী খুন করিয়া ফাঁসী গিয়াছিল—আততায়ীর স্ত্রী; তাহার পুত্র কন্যাকে দেখাইয়া বলিবে, ইহাদের বাপের ফাঁসী হইয়াছিল! কতকাল তাহার অদৃষ্টে এ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ আছে, তাহা কেবল অন্তর্যামী ভগবান জানেন!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে একজন ভৃত্য আসিয়া পিসীমাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে প্রফুল্লবাবু একবার দেখা করিতে চাহেন।"

পিসীমা বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা—কে প্রফুল্লবাবু?"

"হাঁ—কি বিশেষ কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে কি কথা? চল যাইতেছি।"

প্রফুল্লবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, পিসীমাকে দেখিয়া বলিলেন, "শুনিলাম সতীশ বাবুর স্ত্রী এখন ভাল আছেন, একটা খবর তাঁহাকে বলিতে আসিলাম, কিন্তু এ অবস্থায় বলা উচিত কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাকে ডাকাইয়াছি!"

পিসীমা বলিলেন, "কি খবর—নূতন কিছু—সতীশের—"

প্রফুল্ল বাবু বলিলেন, "তাহা কিছু নয়, এত দিন পরে রমেন্দ্রের খুনী ধরা পড়িয়াছে।"

পিসীমা মুক্তনেত্রে অন্ধকার দেখিলেন, তবে কি পুলিশ সতীশকে ধরিয়াছে?

প্রফুল্লবাবু বলিলেন, "এ খবর আমি নিজেই দিতে আসিলাম। সতীশের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারেই খুনী ধরা পড়িয়াছে।"

পিসীমার স্বর কম্পিত হইল, তিনি এই খুনীকে কেমন করিয়া ধরা পড়িল তাহা সশঙ্ক হৃদয়ে প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রফুল্ল বাবু বলিলেন, "লোকটা সেই দোসাদদের দলের একজন—ইহার নাম দামন। অন্য দুজন যখন মাড়োয়ারীকে খুন করিয়া তাহার টাকা কড়ি লইবার জন্য পথে লুকাইয়াছিল, সেই সময় দামন নিজে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু রোজগার করিবার জন্য ডাক্তারকে আক্রমণ করে; সেই পর্য্যন্ত বদমাইস লুকাইয়াছিল।"

পিসীমা বুঝিলেন, পুলিশ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া এই দামনকে ধরিয়াছে,

রমেন্দ্রের খুনী দামন নহে। তিনি কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলেন?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন, "এই দোসাদ দলের একজন সতীশের পাঁচ হাজার টাকার লোভে সব কথা পুলিশকে বলিয়া দিয়াছে। এ একটা ছোঁড়া, বছর ষোল-সতর বয়স। এই ছোকরা পুলিশে আসিয়া সব কথা বলিয়া দিয়াছে, তাহার পর দামন যেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহাও বলিয়া দিয়াছিল, এখন দামন ধরা পড়িয়াছে।"

"সে রমেন্দ্রকে খুন করিতে দেখিয়াছিল?"

"না—বোধ হয় নয়, এ কথা আমি শুনি নাই।"

"তাহা হইলে কেবল্ এই ছোকরার কথার উপর এই লোকটাকে পুলিশ ধরিয়াছে।"

"হাঁ—এখন তাহাই—পরে অন্য প্রমাণও হইবে।"

প্রফুল্লকুমার প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় পিসীমা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কেননা প্রকৃত খুনী কে, তাহা তিনি জানিতেন; তবে এই লোকটা ধৃত হওয়ায় তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। লোকটা দোষী হউক আর নির্দ্দোষ হউক, সতীশের উপর সন্দেহ আর কেহ করিবে না।

* * *

দামন ধৃত হইলে মধুপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাহাকে দেখিতে ছুটিল। চারিদিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

যথা সময়ে দামন হাকিমের সম্মুখে নীত হইল। দোসাদ-বালক এইরূপ জবানবন্দী দিল;—

"একদিন দোসাদেরা মাড়োয়ারীকে খুন করিয়া তাহার টাকা লইবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার জন্য পথে লুকাইয়া থাকিল। দামন তাহাদের বলিল, তোরা দুজনেই মাড়োয়ারীটাকে ঠিক কর্‌তে পার্‌বি, আমি ডাক্তারটাকে দেখি, সে রোজ রাত্রেই বাহিরে বার হয়, সঙ্গে তার টাকাও থাকে। এই বলিয়া সে ডাক্তারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাড়ীর কাছে আসিলেন। তখন দামন পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাহার মাথায় লাঠী মারিল, ডাক্তার পড়িয়া গেলেন। সে ডাক্তারের ঘড়ী চেন টাকা লইতেছিল, এই সময়ে সেখানে আর একজন লোক কে আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই লোক তাহার কীর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে ভাবিয়া দামন তাহার উপর পড়িল, সেই লোকটার হাতের

লাঠীখানা ভাঙ্গিয়া গেল ; কিন্তু দামন দেখিল, তাহার সঙ্গে সে বলে পারিবে না, তাহাই সে ছুটিয়া পলাইল, অন্ধকারে সেই লোকটা আর তাহাকে ধরিতে পারিল না। দামন এই কাজ করিয়া দোসাদদের আড্ডায় উপস্থিত হইল, তাহার ডাক্তারকে খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল তাহাকে অজ্ঞান করিয়া তাহার টাকা-কড়ি লইবারই ইচ্ছা ছিল।"

দোসাদ বালক যাহা বলিল, প্রকৃতই তাহাই ঘটিয়াছে, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিল, যাহার মনে কোন সন্দেহ ছিল, তাহাও শীঘ্র দূর হইল। দামন নিজেই খুন স্বীকার করিল। সে বলিল, "হাঁ—আমি ডাক্তারের টাকা-কড়ি লইতে গিয়াছিলাম, তাহাকে খুন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না ; সে যে এক লাঠিতে কেমন করিয়া মরিল, তাহা জানি না। আমি তাহার পকেট হইতে ঘড়ি চেন টাকা লইতে যাইতেছিলাম, এই সময়ে একটা লোক আসিয়া পড়িল, আমি তাহার উপরে পড়িলাম, সেও আমার উপরে পড়িল, মারামারিতে তাহার লাঠী ভাঙ্গিয়া গেল। আমি যখন দেখিলাম, তাহার সহিত পারিব না, তখন আমি অন্ধকারে পলাইলাম।"

সে লোক কে জিজ্ঞাসা করায়, দামন বলিল, তাহা সে বলিতে পারে না, অন্ধকারে তাহাকে ভাল দেখিতে পায় নাই, তবে কথা শুনিয়া বোধ হইয়াছিল, কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

দামনের কথা সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে নানাভাবে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পিসীমা তাহাকে রমেন্দ্রের খুনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, বিশ্বাস করা অসম্ভব, সেইজন্য তিনি পুরাণ ঝিকে বলিলেন, "এ সব কথা হেমকে বলিও না, এসব শুনিবার মত তাহার অবস্থা নাই। এখনও সে ভাল হয় নাই।"

পুরাণ ঝি কিন্তু অন্যরূপ বুঝিল। সে জানিত, হেমাঙ্গিনী রমেন্দ্রকে খুব যত্ন-ভক্তি করিত, তাহার খুনী ধরা পড়িয়াছে, শুনিলে হেমাঙ্গিনী সন্তুষ্ট হইবে, এইজন্য সে পিসীমার পরামর্শে কাণ দিল না, সুবিধা পাইবামাত্রই হেমাঙ্গিনীকে সকল কথা বলিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ রাত্রির গাড়ীতে হেমাঙ্গিনী কলিকাতায় যাইবে, সকাল হইতেই দাস-দাসীরা দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। হেমাঙ্গিনী যদিও এখন

অতীব দুর্ব্বল, তথাপি সে উঠিয়া বসিয়াছে। সে এখান হইতে যাইতে পারিলে বোধ হয় কিছু শান্তি পায়। এখানে যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

পুরাণ ঝি আসিলে, হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সব বাঁধা হইয়াছে ?"

ঝি বলিল, "হাঁ—দুপুরের মধ্যেই সব বাঁধা ছাদা হয়ে যাবে—তবে—"

"তবে কি ঝি!"

"সেই লোকটা ধরা পড়েছে!"

"কোন্ লোকটা ?"

"খুনী—ডাক্তার বাবুকে যে খুন করেছিল।"

প্রবল বেগে হেমাঙ্গিনীর বক্ষোবেপন আরম্ভ হইল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "কে কে—কে রে ?"

"খুনী স্বীকার করেছে, সে ডাক্তার বাবুর মাথায় লাঠী মেরে তাকে খুন করেছিল।"

"কে—কে—সে ?"

"একজন ঘোসাদ—তার নাম দামন, সকলেই গোড়া থেকে জান্তো, এই বদমাইশরাই এ কাজ করেছে।"

"পিসী—পিসীমাকে ডেকে দাও।"

পিসীমা আসিলেন। হেমাঙ্গিনী পিসীমাকে কি হইয়াছে সব তাহাকে বলিতে বলিলেন। পিসীমা যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, সব তাহাকে বলিতে লাগিলেন; এমন সময়ে সহসা হেমাঙ্গিনী অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, দ্বারে দণ্ডায়মান—স্বামী সতীশচন্দ্র।

দেখিলেই বোধ হয় তিনি এই মাত্র রেলে আসিয়াছেন, তাহার বেশ অপরিস্কার—ধুলি-ধূসরিত, বস্ত্রাদিও বিক্ষিপ্ত, তিনি হেমাঙ্গিনীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হেম, এখন বিশ্বাস হইল ?"

সে কি বিশ্বাস করিবে—তিনি খুনী না অন্য অপর কেহ খুনী ? সে ব্যাকুল বিষণ্ণ, বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি দৃষ্টি! দেখিয়া মনে হয়, কি এক মহা আর্ত্তনাদ যেন সেই চোখ দুটি বিদীর্ণ করিয়া এখনই বাহির হইবে।

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "সতীশ, সতীশ, তুই বল্—তুই বল্, যে তুই—"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, তুমি কি আমায় এমনই পাষণ্ড ঠাওরাও—আমি খুন করিব ? না পিসীমা, আর একটু আগে উপস্থিত হইলে এই ঘোসাদ

কখনই রমেন্দ্রকে খুন করিতে পারিত না, আমিই গিয়া পড়িয়াছিলাম, আমার ভয়েই এই দোসাদ পলাইয়াছিল। পিসীমা,—হেমের সঙ্গে আমার কথা আছে,—তুমি একটু ঐ ঘরে যাও।"

পিসীমা সতীশের উপর নিজেদের অন্যায় সন্দেহে বিশেষ দুঃখিত হইয়া ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র স্ত্রীর সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন হেমাঙ্গিনী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, " এ কি—এ কি সত্য ?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

"তবে—তবে এ কথা আমায় আগে বল নাই কেন ?"

"তোমার এই কথার উত্তর দেবার আগে, আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি সে সময় আমি এ কথা তোমায় বলিতাম, তাহা হইলে তুমি কি তখন আমার কথা বিশ্বাস করিতে ?"

হেমাঙ্গিনী বুঝিল, সে কথা ঠিক, তাহার হৃদয়ে ইতিপূর্ব্বে যে নিদারুণ সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার স্বামী তখন সহস্র শপথ সহকারে অস্বীকার করিলেও সে সময়ে তাহার হৃদয় হইতে সে সন্দেহ দূরীভূত হইত না।

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আমি জানিতাম, আমি তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেও তোমার মন হইতে এ সন্দেহ যাইত না। সেজন্য আমি সে সময়ে তোমায় কোন কথাই বলি নাই। আমি তোমায় এখানে রাখিয়া প্রকৃত খুনী যাহাতে ধরা পড়ে, তাহারই চেষ্টায় গিয়াছিলাম। এখানে পাঁচ হাজার টাকা দিব বলিয়া কলিকাতায় গিয়া ডিটেক্‌টিভ পুলিশে খবর দিয়াছিলাম, তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলাম। আমি তোমার পাগলামী কথায় কান দিই নাই। তোমার কথায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাই নাই।"

এ দোষীর কথা নহে—হেমাঙ্গিনীর চোখে যে সন্দেহের করাল ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা অপসারিত হইয়া গেল। সে কথা কহিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া সে রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হেমাঙ্গিনীকে সমস্তই বলিলেন।

তিনি সেদিন রাত্রে হেমাঙ্গিনীর নিকটে রমেন্দ্রকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিবার কথা তাহার মনে এক নিমেষের জন্যও হয় নাই। যাহাতে রমেন্দ্র আর তাঁহার বাড়ীতে না

আসেন, যাহাতে তিনি আর হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা না করেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি রমেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা শব্দ ও অস্ফুট আর্ত্তনাদ নিকটে শুনিয়া ছুটিয়া সেইদিকে গেলেন; দেখিলেন, একটা লোক ডাক্তারের পকেট হ'তে ঘড়ি চেন লইতে চেষ্টা পাইতেছে, সে তাহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল, তিনিও তাহাকে আক্রমণ করিলেন, ইহাতে তাহার লাঠী ভাঙ্গিয়া গেল; লোকটা ধরা পড়ে দেখিয়া তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে তাহাকে ধরা অসম্ভব দেখিয়া তিনি আর তাহার অনুসরণ করিলেন না। পকেট হইতে দেশলাই জ্বালিয়া দেখিলেন, রমেন্দ্রনাথ জীবিত নাই; তখন পাছে কেহ এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে সন্দেহ করে বলিয়া, তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু পথে এত অন্ধকার যে, তিনি পথ ভুলিয়া একেবারে অজয়ের জলে গিয়া পড়িলেন; তাহার কাপড়-চোপড় জামা সব ভিজিয়া গেল। পাছে কেহ তাহাকে সন্দেহ করে বলিয়াই তিনি সেই ভাঙ্গা লাঠী আর ভিজা কাপড় নিজের বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কেন তুমি এ সব কথা আগে আমায় বল নাই? কেন রমেন্দ্র বাবুর অবস্থা দেখিয়া তখনই সকলকে জানাও নাই; কেন সব কথা সকলকে বল নাই, তাহা হইলে আমি—আমি এত কষ্ট পাইতাম না।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "কেন বলি নাই, তাহা ত তোমায় বলিলাম। আমায় লোকে সন্দেহ করিবে বলিয়াই এ কথা প্রকাশ করিতে সাহস করি নাই—পথে মাঝী খুনের কথা বলায়, আমার মনে হইয়াছিল, সে নিশ্চয়ই রমেন্দ্রের খুনের কথাই বলিতেছে, তাহাই খানসামা মাড়োয়ারীর কথা বলায় আমার মনে হইয়াছিল যে, সে ভুল শুনিয়াছে। মাড়োয়ারী খুন হয় নাই, রমেন্দ্রনাথ খুন হইয়াছেন।"

"কেন তুমি এ রকম করিলে—কেন—কেন, তাই আমরাও তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। কি কষ্ট পাইয়াছি, তাহা তুমি জান না।" হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশচন্দ্র কহিলেন, "জানি; কিন্তু উপায় ছিল না, প্রকৃত খুনী ধরা না

পড়িলে আমার কথা, অন্যের কথা কি—তোমরাও বিশ্বাস করিতে না, সেজন্য আমাকে বাধ্য হইয়া নীরব থাকিতে হইয়াছিল, এখন ত সব শুনিলে—এখনও কি সন্দেহ কর ?"

"না—না—আমি বাঁচিলাম !"

সতীশচন্দ্র দুই হস্তে হেমাঙ্গিনীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আদরে সপ্রেমে চুম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েরই কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। অবশেষে সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আজই এখান থেকে যাইবে স্থির করিয়াছ ?"

"হাঁ, রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া স্থির করিয়াছি।"

"তোমার শরীর এখনও ভাল হয় নাই, আরও দিন-কত এখানে থাকিলে তোমার শরীর ভাল হইবে, তাহার পর কলিকাতায় ফিরিব—কি বল ?"

"তুমি যা বল—এখন সব যায়গায় আমার স্বর্গ বলে বোধ হইতেছে, তুমি হয় ত শোন নাই, আমার জ্বর-বিকার হইয়াছিল।"

"আমি জানি—তুমি কেমন আছ, আমি রোজ খবর পাইতাম।"

"কে খবর দিত ? পিসীমা বলিলেন, তিনি তোমায় পত্র লেখেন নাই।"

"ডাক্তার বাবু রোজ খবর দিতেন। তোমার পীড়া বাড়িলে আমি তখনই ছুটিয়া আসিতাম। কিন্তু ডাক্তার বাবু রোজ লিখিতেন, কোন ভয় নাই। আসিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমায় ভুলিয়াছিলাম ?"

"না—না—তা আমি মনে করি নাই, তুমি—তুমিই আমায় অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলে।"

"স্বীকার করি, এখন সে সন্দেহ একেবারে গিয়াছে। আর কখনও এই সন্দেহ-রাক্ষস যে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।"

"ভগবান আছেন—"

"আর পাঁচ হাজার কেন, আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিলে রমেন্দ্র যদি ফিরিয়া আইসে, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।"

"সে রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলে, তাহা কি সকলকে—পুলিশকে বলিবে না ?"

"না—হেম, এ সব কথা বলিয়া কোনই লাভ নাই। লোকটাকে আমি অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই, যে লোক ধরা পড়িয়াছে, সেই যে রমেন্দ্রকে খুন করিয়াছিল, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিব না ; আমি কলিকাতায়

পুলিশকে সব কথা বলিয়াছি, আর এখানে সেই কথা বলিয়া কথা বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই। যাহা আমরা জানিলাম, ইহাই যথেষ্ট, আর কাহারও জানিবার আবশ্যকতা নাই।”

এই সময়ে খোকা সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া “বাবা বাবা” বলিয়া সতীশচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল; সতীশচন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

খোকা বাবুর পশ্চাতে পুরাণ ঝি—বাবু যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহা সে জানিত না, কাজেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

হেমাঙ্গিনী বলিল, “ঝি, বাবু বলিতেছেন—”

সতীশচন্দ্র বলিলেন, ‘হাঁ, এখনও হেমের শরীর ভাল হয় নাই। আরও দিন-কত এখানে তাহার থাকা দরকার। যাও—জিনিষ পত্র খুলিতে বল।”

সমাপ্ত।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

শম্ভুজী-হত্যা।

অন্যান্য বহুবিষয়ক নীতির সহিত বর্ত্তমান রণনীতি য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোকচ্ছটায় যে উন্নীত হইয়াছে তাহা পুরাতন ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ইতিহাস তুলনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। মুসলমান জাতিদিগের অভ্যুত্থানের সময় বৈরীপক্ষীয় বন্দীনিগ্রহ ন্যায়বিগর্হিত ছিল, অন্ততঃ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারা তাহার প্রমাণ হয় না। বিজয়ী তাইমুর বাদসাহ একদিনে একলক্ষ ভারতবাসী বন্দীর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, একথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইতিবৃত্তকার কাফীখাঁ মন্তাখাবুল লুবাব * নামক ইতিবৃত্তে ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চরিত্র

---

* মন্তাখাবুল লুবাব ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের একখানি বহুমূল্য ইতিহাস। লেখকের নাম মহম্মদ হাশিম। তিনি কাফীখাঁ খেতাব পাইয়াছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় তাঁহার শাসনের ইতিহাস লেখা নিষেধ ছিল। হাশিম ও তাঁহার পিতা সম্রাটের নিকট চাকুরী করিতেন এবং হাশিম গুপ্তভাবে এই ইতিহাস সংকলন করেন। পরে মহম্মদ সাহের সময় তিনি এই ইতিবৃত্তখানি প্রকাশিত করেন। কেহ কেহ বলেন, ইতিবৃত্তকার গোপনে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন বলিয়া মহম্মদ সাহ তাঁহাকে কাফী বা গুপ্ত খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন।

সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তাইমুর বংশের কোনও ভূপতি এমন কি শেকন্দর লোদীর সময়াবধি দিল্লির কোনও ভূপতি ভক্তি, নিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচারের জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মত প্রসিদ্ধ ছিলেন না"। সেই নিষ্ঠাবান ভূপতি ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয় বীর শম্ভুজীকে যে প্রকারে নিহত করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে আমাদের মনে হয় জগতের সেকালের বন্দী সম্বন্ধীয় নীতিজ্ঞান আধুনিক কালের নীতিজ্ঞানের মত উদার ছিল না। আমরা যথা সম্ভব কাফীখাঁর বর্ণনা হইতে শিবাজীতনয় শম্ভুজীর শেষদশার গল্প বিবৃত করিব।

ইং ১৬৯০ খৃঃ অব্দে সঙ্গমনীর নামক স্থানে বাণ গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া মহারাজা শম্ভুজী তাঁহার মন্ত্রী কবকলসের (?) সহিত তত্রত্য এক প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সে স্থলটি অতি মনোরম। প্রাসাদটি উপত্যকামধ্যে বিরাজিত ছিল। অযুত ফল পুষ্প সুশোভিত প্রমোদোদ্যানবেষ্টিত এই বিলাস হর্ম্ম্যে মহারাজা শম্ভুজী বিশ্রাম করিতেছেন শুনিয়া মোগল সেনাপতি মকরবখাঁ তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজা শম্ভুজী মকরব খাঁর অভিসন্ধি আদৌ বিদিত ছিলেন না। তিনি নির্ভীক নিঃসন্দেহ চিত্তে ইন্দ্রিয় সুখোপভোগে ব্যাপৃত ছিলেন।*

কেহ কেহ বলেন খোরাসানের কাফ প্রদেশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের গৃহ ছিল বলিয়া তিনি কাফীখাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। যাহা হউক ইংরাজ লেখকগণ একবাক্যে তাঁহার ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়াছেন। Elphinstone সাহেব ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস তাঁহার গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়াছিলেন।

* কাফীখাঁ শম্ভুজীর চরিত্র সম্বন্ধে বলেন—শিবাজীর যেমন আদর্শ চরিত্র ছিল, তাঁহার পুত্রের চরিত্র তদনুরূপ ছিল না। শম্ভুজী সুরাপায়ী ছিলেন এবং সুন্দরী পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। "আপনার আবাস ভূমির নিকট শিবাজী একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন। কূপের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর মণ্ডিত করিয়া তথায় তিনি একটি প্রস্তর আসন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই আসনে শিবাজী উপবেশন করিতেন এবং যখন বণিকদিগের বা দরিদ্রগৃহস্থের স্ত্রীলোকগণ জল তুলিতে আসিত শিবাজী তাহাদিগের শিশুগণকে ফল বিতরণ করিতেন এবং আপনার জননী বা ভগ্নী জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত গল্প করিতেন। শম্ভুজী রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়াও এই কূপ সন্নিধানে বসিতেন, যখন প্রজাদিগের স্ত্রী কন্যাগণ জল তুলিতে আসিত তখন এই নীচ কুক্কুর এক হস্তে তাহাদিগের কলসী ধরিত এবং অপর হস্তে তাহাদিগের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে আপনার আসনের নিকট টানিয়া লইয়া যাইত। তথায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া তবে মুক্তি দিত। * * অবশেষে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত প্রজাবর্গ তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া সন্নিকটস্থ ফিরিঙ্গি অধিকারভুক্ত

মোগল সেনাপতি মকরব খাঁ অত্যন্ত সাহসের সহিত কোলাপুর হইতে সেই দুরারোহ ঘাট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শম্ভুজীর অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। আপনার চমূ হইতে বাছিয়া বাছিয়া শূরবীর মোগল সেনাপতি দ্বি সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতির অনীকিনী লইয়া এই দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যে সকল দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে মোগল সেনা উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, সেনাপতি স্বয়ং সে সকল স্থলে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন, শেষে বহু কষ্টে মুসলমান চমূ শম্ভুজী অধিকৃত উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহারাজার দূতেরা নাকি মোগল সেনার আগমন বার্ত্তা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল। সে স্থান যে অগম্য এ ধারণা হিন্দুবীরের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল ছিল যে, তিনি দূতবার্ত্তা মিথ্যা ভাবিয়া তাহাদের রসনা কাটিয়া দিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

মকরবখাঁ এদিকে আপন পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রাদি বিশ্বস্ত যোদ্ধা লইয়া এবং শতেক অশ্বারোহী লইয়া নিশ্চিন্ত হৃদয় বিস্মিত মহারাষ্ট্র ভূপতির উপর আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্র পুরীমধ্যে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি অসম সাহসিক মন্ত্রী কবকলস (?) মুষ্টিমেয় পার্শ্ব রক্ষকাদি সংগ্রহ করিয়া অমিত পরাক্রমে সেই মহতী মোগলগণের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু সে গতি প্রতিরোধ করা মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধৃবর্গের পক্ষে অসম্ভব।

মোগল সৈন্য প্রবাহ প্রতিরোধ করিতে গিয়া হিন্দু সেনাপতি শরবিদ্ধ হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে নিপতিত হইলেন। তিনি সদর্পে বলিলেন—"আমি এস্থল হইতে পলাইব না। এইখানেই প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আপন অসাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করিব"। চারি পাঁচ জন বীর নিহত হওয়ায় অবশিষ্ট মাহারাট্টা যোদ্ধা পলায়ন করিল। মহারাজ হতাশ হইয়া সপরিবারে দেব মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুসলমানগণ সন্ধান পাইয়া মন্দির বেষ্টন করিল। অবশিষ্ট মহারাষ্ট্র নৃপতির জীবন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া একে একে মোগল করে নিহত হইতে লাগিল। শেষে নিরুপায় মহারাষ্ট্র নেতা শম্ভুজী বাদসাহী সেনা কর্ত্তৃক সপরিবারে বন্দী হইলেন। হস্তপদবদ্ধ ষষ্ঠবিংশতি স্ত্রী পুরুষ বিজয়ী সেনাপতি মকরবের নিকট আনীত হইল।

দেশে পলায়ন করিয়াছিল।" বলা বাহুল্য শম্ভুজীর এই চরিত্র শত্রু পক্ষীয় চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত। তবে শম্ভুজী যে আপন পিতার বিমল চরিত্রের আদর্শে চরিত্র গঠন করিতে পারেন নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

মোগল আক্রমণের সময় শম্ভুজী শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন করিয়া মুখে ভস্ম মাখিয়া গৈরিক বাসে সজ্জিত হইয়া সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর-স্থিত মুক্তাহার দেখিয়া এবং তাঁহার অশ্বের পদে সুবর্ণ বলয় দৃষ্টে সেনাপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বিজয় গর্ব্বস্ফীত মকরব তখন এক উচ্চ বারণ পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন। দীন বন্দিগণ তাঁহার হস্তী পদতলে নীত হইল। প্রভূত উদারতা দেখাইয়া বীর মকরব বীরের মর্য্যাদা রাখিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র রাজনকে আপন গজপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। অবশিষ্ট বন্দী বন্দিনীগণ কেহ করিপৃষ্ঠে, কেহ তুরঙ্গমে তাহাদের অনুসরণ করিল।

ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহণে বাদশাহী দূতবৃন্দ তীরবেগে সংবাদ লইয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট ছুটিল। তিনি তখন নীরানদীতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী তনয় সপরিবারে বন্দী হইয়া তদসমীপে আনীত হইতেছে এ সংবাদ শ্রবণে সম্রাট আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি নগরে নগরে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাপতিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শিবিরের পথে দুই ক্রোশ দূরে রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সম্রাটের প্রধান অরি মহারাষ্ট্র বীর বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া সকল শ্রেণীর রাজভক্ত প্রজা আনন্দ করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে উৎসব চলিতে লাগিল। কাতারে কাতারে নরনারী পথের ধারে দাঁড়াইয়া প্রসিদ্ধ বন্দীকে দেখিতে লাগিল।

বাদসাহের শিবিরে মকরব খাঁ সদল বলে পঁহুছিলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব একটি দরবার করিলেন। সিংহাসনাধিরূঢ় হিন্দুস্থানের সুলতানের সম্মুখে হিন্দুবন্দিগণ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া জগদীশ্বরের উদ্দেশে দুইবার প্রণাম (রোকাত) করিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী কবকলস্ সম্রাটের তাদৃশ ভাব দেখিয়া হিন্দি শ্লোকে মহারাজাকে বলিলেন—'রাজন, এত জাঁক জমকের মাঝেও আলমগির ভূপতি আপনাকে দেখিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। 'আপনাকে সম্মান করিবার জন্য সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন।' বন্দীদিগকে অবলোকন করিয়া সম্রাট তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন।

তাহার পর বন্দীদিগকে লইয়া কি করা হইবে তাহা লইয়া রাজামাত্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। একদল অমাত্যের পরামর্শে স্থির হইল যে যদি শম্ভুজী তাঁহার সেনাপতিগণ রক্ষিত দুর্গগুলির চাবি সম্রাটকে প্রদান করেন

তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণরক্ষা হইবে। বন্দীদিগের নিকট এ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইলে তাঁহারা সম্রাটকে উপহাস করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে শুনাইয়া ঔরঙ্গজেবকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। এ সংবাদ সম্রাটের নিকট পঁহুছিলে তিনি কুপিত হইয়া শম্ভুজী ও কবকলসের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিলেন।

যেমন একালে রাজাজ্ঞায় বন্দীর প্রাণদণ্ড হয় অবশ্য এতদুভয় বন্দীর সেরূপ প্রাণদণ্ড হইল না। ঔরঙ্গজেব আজ্ঞা দিলেন যে, যখন জিহ্বা দ্বারা বন্দীদ্বয় তাঁহাকে গালি দিয়াছেন তখন প্রথমে তাঁহাদের জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হউক। তাহার পর তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা হইল। তাহার পর নানা-প্রকার কঠোর দণ্ডের পর আরও দশ জন বন্দীর সহিত তাহাদের শিরচ্ছেদ হইবার আজ্ঞা হইল। হতভাগ্যদিগের দেহ মৃত্যুর পরও পবিত্র শান্তিপ্রদ চিতায় আশ্রয় পাইবার অধিকার পাইল না। সম্রাট ঔরঙ্গজেব আজ্ঞা দিলেন যে শম্ভুজী ও তাঁহার মন্ত্রীর খণ্ডিত শিরে খড় পুরিয়া দামামা দুন্দুভি বাজাইয়া দক্ষিণের সকল সহরে তাহা দেখান হউক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে এক বীর পরাজিত অপর এক বীরকে এইরূপে নিগৃহীত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই!

পৌরাণিক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম মন্বন্তরের বর্ণিত নৃপতিগণের অধিকারের বিষয় প্রথম অংশে শেষ না হওয়াতে দ্বিতীয় অংশে তাহার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হইয়াছে। সেই নরপতিগণের মধ্যে ভরত নামক একজন রাজা আপনার নামানুসারে এই দেশকে ভারতবর্ষ আখ্যায় অভিহিত করেন। ইহাতেই পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে সুমেরু পর্ব্বত, সপ্তদ্বীপ এবং তদ্বেষ্টিত সপ্ত সমুদ্রের সংস্থান এবং পৃথিবীর সীমা উল্লিখিত হইয়াছে। সে সমস্ত বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও যে সকল দেশ প্রদেশ বা স্থান তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের ভৌগোলিক বর্ণনা সম্বন্ধে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কেবল ভারত

নামক দেশটী ঐ নিয়মের বহির্ভূত। যে সমস্ত পর্ব্বত বা নদী ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত নগর বা জাতির উল্লেখ ইহাতে আছে, তাহাদের প্রকৃত সত্বাও অনেক স্থলে সপ্রমাণিত হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত এই সমস্ত বিবরণ দীর্ঘায়তন নহে এবং বোধ হয় কোন বিস্তৃত বিবরণ হইতে তাহারা এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক প্রভৃতির যে বিবরণ দেখা যায়, সে সমস্তও কাল্পনিক। তাহাদের স্থানে স্থানে প্রকৃত ঘটনার কিয়দংশ থাকা অসম্ভব নহে। ভরতের জীবনের শেষভাগের আখ্যায়িকা বোধ হয় সংগ্রহকারকের স্বকপোলকল্পিত। যিনি রাজা ভরত নামে পূর্ব্বে আখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ আখ্যায়িকায় দৃষ্ট হয়, যে তিনি ব্রাহ্মণরূপী এবং সেই বেশে তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। এ ব্যাপারটী সংগ্রহকারকের স্বকপোল-কল্পিত এবং তাহা এ পুরাণের একটী বিশেষ লক্ষণ। বেদ এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থকে হিন্দুগণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করেন অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থকে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপাদি এবং ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক বর্ণনার প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহাদের প্রকরণ ইহার তৃতীয় অংশের প্রারম্ভেই সুপ্রণালী অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সকল গ্রন্থ হিন্দুদিগের সাহিত্য ও ধর্ম্ম ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকরী। এস্থলে ব্যাস, বেদ ইতিহাস ও পুরাণ রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত না হইয়া সেই সকল গ্রন্থের সংগ্রহকারক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কতকগুলি ব্যাস ভূতলে অবতীর্ণ হইবার প্রসঙ্গ যাহা ইহাতে আছে অর্থাৎ যাহারা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ নূতন আকারে গঠন করিয়াছেন, তাহারা সময়ে সময়ে যে সেই কার্য্য করিয়াছেন, সেই সময়ের কাল্পনিক ব্যবধান ব্যতীত তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রকার বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না। পুরাতন উপাদানে কোন নূতন বিষয় নূতন আকারে গড়িতে হইলে কতক অংশ পরিত্যাগ বা কতক অংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়। সুতরাং সেই জন্য এরূপ ব্যাপারের সংঘটন হওয়া বিচিত্র নহে। এখানে সর্ব্বজনবিদিত শেষ সংগ্রহকারক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুলেখকগণ অনুমান করেন যে, এই সকল ব্রাহ্মণ চতুষ্পাঠী বা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহুকাল পূর্ব্বে, এরূপ এক সময়ে তাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রীস-

দেশীয় লেখকদিগের লিখিত ভারতের বিবরণ সম্বন্ধে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দারা উপলব্ধি হইবে যে, গ্রীকজাতিদের ভারতের বিবরণ সংগ্রহের কিছুকাল পূর্ব্বে ঐরূপ চতুষ্পাঠী বা বিদ্যালয় ভারতে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই বিবরণে সম্যক উপযোগী প্রণালী থাকাতে ইহা সপ্রমাণিত হইবে যে সেই সকল বিবরণ সম্পূর্ণাবয়বে ছিল। সে সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাসনামা অন্যান্য ব্যক্তিগণ এবং বিদ্যামন্দির বর্ত্তমান ছিল এবং অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বিশেষতঃ পুরাণ সকল নূতন আকারে গঠিত হইয়াছিল। এই দুই ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না, কারণ সেই সকল গ্রন্থের আভ্যন্তরিক বিষয় আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, যে তাহাদের মধ্যে ঐ সকল বিষয় অপেক্ষাকৃত অপ্রামাণিক ও আধুনিক উপাদানে গঠিত হইয়াছে। আবার উহাদের আভ্যন্তরিক বিবরণে নির্ব্বিবাদে ইহাও সপ্রমাণিত হইবে যে, উহাদের মধ্যে পুরাতন উপাদানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; এবং সেইজন্য পুরাণের সূচীপত্রোল্লিখিত অধিকাংশ, শিক্ষাপ্রদ প্রচলিত নীতিসমূহ, জনশ্রুতির বিবরণ এবং তদানীন্তনতার প্রতি সন্দেহ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করা বৃথা। কিন্তু তাহাদের নীতির মূল ও বিকাশ, জনশ্রুতি, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি সামান্য সময়ের মধ্যে উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে।

তৃতীয় অংশের অবশিষ্ট ভাগে হিন্দুদিগের প্রচলিত বিদ্যামন্দির, ভিন্ন ভিন্ন জাতির কর্ত্তব্যতা, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর এ জীবনের কার্য্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হইয়াছে এবং মনুর অভিমতের সহিত সে সকলের ঐক্যতা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ এবং এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ যে অধিকাংশ পুরাণের পূর্ব্বে প্রকটিত তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইবে। কারণ ইহাতে উপাসক সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন অনাবশ্যক ক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই। ইহাতে ব্রতাদি বা প্রশস্ত দিনের ব্যবস্থা নাই। কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করিবার নিয়ম নাই। পর্ব্বদিবস নাই। লক্ষ্মীর উদ্দেশে রাত্রি জাগরণের নিয়ম নাই এবং বেদের নিয়মানুসারে বলি বা অন্য কোন প্রকার পূজার পদ্ধতি ইহাতে নাই। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ইহাতে কীর্ত্তিত হয় নাই।

চতুর্থ অংশে হিন্দুদিগের পুরাতন ইতিবৃত্তের বিবরণ আছে। ইহা বংশাবলী এবং ব্যক্তি বিশেষের বৃহৎ ও সুদীর্ঘ তালিকায় পরিপূর্ণ। ইহা ঘটনা সমূহের উৎবর ইতিহাস। ইহাতে বিবৃত ঘটনা সমূহ অলীক না হইলেও ব্যক্তিগণের

ইতিহাস প্রকৃত নয় বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কারণ ইহাতে বর্ণিত পুরাতন বংশাবলীর নৃপতিগণের পরমায়ু সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে সেগুলি যে নিশ্চয়ই ভ্রমে পরিপূর্ণ,তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি তাহাদের মধ্যে বর্ণিত কতকগুলি বিষয় অসার ও কাল্পনিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তদুল্লিখিত ব্যক্তিগণের অবরোহ প্রণালীগত উত্তরাধিকারিগণের বিবরণে অকৃত্রিম, সরল ও সঙ্গত ভাব দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের কোন কোন কার্য্য অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এবং সেইজন্য এই জনশ্রুতি সকল বিশ্বাসযোগ্য ও সমীচীন অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপ ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে না, সে যাহাই হোক তাহারা সমীচীন কি না, তাহা নির্ণয়ের কোন উপায় না থাকিলেও সেই সকল উপন্যাস যেরূপ আকারে থাকুক না কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। সেই সকল উপন্যাস কতদূর সমীচীন, তাহা জানিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতিদের অভ্যুদয় বা রাজত্বের কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ নৃপতি-বিশেষের রাজত্বকালের সামান্য আভাষ ব্যতীত বা কৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে এবং কলিযুগের আরব্ধ কাল ঘটিত প্রচলিত ঘটনা ব্যতীত মূল গ্রন্থে তাহাদের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং কলিযুগ আরম্ভ এই ঘটনাদ্বয় বর্ত্তমান কাল হইতে পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এক সময়ে আরম্ভ হইলেও ঐ দুই ঘটনার সময় পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশে ৯১ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং চন্দ্র-বংশে ৪৫ জন মাত্র। ইহা হইতে বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত বংশের তালিকায় কতকগুলি নাম যোগ করা হইয়াছিল এবং শেষোক্ত বংশ হইতে কতকগুলি নাম বিয়োগ করা হইয়াছিল। এবং সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ সমসাময়িক হইলেও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদের পরবর্ত্তীকালে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। চন্দ্রবংশ যে নিশ্চয়ই সূর্য্যবংশের শাখা তাহা সুদ্যুম্নের উপন্যাসেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত সময়ের অনেক পূর্ব্বকাল বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকৃতি এই গল্পে বিশদভাবে দৃষ্ট হয়। সংখ্যাবহুল নৃপতিদের মধ্য হইতে অধিকাংশ নৃপতিকে বিয়োগ করিলে বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইবে না। হিন্দু ভূপতিগণ ও তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান

ছিল হয় ত ইহা অধিক পুরাতন হইতে পারে বা না হইতে পারে, তবে এই কথা বলিলে বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে, যে যখন এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত একান্ত অসম্ভব, তখন পুরাণে উল্লিখিত নৃপতিগণের বংশাবলীর মধ্যে আমরা এরূপ প্রমাণ পাইতে পারি, যে যদিও কাল সহকারে অলীক ঘটনা সকল তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যদিও অযত্ন ও অবিমৃশ্যকারিতা হেতু সেই সকল সংগৃহীত বিষয়ে কোন প্রকারে দোষ সংস্পর্শ হইয়া থাকে, তত্রাচ তাহাদের মধ্যে যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ অসমীচীন বোধে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। তাহাতে অন্যান্য জাতিদের সমীচীন ইতিহাসের ন্যায় হিন্দুদিগের ধারাবাহিক রাজত্বের সংস্থান ও তাহাদিগের অবরোহ ক্রম অতি পুরাকাল হইতে যে ক্রম প্রণালী অনুসারে দৃষ্ট হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

যে সমস্ত আদীম নৃপতির বিবরণ তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ক ঘটনার সহিত ভারতের উপনিবেশের জাজ্বল্যমান সংস্রব আছে এবং জনহীন বা অসভ্য লোক পরিপূর্ণ প্রদেশের উপর নবাগত জাতির ক্ষমতার ক্রম বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, যে ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তাহাদের সুসংস্কৃত আচার রীতিনীতি প্রভৃতি বিদেশ হইতে ভারতে নীত হইয়াছিল। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এবং অন্যান্য স্থানে এখনও পর্য্যন্ত এবম্প্রকার জাতি আছে। যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতা পাঠে উপলব্ধি হইবে যে বঙ্গ, উৎকল এবং দাক্ষিণাত্যের সমগ্র প্রদেশে এক সময়ে নীচ ও অসভ্যজাতি বাস করিত। পুরাণও ইহা সমর্থন করে। কিন্তু হিন্দুগণ কোথা হইতে ভারতে আসিয়াছিল, সে বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও পুরাণে লক্ষিত হয় না। এসিয়া মহাদেশের কেন্দ্রস্থল হইতে, ককেসস পর্ব্বত হইতে বাবিলনের সমতল ক্ষেত্র হইতে কিম্বা কাস্পিয়ান হ্রদের তীর হইতে তাহারা আসিয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পুরাণে নাই। অন্যান্য কতকগুলি জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার একতা দৃষ্টে সপ্রমাণিত হইতে পারে যে তাহারা এবং হিন্দুরা এক সময়ে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থিত প্রদেশ বিশেষে বাস করিত এবং সেই প্রদেশেই মানবজাতির প্রথম বসতি হইয়াছিল। বেদশাস্ত্রে ইহার কোন আভাষ ছিল কি না তাহার সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের এবং তাহাদের শাসিত প্রদেশ সমূহের আদি সংস্থাপন সম্বন্ধে জনশ্রুতি ব্যতীত পুরাণে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত

অসঙ্গত। তজ্জন্য বিদেশীয় মূল হইতে হিন্দুজাতির উৎপত্তি সে সম্বন্ধে কোন সন্ধান পুরাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারা যায় না।

সেই কারণে হিন্দুজাতির ইতিহাসে ভারতের পুরাতত্ব আবিষ্কার করিবার কোন উপায় দেখিতে পাই না। ভারতে অসভ্য আদিম নিবাসিগণের অবস্থান, মনুসংহিতা প্রকটিত হইবার সময়ে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের ক্রম বিস্তৃতি, সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন কতকগুলি ভাষার প্রচলন, পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সৌসাদৃশ্য, এই কয়টী ব্যাপার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, যে ব্যক্তিগণের ভাষা সংস্কৃত এবং যাহারা বৈদিক ধর্ম্ম অনুসরণ করিত তাহারা সিন্ধু নদের পশ্চিমের কোন প্রদেশ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে আগমন করিয়াছিল। কোন সময়ে কি প্রকার অবস্থায় তাহারা ভারতে আসিয়াছিল এবং তাহাদের উপনিবেশ কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে কোন কালে নির্ণয় হইবে সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু কোন্ স্থানে তাহারা প্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ক্রম উপনিবেশের সার সংগ্রহ করা তত কঠিন নহে।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

নাদির সাহ।

আধুনিক জগতের রণনীতি পূর্ব্বের রণনীতি অপেক্ষা উন্নীত, আধুনিক সভ্য জগতের বিজয়ী সেনা বা বিজয়ী বীর একেবারে আদর্শ চরিত্র না হইলেও তাহারা যুদ্ধজয়ের পর যথেষ্ট সংযমের পরিচয় প্রদান করে একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। য়ুরোপীয় খৃষ্টান জগতের রণনীতি চিরকালই অপেক্ষাকৃত উন্নত। এমন কি আধুনিক মুসলমান জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে আধুনিক মুসলমান পূর্ব্বের মুসলমান অপেক্ষা বহুগুণ সংযমী। মুসলমান জগতে পূর্ব্বে কে কবে রক্তহীন রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা শুনিয়াছে? আধুনিক জগতে পারস্য ও তুরস্কে যেরূপ সুশৃঙ্খলে একটা বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহা প্রশংসার যোগ্য।

বেশী প্রাচীন ইতিহাসের কথা নয়, ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্ত্তৃক শান্তিস্থাপনের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিজয়ী পারস্য বীর নাদির সাহ যেরূপ নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় জগদীশ্বর ওরূপ নরপিশাচ

সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিসের জন্য। মোহম্মদ সফি নামক ইতিবৃত্তকার বলেন যে নাদির সাহ কর্ত্তৃক দিল্লি বিজয় এবং তাঁহার সহিত মহম্মদ সাহের সন্ধি স্থাপনের তিন দিন পরে একটা গুজব উঠিল যে মহম্মদ সাহ নাদির সাহকে হত্যা করিয়াছেন। এই সংবাদে দিল্লিবাসিগণ বিজয়ী পারস্যবাসীদিগের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য নাদির সাহের তিন সহস্র পারস্যবাসী সৈন্যকে হত্যা করিল। মধ্যরাত্রে যখন নাদির সাহের নিকট এ সংবাদ পঁহুছিল তখন প্রথমে তিনি এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। শেষে যখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার সৈন্য হত্যা সংবাদ সত্য তখন দিল্লিবাসি-দিগের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তিনি স্বয়ং অসি হস্তে পথে নির্গত হইলেন এবং রসতুদ্দৌলার মসজিদের নিকট দাঁড়াইয়া সকল দিল্লিবাসীকে হত্যা করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

সেই মধ্যরাত্র হইতে পরদিন প্রাতে পাঁচ ঘণ্টা কাল অবধি নরনারী জীবজন্তু যে কোন প্রাণী নৃশংস পারস্যবাসীদিগের সম্মুখে পড়িল পিশাচগণ তাহাদের প্রাণবধ করিতে লাগিল। প্রতি গৃহে, প্রতি হর্ম্ম্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল!

এই সংবাদে মোহাম্মদ সাহ স্বয়ং গিয়া নাদির সাহের নিকট দিল্লিবাসিদিগের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। নাদির সাহ তখন আপন সৈন্যকে নিরস্ত করিলেন।*

ইতিবৃত্তকার রস্তম আলিও এই সংহার ও লুণ্ঠনের উপরোক্ত কারণ বিবৃত করেন। তিনি বলেন নাদির সাহ নিহত হইয়াছেন এইরূপ জনরব উঠায় দিল্লিবাসিগণ পঞ্চ সহস্র পারসিক সৈন্য বধ করেন। ইহা শুনিয়া মসজিদের নিকট আসিয়া নাদির সাহ স্বয়ং সংহারের আজ্ঞা দেন। নয় ঘণ্টা ধরিয়া হত্যা চলিয়াছিল এবং লক্ষ প্রাণী নিহত হইয়াছিল।

বয়ানি ওয়াকির মতে ৩০০০ পারস্যবাসী ও ২০,০০০ ভারতবাসী নিহত হইয়াছিল। ৮০৯ক্রোর টাকার দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শেষে মহম্মদ সাহের অনুরোধে পারস্য সেনা নাদির সাহের আজ্ঞায় নিরস্ত হয়।

সমসাময়িক হিন্দু ইতিবৃত্তকার আনন্দ রাম বলেন—"১১ই তারিখের প্রাতে পারস্যাধিপতি নগরবাসীদিগকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইহার কি ফল

---

* কিম্বদন্তী আছে যে কতিপয় পারাবত লইয়া পারস্য সেনা ও দিল্লিবাসীদিগের মধ্যে কলহ হয় এবং তাহার ফলে হত্যা ও লুণ্ঠন হয়। কোনও বিশ্বস্ত ইতিবৃত্তকার কিন্তু এ কিম্বদন্তীর সমর্থন করেন না।

হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। এক মুহূর্ত্তে বিশ্ব ধ্বংস হইবে বলিয়া বোধ হইল। চাঁদনী চক, ফলের বাজার, দরীশ বাজার এবং জুমা মসজিদের চতুর্দ্দিকের ঘরবাড়ী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। প্রত্যেক নগরবাসীকে নিহত করিবার উদ্যোগ হইল। কোন কোন স্থলে একটু প্রতিরোধের চেষ্টা হইল কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিনা প্রতিরোধে লোকে প্রাণ দিতে লাগিল।......সহরের বাহিরে ওয়াকিলপুরা মহল্লায় আমার গৃহ হইতে আমি ত্রাস্ত হইয়া এ ব্যাপার দেখিতেছিলাম। যদি আবশ্যক হয় তো ঈশ্বরের নামে শেষাবধি যুদ্ধ করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।" লেখক বলেন বহুদিন ধরিয়া দিল্লির রাজপথ সকল নরদেহে আবৃত ছিল। নাদির সাহ এই ব্যাপার উপলক্ষে নগদ মুদ্রা এবং বহু সহস্র আসরফি লইয়াছিলেন। এক ক্রোর মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ থালি এবং ৫০ ক্রোর টাকার জহরৎ পারস্যাধিপতির হস্তগত হইয়াছিল। হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও লইয়া যাইতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এমন কি বহুমূল্য ময়ূর-সিংহাসনও তিনি লইয়া গিয়াছিলেন।

জৌহরী সমশাস নামক ইতিহাসে প্রকাশ যে মহম্মদ স্বয়ং ময়ূর-সিংহাসন নাদির সাহের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এখন বেশ ধারণা করা যায় যে আধুনিক সভ্যতার ফলে জগত নাদির সাহের মত বিজয়ী বীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যখন মানুষ আদর্শ সভ্যতার সীমায় উঠিবে তখন পৃথিবী হইতে যুদ্ধ প্রথা উঠিয়া যাইবে এবং মানবজাতি শালিশির দ্বারা আপনাদের মনোমালিন্য তিরোহিত করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক সুধীজনের এইরূপ আশা।

সোরাব ও রস্তম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কুপিত সোরাব কিন্তু করিল উত্তর ;—
ভেদিয়াছে তীক্ষ্ণশূল বেগে পার্শ্বদেশ
গভীর, যাতনা তীব্র বিঁধিছে শরীর,
বাহির করিতে তাই ফলকে বাসনা,
ছুটাইতে রক্তস্রোতে প্রাণ জ্বালাকুল ;
কিন্তু ইচ্ছা বুঝাইতে উদ্ধত শত্রুরে ;—
" 'সোরাব রুস্তমসুত' সত্য সুনিশ্চয় !
অর্দ্ধোত্থিত বাহুপরি কহিল কর্কশ ;

"কে তুমি হে মহাশয়,অ বিশ্বাস মোরে !
মুমুর্ষুর মুখে সত্য নিঃসরে সতত !
মিথ্যা কভু বলি নাই আমার জীবনে !
বলি শুন, পুরাকালে জনক আমার
দিলেন মায়েরে মোর, মুদ্রা কুলাগত,
ইচ্ছা, যেন মাতা তাঁর পুত্রের শরীরে
সূচ্যগ্রে বিদ্ধেন চিহ্ন—কুলের লক্ষণ ;
আছে সেই চিহ্ন মোর স্কন্ধের উপরি।"

কহিল সোরাব হেন। রস্তমের মুখ
হইল মলিন শোকে, কাঁপিল দু' জানু,
হানে বৰ্ম্মাবৃত হস্ত শোকে বক্ষঃস্থলে ;
লৌহময় উরস্ত্রাণ স্বনিল ভীষণ
ঝনঝনি ; আর করে হৃৎপিণ্ড চাপি,
(যেন বক্ষ ভেদি প্রাণ বাহিরিতে চায়)
কহিলা গদ্‌গদ স্বরে সোরাবের প্রতি ;—
"সত্য বটে, সেই চিহ্ন অব্যর্থ প্রমাণ,
সোরাব ! যদ্যপি তাহা পার দেখাইতে,
তবেই নিশ্চয়,তুমি রস্তমের সুত !"

রস্তমের বাক্য শুনি, ক্ষীণ দ্রুত করে
খসাইল কটিবন্ধ সোরাব তৎপর,
স্কন্ধোপরি খুলি দিল বৰ্ম্মের বন্ধন ;
দেখাইল চিহ্ন তথা রচিত সিন্দূরে
সূচ্যগ্রে, অস্ফুট ! পিকিননিবাসী যেন
চারু শিল্পকর, করে লঘুকরে চিত্র
চীনের কলসে—সম্রাটের উপহার—
সূচ্যগ্রে সিন্দূরে, সুন্দর, প্রভাতকালে,
সুদীর্ঘ দিবসে, নিশাকালে দীপালোকে,
(দীপশিখা জ্বলে তার ভালে, লঘুকরে)
সেরূপ সোরাব স্কন্ধে লঘুকরাঙ্কিত
প্রকাশিল সূচীচিহ্ন—মুদ্রা রস্তমের !

গ্রিফিনের মূর্ত্তি,—মুদ্রা ;—পালিল গ্রিফিন্
রস্তমের পিতামহে, অসহায় শিশু
ফেলি গেল গিরিমাঝে যবে মৃত্যু-ক্রোড়ে
পিতা মাতা, দয়াপর পুত্রসম স্নেহে !
গৌরবের চিহ্ন বলি, ধরেন রস্তম্,
দেহে সে পশুর মূর্ত্তি, কুলচিহ্ন-রূপে ;
সোরাব্ দেখায় চিত্র নিজ স্কন্ধোপরি !
কতক্ষণ শোকচক্ষে নিরখি বিশেষে
পরশি স্বকরে মুদ্রা কহিল রস্তমে ;—
"কি বল এখন ? এই কি যথার্থ চিহ্ন
রস্তম্-সুতের ? আর কেনো বীরেশের
তনয় অথবা, বহে হেন চিত্র দেহে ?"

সোরাব্ কহিল হেন। রস্তম্ কাতর,
এক দৃষ্টে কতক্ষণ রহিল চাহিয়া ;
দাণ্ডাইল বাক্যহীন ; কতক্ষণ পরে,
শ্রবণভৈরব-রবে, উত্তরিলা বীর ;—
"হায়, বৎস, পিতা তব !— নীরব রস্তম্ ;
আর না সরিল ভাষা, রুদ্ধ ভাষা-পথ
শোকাবেগে ; দশদিক্ হেরিল আঁধার।
ঘুরিল মস্তক ; ভূমে পড়িল মূর্চ্ছিত !
সোরাব আইল তথা বক্ষে ভর করি,
জনকেরে জড়াইল বাহুর বেষ্টনে
স্কন্ধদেশে ; পিতৃমুখ করিল চুম্বন ;
পিতার কপোলযুগে, চৈতন্য করিতে,
কম্পমানে বুলাইল কর অনুরাগে !
রস্তম্ লভিল জ্ঞান কতক্ষণ পরে,
মেলিল নয়নদ্বয় ভয়বিস্ফারিত ;
দু'হাতে পার্শ্বের ধূলি তুলিয়া মুষ্টিতে
মাখিল মস্তকে, কেশ করিল মলিন,
করিল বিবর্ণ মুখ, শ্মশ্রু, অস্ত্র সব

সমুজ্জ্বল ; বক্ষঃস্থল উঠিল কাঁপিয়া
প্রবল শোকের ক্ষোভে; না সরিল ভাষা
শোকগদগদ কণ্ঠে ; লইলা কৃপাণ,
জনমের মত প্রাণে দিতে জলাঞ্জলি !
সোরাব্ জানিল মন, ধরিল দু'হাতে,
সান্ত্বনার বাক্যে তবে প্রবোধে জনকে !
"ক্ষান্ত হও, পিতঃ ! মম জনমের কালে
যা' ছিল ভাগ্যের লিপি, তাহাই ঘটিল
ভাগ্যে মোর আজ, তুমি সে ভাগ্যের মাত্র
সাধন প্রধান ! তুমি তা' জানিবে কিসে !
নিশ্চয়, যখনি তোমা, দেখিলাম আমি,
তখনি জানিল মন, তুমি পিতা মম ;
তোমারো অন্তর বলেছিল, পুত্র আমি !
কিন্তু, ভাগ্যস্রোতে সব দিল ভাসাইয়া !
দারুণ ভাগ্যের গতি ! ভাগ্য, সেই ভাগ্য
ঘটাইল রণ, নিক্ষেপ করিল মোরে
জনকের শূলে ! কিন্তু এ কথায় আর
কিবা প্রয়োজন ? পেয়েছি জনকে মোর
দেখিনু জনকে এবে খুঁজি কতকাল !—
মহানন্দ ! উপভোগ করিব এখন
সেই সুখ ! এস পিতা, সৈকত শয্যায়
বৈসহ পুত্রের পার্শ্বে, ধর দুই করে
শির মম, চুম্ব দেহ কপোলযুগলে,
দরদর অশ্রু তাহে পড়ুক ঝরিয়া ;
শোককণ্ঠে "পুত্র" বলি ডাক একবার !
সত্বর ! সত্বর ! পিতঃ, সন্নিহিত মোর
অন্তিম সময়, শীঘ্র অভিলাষ এই
কর সম্পাদন ; পশিনু বিদ্যুদ্‌বেগে
সমরপ্রাঙ্গণে, যাইব চলিয়া এবে
বায়ুবেগে,—অকস্মাৎ অতি দ্রুতগতি
প্রবল পবনবেগে ! বৃথা কেন শোক !
ইহাই লিখিলা বিধি সোরাবের ভালে,
নিশ্চয় ঘটিবে ইহা, নহিক অন্যথা।"

কহিল সোরাব হেন। সান্ত্বনাবচনে
রস্তমের শোকভার করিল শিথিল ;
চক্ষু ফাটি অশ্রুরাশি বাহিরিল বেগে !
দু'করে কুমারে স্কন্ধে করিয়া বেষ্টন
কাঁদিল বিমুক্তকণ্ঠে ; চুম্বিল সস্নেহে
তনয়ের মুখচন্দ্র ! উভয় বাহিনী
হেরি রস্তমের শোক হইল বিস্মিত !
রক্ষ হয়বর, মস্তক আনত করি,
লুণ্ঠিতকেশর, আইল দোঁহার কাছে।
ভাষা নাই ; শোকপূর্ণ সুদীন নয়নে
রস্তমের সোরাবের চাহিল বদন,
জিজ্ঞাসিতে যেন কি সে দুঃখের কারণ
উত্তপ্ত অশ্রুর বিন্দু, সম বেদনায়,
নীল নয়নের প্রান্তে ঝরিল ঝর্ঝর,
ভাসাইয়া গণ্ডস্থল সিঞ্চিল সৈকত !
রস্তম্ ভর্ৎসিলা কিন্তু কর্কশ বচনে,
রুক্ষে ; কহিলেন ;—রুক্ষ ! এখন সহিছ
মহাশোক ; কিন্তু হেথা আসিবার আগে
অথবা শৈশবে সুদৃঢ় চরণসন্ধি
ধাবনকুশল, স্খলিত হইত যদি
গ্রন্থিতে, গ্রন্থিতে, ঘটিত না সর্ব্বনাশ !
চাহিল সোরাব তবে ঘোটকের পানে,
কহিল ;—এই কি তবে রুক্ষ ? কতবার
শুনিলাম জননীর মুখে পূর্ব্বকালে,
বিবরণ তব ! পরাক্রান্ত তুমি, অশ্ব !
ভীষণ পিতার মম ঘোটক ভীষণ !
কহিলেন মাঁ ;—"একদিন প্রভু সহ

দেখিব তোমাকে।" এস, বুলাইব কর,
কেশরে তোমার ; ভাগ্যবান্ তুমি, রুস্ক !
সোরাব হইতে ; ভ্রমিয়াছ কত দেশ ;
যাবেনা সেখানে সোরাব এ জন্মে আর ;
পিতৃ-জন্মভূমি পুণ্য, সেবিয়াছ তা'র
সমীরণ, ভ্রমিয়াছ সৈকত প্রান্তরে ;
হেলমণ্ড, জিরাহ্রদ হেরিয়াছ তুমি ;
বৃদ্ধ পিতামহ স্কন্ধে ধীর করাঘাতে
তুষিতেন মন তব ; হেমপাত্র ভরি,
দিতেন সুরায় সিক্ত শস্য, খাদ্য কত !
বলিতেন—"সাবধানে বহিও রস্তমে !"
কিন্তু, দেখি নাই আমি কভু এ জনমে,
পিতামহ জালের সে কুঞ্চিত কপাল ;
হেরি নাই সিষ্টানের সুন্দর ভবন ;
করি নাই তৃষ্ণা দূর সে নদীর নীরে,
নিরমল ; বঞ্চিলাম পিতৃশক্রদলে
এ জীবন ; দেখিয়াছি তাতারবাসীর
অসিত শিবিরপুঞ্জ ; মরুভূমিমাঝে
বোখরা, সমরকন্দ, খিবা এই তিন
রাজার নগরী; মুর্খাব, টেজাণ্ড, কোহিক্
মরুনদীত্রয় উত্তরেতে সার নদ,—
কাযাকেরা তীরে যার রাখে মেষপাল,—
এই মহানদী আমু,—হেমধারা যেন,—
যাহার সৈকততটে হারাইনু প্রাণ ;
নিবারিনু তৃষাক্লেশ এ সবার নীরে !"

সোরাব হইল মৌনী। দীর্ঘ শোকোচ্ছ্বাসে
বিলাপ করিয়া তবে কহিল রস্তম্ ;—
"হায়, যদি তটিনীর তরঙ্গ সকল,
উছলি ভাসায় মোরে, কিংবা স্বর্ণবর্ণ,
তীরের বালুকারাশি তরঙ্গে নাচিয়া,
সমাহিত করে, তবে জুড়ায় এ প্রাণ !"

মধুর গম্ভীর তবে পিতার বিলাপে
উত্তরে সোরাব্ ;-"করিওনা কভু পিতা,
হেন অভিলাষ ! জীব দীর্ঘকাল তুমি ;
সংসারে কাহারো জন্ম মহাব্রত তরে;—
দীর্ঘজীবী হয় সেই। কাহারো জনম,
মরিবারে ;—রহে নাম আঁধারে ডুবিয়া।
মরিনু অকালে তাই নারিনু সাধিতে
জীবনের মহাব্রত ! তুমি সাধ, পিতা ;
কীর্ত্তির দ্বিতীয় স্তম্ভ রচ এ জীবনে !
তুমি মম পিতা ;—তোমার হইলে যশ,
আমারো নিশ্চয় ! আর শুন, দেখ, ওই
অসংখ্য সৈনিক ; মোর অনুচর সবে ;
নাশিওনা সে সবারে, এ মম প্রার্থনা !—
তা'দের প্রাণের তরে, এই ভিক্ষা মোর !
কি দোষ তাদের ! তা'রা অনুচরমাত্র,
আমার, আশার মম, যশের, ভাগ্যের !
সকলে ফিরিয়া যাক আমু-পরপারে
নিরাপদে ! আর পিতা ! প্রেরিও না মোরে,
তাহাদের সনে, লহ মোরে হেথা হ'তে
সিষ্টাননগরে তব সঙ্গে ! শয্যাতলে,
স্থাপি মৃতদেহ, তথা বৃদ্ধ পিতামহ
বন্ধুগণ সহ প্রকাশিও মৃত্যুশোক !
সেই প্রিয় দেশে করিয়া সমাধি মোর,
ঢাকিও কঙ্কাল, উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপে,
তদুপরি স্মৃতিস্তম্ভ করিও স্থাপিত
মেঘস্পর্শী ! মরুস্থলে অশ্বারোহী যেন,
দূর, অতি দূর পথে, পায় দেখিবারে

আমার সমাধিস্তম্ভ,বলে উচ্চৈঃস্বরে ;—
"বার রস্তমের সুত সোরাবের ওই
অত্যুচ্চ সমাধিস্তম্ভ! যশস্বী জনক
মারিল অরাতিবোধে!" মরণেও তবে
ডুবিবে না নাম মম বিস্মৃতি-আঁধারে!"

রস্তম্ শোকার্ত্ত স্বরে উত্তরিলা তবে;
"চিন্তা নাই,বৎস! তুমি কহিলে যেমন,
তেমনি করিব! অগ্নিমুখে সমর্পিব
শিবির আমার, ছাড়ি দিব সৈন্যগণে;
ল'য়ে যাব হেথা হ'তে তোমারে সিষ্টানে;
শয্যাতলে মৃতদেহ করিয়া স্থাপন,
বৃদ্ধ পিতা, বন্ধু সহ প্রকাশিব শোক;
সেই তব প্রিয় দেশে করিয়া সমাধি,
উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপে আবরিব দেহ;
রচিব সমাধিস্তম্ভ উচ্চ তদুপরি;
রহিবে তোমার নাম জাগ্রত সংসারে!
ছাড়ি দিব তব সৈন্যে, যাবে নিরাপদে
অতিক্রমি আমু; বিনাশি তা' সবে আর
কি ফল আমার! ঘোর শত্রুদল মম,
প্রতিযোধগণ, যাহাদের মৃত্যুপথে
পশিলাম আমি এই যশের মন্দিরে,—
সামান্য মানব, তবু সামান্য সৈনিক,
দীন, যশোহীন আমি—যদি সে সকল,
নিহত আমার রণে পাইত জীবন,
বৎস প্রিয়তম! তুমি যদ্যপি বাঁচিতে,
নাশিতাম সে সবারে! অথবা যদ্যপি
অজ্ঞাত তোমার করে রস্তম্ আহত,
পড়ে এ মুহূর্ত্তে এই রক্তাক্ত সৈকতে
মুমূর্ষু, জীবন দগ্ধ বাহিরায় তাহে,
তুমি রস্তমেরে লহ বহিয়া সিষ্টানে,
করেন জনক শোক পুত্রের মরণে,
বলেন;—"তাদৃশ শোক নাই তব তরে,
ইচ্ছা করি নিজমৃত্যু আহ্বানিলে,তাত!
জানি আমি!" নাশিতাম তবে সে সবারে!
যৌবন যাপিনু যুদ্ধে, ভীষণ হত্যায়,
রঞ্জিত বার্দ্ধক্য মম শোণিতে,সমরে ;—
কভু না হইবে শেষ দারুণ জীবন!"
উত্তরিল পিতৃবাক্যে সোরাব মুমূর্ষু ;—
সত্যই জীবন তব নিতান্ত ভীষণ,
বীরবর! কিন্তু, কর শান্তির ভজনা;
খসরুর আর আর সচিবের সনে,
প্রিয় সম্রাটের তব সাধিয়া সমাধি,
নীল নীরনিধি-বক্ষে আরোহিয়া পোতে,
ফিরিবে স্বদেশে যবে, যাবৎ সে দিন,
ছাড় এ বাসনা,পিতঃ! রহ শান্তমনে!"

অনিমেষ সোরাবের নিরখি বদন,
কহিলা রস্তম্ ;—"বৎস! আসুক সে দিন
শীঘ্র! অতল, অগাধ হ'ক সে সাগর;
নিতান্তই এই যদি ভাগ্য রস্তমের,
জ্বলুক এ জীর্ণ হৃদে শোকানল জ্বালা!"

কহিলা রস্তম্ হেন। পিতৃমুখ চাহি,
ঈষৎ হাঁসিল যুবা; ধরি শক্তি করে,
দেহ হ'তে মহাশূল করিল বাহির,
নিবিল বেদনা তীব্র; কিন্তু ক্ষত-মুখে,
ভাসাইয়া যুবকের নবীন জীবন,
বহিল শোণিত বেগে,সুলোহিত স্রোতে,
সোরাবের পার্শ্বদেশে,কর্দ্দমিত, ম্লান ;—
যেন সদ্যো-বৃন্তচ্যুত ধবল কমল,

ধূলিমাখা, ফেলি গেছে সরসীর তীরে,
শিশুগণ, ডাকিলেন জননী যখন,
ভানুকর হ'তে শীঘ্র পশিতে ভবনে।
মস্তক হইল নত, অবয়ব সব
প'ড়িল শিথিলসন্ধি; রহিল সোরাব,
নিশ্চেষ্ট, মুদিতনেত্র; শেষ দীর্ঘশ্বাসে
কাঁপিল শরীর যবে, দিল প্রাণশক্তি,
মেলিল যুবক নেত্র, জনকের মুখ
চাহিল কাতরভাবে নির্নিমেষ আঁখি;
কতক্ষণে শক্তি সব পাইল বিলয়;
অনিচ্ছায় জীব-আত্মা ছাড়ি বীর দেহ—
সুখময় অট্টালিকা, প্রফুল্ল যৌবন,
সুখভরা ধরাতল—সব পরিহরি,
অনুতপ্ত, পলাইল মৃত্যুর শাসনে।
এরূপে সোরাব মৃত রহিল পড়িয়া
শোণিতাক্ত সে সৈকতে; মৃত কলেবর
ঢাকিল রস্তম্ ধীর স্বীয় আচ্ছাদনে;
রহিলা বসিয়া মৃত তনয়ের পাশে;—
অত্যুচ্চ প্রাসাদস্তম্ভ দৃঢ়, বহুকাল
বহি অট্টালিকা শিরে, দৃপ্ত মহাবলে,
জীর্ণ পড়িয়াছ যেন এবে ভগ্নশেষে
স্তূপাকারে, গিরিপার্শ্বে অবনতশির।
হেনকালে আইলা রজনী তমস্বিনী;
অদৃশ্য হইল সৈন্য, মরু সুগম্ভীর,
পিতা পুত্র দুই জন, শূন্য, জল, স্থল,
তিমির-অঞ্চলপাশে; আঁধার কুহেলী
ছাড়ি আমুনীর-গৃহ আসি ধীরে ধীরে
মিলিল সঙ্গিনী সনে। অকস্মাৎ তবে,
মহাসভা-ভঙ্গে যেন মহা কলরব,
পূরিল গগনগর্ভ ঘোর কোলাহলে;—

ফুটিল দীপের শিখা কুঝটী আঁধারে,
ধবল বসনে যেন হীরকের পাঁতি;
চলিল উভয় সৈন্য শিবিরনিবাসে,—
পারসীকদল, মুক্ত সৈকত-প্রান্তরে
দক্ষিণে, আমুরতীরে তাতারবাহিনী;
ভোজন করিল সবে, নিভৃত প্রান্তরে
রহিল রস্তম্‌মাত্র মৃত সুত সনে।
সুগম্ভীর আমু, ভেদি কুহেলীতিমির,
বাহিনীর কোলাহল, ধাইল প্রবল
তারালোক-প্রকাশিত তুহিন প্রদেশে;
কতদূরে ফিরি, যায় শান্ত মরুপথে
হরষিতা, সুসজ্জিতা কৌমুদীভাতিতে;
পরে, ধ্রুবতারামুখে ছুটিলা চঞ্চলা
অতিক্রমি তীরে কত পর্ব্বতের শ্রেণী,
পশিল সৈকত ভূমি, বালুকার স্তূপ
রোধিল স্রোতের গতি; শিথিলা তটিনী
চলি গেলা কত পথ মন্দ মন্দ গতি
দূর, দূরপথ কত, আলু থালু বেশে,—
কভু বালুকার স্তরে, কভু গুল্ম পথে—
বহিলা তটিনী;—ত্যজি ক্রোড় পামীরের
শিলাময়, ছিন্ন ভিন্ন বিকৃতশরীর,
হীনগতি, এবে নদী পতিগৃহ-পথে;
কতক্ষণে শুনে ধনী ভৈরবকল্লোল
সাগরের—
চির আশা; দেখে কত দূরে,
সুচিক্কণ সাগরের সলিল-আবাস;
উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি গৃহতল-দেশে,
সদ্যঃস্নাত নীলনীরে বিস্তারিছে প্রভা,
করিয়াছে সমুজ্জ্বল আরাল সাগর!

সম্পূর্ণ।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা-কুঞ্জ।

বিরামে।

চাঁদিনী ফুটেছে নিরালা সাঁঝেতে
শান্তি এসেছে দ্বারে।
দিবসের কাজ সারাবেলা যুঝি'
নিথর ক্লান্তি ভারে।
বিরাম ডাকিছে মোহন সুরেতে
এস গো বিশ্ব এস।
আবরণ ফেলি সঙ্কোচহীন
যে যার ভাবেতে বস।
মম, আকুল হিয়ার মর্ম্মর তানে
ভাসিছে রাগিণী শত,
সারাটা বিশ্বে তোমার মুরতি
খুঁজিতেছি অবিরত।
বাঁশীর সুরেতে তব আলাপন
শ্রবণ শুনিতে চায়
চাঁদের আলায় তব রূপরাশি
নয়ন দেখিতে ধায়।
ফুলের মাঝারে তোমার সুবাস
নাসিকা খুঁজিতে যায়
সমীর পরশে তব পরশন
দেহ অনুভূতি পায়;
মম, সাধ্য নাহিক সাধনা নাহিক
তোমারে পাইব আমি
এমন সময় নয়ন সমুখে
হে মোর জীবন স্বামি!
শুধু মনে হয় হিয়ার মাঝারে
তোমার মুরতিখানি
পূজি অবিরত মম সাধ যত
বাহির করিয়া আনি।

শ্রীউমাচরণ ধর।

প্রাণের গান।

দয়াময়ী প্রকৃতির দয়া দৃশ্যে যদি
হয়ে প্রাণ তন্ময় গো তায়,
তুমি স্বর লহরীর অনন্ত উচ্ছ্বাস
মর্ম্মে ধ্বনি কি সঙ্গীত গায়!
"যদি হইতাম শ্যাম বটপত্র আমি
ছায়াদানে রৌদ্র-দগ্ধ জনে
দিতাম আশ্রয়, শান্তি মরেও ঝরিয়া
বসিবার দিতাম আসনে।
পান্থ-পাদপ যদি হ'তাম মরুর,
পথ-শ্রান্ত ক্লান্ত তৃষাতুরে
দিতাম বিদারি বক্ষ স্নিগ্ধ স্বচ্ছবারি,
কি আনন্দ হ'ত তা' পিয়েরে?
যদি হইতাম বংশ, হ'য়ে খণ্ডীকৃত
হইতাম যষ্টি দৃঢ়তর;
কত অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ পেত চলচ্ছক্তি
মোর'পরে করিয়া নির্ভর।
যদি হইতাম আমি নিম্ব বৃক্ষ ভবে,
দিয়ে ত্বক দিয়ে পত্ররাশি
বাঁচাতাম কত রোগ-দগ্ধ অভাগায়,
ম্লান মুখে আনিতাম হাসি।
দীর্ঘকায় তালপত্র যদি হইতাম,
দরিদ্রের হ'ত উপকার;

বুক পেতে কুটীরের ছাউনী হইয়া
দিতাম আশ্রয় থাকিবার।"
দয়াময়ী প্রকৃতি গো। এক বৃক্ষ তব
খুলে দেছে রুদ্ধ হৃদি-দ্বার;
তব বায়ু নির্ঝরিণী, রবি, শশী আদি
শিক্ষাগুরু প্রণম্য আমার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

কে?

এমন করে' কে আসে যায়
আমার হিয়া মাঝে;
শুনি কাহার নূপুর ধ্বনি,
বাঁশি কাহার বাজে।
ফুল গুলি কা'র পরশ পেয়ে
মেলে মুদিত আঁখি,
কা'র সাড়াতে প্রাণের পিক
ওঠে এমন ডাকি'।
সুরভি কা'র আকুল করে
কিছুই বুঝি না যে,
শুধুই প্রাণে কে আসে যায়
জানিনা কোন্ কাজে।

প্রার্থনা।

তুমি যে গো নাথ, ডেকেছ আমারে
জানি তাহা আমি জানি
ছেয়েছ আমারে করুণার ধারে
কেমনে তাহা না মানি?
রবি শশী ঘুরে তোমার আকাশে
শত বার মোরে ডাকে তব পাশে
ধরার মধুর স্নিগধ শ্যামলে,
মিলন তোমার হাসে
কত পথ তুমি দিয়েছ খুলিয়া
যাইতে তোমার পাশে।
বাতায়ন হ'তে দেখে চেয়ে চেয়ে
কত শত লোক চলিয়াছে ধেয়ে
চলিয়াছে তব পানে;
আমি শুধু হেথা বসি' গৃহকোণে,
তিলে তিলে হায় লভি গো মরণে
ব্যথিত কাতর প্রাণে।
তুমি কোথা আছ আমি কোথা আছি,
লয়ে' চল প্রভু আরো কাছাকাছি,
যেন, আমি গো তোমারে পাই;
যাক্ ভালবাসা সাধের কাঁদন
যাক্ মিছে সব মোহের বাঁধন
তাহে মোর দুখ নাই,
যদি, তোমারে গো আমি পাই।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

কোথা যাও?

কোথা যাও প্রিয়তম কোন অমরায়।
স্তিমিত এ বিশ্ব-ছবি, অস্তাচলে যায় রবি
তুমি কেন সাথে তার। যেতেছ কোথায়।
এস এস, ফিরে এস মিনতি তোমায়।
এখনি যে বসুন্ধরা, হইবে আঁধারে ভরা।
সে আঁধারে যমচর ফিরে পায় পায়।
এস ফিরে ওগো সখা, ধরি দুটী পায়।
ওই যে সাঁঝের কাক, ডাকিছে ভীষণ ডাক,
আকুল পেচক-রব বকুল-শাখায়—
সকলি ভয়াল দৃশ্য হৃদয় শুখায়।
এত স্নেহ প্রীতি ছাড়ি, আঁধারিয়া ঘরবাড়ী
প্রাণাধিক প্রিয়তম কার কাছে যায়।
এস হে আমার বুকে, আমি ঘুম-হারা চোখে
তোমা' তরে সারানিশি র'ব প্রহরায়
দুঃখিনী যে সব দিয়ে লুটায়েছে পায়।
এ আঁধারে প্রাণসখা, আর কি দিবেনা দেখা।
অমূল্য মাণিকরত্ন ফেলিনু কোথায়।
হা অদৃষ্ট। ভগবন্। কি করি উপায়।

শ্রীমতী পুষ্পমালা দেবী।